বাংলার নামে

পরিচয়

মাঘ। ১৩৬২

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান ॥

বাংলার [illegible], বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
হে ভগবান ॥

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,
হে ভগবান ॥

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যতো ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান ॥

॥ সম্পাদকীয় ॥

বাঙলার বিলুপ্তি

গত ২১শে জানুয়ারী পশ্চিমবাঙলার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার জনসাধারণ যে শান্ত মর্যাদার সঙ্গে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের স্বপক্ষে আপনাদের প্রতিবাদ ঘোষিত করেছেন, সর্বাগ্রে সেজন্য তাঁদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। অন্যায় যখন মানুষের সমস্ত নিবেদনকে পদদলিত করে চলে তখন হতাশ মানুষের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। পূর্বে অন্ধ্রে, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ও উড়িষ্যায় আমরা তা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। তাই বাঙলার প্রতিবাদে সংযম ও শুভবুদ্ধির সংযোগ দেখে আমরা গৌরব বোধ করেছি।

কিন্তু ন্যায় ও জনমতে যাদের আস্থা নেই, মানুষের সংযম ও শুভবুদ্ধিকে তারা মর্যাদা দেবে কেন? তাতে তাদের বরং দুঃসাহসই বেড়ে যায়। নইলে ২১শের প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি শেষ হতে না হতেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বাঙলা বিলোপের প্রস্তাব নিয়ে কলকাতায় পদার্পণ করলেন কি করে? বিহার বিলোপের প্রস্তাব নিয়েই বা পাটনায় উপস্থিত হলেন কি করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ—যে বিহার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে ১৯১২তে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল? এ কোন দুঃসাহস যে দুই মুখ্যমন্ত্রীর একজনাও দুইটি রাজ্যের বিলোপের প্রস্তাবে অনায়াসে অঙ্গীকার করেন একবারও রাজ্যের জনমত সংগ্রহ না করে? আর এ-ই বা কোন্ গণতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক বোধের পরিচয় যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই ইতিহাসবিরোধী জাতি-নাশী প্রস্তাবকে সাড়ম্বরে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেসের মারণ-

এত অকস্মাৎ উত্থাপন করে এত তাড়াতাড়ি আইন-সভায় পাশ করিয়ে নেবার চেষ্টা বোধ হয় কার্জনও করতেন না, ইতিহাসেও অশ্রুতপূর্ব। কেন? লোকমত-সংগ্রহে আপত্তি কেন? কেন অদূরের নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে এ-প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হতে আশঙ্কা? কেন জনসমাজের সম্মুখে মুখ দেখাতে দ্বিধা?

কার স্বার্থে, কার কল্যাণে বাঙলার বিলোপ, বিহারের বিলোপ? ভারতবর্ষের? সে তো দেখেছি—এ নীতি ভারতদ্রোহ—ভারতের সমস্ত সাধনার অস্বীকৃতি। বাঙলা-বিহারের অর্থনৈতিক বিকাশ? উদ্বাস্তু বাঙালীর পুনর্বাসনের সুবিধা? এখনই বা তাতে বাধা জুটছিল কেন? বাঙলা ও বিহার দুই-ই তো ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে সংযুক্ত; তবে আবার নতুন করে কি সংযুক্ত হবে? ডাঃ রায়-সিংহদেরই 'মার্জার' নীতিতে? আর এখন যদি ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দুই ভ্রাতৃরাষ্ট্র হয়েও—ভারতব্যাপী কেন্দ্রীয় শাসনের অধিকর্তৃত্ব সত্ত্বেও—তারা অর্থনৈতিক বিকাশে একমত হতে পারে না, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কলহ করে, তাহলে দু রাজ্যকে কাল এক করে দিলেই বা তাদের মতের ঐক্য স্থাপিত হবে কি করে? উদ্বাস্তুর ভাগ্যে চাষযোগ্য জমি বা জীবিকার পথ খুলে যাবে কোন্ প্রান্তে—জনবহুল বিহারের নিরন্ন জনসংখ্যা নিজেরাই যখন কলকাতার কলে-কারখানায় ছাড়া বিহারে জমি দেখে না, জীবিকার সামান্য পথও পায় না? আর বাঙালী ও বিহারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ মিলিয়ে যাবে কোথায়, যতক্ষণ উভয়ে নতুন সমাজের পত্তন করতে না পারছে? বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত তা-ই হবে যা এখন হচ্ছে মানভূমে-পূর্ণিয়ায়।—এখনো তো মানভূম ঐ 'মার্জার-নীতি'র ফল ভোগ করছে; আর ১৯১২ পর্যন্ত তো বিহারও ফলভোগ করেছে এরূপ 'মর্কটনীতির'।

আমরা জানি—বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পশ্চিমবাঙলার কংগ্রেস-নেতৃত্ব বাঙালী মধ্যবিত্তকে এই প্রলোভন দেখাবেন, 'হ[illegible]র জোরে আমরা বিহারকে চরিয়ে খাব।' আর বিহারের কংগ্রেস নেতৃত্ব বিহারীদের বোঝাবেন, 'সংখ্যার জোরে আমরা কলকাতা ও পশ্চিম বাঙলা হস্তগত করব।' ঘৃণার সঙ্গেই এই প্রবঞ্চনার স্তোকবাক্যকে প্রত্যাখ্যান করবে বাঙালী ও বিহারী শিক্ষিত বা সাধারণ মানুষ। কারণ, ধিক্ সেই বাঙালীত্বে যে বিহারকে শোষণের মিথ্যা আশা পোষণ করে। ধিক্ সেই বিহারীত্বে যে বাঙলাকে শাসনের এই মূঢ় আশা মনে স্থান দেয়। মনে রাখবেন তাঁরা পূর্ব বাঙলার মুসলমানের কথা—ঢাকার পথে তারা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় আত্মদান করেছে। পশ্চিমবাঙলাও রক্তে [illegible] যাবে, তবু তার বাঙালীত্বকে বিসর্জন দেবে না। বিহারের সম্বন্ধে [illegible] নিশ্চয়ই 'বুদ্ধিবাদী' শোষকের এই [illegible] নীতিকে [illegible] মাটিতে মিশিয়ে দেবে—এও আমরা আশা করব। কিন্তু আমরা জানি—বাঙলা-বিহার দুই রাজ্যেরই [illegible] শিল্প—সব ইংরেজ ধনিক ও টাটা-বিড়লা-গোষ্ঠীর সম্পত্তি—অর্থাৎ বাস্তবে দুই-ই পরবাসী।

শেষ কথা, আজও আমরা [illegible] দুই রাজ্য 'একাকার' হবে। [illegible] না করে প্রস্তাবটিকে আইন-সভায় গ্রাহ্য করানো হচ্ছে—ধনিকতন্ত্রের অভিসন্ধি। নীতি হিসাবেই [illegible] হবে জনসাধারণের বর্জনীয়। সমস্ত জনমতকে অগ্রাহ্য করে [illegible] হয়তো কংগ্রেস সদস্যরা এই দেশদ্রোহে সম্মতি দেবেন। যদি তা হয়, তখন বাঙলা-বিহারের জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে হবে 'স্বদেশী' আমলের মতো প্রতিবাদের ঝড় তুলবার জন্য, প্রতিরোধের অনমনীয় প্রাচীর গড়বার জন্য আর উদ্দীপ্ত শান্ত পৌরুষে আত্মদানের জন্য।

উচাটন যন্ত্রকে এই অন্যায় উদ্দেশ্যে এমনভাবে প্রয়োগ করেন? সম্ভবত জনমতের সুশৃঙ্খল মর্যাদাময় প্রকাশের অপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খল ক্ষিপ্ত প্রকাশকেই তাঁরা গুরুত্ব দিতে শিখেছেন।

অন্তত সন্দেহমাত্র নেই, বাঙলা-বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরা পরোক্ষে এই প্ররোচনাই দুই রাজ্যের উত্ত্যক্ত জনসাধারণকে দিয়ে নিজেদের অপচেষ্টা ও অন্যায়ের সমর্থন খুঁজছেন। সংকল্পে ও সংযমে সুদৃঢ় বাঙালী জনসাধারণের আজ তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন—কংগ্রেস নেতৃত্বের এই ঘৃণিত অভিসন্ধি ও ভয়াবহ অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করা; দুর্জয় শৃঙ্খলা ও দৃঢ়সংকল্পের বলে বাঙালীর রাজ্য, বিহারীর রাজ্য, বাঙলার নাম, বিহারের নাম ভাষার ভিত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা; ভারতের সমস্ত জাতি-উপজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতীয় মহাজাতির সংহতি ও আত্মবিকাশ সুনিশ্চিত করা; ভারতের ইতিহাসের প্রধানতম সত্য, বাঙালীর সংস্কৃতির প্রিয়তম সাধনা—বিচিত্রের মধ্যে একের প্রকাশ—রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনে অনমনীয় প্রতিজ্ঞায় উদ্‌যাপিত করা।

এমন বাঙালী আমরা কে আছি যে জানি না, আমরা ভারতবর্ষের সন্তান? যে জানি না, ভারতীয় মহাজাতির সাধনা আমার সাধনা—বিহারের সৌভাগ্যে, আসামের সৌভাগ্যে, উড়িষ্যার সৌভাগ্যে আমার সৌভাগ্য? এমন বিহারী, এমন অসমীয়া, এমন ওড়িয়াই বা কে আছেন যিনি বিস্মৃত হবেন বাঙালীর সুখ, বাঙালীর দুঃখ তাঁর সুখ নয়, তাঁর দুঃখ নয়; ভারতীয় মহাজাতির যে-কোনো একটি অঙ্গ হীনবল হলে তিনিও হীনবল, তিনিও দুর্বল না হন? যদি থাকেন সে বাঙালী নিশ্চয়ই দেশদ্রোহী, সে বিহারী নিশ্চয়ই দেশদ্রোহী, সে অসমিয়া, সে ওড়িয়াও দেশদ্রোহী। কিন্তু এমন বাঙালী বা বিহারী কে আছেন যিনি মনে করেন—তাঁর বাঙালী সত্তার বিলোপই ভারতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে প্রয়োজন,

বিহারের বিলোপে ভারতীয় সংহতি সম্ভব, বিহার-বাঙলাকে 'একাকার' করে না দিলে ভারতবর্ষের ঐক্য স্থাপিত হবে না ;—ভারতবর্ষ শুধু ইউরোপীয় ছাঁচে-ঢালা একটা সর্বগ্রাসী 'নেশন', ভারতবর্ষের আপন সাধনায় আপন বৈশিষ্ট্যে বিকাশমান একটা মহাজাতি নয়, আগামী দিনের মানব-মহামৈত্রীর প্রথম উদার স্বাক্ষর নয় ?—এমন কেউ থাকলে তিনি শুধু বাঙলাদ্রোহী, বিহার-দ্রোহী নন, তিনি ভারতদ্রোহী, ইতিহাসদ্রোহী, ন্যায়-ও-সত্যদ্রোহী।

এই ইতিহাসদ্রোহের অভিসন্ধি নিয়েই কি লর্ড কার্জন বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন ? তবু তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাত্র বিভাগ করা, বাঙলাকে বিলোপ করা নয়। কার্জনী চক্রান্তই সাম্রাজ্যবাদী কুটিল পথে সার্থক হয়েছিল ১৯৪৭ সালে যখন স্বেচ্ছায় আমরা আইন-সভায় তা মেনে নিলাম। আজ আর পূর্ব বাঙলা 'পূর্ব বাঙলা' নয়, 'পূর্ব পাকিস্তান' ; রক্ত দিয়েও পূর্ব বাঙলার বাঙালী ভাইবোন এখন পর্যন্ত তাঁদের বাঙালী সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে উঠতে পারেন নি। অথচ সেই কার্জনী চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকস্বার্থবাদের কুটিলতর ইঙ্গিতে আজ পশ্চিমবাঙলার ও বিহারের সম্পূর্ণ বিলোপের প্রস্তাব তুলেছে কংগ্রেস মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মুখ দিয়ে। লর্ড কার্জন যা করতে পারেন নি, ডাঃ বিধান রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তা-ই করতে চান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা কার্যে পরিণত করতে পারে নি, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর কংগ্রেস-চক্র তা-ই করতে অগ্রসর। বাঙলা বলে কোনো দেশ আর থাকবে না, এই তাদের উদ্দেশ্য। পণ্যোপজীবী সংবাদপত্র-মালিকের সহায়তায় ও ক্লীবত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেসী সদস্যদের ভোটের জোরে ছাড়া এই কার্জনী-চক্রান্তকে কোনোরূপেই এই কংগ্রেসী-নেতৃত্ব দেশের মাথায় চাপিয়ে দেবার পথও পান না। এত বড়ো বিপর্যয়কারী প্রস্তাব

এ আলোয় চোখ মেলে দেখেছি যে সবুজ আকাশ,
দিগন্তের নীল গ্রাম, চষামাঠে তামাটে কৃষাণ ;
শুনেছি বুকের পাশে সলজ্জ যে বধূর নিশ্বাস,
ভোরের বাউল আর শান্তিখোঁজা সন্ধ্যার আজান ।
এ ধুলোয় জন্মে যতো পূর্বপুরুষের স্পর্শ লাগে,
যতো বীর রুক্ষ দিনে ভেঙে গেছে যন্ত্রণা-পাহাড়,
জীবনের তৃষ্ণা দিয়ে যতো কবি ভরেছে সংলাপ,
তাদের সবার নামে বলি ঃ মৃত্যু নেই এ বাংলার ।
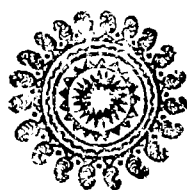
সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতিবাদ

[প্রতিবাদে পরিচয়ের পাঠকদেরও স্বাক্ষর দেবার জন্য অনুরোধ জানাই প. স.]।

বাঙলা ও বিহার একীকরণের প্রস্তাবে আমরা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতেছি। ভাষাভিত্তিক প্রদেশের যে ন্যায্য দাবি লইয়া সারা ভারতবর্ষে মুক্তিকামী জনসাধারণ জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, এই প্রস্তাব তাহাকে অস্বীকার করিতে চাহিতেছে। আমরা ইহার তীব্র বিরোধিতা করিতেছি।

বাঙলাদেশ ও বাঙলাভাষা কোনদিনই প্রাদেশিক সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাঙালী অকাতরে আত্মবলি দিয়াছে, সারা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য চিরদিন ভারতের ঐক্যকে শক্তিশালী করিয়াছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের ঐক্য যেমন অবশ্যপ্রয়োজন, তেমনি এই বিরাট বিচিত্র দেশে জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া সংহতি আনিবার চেষ্টা শুধু যে ভুল তাহা নহে, ভারতবর্ষের সংহতি বিনাশের তাহাই প্রকৃষ্টতম উপায়।

বিরাট মহানদীর মতো বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা যে নানাজাতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের জলধারায় পরিপুষ্ট সেই শাখাপ্রশাখা বন্ধ করিয়া দিলে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারাই শুকাইয়া যাইবে। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, বিহার ও বাঙলা একীকরণের যে প্রস্তাব আসিয়াছে, তাহাতে এই বিকাশ ব্যাহত হইবে, দৈনন্দিন শাসনকার্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে না। মানবমঙ্গলের উদ্দেশ্যেই শাসন-ব্যবস্থা—শাসনকার্যের কতকগুলি কল্পিত সুবিধার কথা ভাবিয়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নহে। আমরা তাই দাবি করিতেছি, ভাষার ভিত্তিতে বাঙলাদেশকে পুনর্গঠিত করিয়া ভারতের সংহতি অটুট রাখা হউক।

যুগে পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থার জন্য জমি তৈরী হতে থাকলেও নতুন ব্যবস্থার যে মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা, তা তখনও আইনসঙ্গত স্বীকৃতি লাভ করেনি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথার্থ উৎপত্তিকাল তাই ১৭৭৫ থেকে ১৭৯৩ সাল। বলা বাহুল্য, আগের পর্যায়ের ভাঙনের কাজ এই যুগেও চলেছে: পুরানো জমিদারি ব্যবস্থার চূড়ান্ত সর্বনাশ এই যুগেই ঘটে, সেচের অভাবে গ্রাম্য কৃষিব্যবস্থায় নিদারুণ সংকট দেখা দেয়, একাধিক দুর্ভিক্ষ বাঙলা ও বিহারে বিপর্যয় আনে, এবং কৃষকদের মধ্যে বেকারি ও দারিদ্র্যের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পুরানো ব্যবস্থার ধ্বংসলীলার মধ্যেই এই যুগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিকে এগিয়ে গেছে দুদিক থেকে: প্রথমত, এই যুগেই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয় এবং ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে তা আইনে পরিণত হয়; দ্বিতীয়ত, বাঙলার কৃষিব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের অবাধ বাণিজ্যের আওতায় এসে পড়ার ফলে গ্রাম্য-শিল্পের ধ্বংসের সূচনা দেখা যায় এবং কাঁচামালের জন্য এদেশের অর্থনীতির উপর ইংল্যাণ্ডের শিল্পস্বার্থের চাহিদার চাপ ক্রমেই বাড়তে থাকে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তনের এই আঠারো বছরের ইতিহাসকে দুই পর্বে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে (১৭৭৫-৮৫) বাংলার কৃষিসমস্যা যতই ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের আওতায় এসে পড়ে, ততই শিল্প-স্বার্থের মুখপাত্রদের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন এদেশের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু হয়, তেমনি অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ডে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার কেড়ে নেবার জন্য শুরু হয় পার্লা-মেণ্টারী সংগ্রাম। পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪) এবং ম্যাকফারসনের শাসনব্যবস্থায় (১৭৮৫-৮৬) এই পর্বের শেষ। দেখা যাবে যে কোম্পানির বিরুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যের অভিযান এবং যৌথ কৃষিস্বত্বের বিরুদ্ধে জমিদারি মালিকানার আক্রমণ, এই দুই চেষ্টাই আপাতত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একটা মাঝামাঝি আপোসে এসে থেমে যায়। দ্বিতীয় পর্বের (১৭৮৫-৯৩) বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তত্ত্বকে প্রথমে বিহারের মোকারারি বন্দোবস্তে এবং তারপর বিহার ও বাঙলার দশসালা বন্দোবস্তে কার্যকরী করার চেষ্টা, এবং ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থেই শেষ পর্যন্ত দশসালা বন্দোবস্তের

ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আইনে পরিণত করা।

বাণিজ্যধনবাদ থেকে অবাধবাণিজ্যবাদ

১৭৬৫-৯৩ সালে যেমন বাঙলার কৃষিবিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছিল, তেমনি ঠিক এই যুগেই ইংল্যাণ্ডেও শিল্পবিপ্লব কদমে কদমে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই দুটি বিপ্লবের ঐতিহাসিক পরিণতি ছিল পরস্পরবিরোধী: আঠারো শতকের শেষ তিরিশ বছরে ইংল্যাণ্ড ঠিক যতখানি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে দূরে সরে আসে, বাঙলাদেশ ঠিক প্রায় সেই অনুপাতেই সামন্তবাদের দিকে আরও এগিয়ে যায়। কিন্তু বিপরীত অর্থে হলেও বিপ্লবের চাকা উভয়তই পুরো এক চক্কর ঘুরেছে: ওদেশে—কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে, বাণিজ্যধনবাদ থেকে অবাধ-বাণিজ্যবাদের দিকে; এদেশে-যৌথ কৃষিস্বত্ব থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার দিকে, প্রাচ্যের পুরানো নবাবী সামন্তবাদ থেকে পাশ্চাত্ত্যের বণিক-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ঢালাই নয়া-সামন্তবাদের দিকে। কিন্তু বিপরীতমুখী হলেও পরিবর্তনের এই দুটি ধারার মধ্যে প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

১৬৯০ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দুশো বছরের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ইতিহাসকে চার পর্যায়ে ভাগ করে বার্নাল বলেছেন যে তার "দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৭৬০-১৮৩০) সত্তর বছরের গুরুত্ব বিজ্ঞানেও যতখানি রাজনীতিতেও ততটা।" এরই মধ্যে আবার ১৭৬০-১৮০০ এই চল্লিশ বছর সবচেয়ে ঘটনাবহুল। "প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ফলাফলের দিক থেকে এই যুগ সতেরো শতকের বৈজ্ঞানিক গুরুত্বকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যায়। ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে এই যুগেই।......আঠারো শতকের শেষভাগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে পুঁজিবাদী আবিষ্কারসমূহের মিলন ঘটে, এবং সেই প্রক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উৎসারিত হয় তাই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদে ও বিজ্ঞানে এবং সেই সঙ্গে সারা দুনিয়ার মানুষের জীবনেও রূপান্তর ঘটায়।" ২

ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের শুরু বস্ত্রশিল্পে। ১৭৬৪ সালে স্পিনিং-জেনি উদ্ভাবন করে হারগ্রীভ্‌স্ বয়নশিল্পে যে পরিবর্তন আনেন, পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যেই তার গতি আর্করাইট ও ক্রম্পটনের প্রতিভাবলে বস্ত্রশিল্পের

অন্যান্য বিভাগে সঞ্চারিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে কয়লা ও লৌহশিল্পেও অনুরূপ অগ্রগতি দেখা যায়। এ যুগের বিজ্ঞানে সবচেয়ে বৈপ্লবিক দান বাষ্পশক্তির। ১৭৬৫ সালে ওয়াট্‌সের স্টীমইঞ্জিনে যে বিপ্লবের সূচনা হয় তারই প্রত্যক্ষ পরিণতি ১৭৮৫ সালে কার্টরাইটের বাষ্পচালিত তাঁতের প্রবর্তন। এইভাবেই বৃহৎশিল্প ও লঘুশিল্পের দুই স্বতন্ত্র ধারা যুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিল।

"এর ফল হল একদিকে সমস্ত কারখানাজাত পণ্যের মূল্যহ্রাস, শিল্প-বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ, অরক্ষিত সব পণ্যের বাজার জয় করে নেওয়া, মূলধন ও জাতীয় সম্পদের আকস্মিক বৃদ্ধি; অপরপক্ষে, আরও দ্রুতহারে শ্রমজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, শ্রমিকশ্রেণীর যাবতীয় সম্পত্তি নাশ ও রুজির অনিশ্চয়তা," ইত্যাদি...।[৩]

ব্রিটিশ অর্থনীতি ও সমাজের এই পরিবর্তন অবশ্যই অনিবার্যভাবে তার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্র ধরে উপনিবেশে হানা দিল। মূলধন তার কৈশোরের বাণিজ্যধনবাদ থেকে বেপরোয়া যৌবনের দিকে অবাধবাণিজ্যের রাস্তায় পা বাড়াল। কারখানাজাত পণ্যের অব্যাহত রপ্তানি ও কারখানায় জোগান দেবার জন্য কাঁচামালের অবাধ আমদানির উপর তখন ব্রিটিশ শিল্পের জীবন-মরণ নির্ভর করে। ফলে, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির যে গুরুতর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে উঠল, তার চাপ পড়ল কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ে ও বাঙলার বস্ত্রশিল্পের উপর। ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিতে কৃষিস্বার্থ ও শিল্পস্বার্থের যে কঠিন সংগ্রাম তখন চলছিল তারই প্রভাবে একদিকে শুরু হল পার্লামেণ্টের মধ্যে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের মুখপাত্রদের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব ও অপরদিকে, ভারতবর্ষে কোম্পানির সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ বড়লাটের কাউন্সিলে জমির সরকারী মালিকানার নীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার তত্ত্বের সংঘাত।

১৭৭৫ সালের পরেই যে অবাধবাণিজ্য স্বার্থের সঙ্গে বাণিজ্যধননীতির সংঘর্ষ চূড়ান্ত তীব্রতা লাভ করে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবই তার একমাত্র কারণ নয়। ১৭৭৬ সালে আমেরিকা ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে, এবং এই প্রকাণ্ড রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্য, নৌবিধান ও ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। বিশেষ

করে, একটা গোটা সাম্রাজ্য হাতছাড়া হবার ফলে অবাধ বাণিজ্যের চাপ অখণ্ডভাবে এসে পড়ল ভারতীয় উপনিবেশে। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে বাণিজ্যধনবাদের সংকটের প্রসঙ্গে কানিংহামের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"আমেরিকান উপনিবেশগুলি যখন মাতৃদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করল, তখন আমাদের পোতবাহী বাণিজ্যের সমগ্র প্রকৃতি অনিবার্যভাবেই পরিবর্তিত হল; সামুদ্রিক বাণিজ্যে উৎসাহ দেবার জন্য আগে যে সব আইন করা হয়েছিল, নতুন পরিবর্তিত অবস্থায় তার প্রয়োগ আর সম্ভব হল না, এবং এইভাবে বাণিজ্যধনবাদী ব্যবস্থার আরও একটা প্রকাণ্ড বিভাগকে আবার ঢেলে সাজতে হল।······নানা নিষেধের দ্বারা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করায় কার্যক্ষেত্রে যে সব গুরুতর বিপদ দেখা দেয়, বাস্তব ও ব্যবহারিক যে ক্ষতি তাতে হয় আডাম স্মিথের রচনাবলী সেসব কথা জনসাধারণের মনে গভীর-ভাবে মুদ্রিত করে দিল।"[৪]

একাধিকার বনাম অবাধবাণিজ্যবাদ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে অবাধবাণিজ্যবাদের আক্রমণ আডাম্ স্মিথের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষার্ধের অনেক পুস্তিকায় তার সাক্ষ্য আছে। ১৭৬৬-৬৭ সালে চ্যাথামের মন্ত্রিত্বকালে যখন একবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রসঙ্গ পার্লামেণ্টে ওঠে তখন জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক "দি অ্যাবসোলিউট নেসেসিটি অব্ লেইং ওপ্ন্ দি ট্রেড টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ" (লণ্ডন, ১৭৬৭) অর্থাৎ "পূর্বপ্রাচ্যের বাণিজ্যকে উন্মুক্ত করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা" নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। শিরোনামার নিচেই পুস্তিকার পরিচয় লেখা আছে এইভাবে :

"প্রামাণ্য বিষয় এই যে যেহেতু [উক্ত উপায়ে] প্রতি বৎসর রাষ্ট্রের রাজস্ব লাভ হবে ৫০ লাখ পাউণ্ড ও চাঁদা ৮০ লাখ পাউণ্ড, যেহেতু প্রজারা অবাধ বাণিজ্যে তাদের জন্মগত অধিকার ফিরে পাবে এবং করভার থেকে নিস্তার পাবে, সেই হেতু কোম্পানির সনদের মেয়াদ চালু রাখার পক্ষে যে কোন প্রস্তাব আসুক তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত; এবং যারা এইরকম প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, তারা প্রজা ও রাষ্ট্র উভয়েরই শত্রু বিবেচিত হবে।"

পার্লামেণ্টে কোম্পানি স্বার্থের প্রভাব যে কী প্রবল সেই প্রসঙ্গে লেখক বলেন :

"পার্লামেণ্টে এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁদের স্বার্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তহবিলের সঙ্গে খুবই সংশ্লিষ্ট ; এবং যেহেতু দেশপ্রেমের চেয়ে তাঁদের আত্মপরতা অনেক বেশি, তাই তাঁরা সম্ভবত যথাসাধ্য **অবাধ বাণিজ্য**কে বাধা দেবেন।"[৫]

যাঁরা কোম্পানির পক্ষে, তাঁরা সামন্তস্বার্থেরই প্রতিভূ :

"পার্লামেণ্টে যাঁরা সারা জাতির প্রতিনিধি হিসাবে যান, তাঁরা সর্বাগ্রে এবং বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই নিজ নিজ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। তার একটি সাম্প্রতিক প্রমাণ হল জমিদারী কর কমানো।"[৬]

লেখক স্বয়ং যে শিল্পস্বার্থের পক্ষে ওকালতি করছেন তারও প্রমাণ আছে ছত্রে ছত্রে। অভিজাতদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ গোপন করার কোন চেষ্টা না করে তিনি সোজাসুজি প্রস্তাব করেছিলেন যে মোমবাতি, দেশলাই, কয়লা, বিয়ার ইত্যাদি নিত্যাবশ্যক পণ্যে কর বসিয়ে জনসাধারণের দুঃখ না বাড়িয়ে কর বসানো হোক দাস-দাসী, কোচোয়ান, ঘোড়া ও অট্টালিকার মালিকদের উপর ; "আরাম ও বিলাসিতার" উপর এই কর জাতিকে ঋণমুক্ত করবে।[৭]

বাণিজ্যধনবাদের পতনের ইতিহাসে কানিংহাম ১৭৭৬ সালকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] কারণ, ঐ একই সালে একদিকে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা ও অন্যদিকে আডাম স্মিথের "ওয়েল্‌থ অব্‌ দি নেশনস" গ্রন্থের প্রকাশের ফলে অবাধ বাণিজ্যের রাষ্ট্রিক ও তাত্ত্বিক জয়ের যুগপৎ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিবিস্তার করতে গিয়ে আডাম স্মিথ তাঁর গ্রন্থের একাধিক অধ্যায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারকে যে নির্মম ভাষায় আক্রমণ করেন, বিদ্রূপে ও তীব্রতায় তা কেবল বার্কের বক্তৃতার সঙ্গেই তুলনীয়।

"মনে হয়, একচেটিয়া বৃত্তিই……বাণিজ্যধনবাদী ব্যবস্থার একমাত্র চালিকা শক্তি।"[৯] এই প্রকার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। কারণ, এই ধরনের একচেটিয়া সংগঠন জাতির প্রধান একটা অংশকেই শুধু বাণিজ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখে তা নয়, উপরন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য দেশের লোকের কাছে যত চড়া দামে বিক্রি করতে পারে তা

কখনোই অবাধ বাণিজ্য থাকলে সম্ভব নয়। "উদাহরণস্বরূপ, ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তনের সময় থেকে ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য অধিবাসীরা বাণিজ্যের সুযোগ থেকে তো বঞ্চিত হয়েছেই, উপরন্তু ভারতবর্ষ থেকে আমদানি পণ্যের ব্যবসায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারজাত মুনাফা তাদের জোগাতে হয়েছে ঐসব পণ্যের ক্রয়মূল্য দিয়ে; তাছাড়া এতবড় একটা কোম্পানির কারবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রতারণা ও অপব্যয়জনিত অস্বাভাবিক অপচয়ের মূল্যও তাদেরই দিতে হয়েছে।"[১০] আডাম স্মিথের মতে তাই, এইসব কোম্পানিগুলি "সব দিক থেকেই একেবারে নির্জলা আপদবিশেষ"—যে দেশের কোম্পানি তাদের পক্ষে যেমন, যে দেশে তার ব্যবসায় সেই দেশেও তেমনি।[১১]

অবাধ বাণিজ্যবাদের এই অভিযানের সঙ্গে তাল রেখেই পার্লামেণ্টের মধ্যেও কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে একটা বিবাদ গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রতিরোধের প্রকাশ দেখা যায় কোম্পানির সনদের মেয়াদবৃদ্ধির বিরোধিতায়। "প্রত্যেক যুগেই সনদের মেয়াদবৃদ্ধির সময় লণ্ডন, লিভারপুল ও ব্রিস্টলের বণিকরা চেষ্টা করেছে কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিকারকে ভেঙে দিয়ে বাণিজ্যের সেই সোনার খনিতে ভাগ বসাতে।"[১২] এই চেষ্টার ফলে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয় ভারতবর্ষ থেকে ও ভারতবর্ষে কিছু কিছু পণ্য আমদানি-রপ্তানি করার। কিন্তু সমগ্রভাবে ধরলে দেখা যায় যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নেবার এই চেষ্টা ১৮১৩ সালের আগে পর্যন্ত তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। ১৭৭৩ সালের আইনে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরা যতটুকু বা সুবিধা পেয়েছিল, তার পরিধিও নানা শর্তে একেবারেই সঙ্কুচিত ছিল। দশ বছর পরে ডান্‌ডাসের খসড়া আইনে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের কোন উল্লেখই ছিল না। ফক্‌সের খসড়া আইনে (১৬৭৩) অবশ্য প্রস্তাব করা হয়েছিল যে কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যাপারের অভিভাবক হিসাবে নয়জন সহকারী পরিচালক পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। কিন্তু ফক্‌সের খসড়া আইন পার্লামেণ্টের অনুমোদন পায়নি। ১৭৮৪ সালে পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে কোম্পানির উপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের দাবি বিসর্জন দিয়েঃ বলা যেতে পারে যে বাণিজ্যমূল্য দিয়ে সার্বভৌমত্ব খরিদ করা হল। এই অর্থেও ১৭৮৪ সালের

আইন রাষ্ট্র ও কোম্পানির মধ্যে একটা রফার ব্যাপার। ফিলিপ্‌স্‌ তাই বলেছেন: "কোম্পানির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ তখন এতই পরস্পর নির্ভর ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো যে নতুন যে-বোর্ড গড়া হল তাকে বাণিজ্যব্যাপারে মাথা গলাবার কোন অধিকার না দেওয়া একেবারেই অযৌক্তিক হয়েছে।"[১৩]

শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতি সত্ত্বেও ১৭৮৫—এমনকি, ১৮১৫ সাল পর্যন্তও পার্লামেন্টে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ করা সম্ভব হল না কেন? তার কারণ, প্রথমত আঠারো শতকের শেষে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বনিয়াদে পরিবর্তন খুব দ্রুত ও গভীরভাবে শুরু হলেও তা তখনও এত প্রবল হয়ে ওঠেনি যে পার্লামেন্টের পুরানো সামন্ত-তান্ত্রিক চেহারা তৎক্ষণাৎ বদলে দিতে পারে। প্রথম সংস্কার আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত অভিজাত ভূস্বামীদের শ্রেণীস্বার্থই পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন জুড়ে ছিল; এবং পার্লামেন্টের মধ্যে সামন্তস্বার্থের সঙ্গে কোম্পানিস্বার্থের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যে কথা ১৭৬৭ সালের পুস্তিকাটির লেখক বলে গেছেন তা এই গোটা যুগেরই পক্ষে প্রযোজ্য। আঠারো শতকের শেষার্ধের ব্রিটিশ রাজনীতিতেও শিল্পস্বার্থ ও কোম্পানিস্বার্থের বিরোধ ষোলো আনা সুস্পষ্ট নয়। তাই পরবর্তীকালের কবডেনের মতো শিল্পস্বার্থের আপোসহীন প্রতিভূ এযুগের রাজনীতিতে বিরল। এযুগের রাষ্ট্রনেতাদের "টাইপ্‌" হচ্ছেন পিট্‌। অবাধবাণিজ্যের নীতিতে বিশ্বাসী হয়েও তাঁকে ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের অর্থ ও প্রতিপত্তির সাহায্য নিতে হয়েছিল সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য, এবং কোম্পানিপক্ষের সদস্যদের সমর্থন বজায় রাখার জন্যই মন্ত্রিত্ব হাতে নিয়েই ঋণ শোধ করতে হয়েছিল কোম্পানির আমদানি চায়ের উপর থেকে শতকরা ৩৭'৫ ভাগ শুল্ক হ্রাস করে, অর্থাৎ ৬ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব বিসর্জন দিয়ে।[১৪] এমত অবস্থায় পার্লামেণ্টারী উপায়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিকারকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির একাধিকারের মেয়াদ বেশিদিন স্থায়ী হবার একটি প্রধান কারণ এই যে আঠারো শতকের শেষ পঁচিশ বছরে ইংল্যাণ্ডের আভ্যন্তরিক অর্থনীতির অবস্থা অবাধবাণিজ্যের অনুকূল হলেও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা তার প্রতিকূল ছিল। ১৭৭৫ সালে আমেরিকা ও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের শুরু, ১৭৮০-দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের

শুরু, ১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব, ১৭৯০—তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯৩—ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ এবং শতাব্দীর শেষ দিকে নেপোলিয়নের আবির্ভাব ও সেই সঙ্গে ইঙ্গফরাসী সংগ্রামের বিশ্বব্যাপী সূচনায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই যে সংরক্ষণশীলতা দেখা গিয়েছিল তাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটেছে। এই সাধারণ রাজনৈতিক দুর্যোগের যুগে রাষ্ট্রনেতারা অবাধবাণিজ্যে বিমুখ ছিলেন বলেই রাষ্ট্রস্বার্থ ও শিল্পস্বার্থের মধ্যে এক সাময়িক ও কৃত্রিম বিভেদের আড়ালে আত্ম-রক্ষা করে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় তার স্বাভাবিক মৃত্যুর তারিখকে কিছুদিন পেছিয়ে দিতে পেরেছিল। একদা অবাধবাণিজ্যবাদী পিট্ এই কারণেই ১৭৮৪ সালে কোম্পানির একাধিকারকে বেশি ঘাঁটাতে চাননি।

শিল্পস্বার্থের রাষ্ট্রজয়

যে কারণে বণিকের মানদণ্ড আপাতত কোম্পানির হাতে রয়ে গেল, ঠিক সেই কারণেই রাজদণ্ডটি তার হাতছাড়া হল।

অখণ্ড বাণিজ্যাধিকারের সঙ্গে অখণ্ড রাজ্যাধিকার যুক্ত হয়েছিল ১৭৫৭ সালেই। অর্থাৎ, কোম্প্যানি ব্রিটিশ রাষ্ট্রের অধীন হওয়া সত্ত্বেও বিদেশে আরেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই অদ্ভুত ব্যাপারের পরিণতি খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। ভারতবর্ষে দেশী বা বিদেশী শক্তির সঙ্গে কোম্পানির রাজনৈতিক ব্যবহারে কোন ভুল হলে তার মাশুল গোটা ইংরাজ জাতিকেই দিতে হতে পারে; কোম্পানির লড়াই ব্রিটেনের জাতীয় বিগ্রহে পরিণত হতে পারে; ভারতে ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে ফরাসী বা ওলন্দাজ কোম্পানির সম্পর্ক ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স বা হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রিক সম্পর্ককে বিব্রত বা বিকৃত করতে পারে; কোম্পানির শাসনের অব্যবস্থা সমগ্র ইংরাজজাতির মহাকলঙ্কে পরিণত হতে পারে, এবং কোম্পানির অমিতব্যয়িতার ক্ষতিপূরণ করতে হতে পারে ইংরাজ করদাতার পকেট কেটে। বিশেষত ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার পরে অন্য কোথাও আরেকটা মস্ত বড়ো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ক্রমেই আরও ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে থাকল।"[১৫] ফলে ভারতে কোম্পানির সার্বভৌম অধিকারের প্রশ্ন আর কেবল আইনের কূটকচালিতে সীমাবদ্ধ না থেকে পার্লামেণ্ট, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দলাদলি ও প্রচার-পুস্তিকার মারফত এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে পরিণত হল।

ভারতটা কার—কোম্পানির না ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ? এই প্রশ্নের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন :

"কিছু ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ বণিকের যে কোম্পানি টাকার জন্য ভারতবর্ষ জয় করেছিল তারা যখন তাদের ফ্যাক্টরিগুলি বাড়িয়ে সাম্রাজ্যে পরিণত করা শুরু করল, ওলন্দাজ ও ফরাসীর স্বতন্ত্র বণিকদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা যখন জাতিগত রেষারেষি হয়ে দাঁড়াল, তখন থেকেই অবশ্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল, এবং নামে না হলেও কার্যত ভারতবর্ষে এক দ্বৈত শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হল।" [১৬]

কোম্পানির ব্যবসায় স্বার্থের সঙ্গে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার মৌলিক অসঙ্গতির কথা তত্ত্বের দিক থেকে খুব সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছিল ১৭৭৬ সালেই আডাম স্মিথের গ্রন্থে। ইউরোপ থেকে যে-সব পণ্য ভারতে আমদানি হয় তা যথাসম্ভব শস্তায় বিক্রি করা এবং ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি পণ্যকে ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা এই হচ্ছে ভারতের সার্বভৌম শাসক হিসাবে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ। কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। "সার্বভৌম শাসক হিসাবে, তাদের স্বার্থ আর যেদেশ তারা শাসন করছে তার স্বার্থ হুবহু একই। ব্যবসায়ী হিসাবে, তাদের স্বার্থ উক্ত স্বার্থের ঠিক বিপরীত।" [১৭] ফলে, কোম্পানির বাণিজ্যে যেমন ক্ষতি হয়, তার ভারতীয় শাসনব্যবস্থায়ও তেমনি অযোগ্যতা দেখা যায়। আডাম স্মিথের মতে, তাই, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যসমূহে ব্রিটিশ রাজের, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্র ও জনসাধারণের অধিকারের ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।" [১৮]

ভারতটা সত্যিই কার? ভারতবর্ষ থেকে বহু হাজার দূরে এক বিদেশী বিধান-সভায় এই প্রশ্ন নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রনেতা, দল ও মতামতের যে যুগ-যুগব্যাপী সংঘর্ষ ঘটেছে তার মধ্যে একটা হাস্যকর অবাস্তবতা আছে, সেকথা মার্কসের রসিক মনকে এড়ায়নি। প্রায় পঁচাশি বছর-ব্যাপী এই পার্লামেণ্টারী রঙ্গকে ব্যঙ্গ করে তিনি ১৮৫৩ সালে লেখেন :

"শাসন কর্তৃত্ব কার হাতে ?—এই প্রশ্ন নিয়ে অ্যারিস্টটলের যুগ থেকেই ভূরিভূরি রচনার বন্যায় দুনিয়া ভাসানো হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি বেশ মাথা খাটিয়ে লেখা, অনেকগুলি আবার বাজে। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম

দেখা গেল যে ১৩, ৬৮, ১১৩ বর্গমাইল আয়তন জোড়া এক দেশের ১৫,৬০,০০,০০০ অধিবাসীর উপর কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত একটি জাতির সর্বোচ্চ শাসনপরিষদের সদস্যরা অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ অধিবেশনে সমবেত হয়ে এই কুটিল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত; কী? না,—উক্ত ১৫ কোটি বিদেশীর উপর এই শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী আমাদের মধ্যে কে? ব্রিটেনের শাসন পরিষদে এমন কোনও ঈডিপাস্ তখন কেউ ছিল না যে এই ধাঁধাঁর জবাব দিতে পারে।"[১৯]

১৭৬৭ সাল থেকেই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানির রাজ্য হরণের চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু কোম্পানি মোটামুটি সরকারকে তার রাজস্বের একটা বখরা দিয়ে এই সমস্যাকে আরও প্রায় পনেরো বছর ধামাচাপা দিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির আভ্যন্তরিক অব্যবস্থার ফলে ইংল্যাণ্ডের জনমত ক্রমেই এত বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং ভারতবর্ষ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা এতই বাড়তে থাকে যে ১৭৮৩-৮৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-সংকটের ধাক্কায় এতদিনের গোঁজামিল দেওয়া রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন হঠাৎ একেবারে জাতীয় প্রশ্নে, একটা গোটা মন্ত্রিসভার থাকা-না-থাকার প্রশ্নে, এবং সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতাদের সামনে পয়লা নম্বর সমস্যায় পরিণত হলো। ১৭৮৩ সালে ফক্স্ তাঁর খসড়া আইনে প্রস্তাব করলেন যে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস ও কোর্ট অব প্রোপ্রাইটর্স নামক সংস্থা দুটি একেবারে তুলে দিয়ে ভারতের শাসনভার সমগ্রভাবে ন্যস্ত হোক পার্লা-মেণ্টের দ্বারা নির্বাচিত সাতজন কমিশনারের হাতে। কিন্তু স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের উদ্যোগে অভিজাততন্ত্রের প্রতিরোধের ফলে এই প্রস্তাব ব্যর্থ হল। ১৭৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পিট ফক্সের বিলকেই একটু নরমভাবে সাজিয়ে নিয়ে এবং কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ করিয়ে নিলেন, তার দ্বারা ব্রিটিশ সরকার পরোক্ষে কোম্পানির রাষ্ট্রক্ষমতা হরণ করল। পিটের আইনের মধ্যে কোম্পানিস্বার্থের সঙ্গে যে-ভাবে রফা করার চেষ্টা হয়েছে, তার অসাধুতা সম্পর্কে সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা যতখানি বদল করা হয়েছে পিটের আইন মারফত, আগেকার কোনও আইনেই তা হয়নি।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ১৭৮৪ সালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিস্থিতিতে কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থ ও তার রাষ্ট্রস্বার্থকে যুগপৎ হরণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে, পিট্ যে রকম রফা করেছেন ইতিহাসের বিচারে তা একেবারেই অনিবার্য ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে আপোসরফার সব রকম পিছু-টান থাকা সত্ত্বেও, এবং আপাতত কোম্পানির একাধিকারের কাছে অবাধ বাণিজ্যস্বার্থকে বলি দেওয়া সত্ত্বেও ১৭৮৪ সালের আইন ইংল্যাণ্ডের শিল্পস্বার্থের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জয়। এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর হবার ফলে এবং এরই সাহায্যে আরও প্রতিকূল আন্তর্জাতিক অবস্থার মধ্যেও ব্রিটিশ স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরা ১৭৯৩ সালে ভারতের বাজারে অবাধ বাণিজ্যের আংশিক সুযোগ লাভ করতে পেরেছিল। এই রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যেই ১৭৮৬-৯৩ সালে ভারতে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা বিশেষত, তার ভূমিরাজস্বনীতিকে ব্রিটিশ শিল্পস্বার্থের প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা ঠিক যতখানি পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টেরই প্রত্যক্ষ পরিণাম, ঠিক সেই অনুপাতে দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যও ১৭৮৪ সালের ঐ বিধানই দায়ী। ক্রমশঃ

---

(১) ফ্রান্সিস্ : "লেটার টু লর্ড নর্থ" (ডেব্রেট্) পৃঃ ৪৫ ॥ (২) বার্নাল : "সায়েন্স ইন্ হিষ্ট্রি", ৩৬৫-৬৬ ॥ (৩) এঙ্গেল্স্ : "দি কণ্ডিশন্ অব্ দি ওয়ার্কিং ক্লাস্ ইন্ ইংল্যাণ্ড" (মার্কস্-এঙ্গেল্স অন্ ব্রিটেন্", মস্কো ৪১ ॥ (৪) কানিংহাম : "দি গ্রোথ্ অব্ ইংলিশ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ এণ্ড্ কমার্স ইন্ মডার্ণ টাইম্স্" ২৫৯-৬০ ॥ (৫) "দি য়্যাব্সলিউট্ নেসেসিটি", ৩৬ ॥ (৬) ঐ, ৩৭ ॥ (৭) ঐ, ৬০-৬৩ ॥ (৮) কানিংহাম : ঐ, ২৬২ ॥ (৯) আডাম্ স্মিথ্ : "ওয়েল্থ অব্ দি নেশন্স্" (২য় খণ্ড), ২৪২ ॥ (১০) ঐ, ২৪২-৪৩ ॥ (১১) ঐ, ২৫৫ ॥ (১২) মাক্স : "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ॥ (১৩) ফিলিপ্স্ : "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ৩৩ ॥ (১৪) মিল্ : "হিষ্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" (৪র্থ খণ্ড), ৩৯৩ ॥ (১৫) মার্কস : ঐ ॥ (১৬) মাক্স : 'দি গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া" ॥ (১৭) আডাম্ স্মিথ্ : ঐ, ২৫১ ॥ (১৮) আডাম্ স্মিথ, : ঐ ৬২৪ ॥ (১৯) মার্কস : ঐ ॥
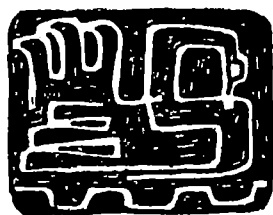
কবিতা

সুরজমুখী

বিষ্ণু দে

সূর্য তখন পড়ে গেছে পশ্চিমে—
ওরা কারা করে মৃত্যুর মিহি গান ঃ
বন্দিনী কোন্ সুন্দরী মৃত হিমে
নিথর—করুণ সুরে কারা করে গান।

কয়লাখনিতে সে কান্না ছায়া বাঁধে,
মায়াবী আকাশে স্তব্ধ বাতাসে গান
বলে যায়, সহমরণের মহাসাধে
তাই কি বিশ্ব বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ ?

বিষাদে বিধুর আকাশে তীব্র বোলে
গ্রামের কাতর রাত্রিতে ঘরে ফিরি,
কানে আসে ওকি গ্রাম্য নাচের ঢোলে
আমনের খুশি চাষীদের দেশী গান ?

ওকি গান শুনি? নাগড়া মাদল ঝাঁঝে
কতো কন্যাকে জীয়ায় সোনার কাঠি?
প্রাণ পায় ভোরে মরেছিল যারা সাঁঝে?
আমি বসে যাই এই পাঠে সহপাঠী।

ভোরে প্রাণ পায়, পুবের পাহাড় জাগে,
পশ্চিমে টিলা কুমারীর স্মিতরাগে
চোখ মেলে, রাঙা নদী চলে ঝিরিঝিরি।
এনে দিলে কোন্ বীর নির্ভয় আসান্?

ফিরে এল বুঝি সূরজমুখীর প্রাণ?
আসানসোলের উষার হাসিতে ফিরি॥

রাজা চায় তবু আরো !

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ছোটো মেয়েটা কচি হাত পেতে পয়সা চায়
দিলুম একটা ফুটো তামা হাতে ফেলে।
মেয়েটা বললে, "জয় হোক বাবা রাজা হও!"
শেখানো কথার সনাতন বিষ ঢেলে।

স্বাধীন দেশের জমকালো এই শহুরে বিষ
মেয়েটা খেয়েছে ডাস্টবিন থেকে তুলে
স্বর্ণচূড়ারা মৃত্যুর ধ্যানে নির্নিমিষ
বিলিতী সুরায় বাররনী সোড়া গুলে।

মেয়েটা বললে, "দয়া করো বাবা রাজা হও!"
রাজারাজড়ার মহিমায় হাত পেতে ;
রাজপথচারী পাথুরে মানুষ নির্বিকার
নাকে দড়ি বাঁধা দুরন্ত শহরেতে।

মেয়েটা অবোধ! জনতাকে ডেকে রাজা বানায়
রাজা হবে তার সময় যে নেই কারো!
পুরোনো রাজারা বেসামাল হয়ে ডোবে খানায়
অভাগী মেয়েটা রাজা চায় তবু আরো?

উৎসের উদ্দেশে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

দেশের, দশের মাটি, মাটির মমতাময় ঘ্রাণ
বুকে নিয়ে মানুষের বিচিত্র মেলায়, হাটে-ঘাটে,
পথচলার ছন্দে, সুরে, প্রেরণায় করেছি সন্ধান
যাকে, আজো যার ধ্যানে ধরণীর শ্যামলিম মাঠে
ফসলের ফুলে চোখ রেখে, নীল দিগন্তের রঙ
চেয়েছি চোখের হ্রদে, গেঁথেছি শিশিরফুলের মালা।
দীঘল দিনের রোদে সবুজ ঘাসের স্নেহ ঝরে
বিচিত্র বাংলার বুকে, মাটিতে, অরণ্যে অনুক্ষণ!
পাখির নিবিড় কণ্ঠ দিনভোর ছায়ার আসরে
আলাপের তান তোলে; নদীর কল্লোলে কতো মন
পথে নেমে আসে। দূরে মেঘমুক্ত আকাশের মুখ—
জনমদুখিনী, আহা জননীর মতো চেয়ে আছে,
তার কাছে, তারি কাছে আমার বেদনাবহ বুক
পেতেছি প্রাণের ধারা পাবো বলে। আমি তার মাঝে
শুনেছি ঢেউয়ের গান, কলতান; হাওয়ার দু হাত
মমতার মতো এসে এ প্রাণের সমস্ত বেদনা
কখন দিয়েছে মুছে। দেশান্তরী স্রোতের প্রপাত
আমার পথের সঙ্গী, যৌবনের দুর্জয় সাধনা!

উৎসের উদ্দেশে আমি তাই নীল সাগরসঙ্গমে
মোহানার মুখ থেকে দূর-দূরান্তের পথে চলি ;
স্নেহশীলা জননীর মতো দেশ, জনমে-জনমে
যাকে জানি, সেই বসুধার বুকে সৃষ্টির কাকলী
ওঠে, ফুল ফোটে, দেখি, পাখির ডানায় হাওয়া নড়ে,
ফল নিয়ে খেলা করে ফসলের সার্থক সন্তান ;
বধূর বুকের ভাঁজে বেদনার অন্ধকার ঘরে
শিশুর সুন্দর মুখ প্রতিদিন প্রতীক্ষার গান
শোনে ; দিন গোনে একা কুমারী প্রাণের প্রজাপতি,
ফুলের কুঁড়ির দিকে চেয়ে। দূরে আসন্ন অঘ্রান
আশ্বিনের পথ চেয়ে নতমুখী। আলোর আরতি
সূর্যবন্দনার ভোরে ঘরে ঘরে দৃষ্টির দর্পণে
দেখায় দূরের পথ, শঙ্খ বাজে, নবজাতকের
নীল চোখ নেচে ওঠে প্রসারিত প্রাণের স্পন্দনে।

এই দেশ, মহাদেশ, স্বপ্নের ছবিতে প্রতিদিন
চোখ রেখে চলি। আমি আলোর অঞ্জন ছুঁয়ে হাঁটি ;
পাখি-পাখালির ডাক, গাছ-গাছালির শান্ত ছায়া,
শিশুর, বধূর, কুমারীর চোখ, মায়ের মমতা
আমাকে ঘরের পথে টানে। তাই ঘরেরই সন্ধানে
পথে পথে প্রত্যহের সূর্যকে শোনাই সেই গান,
যে গানে আমার জন্ম, আমাদের জন্মের গৌরব ঃ
ভোরের বরণডালা সাজিয়ে কিশোরকিশোরীরা
বকুল ফুলের গন্ধে গল্প করে, হাসে ; চোখে-মুখে
মৌসুমীর মৃদু হাওয়া, শিউলি ফুলের মতো মুখ,
নদীর স্রোতের মতো আঁকাবাঁকা উচ্ছল হৃদয়।

জানে না, দৈন্যের দীপ কেন জ্বলে-নেভে, কেন আজো
ঝড়ে ঘর ভাঙে, প্রাণ পোড়ে রোদে, আগুনে ! প্লাবনে
ভাসে ঘর, বাস্তুভিটেমাটি, ফসলের মাঠ ; ওরা
জানে না বলেই আজো সংসারের শঙ্কাকুল চোখে
আলো আছে, ছায়া আছে ; না হলে নির্মম নীল বিষে
পুড়ে যেতো, ঝরে যেতো প্রাণের সমস্ত স্বপ্ন, সুর !

বহুদূর—বহুদূর থেকে তাই হাওয়া এলে, মন
যেন কার কথা ভাবে, গুনগুন গানের গলা ডাকে
তার নাম ধরে। তবু সে আসে না !—তাই, তারি পথে
প্রত্যয়ের দিকে চলি। কত মানুষের ছায়া পড়ে
নিজের মুখের ভাঁজে, কত প্রাণ দুবাহু বাড়িয়ে
ছুটে আসে ; কতো মুখ : বধু, বন্ধু, ভগিনী, জননী
পবিত্র প্রাণের দীপ তুলে ধরে : আমি পথ হাঁটি।—

এ পথের শেষ নেই। সামনে নীল স্থবির পাহাড় !
আমি তার শৃঙ্গে উঠে বলিষ্ঠ বাহুতে ঢেউ তুলে
আমার স্বপ্নকে আমি আর সকলের স্বপ্ন দিয়ে
বুকে নেবো কবে ! কবে কালের কর্মিষ্ঠা সেই নারী
জীবনের জয়স্তম্ভে যৌবনের রক্তিম ধ্বজায়
আঁকবে মুক্তির ছবি, লিখবে জয়ের ইতিহাস !
আমি তারি প্রতীক্ষায় পথ চলি, আজো পথ চলি……

জে. বি. প্রিস্টলির
'ইন্সপেক্টর কলস'
অবলম্বনে

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

চন্দ্রমাধব সেন	বিখ্যাত ধনী, কয়েকটি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও ডিরেকটর
রমা সেন	চন্দ্রমাধব সেনের স্ত্রী
শীলা সেন	ঐ কন্যা
তাপস সেন	ঐ পুত্র
গোবিন্দ	ঐ ভৃত্য
অমিয় বোস	চন্দ্রমাধব সেনের বন্ধুপুত্র
তিনকড়ি হালদার	পদ্মপুকুর থানার সাব-ইন্‌স্পেক্‌টর
স্থান	পদ্মপুকুরে মাধবচন্দ্র সেনের বাড়ির ড্রয়িংরুম
কাল	১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের এক সন্ধ্যা

প্রথম অঙ্ক

[চন্দ্রমাধব সেনের বাড়ি। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। পর্দা উঠিলে দেখা গেল সোফা, কাউচ ইত্যাদিতে বসিয়া চন্দ্রমাধব সেন শ্রীমতী রমা, শীলা, তাপস ও অমিয় গল্প করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘড়িতে সাতটা বাজে।]

চন্দ্রমাধব। আচ্ছা শীলা বল তো, আজকের টি-পার্টির সবচেয়ে remarkble ব্যাপারটা কি ?

শীলা। কি বাবা ?

চন্দ্রমাধব। বাঃ—আজকের কাটলেট থেকে আরম্ভ করে পুডিং পর্যন্ত সবই তো তোর মার হাতের তৈরি। করিমের তো আজ সারাদিন ছুটি।

অমিয়। তাই নাকি! তাই প্রত্যেকটা আইটেম অত চমৎকার হয়েছিল—

রমা। (মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে) আচ্ছা তুমি কি বল তো ? শীলা-তাপসের সামনে না হয় যা ইচ্ছে তাই বললে—কিন্তু তাই বলে—(মৃদু হাসিয়া অমিয়র দিকে ইঙ্গিত করিলেন)

চন্দ্রমাধব। ও অমিয় ? তা অমিয়র সামনে লজ্জা কিসের ? ও তো ঘরের ছেলে !

অমিয়। না কাকীমা, এ আপনার ভারী অন্যায়। আপনি এখনও আমাকে পর বলে মনে করেন ?

তাপস। সত্যি মা, তোমার ভারী অন্যায়! শেখরকাকার টেলিগ্রাম, চিঠি, দুই এসে গেছে—

শীলা। বাঃ—শুধু তাই ? আজ বিলিতি মতে এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে গেল—সাত দিন বাদে দিশী মতে পাকা-দেখা—

তাপস। শুধু পাকা-দেখা ? এক মাস বাদে বিয়ে—

অমিয়। না না তাপস,—বাবার চিঠি, টেলিগ্রাম, বিয়ের দিন ঠিক হওয়া, এসব না হয় আজকালের ব্যাপার। আগের কথাটা ধর। কাকাবাবু বাবার ছোটবেলার বন্ধু, ছোটবেলা থেকে আমার এখানে আসা-যাওয়া। মাঝে যে ক বছর বিলেতে ছিলাম, সেই ক বছরই যা আসতে পারিনি। নইলে দেখ, ফিফ্‌টি ওয়ানের ডিসেম্বর ফিরেছি—আজ তিন বছর হতে চলল—নিয়মমতো এ বাড়িতে আমার আসা-যাওয়া—

শীলা। উঁহু—অঙ্কে ভুল হয়ে গেল! ফিফ্‌টি থির মে-জুন জুলাই এ বাড়িতে তোমার টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় নি—

অমিয়। বারে আমি তোমাকে বলিনি—ফ্যাক্‌ট্রিতে ভীষণ কাজ পড়েছিল—

শীলা। না না—বলনি,—সে কথা কি আমি একবারও বলেছি ? দেখলাম, হিসেবে ভুল করছ—তাই মনে করিয়ে দিলাম।

রমা। এ তোর ভারী অন্যায়, শেলী! বেচারীকে ভাল-মানুষ পেয়ে শুধু শুধু জ্বালাতন করা! কাজের চাপে দু-তিন মাস যদি নাই আসতে পারে! পুরুষ-মানুষের কাজের তুই বুঝিসটা কি? ওদের কত কাজ—

চন্দ্রমাধব। নিশ্চয়। শেখর তো আজ দু-বছর হল সব ওরই ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

রমা। তবে? (শীলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল—'কিন্তু মা'—তাহাকে বাধা দিয়া) আচ্ছা, তুই কি ভাবিস বল তো শীলা? বিয়ের পর দিনরাত ও তোর আঁচল ধরে ঘরে থাকবে? ও একজন বিজনেসম্যান্! সময় সময় দেখবি কাজের চাপে, বাড়িঘর কোন কথাই ওর মনে নেই না না, তুই ধারণা বদলাতে চেষ্টা কর শেলী—

শীলা। চেষ্টা করে দেখেছি মা—পারিনি! আর কোন দিন যে পারব তাও তো মনে হয় না। অতএব অমিয়বাবু, তুমি এখন থেকে সাবধান! (তাহার এই শেষের কথাগুলি শুনিয়া, দুই রকমই মনে হইতে পারে। মনে হইতে পারে, হয়তো সে অমিয়র সহিত রসিকতা করিতেছে—কিংবা হয়তো সত্য সত্যই তাহাকে সাবধান হইতে বলিতেছে)।

অমিয়। না না তুমি দেখে নিও শীলা—ঐ একবারই যা হয়ে গেছে—(কোথাও কিছু নাই অমিয়র কথা শুনিয়া তাপস হঠাৎ জোরে হাসিয়া উঠিল। মিঃ ও মিসেস সেন বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন।)

শীলা। উঃ হেসে লুটিয়ে পড়লেন একেবারে। কেন, কিসের এত হাসি শুনি?

তাপস। (তখনও অল্প হাসিতে হাসিতে) তা তো জানি না—হঠাৎ কি রকম হাসি পেয়ে গেল—

শীলা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তা তো পাবেই! হাসি পাবার মতো কথা বললুম আমরা—আর উনি হেসে আমাদের তুড়িতে ফুঁ করে দিলেন!

তাপস। না কক্ষনো না—আমি কোন কিছু ভেবে হাসি নি—

রমা। আঃ—আবার দুজনে ঝগড়া আরম্ভ করলি! আর শীলা, তোকেও বলি। কি সব কথাবার্তা বলছিস আজকাল? তুড়িতে ফুঁ করে দিলেন! কোত্থেকে শিখছিস এসব?

তাপস। তুমি বোধহয় ওর কথাবার্তা বিশেষ কান করে শোন না মা—আজকাল ও ওইরকম কথাই তো বলে—

শীলা। দেখ মা—আমি কারুর মান-টান রেখে কথা বলতে পারব না বলে দিচ্ছি! ছোড়দাকে ও রকম গাধার মতো কথা বলতে বারণ করে দাও—

তাপস। দেখ শীলা—

রমা। (বাধা দিয়া) আঃ তোরা থামবি কিনা! দু-জনে দেখা হবার জো নেই একেবারে! দেখা হলেই ঝগড়া! (শীলাকে) আর ঝগড়া তো খুব করছিস? আজকের দিনে বাবাকে যে একটা প্রণাম করতে হয়, সে কথাটা মনে আছে কি?

শীলা। ঐ যাঃ—একেবারে ভুলে গেছি! (উঠিয়া মিঃ ও মিসেস সেনকে প্রণাম করিল—সেই সঙ্গে সঙ্গে অমিয়ও প্রণাম করিবার সময় মিঃ সেনকে 'থাক বাবা থাক, হয়েছে হয়েছে'—বলিতে শোনা গেল।)

চন্দ্রমাধব। (রমাকে) বুঝলে, ওরা ভাবছে, আজ ওদেরই দিন। তোমার আমার কথাটা তো জানে না! শীলার সঙ্গে অমিয়র বিয়ে—এ আমাদের কতদিনের ইচ্ছে! অমিয় যখন বিলেতে, তখন থেকে কথাবার্তা চলছে। এ বছর হবে সমস্ত ঠিক। এমন সময় শেখর বৌকে নিয়ে চলে গেল বম্বে। ভাবলাম এ বছরও হল না। তারপর হঠাৎ কাল শেখরের টেলিগ্রাম—সামনের শনিবার পাকা-দেখা, সব ব্যবস্থা কর, আমি যাচ্ছি।

রমা। ওঃ—কাল যদি টেলিগ্রাম পাবার পর আমাদের অবস্থা দেখতে! কি যে করব, কাকে যে বলব, যেন কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না! আমি তো বলেছিলুম, আমাদের সার্কলের সবাইকে আজকের পার্টিতে বলা হোক—

চন্দ্রমাধব। সেটা আমিই বারণ করেছিলাম অমিয়! আচ্ছা তুমিই বল, আজকের এই যে ঘরোয়া ব্যাপার—এটাই বেশ চমৎকার হল না?

অমিয়। না না, কাকীমা, এটা খুব ভাল হয়েছে। শনিবার একটা পাবলিক কিছু করলেই হবে।

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ, তারপর কি যেন বলছিলুম—? ও, হ্যাঁ - শেখর আর আমি আজই আমরা ফ্রেণ্ডলি রাইভ্যাল্‌স্—কিন্তু একমাস বাদে? তখন আমরা আত্মীয়। সত্যি আজ আমি স্বপ্ন দেখি অমিয়—শেখর আর আমি এক

হয়ে গেছি। অবিশ্যি শেখরের কনসার্ন আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক পুরনো—তা হোক, তবু আমার মনে হয়, দুই মিলে এক হবেই! বিরাট বিজনেস ট্রাস্ট গড়ে উঠবে—নাম হবে ধর, চন্দ্র-শেখর নগর, কি শেখর-মাধব নগর—ট্রেড্‌মার্ক হবে, এনভিল আর হ্যামার! (উত্তেজিত হইয়া) তখন আর আমরা রাইভ্যালস নই অমিয়, তখন আমরা এক হয়ে কাজ করছি—for lower costs and higher prices!

অমিয়। And for more profits! আমার মনে হয় বাবাও এতে রাজী হবেন কাকাবাবু।

রমা। আচ্ছা, তুমি যেন কি! আজকের দিনে আর কথা পেলে না? সেই বিজনেস্, বিজনেস্ আর বিজনেস্!

শীলা। সত্যি বাবা—কোথায় সানাই বাজবে না তোমরা দুজনে খেরো খাতা নিয়ে বসলে!

চন্দ্রমাধব। না না, ও আমি এমনি কথার কথায় বলছিলাম। কিন্তু যাই বল রমা—শীলা, অমিয়, এরা সত্যিই ফরচুনেট্—

অমিয়। (শীলার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া) অন্তত আমি যে ফরচুনেট্‌এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই!

রমা। (অল্প তর্জনের সুরে) কিন্তু শীলা—

শীলা। কি হল মা? আবার কি করলুম?

রমা। বাঃ—কি করলুম মানে? (তাপসের দিকে ইঙ্গিত করিলেন)

শীলা। (ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া) ঐ দেখ একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম! (তাপসকে প্রণাম করিয়া) আজকের দিনে তুই আমায় মাফ কর ছোড়দা—

তাপস। (শীলার হাত ধরিয়া উঠাইয়া) দূর পাগলি! মাফ কিসের? তুই কি কোন দোষ করেছিস, যে মাফ করব? বুঝলে অমিয়—শীলা একটু বদ-মেজাজি বটে, কিন্তু এরকম মেয়ে হয় না—

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁগো শীলার এ আংটিটা নতুন গড়ালে বুঝি? বেশ চমৎকার হয়েছে তো!

রমা। আমি গড়াব কেন? ওটা যে অমিয় আজ শেলীকে প্রেজেন্ট করেছে—

চন্দ্রমাধব। বাঃ, বেশ হয়েছে! শেলী—মাই গার্ল। সত্যি এ একটা বিয়ের

মতো বিয়ে হচ্ছে, কি বল। আমার মেয়ে শেখরের ছেলে! পরে তুমি আমার কথা মিলিয়ে নিও—এ বিয়েতে ওরা দুজনেই খুব সুখী হবে! হ্যাঁ, কিন্তু একটা কথা—(শীলাকে তখনও আঙুলের আংটির দিকে দেখিতে দেখিয়া) ওরে শোন শোন কথাগুলো শুনে রাখা তোরও দরকার—আজ বাদে কাল একটা ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়ালিস্টের বউ হতে চলেছিস—

শীলা। না না, তুমি বল বাবা—আমি শুনছি—

চন্দ্রমাধব। না—মানে ঐ যে বলছিলুম না—সত্যিই তোরা খুব সুখী হবি! আর কেন হবি না বল? সত্যিই খুব ভাল সময়ে তোদের বিয়ে হচ্ছে! তুমিই বল না অমিয়, সময়টা কি এমন খারাপ! বাইরে অবিশ্যি দু-চার জন লোকের মুখে সব সময়েই শুনতে পাবে—বাজার মন্দা, সময়টা বড্ড খারাপ! কিন্তু আমিও তো একজন দুঁদে বিজনেস্‌ম্যান? আমি আমি তোমায় বলছি অমিয়, ওসব কথার কোন মানেই হয় না! যারা কোন কালে কিছু করতে পারে না তারাই ঐ সব কথা বলে! আরে এখন তো সময় ভাল যাচ্ছেই, এরপর আরো ভাল সময় আসছে। বাইরে অবিশ্যি ঐরকম দু-চারজনের মুখে শুনতে পাবে—কোথায় সময় ভাল? আজ অমুক মিলে স্ট্রাইক, কাল তমুক ফ্যাক্‌ট্রিতে কাজ বন্ধ। ঐ যে—ওমাসে জেনারাল স্ট্রাইক না কি একটা হল না—আরে সে কি হৈ-চৈ! এইবার লেবার-ট্রাবল আরম্ভ হল—আর রক্ষে নেই—হেন-তেন-সাত-সতের সে সব আরো কত কি! আরে, যতই যাই হক—ফরটি-সিক্সের মত তো আর হবে না! কিন্তু, কই কিছু হল কি? রায়ট বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় ভেসে গেল ইন-কিলাব-জিন্দাবাদের দল! তারপর আমরা এমপ্লয়াররাও তো কিছু চুপ করে বসে নেই! আমরাও দেখছি যাতে ক্যাপিটালের ইণ্টারেস্ট প্রপারলি প্রটেকটেড হয়! আমি তোমায় বলছি অমিয়, আমাদের এখন ধনস্থানে বৃহস্পতি—ফল সম্ভোগ, অর্থ-বৃদ্ধি—বুঝলে—

অমিয়। আমারও তাই মনে হয় কাকাবাবু—

তাপস। আর পাঁচজনে কিন্তু অন্য কথা বলছে। তারা বলছে বিপ্লব, শ্রেণী-সংগ্রাম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ—আরো সব কত কি!

চন্দ্রমাধব। থামো থামো! বিপ্লব, শ্রেণী-সংগ্রাম! সব অত শস্তা কিনা! মাঠে ময়দানে, দু-চারটে মিটিঙে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ইন-কিলাব, ইন-কিলাব করলে যদি বিপ্লব আসত, তাহলে আর ভাবনা থাকত না! আগে দেখ লোকে কি চায়? এদেশের লোকের প্যাসিভ নেচার্! তারা ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবে কেন? ওসব হাঙ্গামায় তাদের লাভটা কি? আর বুদ্ধিমান লোক তো মোটেই ওসবের মধ্যে যাবে না। তারা এ বাজারে বেশ পয়সা করে খাচ্ছে! তোমার আমার মতো নরম্যাল লোকের ওসব ঝঞ্ঝাট করে লাভ তো কিছুই হবে না—বরং লোকসান! এক লাভ হতে পারে কাদের—যারা অ্যাব-নরম্যাল, অকর্মা, বেকার তাদের! কিন্তু তাদের সে শক্তি কই? সে ক্ষমতা কোথায়?

তাপস। সব বুঝলাম—কিন্তু তবু—

চন্দ্রমাধব। আবার তবু কিসের শুনি, তবু কিসের? তোদের ধরনই এই! জানিস তো কত—কিন্তু তবু দেখ সব কথায় একটা করে তবু-কেন-কিন্তুর ফোড়ন আছেই! ওরে বাবা, আমিও তো একটা দুঁদে বিজনেস-ম্যান আমার কথারও তো একটা দাম আছে! দুনিয়াটার দিকে তাকিয়ে দেখ—দেখ how fast it is developing যারা একটু বুদ্ধিমান, একটু চিন্তা করে, তাদের এখন ওসব কথা ভাববার সময় কই! এটা কি উনিশ শো আঠারো সাল—না রাশিয়া! জীবনের কমফর্টস, লাক্সারি, কত বেড়ে গেছে এখন! এই চোখের ওপর দুর্গা মিত্তিরকেই দেখছি। ছিল একটা পেটি বিজনেস-ম্যান। যুদ্ধের বাজারে দুটো পদে ব্যাবসা আরম্ভ করলে, দিশী পদে চাল আর পুরনো লোহা, আর আর বিলিতি পদে বীফ। দুদিনে একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ। যা একটু বাকি ছিল ব্যাঙ্কটাকে ফেল করিয়ে তাও পুষিয়ে নিলে। প্রথম প্রথম সব্বাই নাক সেঁটকাত। আজ? আজ সে আমাদেরই একজন। কে বলবে সে একদিন বীফের ব্যাবসা করত! গোহত্যা নিরোধের আজ সে একজন বড় পাণ্ডা! এই তো পরশু প্রসেশনের সঙ্গে মোটরে করে গেল তারপর মোটর থেকে নেমে গিয়ে পুলিশের লাঠি খেলে। আগে একখানা ভাঙা ফোর্ড ছিল—এখন দেখ

চারখানা নতুন মডেলের গাড়ি। আগে কোন রকমে সেকেণ্ড ক্লাসে ট্রাভেল করত, এখন প্লেন ছাড়া কথা বলে না। এই তো কালই বলছিল—ছাতে প্লেন নামাতে পারলে ভারী স্নবিধে হয়! আরে, এখন কি দেখছিস? আবার তাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে যখন পার্টি দিবি, তখন দেখবি – লোকে দিব্যি আরামে রয়েছে, চারধারে র‍্যাপিড প্রগ্রেস, মালিকেরা সব এক জোট, লেবার ট্রাবলের কোন চিহ্নই নেই! দেখবি প্রত্যেকটা দেশ তখন আমেরিকার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে—অবিশ্যি রাশিয়া, চীন-ফিন্ বাদে! ওসব জায়গায় আজও ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, সেদিনও থাকবে না—কাজেই নো প্রগ্রেস।

রমা। (বিরক্ত হইয়া) আচ্ছা, তোমার আজ কি হয়েছে বল তো? আবার আজকের দিনে ঐ সব বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে—

চন্দ্রমাধব। না মানে—

রমা। না, কোন মানে নয়, চুপ একেবারে।

চন্দ্রমাধব। আচ্ছা আচ্ছা, এই চুপ করলাম—হয়েছে তো! কিন্তু না বলেই বা কি করি বল? বাইরে তো ঘুরতে হয় না, ঘুরলে দেখতে পেতে! যত ব্যাটা হতভাগা, অকর্মার দল! কেউ নাটক লেখেন, কেউ লেখেন গল্প-কবিতা, কেউ বা খুচরো পলিটিক্স করেন! আর সব কথা বলছে কি! শুনলে মনে হবে দেশের নাড়ীনক্ষত্র সবকিছু জেনে বসে আছে একেবারে! আরে দেশের বুঝিসটা কি? জীবনের দেখলি কি? ক্যাপিটাল আমাদের, বিজনেস আমাদের! যেটুকু বোঝবার, সেটুকু তো আমরাই বুঝি! তুমি কথা বলার কথা বলছ? এতদিন তো চুপ করেই ছিলাম। আজ ওরা আবোল-তাবোল বকছে বলেই না আমরা একটু-আধটু বলছি। অন্তত এটা তো ঠিক কথা – আমরা যেটুকু বলব, তা সলিড এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলব—ওদের মতো আবোল-তাবোল নয়!

(গোবিন্দর প্রবেশ)

গোবিন্দ। মা, স্যাকরা এসেছে, তাকে কি এখানে নিয়ে আসব?

রমা। না, ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা, আমি যাচ্ছি। চল শীলা, প্যাটার্ন আর ডিজাইনটা পছন্দ করে দিবি চল—অমিয়, চলে যেও না যেন

বাবা, আমরা এখুনি আসছি—(অমিয় 'না না আমি আছি কাকীমা' বলিলে, মিসেস সেন ও শীলা উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তাপসকে) তুই একটু আয় তো তাপস, দরকার আছে। (তাঁহাদের পশ্চাতে তাপসের প্রস্থান।)

(তাঁহারা চলিয়া গেলে চন্দ্রমাধব সিগারেট কেস হইতে সিগারেট ধরাইলেন)

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ, একটা কথা অমিয় অবশ্যি তোমার আমার মধ্যে! আমি যত দূর জানি, তোমার মার বোধহয় বিশেষ মত ছিল না এ বিয়েতে—তাঁর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল স্যার এ এনের নাতনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়—তাই না? (অমিয়কে 'না মানে না মানে' বলিতে দেখিয়া) না না, আমি বলছি না তাঁর অন্যায়। শেখর আমার বন্ধু হতে পারে—কিন্তু ঘর হিসাবে তোমরা আমার চেয়ে অনেক বড়ঃ বিশেষ করে তোমার মা তো স্যার বীরেন মিত্তিরের মেয়ে। তবে আমারও পোজিশন খুব একটা নিচু এখন নয়। বার দুয়েক বিলেতও ঘুরে এসেছি—আর অনর্স-লিস্ট এখন নেই তাই—থাকলে স্যার না হলেও একটা রায় বাহাদুর—অন্তত হতুম। তবে একটা ভরসা আভাসে তোমার মাকে দিতে পার—এবার বোধহয় অ্যাসেম্বলিতে যাচ্ছি—

অমিয়। তাই নাকি?

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ, রিসেণ্টলি ভূপেন মিত্তিরের সিট খালি হয়েছে না? ঐ সিটে—

অমিয়। বাঃ—ফিরে এলেই মাকে আমি খবরটা দেব—

চন্দ্রমাধব। না না, এখনও সেণ্ট পারসেণ্ট সার্‌টেন্‌ নয়---তবে তুমি তোমার মাকে বলতে পার। নমিনেশনটাও জাঁদরেল ব্লকের আর এলাকাটাও ভাল! বেশির ভাগ ভোটারই ব্যবসাদার—খালি গোটা দুয়েক বস্তি আছে। কিছু যদি ভাঙাতে পারি, আর মনে হয় পারব—তাহলে আর দেখতে হবে না—ইলেক্‌শন সার্‌টেন্‌!

অমিয়। তাহলে, মাকে খবরটা পরিষ্কার জানিয়েই দিই, কি বলেন?

চন্দ্রমাধব। না না, বলা কি যায়! ধর শেষ পর্যন্ত একটা স্ক্যাণ্ডালই হয়ে গেল—কোর্ট ঘর করতে হল—

অমিয়—শুধু শুধু স্ক্যাণ্ডালই বা হতে যাবে কেন?

চন্দ্রমাধব। তা কি বলা যায়? চারদিকে কত পুয়োর রিলেশন্স্! কখন কে কি কুকর্ম করে বসে তার ঠিক কি? তুমি বরং তোমার মাকে হিণ্ট দিয়ে রেখ—(তাপসকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) কিরে, তোকে যে তোর মা দরকার বলে ডেকে নিয়ে গেল?

তাপস। দরকার না ছাই। স্যাক্‌রা ডিজাইন-বুক দিয়ে চলে গেল, আর ওঁরা শাড়ি-জর্জেটের কথা আরম্ভ করলেন। আমায় যে দরকার বলে ডেকে এনেছে, সে হুঁশই নেই কারুর! আমি একটা মজা দেখেছি বাবা, মেয়েরা কাপড় আর গয়নার কথা যখন আরম্ভ করে, তখন বিশ্ব সংসার ভুলে যায়!

চন্দ্রমাধব। কিন্তু কাপড় আর গয়নাটা তোদের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু ওদের কাছে নয়। তুই কি ভাবিস, মেয়েরা তাদের সুন্দর দেখাবে বলেই ওসব নিয়ে এত মাথা ঘামায়? কাপড় আর গয়না ওদের সেল্‌ফ্-রেস্‌পেক্টের একটা চিহ্ন, তা জানিস!

অমিয়। ঠিক বলেছেন আপনি—

তাপস। (ব্যস্তভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও মনে পড়েছে—(থামিয়া গিয়া) না—মানে—

চন্দ্রমাধব (বাধা দিয়া) না মানে? না মানে কি? কি মনে পড়েছে তোর?

তাপস। (অপ্রতিভ হইয়া গিয়া) না—মানে—ও কিছু নয়—এমনি বলছিলুম—

অমিয়। (ঠাট্টা করিয়া) উঁ-হু তাপস, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে—

চন্দ্রমাধব। তা যা বলেছ—কিছু বিশ্বাস নেই এদের! হাতে অবসরও প্রচুর, টাকাও প্রচুর। কাজেই কখন যে কি করতে পারে, আর কি করতে পারে না—তা জোর করে কিছু বলা যায় না। অথচ আমাদের ছোট বেলার কথা মনে আছে—বাড়িতে এক মিনিট বসে থাকতে সময় পেতুম না! কিছু না থাকলে ঘরে কাজ করতে হত। আর টাকা-পয়সা? মনে আছে যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তে যেতাম, তখন বাসভাড়া আর জলখাবার মিলিয়ে দশটা করে পয়সা পেতাম। কিন্তু কেমন চলে যেত আমাদের—আবার ওরই মধ্যে একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদও করেছি—

অমিয়। তা তো করতেই হবে—একটু আমোদ-আহ্লাদ না করলে চলবে কেন ?

চন্দ্রমাধব। সেই কথাই তো বলছি ! তাপস ভাবছে, আমি আবার হয়তো বক্তৃতা শুরু করব। কিন্তু বক্তৃতা কোথায়—এটা একটা দরকারী কথা ! কথাটা তোমাদের কারুরই মনে থাকে না—বোঝও না বোধ হয় তোমরা। আজকে তোমরা যা পাচ্ছ -এ তো তৈরি জিনিস। কিন্তু আমরা তা পাইনি—আমাদের তৈরি করে নিতে হয়েছে। তোমাদের এগিয়ে যাওয়া কত সহজ—কিন্তু পারছ কই তোমরা আমাদের মতো এগুতে ? কেন পারছ না জান? ঐ দরকারী কথাটা কেউ বোঝ না বলে। জানবে আজকের দিনে বড় হতে গেলে ছুনিয়ায় নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখবার নেই। জেনে রেখ—first you yourself, second you yourself, and last you yourself ! অবিশ্যি ফ্যামিলি থাকলে ফ্যামিলির কথাটাও কন্‌সিডার করতে হবে। এই সেল্‌ফের নীতি-কথাটি যদি মনে থাকে, তবেই দেখবে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছ। আর নইলে বাইরের ঐ সব মাথাখারাপ হতচ্ছাড়াদের কথায় কান দিয়েছ কি মনে হবে - উঁ-হু, সেল্‌ফ তো ঠিক কথা নয়, সমাজের সকলের সুখ-দুঃখ দেখতে হবে। আর যত সব নন্‌সেন্স্ কথা মনে আসবে—সমাজ, রাষ্ট্র, কো-অপারেশন, ব্রাদারলি ফিলিং !—আর ঐ সব মনে হয়েছে কি তলিয়ে গেছ ! আরে বাবা—আমি একটা ঝুঁদে বিজনেস্‌ম্যান, অভিজ্ঞতার পাঠশালায় আমার পড়া নেওয়া ! আমি তোমাদের বলছি—দুনিয়ার কোন লোকের জন্য এতটুকু দায় তোমাদের নেই ! খালি নিজেকে দেখ, নিজের ফ্যামিলিকে দেখ। আর তেল যদি দেবার দরকার হয়—দাও তেল—কিন্তু নিজের চরকায়।

[ক্রমশ

আকাশ মাটি

মানসী মুখোপাধ্যায়

॥ চার ॥

কলেজ খোলার কিছুদিন পরে রেবার বাবা অন্যত্র বদলী হয়ে গেলেন। যাবার সময় রেবাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। রমেশবাবু ওদের অনুসরণ করলেন।

এম. এস. সি. পড়ার চাপে এমন ডুবে গেলুম যে ওদের খবর নিয়মিত রাখতে পারলুম না। মাঝে মাঝে এর ওর কাছ থেকে ভাঙা-ভাঙা খবর পেতুম—ওরা দুইটিতে তেমনই আছে। রমেশবাবুর বিয়ের খবরে রেবা প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। পরে একের প্রতি অপরের সহানুভূতি ও নির্ভরতা ওদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। রেবা আবার গানে গানে দিনগুলি ভরিয়ে তোলে। রমেশবাবু তেমনই আঁকেন। ওরা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও মনোমত স্বপ্ন-জীবনকে মাটির বুকে গড়ে তুলেছে।

শেষের দিকে ওদের খোঁজ ছিটেফোঁটাও রাখতে পারতুম না। আকস্মিক আঘাতে মনের এমন ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল যে তখন আমারি কেউ খোঁজ খবর নিয়ে রূঢ় বাস্তব থেকে আড়াল করে রাখলে বেঁচে যেতুম।

কোমর বেঁধে শেষে নিজেই নিজের জন্য উঠেপড়ে লাগলুম। দাদা অবশ্য আপত্তি তুলল। বললে—মা না হয় গেছেন কিন্তু আমরা তো আছি।

হেসে উত্তর দিলুম—কে বললে তুমি নেই। তুমি আছ, বৌদি আছে, আর ঐসব ট্যাবা-টোবা ভাইপো-ভাইঝিরা আছে, সবাই আছে। আমি এটা করছি শখের বশে। একনাগাড়ে পড়ার পর এই তো প্রথম ছুটি পেলুম, একটু বেড়িয়ে আসি। আর সেইজন্যে কোন কিছু করে যদি নিজের হাত খরচাটা জোগাড় করে নিতে পারি তো মন্দ কী?

দাদা অল্প কথার মানুষ। যেটুকু বলে তার বেশির ভাগ কলেজেই খরচ হয়ে যায়। বাকিটুকু বৌদির কানে ব্যবস্থামত বর্ষণ করার পর আমাদের জন্য আর বেশি কিছু অবশিষ্ট থাকে না, কাজেই আমার কথায় চুপ করে গেল। আমি নিজেকে মুক্ত বুঝে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে একদিন কানপুরের টিকিট কেটে গাড়িতে উঠলুম।

এতদিন নিজে পড়ে এসেছি। এবার যাচ্ছি একটি মেয়ে-কলেজে পড়াতে। এ একেবারে অন্য জগৎ, অন্য অভিজ্ঞতা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে টলতে টলতে মনে মনে তারই মহড়া দিতে লাগলুম।

টঙ্গা করে যেতে যেতে গরমে অস্থির হয়ে উঠলুম। বাংলাদেশ এখন মেঘগলা জলের ধারায় স্নান করে সবুজ ওড়না জড়িয়ে হাসছে। আর এ দেশ! মনে হয় যেন কোন্ নির্দয় মানুষের সীমানায় এসে পড়েছি। দেহে তার সন্ন্যাসীর রুক্ষতা আর চোখে বন্দীর নিষ্ফল আক্রোশ।

ঠিকানা মিলিয়ে কলেজে এলুম। প্রথামতো নিয়ম-কানুনের হাঙ্গামা চুকিয়ে বাইরে আসতেই তিনজনে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। এঁরা এই কলেজে পড়ান। আমারই মতো বাইরে থেকে এসেছেন। কলেজের হস্টেল বিল্ডিং শেষ হয়ে ওঠেনি। ওঁরা কয়েকজন মিলে মেস করে আছেন। আমি এসে দল বাড়ালুম।

কুমারী শোভনা সেন, কুমারী লতিকা রায়, কুমারী জয়া চৌধুরী ও আমি ঐ একই টঙ্গা করে মেসে চললুম।

তিনজনের মধ্যে দুজন সংযত আলাপী আর একজন বে পরোয়া বাক্য-বাগীশ। শোভনা ও লতিকাকে যদি বলা যায় নদী তো জয়া হল ঝরনা। কিন্তু কারুর মধ্যে নদী বা ঝরনার মাধুর্য নেই, আছে বঞ্চিতের মুখোসহীন কঠিনতা।

টঙ্গাতে হল পরিচয়, মেসে এসে হল বন্ধুত্ব আর দিবানিদ্রা সেরে সন্ধ্যে-বেলা চা খেতে বসে দেখি সবাই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছি।

নতুনের প্রতি আমাদের একটা মোহ আছে, নতুন মানুষের প্রতিও। নয়তো ওদেরই মতো একজন সুদূর স্বপ্ন-বিলাসিনী, সে হয়তো একদিন ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে তার জন্য ওদের এত মাথাব্যথা কেন।

সংযতভাষিণীরা আগামী রবিবারে নতুন মানুষটিকে নিয়ে বিশেষ দর্শনীয়

বস্তু দেখবার প্রোগ্রাম তৈরী করছিল। জয়া এসে সব উলটে দিয়ে বলল—কাল নয় আজই চল।

আমি তৈরী ছিলুম। ওরা তৈরী হতে গেল। সেই ফাঁকে এঘর ওঘর করে বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ালুম। এ যে রেবা-রমেশের ছবি! এখানে এলো কী করে?

উড়ন্ত আঁচলে টান পড়তে ফিরে দেখি জয়া পেছনে দাঁড়িয়ে অর্থসূচক হাসি হাসছে।

তার শরীরে কোথাও উঁচু-নিচু পাবার জো নেই। যেন একটা কাঠের পাত সামনে দাঁড়িয়ে। সেটাকে জড়িয়ে টান-করে-পরা শাড়ি ভাঁজে ভাঁজে উঠে পিঠে ঝুলছে; টান করে চুল বাঁধা। সবকিছু যেন সে টেনে ধরে রেখেছে নীরস আবেশে।

চোখোচোখি হতেই মুখরা মুখ খুলল—তাই বল। আমি ভাবলুম রেবারই তো বান্ধবী, কোথায় কর্পূর হয়ে উবে গেল বুঝি বা। তা যুগল-মিলন কেমন লাগল?

এ ক ঘণ্টার মধ্যে ওর যা পরিচয় পেয়েছি তাতে বুঝেছি হুল ফুটিয়েই ওর আনন্দ। এদের কথায় রাগ করে লাভ নেই। হালকা হই। বলি—তুমিও তো দেখলে পেছন থেকে দাঁড়িয়ে। কেমন লাগল বুঝতে পারছ না। কিন্তু আমি ভাবছি এ ফটো এখানে এলো কী করে? আর আমি যে রেবাকে চিনি এ তুমি কেমন করে জানলে?

—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কথার সঙ্গে সঙ্গে সাপের মতোই সে লকলকিয়ে ওঠে। ওর তিরিশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবন তার দীনতা নিয়ে বাচনে, ব্যবহারে, ভাবে, ভঙ্গিতে বড়ো বেশি প্রকট।—আরে এখানে ও ফটো এলো যেহেতু একদিন শ্রীমতী এখানে রাস-লীলা করে গেছেন।

—রেবা এখানে ছিল?

—হ্যাঁ গো, তুমি তো তার জায়গাতেই এসেছ।

—সে কোথায় এখন? কথা শেষ করতেই খলখল শব্দে কুৎসিত হাসি কানে এলো।

আসলে জয়া জানাল—এ রাধা আমাদের মডার্ণ। পরিবর্তনশীলতার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। ঐ আয়ান ঘোষের বউয়ের মতো ঐ এক কেষ্ট,

যমুনার পথ আর গাগরীর ছলনাটুকু নিত্যকালের জন্য 'দি বেস্ট' বলে ডিক্লেয়ার করেনি।

—মানে ?

—কিসের মানে খুঁজছ রীতি? সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায়। তারপর জয়াকে দেখে বলল—ওর পাল্লায় পড়েছ বুঝি, হয়েছে আজ বেড়াতে যাওয়া।

—থাম, কী বলছিলে জয়া ?

—বলছিলুম এ জীবন মহানাট্যশালা। যথাসময়ে তোমায় নব নব দৃশ্য-পরিবর্তন দেখাব। এখন 'ইণ্টারভ্যাল'। এ সময়ে তোমাকে আমাদের সঙ্গে বায়ুসেবন করতে অনুরোধ করি। কথার শেষে তার টান-টান শরীরটাকে ভেঙে কুর্নিশ করে চলার ইঙ্গিত জানায়।

তার কাণ্ড দেখে সবাই স-শব্দে হেসে ওঠে। আমিও হাসি। বলি—বায়ুসেবন করাবার আগে বাক্যসেবন করিয়ে যে পেট ফুলিয়ে দিলে তার কী হবে ?

—রাত্রে তুমি আমারি শয্যা-সঙ্গিনী হবে। যথাসময়ে হজমী গুলি দিয়ে নিরাময় করব।

এরপর বেরিয়ে পড়তেই হয়।

লতিকার ইচ্ছে ছিল ওর আর শোভনার সঙ্গে আমি ওর ঘরে শুই। জয়া তার আগে আমায় ছোঁ মেরে তার ঘরে এনে খিল এঁটে দিল। বলল—আব্দার আর কি। যে আসবে সেই ওর ঘরে শোবে আর আমি একা-একা মরি।

এবার একটু রঙ্গ করি। এদেরই সঙ্গে থাকতে হবে তো, সহজ হওয়াই ভালো। বলি—তেমন দাবি কে করছে? বরং সরস হয়ে ডালপালা বিস্তার কর। আমরা হাবাগোবার দল একটু ট্রেনিং পাবার সুযোগ লাভ করে ধন্য হই।

—এই তো, মুখে দিব্যি কথা জোগায় দেখছি, কে বললে ম্যাদামারা। তা না হবেই বা কেন, কার বান্ধবী সেটা তো একবার দেখতে হবে। তারপর সখেদে বলে—আর ভাই আমরা কী ট্রেনিং দেব? তোমাদের কাছে আমরা তো চলি-চলি-পা-পা।

—তোমাদের কাছে ?

—ঐ তোমার বান্ধবীর কাছে। আর তুমি যখন ওর বান্ধবী তখন তোমার কাছেও। কে জানে তুমি আবার কোন ক্ষণজন্মা। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে চোখ বড় বড় করে ঘোরায়।

—আচ্ছা, বার বার তুমি ঐ বান্ধবী কথাটা ব্যবহার করছ কেন? রেবাকে—

—থাক থাক, আর বাজে বকো না। এত বান্ধবীত্ব যে রমেশের বাবার কাছে বিয়ের জন্য ঘটকালি করতে গিয়েছিলে মনে পড়ে? বাধা দিয়ে বলে সে।

—তুমি অনেক কিছুর খোঁজ রাখ দেখছি। কিন্তু বিয়ের ঘটকালি করতে গিয়েছিল ললিতাদি আর শেফালি। যাক্ সে কথা, রেবার সম্বন্ধে তখন কি বলতে চাইছিলে?

—সে তো তুমিও জান।

—মানে?

—মানে আবার কী। ওর জীবনের ঘটনা তোমার নিশ্চয় জানা আছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে আর নতুন কী।

—শুনি।

—ওরা দুজনে প্রেমে পড়েছে। রমেশবাবুর জোর করে একটা বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—তারপর? স্বরে বিদ্রূপ।

—তারপর আবার কী?

—তারপর কী তুমি সত্যি জান না?

—না, ব্যাপার কী? আমি ভয় পাই।

—কিছু না, শুয়ে পড়।

—বাজে কথা রাখ। এই রকম আধখানা কথা শুনে শুয়ে থাকা যায় নাকি? বিশেষ করে ওদের সম্বন্ধে।

—তোমার দেখছি ওদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। মাথার বালিশটা চাপড়ে নিচু করতে করতে বলে জয়া। —আমারো আছে, তবে রেবার প্রতি নয়। কি একটা মেয়েমানুষ, ছিঃ!

—রেবাকে ছিঃ! কেন, সে এমন কী করেছে?

—করেনি কী? আজ এ ফুলে মধু তো কাল ও ফুলে মধু। আর নিষ্ঠা

না থাক, রুচি থাকাতে আপত্তি কি। একটা পাঁড় মাতালের সঙ্গে—থাক শুয়ে পড়। কথার শেষে সত্যি সত্যি সে আমার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়ে।

উঠে বসি এবার। জোর করে তাকে এপাশ ফেরাই। বলি—ন্যাকামি রাখ। কি হয়েছে, কে মাতাল বল।

—কে আবার, ঐ নির্মল রায়, রেডিও আর্টিস্ট। গায় ভালো কিন্তু পাঁড় মাতাল। আর কী চোয়াড়ে দেখতে, একবার চোখ পড়লে আর দুবার দেখতে ইচ্ছে করে না। তারই সঙ্গে......

আমি চুপ হয়ে যাই।

জয়া আড় চোখে একটি কটাক্ষ হেনে বলে স্কুল-কলেজে তো শ্রীমতীর সুনামের অন্ত ছিল না।

—কে বললে? আমি রুখে উঠি।

—থাক থাক, আজ বারো বছর মাস্টারি করছি। ছেলেমেয়ের মুখ দেখলেই বুঝতে পারি বিদ্যের দৌড় কতদূর।

একে আর কী বোঝাব। বলুক ও কি বলতে চায়। দেখি ওর ঐ পাতের মতো দেহটায় কত বিষ জমা আছে।

হ্যাঁ যা বলছিলুম। জয়া শুরু করে—ঐ রমেশবাবুর সঙ্গে তারপর কি হৈ-হল্লা। রোজ বিকেলে গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার, ছবি আঁকা, চা খাওয়া-খাওয়ি, তারপর হাত-ধরাধরি করে বেড়ানো। বলি এখানে পড়াতে এসেছিল না রূপ দেখাতে এসেছিল। দিব্যি তো দিল্লীতে মাস্টারি করছিল। কিন্তু এ রকম করলে কে রাখবে। এখানেও তাই। নোংরা ঘাঁটা যার স্বভাব সে স্থির হয়ে থাকবে কী করে। এখন আবার কোথাও নতুন ফুলের মধু পান করছে বোধহয়। তা বাহাদুরি আছে তোমার বান্ধবীর। কারুর সারা জীবনে একটা জোটে না আর ওর ঝাঁকে ঝাঁকে।

অজ্ঞাতে নিজের মনের কথাটি বলে জয়া আবার পাশ ফিরল।

আমি ভাবি একী হল। জয়ার কথার ডালপালা বাদ দিলেও কিছু সত্যি নিশ্চয় আছে। কিন্তু রেবার চরিত্রে তেমন স্বভাবের ছাপ কোথায়।

চোখ বুজে ওর মূর্তিটি সামনে ধরি। দুপাশ বেয়ে কুঁচ চুলগুলি টানা। ভুরুর ওপরে, শান্ত চোখের পাতায়, চাপা ঠোঁটের খাঁজে খেলা

করছে। একহারা চেহারা শ্রী ও হ্রীকে ধরে আছে। ওর মধ্যে কোথায় সে দুর্বলতা, কোথায় সে নোংরামি। তবে?

জয়া দেখি আবার সোজা হয়ে শোয়। বলে—আর তোমার গিয়ে ঐ রমেশবাবুটিই বা কী। পুরুষমানুষের কি হ্যাংলামি। বুড়ো বাপ এসে কী টানাটানি। তা কিছুতে রেবার সঙ্গ ছেড়ে গেল না।

আমি যেন অকূলে কূল পাই—রমেশবাবুর বাবা এসেছিলেন?

—এখানে কেন, দিল্লীতে। রেবা তখন দিল্লীতে ছিল, সঙ্গেসঙ্গে রমেশ। পুরুষমানুষের সতীত্বের বালাই না থাক সম্ভ্রমের বালাই তো আছে। কাজেই বাপ না এসে কী করে। কেমন ঘরের ছেলে! কিন্তু—যাক্ আমি কেন আর বকে মরি। কাল শোভনাকে জিজ্ঞেস কর। দিল্লীর খবর তো ঐ দিল। কারুর নামে অযথা কিছু বানিয়ে বলা আমার স্বভাব নয়।

সে আমি বুঝি। রেবার কাহিনীর ওপর ও যে কালি ছেটাল ওকাজও করত না যদি জীবনকে সহজ করে পেত। কোথায় নিজের সংসারে বসে সিঁথেয় সিঁদুর টেনে ছেলেমেয়ে-স্বামীর মাঝে পলকে নিজেকে হারাবে আর পলকে খুঁজে পাবে। তা নয়, চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে নিত্য আনন্দহীন কর্তব্যের জোয়ার ঠেলে চলা।

কিন্তু আর না। শোভনাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আর এক দফা হলাহলের সম্মুখীন হবার দরকার নেই। আসল ব্যাপার তো বুঝে নিলুম। রেবা মধুবিলাসিনী নয়। তবে এই ভাঙনের গলদ কোথায় তা আবিষ্কার করতে হবে।

বাইরে গরম হওয়া মাতামাতি করছে। তার রেশ ঘরে ঢুকে চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

॥ পাঁচ ॥

ছুটি ছুটি ছুটি।

এই দীর্ঘ সময়টিতে কত কী হয়ে গেল। আকাশে কত রঙ ধরল; সুবাস বিলিয়ে ফুলে ফুলে কত কথা হল, মাটির ওপর কত আনন্দের উৎস জেগে বেদনার মরুবালিতে লীন হয়ে গেল। তারপর একটি করে সতেজ পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে জানিয়ে দিল একটি বছর শেষ হয়ে গেল।

এখানে প্রকৃতির এখন ভৈরব মূর্তি। মোগলসরাইয়ে দেখব তারভ্রূকুটি। কোলকাতায় যে কদিন পরে শিশু ভোলানাথ হয়ে কাঁদবে।

এক বছর পরে বাড়ি চলেছি। পুজোর সময় অসুখ করেছিল, তাই যাওয়া হয়নি। শীতের ছুটি আর কদিন। এবার গরমের লম্বা ছুটি মুক্তি এনে দিল। বাবা, কী একঘেয়ে জীবন! সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যেন একই নাটকের রিহারসাল চলে। সেই এক ভাবনা, একই কথার পুনরাবৃত্তি আর এক রকম কাজ।

গাড়ি পৌছবার আগেই মন বাড়ি পৌছে যায়। ছাদের কোণে মার হাতের ফুলের গাছগুলির পাশে মন ঘোরাঘুরি করে। বেল-জুঁই এখন বোধহয় গন্ধ ছড়াচ্ছে। রজনীগন্ধার পরিচর্যা এবার আমি গিয়ে করব, তবে সে বর্ষায় গন্ধ দেবে। এদের সঙ্গে মাকে পাব না ভাবতে চোখ জলে ভরে ওঠে।

স্টেশন বেরিয়ে যায়—ফতেপুর, এলাহাবাদ, মীর্জাপুর, মোগলসরাই—হঠাৎ যেন ভূমিকম্প হয়ে যায়—হৈ হৈ, হুড়মুড়, দুড়দাড়। আত্মস্থ হতে দেখি ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি বিরাট সংসারের মাঝে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। পাশে বসে মেজদির ননদ হিরণদি।

তাঁর চেহারা গোলগাল। ডাগর দুটি চোখ স্নেহে সিক্ত; ঠোঁটের ডগায় মায়া-মাখানো হাসি। এলো খোঁপা থলথলে হয়ে ঘাড়ের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। কপালে ডবডবে সিঁদুরের টিপ। সাদা সেমিজের ওপর ভাঁজভাঙা চওড়া-পাড় শাড়ি। হিরণদির এক নিখুঁত ছবি।

যতবার দেখেছি ততবারই এই এক বেশবাস। অনুযোগ করলে মিষ্টি হেসে উত্তর দেন—কখন করব বল তো ভাই।

গাড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখি ছোট, বড়, সাদা, কালো, কিন্তু সব কটি গোলগাল প্রায় দেড় ডজন ছেলেমেয়ে প্রায় ততগুলি পুঁটলি প্যাটরার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। এরা হল হিরণদির রাবণের গুষ্টি—মানে হিরণদির বিপুল আগ্রহে সংগ্রহ করা মা-বাপ-মরা পুষ্যির দল।

নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের জগন্মাতা দেবী উমা বছরে চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসেন। কিন্তু বাঙালী মায়েদের হৃদয় ভেঙে গড়া মেয়েদের অনেকে সামান্য কারণে বা অকারণে বিয়ের পর

বহু বছরে বা সারা জীবনেও একবার বাপের বাড়ি আসতে পায় না। হিরণদির মেয়ের অবস্থা তাই।

প্রথমে মেয়েকে আনার অনেক চেষ্টা করলেন। পরে নিরাশ হয়ে অনাথ আশ্রম খুলে বসলেন। আত্মীয়স্বজন কারুর অসুখ করলেই হিরণদির শ্যেন দৃষ্টি সেখানে গিয়ে পড়ে। তারপর রোগী বা রোগিণীর মৃত্যু হলে মামুলি কান্নাকাটির পর ছেলেমেয়ে যাকে পান এক ঝটকায় নিজের ঘরে তোলেন। প্রতিবাদ করতে গেলে তিনি এমন যুক্তি দেখাবেন যে শেষ পর্যন্ত রায় তাঁর পক্ষে যাবেই।

সে বছর বি. এস. সি. ফাইনাল দিয়ে মেজদির সঙ্গে ওঁদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। সে সময়ে ঐ ষষ্ঠীর মা মারা গেল। দেখলুম কেমন দক্ষতায় হিরণদি তখন ব্যাঙাচির মতো ষষ্ঠীকে তাঁর পরিবারভুক্ত করলেন। তারপর হিরণদির কথায় রুপো, পেতল, লোহার বালা, তাগা ও একমুঠো মাদুলির দৌলতে তিনিই তো ঐ ছেলেটাকে যমকে কলা ঠেকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এরপর ও ছেলে হিরণদির হবে না তো কার হবে।

সেই সব যমে-ঠেকানো ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে দক্ষযজ্ঞ শুরু করল। আর হিরণদি বেঞ্চের ওপর পা ছড়িয়ে বসে কারুর চুল আঁচড়ে দিতে, কারুর দুধ তৈরি করতে, কাউকে খাবার খাওয়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বকুনি ও গায়ে হাত বুলিয়ে আদর চলতে লাগল। পুষ্যির দল দুইই মিটিমিটি চোখে উপভোগ করতে লাগল।

এক সময়ে দেখি আমিও ওঁর পুষ্যিভুক্ত হয়ে গেছি। গায়ে হাত বুলিয়ে শুরু করলেন—কত রোগা হয়ে গেছিস (এটা ওঁর মুখের বুলি। উনি সবাইকে রোগা দেখেন)! আহা, তা আর হবে না, ঘুরে ঘুরে চাকরিবাকরি করলে আর শরীর থাকে। ও সব হল গিয়ে ব্যাটা ছেলের কাজ। ওদের শক্ত শরীর—ঐ গো দেখ দেখ, তাঁর স্বামী অবনীমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে বলেন—ঢুলতে ঢুলতে ছেলেটা বুঝি পড়েই মলো।

বলা বাহুল্য, নিরীহ অবনীমোহনবাবুও তাঁর পুষ্যিগোষ্ঠীর একজন। এ বিষয়ে হিরণদিকে টুকলে বলেন—আহা, ওদের মতো অসহায় পরমুখাপেক্ষী আর আছে। সামান্য ওষুধটুকুও ঢেলে খাবার ওদের ক্ষমতা নেই। সব সময়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তাই তো ভগবানকে বলি, ঠাকুর

আগে যেন ওঁর মৃত্যু হয়। আমার অবর্তমানে কত কষ্টই হবে। স্বামীর সেই ভবিষ্যৎ কষ্ট কল্পনা করে পতিব্রতার চোখ টলটল করে ওঠে। যার জন্য এত ভাবনা তিনি নির্বিকার চিত্তে রহস্য সিরিজের পাতা উলটে চলেছেন।

মুখের কথায় কাজ হয় না দেখে ঝুঁকে স্বামীকে ঠ্যালা দিয়ে বললেন—ওগো শুনছ, ছেলেটা—

অবনীমোহনবাবু চমকে জিজ্ঞাসা করেন—আমায় কিছু বলছ?

এবার হিরণদি মুখিয়ে ওঠেন—না, দেয়ালকে। কী আনাড়ি নিয়ে ঘর আমার···শেষে নানা আক্ষেপ করতে করতে নিজে উঠে ছেলেটাকে ঠিক করে শুইয়ে দেন। তারপর কাছ ঘেঁষে বসে ছেড়ে-যাওয়া কথার খেই ধরেন—তাই তো বলি মেয়েমানুষের দরকার কি বাপু চাকরি করার, কিন্তু কে শোনে। এই দেখ না আমাদের রেবা। চাকরি করতে গিয়ে কী চেহারা হয়েছে।

—রেবা, কোন রেবা?

—ঐ যে রেবা মজুমদার তোমাদের কলেজে পড়ত।

জয়ার সঙ্গে আলোচনা হবার পর রেবার সম্বন্ধে স-ঠিক খবর জানবার চেষ্টা করে নিরাশ হয়েছি। শেফালিদের কারুর ঠিকানা জানা ছিল না। অগত্যা বৌদিকে একটা চিঠি দিয়েছিলুম। তার উত্তর জয়ার মন্তব্যের চেয়ে সুরুচিপূর্ণ নয়। তারপর আশা ছেড়ে দিলুম।

হিরণদি বলে চলেন—ও তো আমার মামাতো ননদ। এই তো ওর বিয়ে গেল। ওখান থেকেই ফিরছি।

—রেবার বিয়ে!

—হ্যাঁ ভাই, তা সে নামেই বিয়ে। তোমাদের কলেজে যখন পড়ত তখন তোমরা সব জান নিশ্চয়। আহা কি থেকে যে কি হয়ে গেল। হিরণদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

আমি অবাক।

কোলের পুষ্যিটিকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আবার বলেন—কী সুন্দর মেয়ে, যেমন রূপে তেমনি গুণে। রমেশের সঙ্গে কেমন মানাত, সেও তো তেমনি। কিন্তু বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা উঠল।

বাঁদরের গলায়! কার সঙ্গে বিয়ে হল শেষ পর্যন্ত? আমি আর থাকতে পারি না, প্রশ্ন করি।

—ঐ যে নির্মল রায়, রেডিও আর্টিস্ট, ওর সঙ্গে। এ বিয়েতে তো রেবার একেবারে ইচ্ছে ছিল না। একরকম নিরুপায় হয়েই এ কাজ করল।

—কী হয়েছে হিরণদি?

—সে ভাই অনেক কথা। রমেশকে তার বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বাড়ি যেত না। যেখানে রেবা সেইখানেই সে থাকত। ছেলেকে যখন বুঝিয়ে পারলেন না তখন রেবাকে ধরলেন—তুমি সরে দাঁড়াও, ও যে আমার ছেলে, বাড়ি ফিরবে।

রেবা দিল্লীতে কাজ নিয়ে চলে গেল। রমেশ খোঁজখবর নিয়ে সেখানে হাজির। রেবা কানপুরে গেল। সেখানেও রমেশ তাকে অনুসরণ করল। হ্যাঁরে, চারহাত এক করে বিয়েই না হয় দেওয়া হয়নি, কিন্তু মনে মনে তারা তো একে অপরকে জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী বলে মেনে নিয়েছে। ছাড় বললেই কি ছাড়াছাড়ি হয়, ভেতরের টান যাবে কোথায়। আর পুরুষ জাতটাই হল গিয়ে অক্ষম, মেয়েদের আঁচল ধরে ধরে ওরা শিশু থেকে বুড়ো হয়। আত্মনির্ভরতার বালাই ওদের নেই। এই দেখ না সেবার আমায় বিছে কামড়াল তো ঐ পঁয়তাল্লিশ বছরের বুড়ো হাউ হাউ করে কেঁদে অস্থির। তারপর আমাকেই গোঙাতে গোঙাতে বলতে হল, ওগো, আমি মরিনি মরব না, ঠিক বেঁচে উঠব। তবে শান্ত হয়। রমেশেরও তো সেই অবস্থা গো। দুম করে বিয়েটা না দিয়ে একটু ভেবেচিন্তে কাজ করলে তোমার এত দুর্ভোগ হত না।

—যাক গে, তারপর?

—তারপর বাপ তো ছেলের কাণ্ড দেখে চুপ হয়ে গেলেন। ওরা দুটিতে আবার তেমনি হেসেখেলে দিন কাটাতে লাগল।

কানপুরে থাকতে রেবা রেডিওতে গান গাইত। সেই সময়ে এই নির্মল রায়ের নজরে পড়ে। নজরে পড়বার মতো মেয়েও তো। কিন্তু নির্মলের গুণ জানতে রেবার দেরি হয় নি। তাই আমল দিত না, পাশ কাটাত। হলে কি হবে, বজ্র যে ওর বরাতে নাচছে।

কালবোশেখী ঝড় উঠেছে। গাছপালা অবিরাম সেই নিষ্ঠুরের পায়ে মাথা

খুঁড়ছে। গাড়ি গর্জন করতে করতে দুলছে। চোখে মুখে বালি ঢুকে আমরা অস্থির। হিরণদির অনুরোধে জানালাগুলো ফেলে দিয়ে এসে বসি। বলি—বিয়ে করল বলেই না রত্ন লাভ হল। রেবা বিয়ে করতে গেল কেন অমন লোককে? ওর সম্বন্ধে আমিও যা-তা শুনেছি।

—এই দেখ, ইচ্ছে করে করল নাকি। শোন সব আগে। আহা, বলতে বুক ফেটে যায়। যখন ওরা ছুটিতে ওদের স্বপ্নে বিভোর, রেবার কাছে এক বে-নামী চিঠি এলো—গঙ্গার ধারে দেখা কর। গিয়ে দেখে রমেশের বৌ। রেবার হাতে একটা থলি ধরিয়ে দিয়ে বলল—এতে আমার যথাসর্বস্ব আছে নাও। আর গঙ্গাজলে শপথ করে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যাও। নয় তো আমি তোমার সামনে ডুবে মরব।

—কী বলছেন আপনি হিরণদি! আমি তাঁর দুহাত জড়িয়ে ধরি।

—সেই হতভাগিনীই চোখের জলে তার বুকের বোঝা আমার কাছে নামিয়েছে ভাই। তোমার মতো আমিও শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। যাক গে, তাড়াতাড়ি শেষ করি। এই ঘটনার পর রেবা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে নির্মলের বাড়ি। সেখানে বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে তারপর সর্বনাশী ঘরে এলো। হিরণদির চোখ জলে টৈটুম্বুর। একটু সামলে বললেন—বিয়ের সময় মেয়ের মুখ যেন নতুন চুনের মতো সাদা, চোখ রাখা যায় না।

গরমে দম আটকে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে ঝপঝপ করে সব কটা জানালা খুলে দিই। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি ঝড় থেমে গিয়ে পৃথিবী এখন নিথর হয়ে যাচ্ছে। আমিও জমাট বেঁধে গেছি।

পুষ্যির দল ঘুমিয়ে পড়েছিল। হিরণদি সবাইকে টেনে টেনে তুলে খাওয়ালেন। অবনীমোহনবাবুও শিশুদলভুক্ত। না, হ্যাঁ আমতা আমতা করে স্ত্রীর সোহাগের শাসনের আড়ালে বসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলেন। আমিও বাদ পড়লুম না।

সব সেরে অনেক রাত্রে হিরণদি নিজে খেয়ে জায়গার অভাবে বসে বসে ঢুলতে লাগলেন। আমার চোখে আজ ও-সবের বালাই নেই। একটি বেদনা মৌনমূর্তি ধরে মনের দোরে দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে যেন প্রশ্নের অন্ত নেই।

টাকার থলি নিয়ে যে আসে তাকে বোঝানো মুশকিল যে হৃদয়াবেগ আর ও জিনিস এক নয়। কিন্তু তার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে দিতে রেবা একি করল! সত্যিই কি সে রমেশকে এড়িয়ে থাকতে পারবে? তার আত্মবলিদান রমেশকে ঐ ভিখারিনীর ঘরে বন্দী করে রাখতে পারবে তো। ভাবনা সব এলো-মেলো হয়ে যায়, মাথাটা মনে হয় যেন বড্ড বেশি ভারী।

॥ ছয় ॥

পচা ভাদ্রে সর্বত্র জলে জলে যেন জলময়। তারপর আশ্বিন। এবারে আশ্বিনও যেন পচা। ঐ তো, কী মেঘ করেছে। কালো কালো জলভরা মেঘের ভারে আকাশ যেন মাটিতে ঝুলে পড়েছে। মনে হয় তার কোথাও একটা ফুটো করে দিলে তা থেকে একসঙ্গে এত জল পড়বে যে একটা নদী তৈরী হয়ে যাবে সেখানে।

ঐ যে জলে-ভেজা পথ বাড়িঘরের আড়াল দিয়ে বেঁকে কোথায় যেন চলে গেছে অমন জায়গা কেন জানি না আমি সহ্য করতে পারি না। পথের বাঁক, নদীর বাঁক, মনের বাঁক দেখলেই আমার মনটা হু-হু করে ওঠে। মনে হয় ওরা যেন সর্বনাশা, যেন কার হৃদয়ের কি ধন আছে তাই ছিনিয়ে নেবার জন্য ওত পেতে বসে আছে তাই অমন বাঁক দেখলেই বুকের ভেতর থেকে গেল গেল, সব গেল, সামাল সামাল রব শুনতে পাই। আজও সকাল থেকে মেঘের আঁধারে ছায়াচ্ছন্ন ঐ পথের বাঁকের দিকে চেয়ে ভেতর থেকে সেই রব শুনতে পাচ্ছি।

রোজই জানালা দিয়ে দেখি ঠিক তুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার আগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে সামনে ঐ বালুচরায় খেলা করে। তাদের খেলা হল বালির মধ্যে পা ঢুকিয়ে গোল গোল খেলাঘর তৈরী করা। তারা পেছন ফিরলে ঘরগুলি ভেঙে পড়ে। তারপর বৃষ্টির জলে ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কী করুণ রাগিণীতে সানাই বাজছে। বিসর্জনের বাজনা বিসর্জনের মতোই করুণ। এত আশা, আনন্দ হাসি গান সব যেন কটা দিনের মধ্যে বুদ্‌বুদের মতো পলকে মিশিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি ঐ সুর যেন তাদের চলে-যাওয়া পায়ের বিদায়ের করুণ মূর্ছনা।

রমেশবাবুর বিদায়কালের পায়ের আওয়াজে কি এই সুর ছিল।

ষোড়শী সবিতার কথা মনে গুন-গুনিয়ে ওঠে। সেদিন যদি অমন করে ও উমানাথের মন্দির থেকে নামতে গিয়ে পড়ে না যেত তবে আরো কতদিন রমেশবাবু সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকতে হত কে জানে।

অদ্ভুত মেয়ে সবিতা—যেন একটা চলন্ত ট্রেন। না হাত-পা, না মুখ কিছুরই বিরাম নেই। ছটফটে ভাব আর খিলখিল হাসি যেন লেগেই আছে।

সেদিন কী জোরে পড়ে গেল। অন্য কেউ হলে প্রথমে অপ্রস্তুত হত, তারপর ব্যথার চোটে অন্ধকার দেখত। কিন্তু সবিতার পড়ে গিয়ে কী হাসি। হাসতে হাসতে সে আর উঠতে পারে না। উঠতে গিয়ে বরং আরো দুধাপ নিচে গড়িয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে হাসির বেগ বাড়ে—খিল খিল খিল। সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুখখানা লাল হয়ে ওঠে।

আমিই টেনে তুলে ধরি। উঠিয়ে দাঁড় করাতে গেলে আমার গায়ে হেসে ঢলে পড়ে। তার জায়গায় আমিই অপ্রস্তুত বোধ করি আর বোধ করেন তার সঙ্গের মানুষটি।

সবিতা পড়ে গিয়ে হাসে আর তার কত লেগেছে ভেবে ঐ মানুষটির মুখ ব্যথিয়ে ওঠে। তাইতেই তো সম্পর্কটা বুঝতে পারি।

তাকে তুলে ধরে জোর করে বসালে এগিয়ে এসে খোঁজ করেন—কোথাও লাগল নাকি?

—লাগল। হা হা হা হি হি হি হো হো হো।

আমি যা জানতে চাইলুম তার উত্তর নেই, কেবল হা হা হা, অনুযোগ সঙ্গের মানুষটি।—অযথা হাসি মানে 'এনার্জি' ক্ষয় করা।

—কী কী বললে? হা হা হা হি হি হি। জান আমার এত এনার্জি আছে যে ধরে রাখতে পাচ্ছি না, মিনিটে মিনিটে ক্ষয় করলেও ফুরবে না, চেষ্টা করলেও শেষ হবে না। তাই—হা হা হা হি হি হি……

—আচ্ছ আচ্ছা, খুব হয়েছে, এবার থাম।

হাসিখুশি আনন্দ উচ্ছল একটি আত্মহারা মেয়ে। সময়ে মনের মতো শ্বশুরবাড়ি ও স্বামী পেলে মেয়েরা অমনিই হয়। তার ওপর স্বামীর সত্যি-কারের ভালবাসা পেলে তো কথাই নেই, তখন তাদের মধ্যে তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাস, ফুলের আত্মত্যাগ ও ঋষির ক্ষমাশীলতার রূপ ফুটে ওঠে।

আমিও বলি—থাম। কিন্তু সবিতা সে মেয়েই নয়। গায়ে পড়ে ভাব

করে। তার বাড়িতে টেনে টেনে নিয়ে যায়। তুনিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, যা জিজ্ঞাসা করা করা উচিত নয় তাও করে। বিব্রত হয়ে পালিয়ে আসি কিন্তু আবার ধরা পড়ি। এক-এক সময়ে কপট নিন্দে করি—কী বেহায়া বৌ বাবা! কে বলবে তুমাস মাত্র বিয়ে হয়েছে, যেন—কিন্তু এরপর আর আমি এগুতে পারি না। তার স-শব্দ হাসির চোটে আমায় থামতে হয়।

একদিন দেখি লুচির জন্য মাখা ময়দা নিয়ে চটকাচ্ছে।

ব্যাপার কী? প্রশ্ন করি। এবার কী ধিঙ্গিপনা ছেড়ে খুকিগিরি চলবে? অমলেশবাবু কোথায়?

—গৌহাটির ভাত বাড়ন্ত তাই বার্থ রিজার্ভ করতে গেছেন।

—আর তুমি মানুষকে উত্ত্যক্ত করবার সুযোগ হারিয়ে ময়দার ওপর ঝাল ঝাড়ছ।

—মোটেই না, তোমার জন্য একটা বর গড়ছি। কতকাল আর আইবুড়ো সরস্বতী হয়ে থাকবে।

—থাক, ও ময়দার ড্যালায় আমার প্রয়োজন নেই।

—তাই বল। তবে যে সেদিন বললে এখনও হোঁচট খাওনি। না বাবা, তাহলে জামাইবাবু গড়ে কাজ নেই। শেষকালে রমুদার মতো প্রেম আর বিয়ের মাঝখানে পড়ে নিরুদ্দেশ হতে হবে।

—রমুদা...প্রেম আর বিয়ে······নি[illegible]! এসব কথার মানে?

—সে আমার এক মাসতুত ভায়ের জমজমাট কাহিনী। তবে শেষের দিকে সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল।

আন্দাজ ঐ করি রমেশবাবুর কাহিনী। কৌতূহল দমন করতে পারি না। না জানার ভান করে প্রশ্ন করি—কী ব্যাপার? শেষের দিকে কী হল?

—রমুদার বাবা—মানে আমায় মেসোমশাই যাকে বলে একেবারে মধ্যযুগীয় 'বিউরোক্র্যাট্'। নিজের পছন্দমত মেয়ে শেতলা বৌদির সঙ্গে রমুদার জোর করে বিয়ে দিলেন। বৌদি অবশ্য আহামরি নয় তবে ছি-ছিও নয়। তোমার আমার মতো স্কুল-কলেজে পড়েনি বটে তবে চিঠিলেখার মতো বিদ্যে আছে। দেখতে গোলগাল, ড্যাবা চোখ। ঠোঁট

ছটো অবশ্য মোটা, তা আমাদের দেশে ডানাকাটা পরী আর কটা।

কিন্তু রমুদার মন বিয়ের আগেই অন্যত্র বাঁধা। তোমার ঐ অমলেশ-বাবুর বেহালার তার বাঁধার মতো নয়, যার সুর দিনের মধ্যে পাঁচবার, নেমে যায়। সে বন্ধন যাকে বলে একেবারে—

—রাখ দিকি তোমার বাক্যবিন্যাস, আসল ব্যাপার বল।

—কী জালা! তুমি তো দেখছি সেই 'ফুল্‌ল আর মলোর' দলের। যাক্ শোন। রমুদা মেসোমশায়ের চাপে পড়ে বিয়ে করল বটে, কিন্তু তার-পরেই জেহাদ ঘোষণা করল—মানে বাড়ি ছেড়ে যত্র রেবা তত্র সে বাস করতে লাগল।

—রেবাকে তুমি দেখেছ?

—শুধু দেখেছি নয় তারও বেশি—মানে ভাল রকম জানি। আরে মেসোমশায়ও জানতেন, অবশ্য আমাদের মতো নয়। কিন্তু মতিভ্রম। নিজের জেদ বজায় রাখার মোহে ভাবলেন বোধহয় বিয়ে নামক এক ডোজ ওষুধ দিয়ে দিই তাহলেই পুত্রের প্রেম নামক ব্যাধিটা কুইনাইন ইনজেকশান্ দেবার পর ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো তরতর করে ছেড়ে যাবে। কিন্তু মনের মানুষকে ছাড়া কি অত সোজা, তুমিই বল না।

—বলব আর কি। তোমাদের চোখের সামনে দেখেই সে তত্ত্ব বুঝতে পারছি। তারপর?

সে প্রথমেই লাল হয়ে যায়। তারপর মুখ খুলে সবচেয়ে বড় মিথ্যে কথাটা বলে—মোটেই না। আমি ওকে একবার কেন দশবার ত্যাগ করতে পারি। ভারী তো—

বাধা দিয়ে বলি—থাক্ থাক্ অযথা শক্তির অপব্যয় কর না। মেয়েদের বীরত্ব দেখাবার আহ্বান এখন নানা দিক থেকে আসছে। তুমি তোমার ভায়ের কথাই বল। রেবার সঙ্গ নিল, শেষে—?

—ঠিক তার শেষে কি হল জানি না। তবে এটুকু জানি রেবা নাকি মনের দুঃখে বাধ্য হয়ে এক মাতালকে বিয়ে করেছে। আমার মনে হয় এ ঐ মেসোমশায়ের কলকাঠির কেরামতি। ফল পেলেন হাতে হাতে, রমুদা নিরুদ্দেশ হল।

—সত্যি নিরুদ্দেশ?

—সত্যি নয় তো কি মিথ্যে। মেসোমশাই চারধারে খবর পাঠালেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে কেউ বলল পুরীর মন্দিরে সন্ন্যাসী বেশে রমুদাকে গাঁজা খেতে দেখেছি। কেউ বললে মাদ্রাজে মেয়েদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে সমুদ্রস্নান করতে দেখেছি। কেউ বলল যে বোম্বেতে সিনেমায় ঢুকেছে। করাচীতে মুসলমান রূপে কেউ দেখল। দিল্লীতে রেসের মাঠে, লক্ষ্ণৌএ নাচওয়ালীর সঙ্গে, কাশীর নোংরা গলিতে অমনি সব জায়গায় সবাই তাকে দেখতে লাগল। বাপের অবাধ্য, বৌয়ের প্রতি অবিবেচক লোক অমন জায়গা ছাড়া আর কোথায় যাবে এই ভাব আর কি।

বৌদির জন্য আমার সত্যি দুঃখ হয়। এই বয়সে বিধবা দিদিমার কাছে তীর্থে পড়ে আছে। কি দরকার ছিল সব জেনে শুনে জোর করে ওকে রমুদার ঘাড়ে চাপাবার। মেসোমশাই একগুঁয়েমির বশে কি সর্বনাশ যে করলেন। তাঁর নিজেরই কি কম শাস্তি। হা ছেলে জো ছেলে করে জীবন বার করছেন। রাস্তায় ঘুরে বেড়ান আর ফর্সা ছিপছিপে কেউ নজরে পড়লেই দৌড়ে কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন রমুদা না আর কেউ। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কোনদিন হয়তো শুনব একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন।

বাইরে বর্ষার ঘরের মধ্যেও থম্‌থম্ করে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে।

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে খোঁজ করি—সত্যি তোমার ভায়ের কোন ঠিকানা পাওয়া যায় নি? সে রকম চেষ্টা করা হয়েছে কি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ করা হয়েছে বৈকি। মেসোমশাই নিজেই করেছেন। আমার মা, বাবা, তিন মামা এঁরা যথেষ্ট খোঁজখবর করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছেন।

কালো মেঘ চুঁয়ে চুঁয়ে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। এখুনি হয়তো ঝমাঝম্ করে নামবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি নিজের ডেরার উদ্দেশ্যে। বিদায়-সম্ভাষণ আর জানানো হয় না। গলার কাছে মনে হয় যেন এক ড্যালা শুকনো ভাত আটকে গেছে।

এখানে ওখানে চাকরি করে ঠিক পাঁচ বছর পর কোলকাতায় এলুম।

শীতের দুপুর যেন প্রাচীনের ঘোলাটে ঠাণ্ডামারা চোখ। রোদ আছে কিন্তু তার তাপ নেই; হাওয়ায় পুলক-শিহরণ নেই, আছে অক্ষমের কাঁপুনি। কুয়াশার ধাঁধা ভেদ করে সব কিছু অস্পষ্ট দেখায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সমস্ত সময়টা যেন বাসি মুড়ির মতো মিইয়ে থেকে মনে বিষাদ-ভাব জাগায়। তাই বাড়ির রান্না পেয়ে একপেট খাওয়া সত্ত্বেও ম্যাটিনি শো দেখতে বেরুলুম।

ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে রমেশবাবুদের বাড়ির সামনে এসে থমকে গেলুম। বিরাট বাগান এখন জঙ্গল। নানা রঙের জংলী ফুলগুলি যেন কুতূহলী শিশুদের মতো সবুজ পাতার বাধা ডিঙিয়ে উঁকি মারছে।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াতে এসে শুয়ে বসে খেলা করে সময় কাটাচ্ছে। তাদের হাসি হাওয়ায় ভেসে বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করছে।

মাঝখানে শ্যাওলা-ধরা ফাটলে ফাটলে বট-অশথের চারা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এককালের মস্ত শৌখীন বাড়িটি। অনেকক্ষণ দেখলে মনে হয় ও যেন একটি অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথাভরা মৌন উত্তর।

॥ **সমাপ্ত** ॥

॥ আলোচনা ॥

জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু—

শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচয়ে' জীবনানন্দ দাশের কবিপ্রতিভাসম্বন্ধীয় আলোচনাটি প্রচেষ্টা হিসেবে অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু সযত্নে আসল বিষয়টি পরিহার করবার বিপজ্জনক উদাহরণ হিসেবে আপত্তিকর। সাধারণ সমালোচকবর্গের মতো মণীন্দ্রবাবু জীবনানন্দকে 'নির্জনতম' কবি বলে সরিয়ে রাখেন নি এটা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্মরণীয় যে সমস্যার মূল সন্ধানে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। এর কারণ তাঁর আলোচনার মধ্যেই নিহিত আছে।

মণীন্দ্রবাবুর সমস্ত আলোচনাটির স্থির বিশ্লেষণে জ্ঞাতব্য যে জীবনানন্দ-মানসের মূল সন্ধানে তিনি তাঁর ব্যক্তিমানসের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে কবির প্রথমজীবনের কাব্যরচনায় দ্বিধাগ্রস্ততার কারণ তাঁর নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমনের স্বপ্নরতি। এ মতবাদ আপত্তিকর। যে কোন ব্যক্তিমানস তার পারিপার্শ্বিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন মাত্র। এবং যে কোন মহৎ শিল্পীর রচনায় স্বীয় আবেষ্টনীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতিক্রিয়া থাকবেই। টলস্টয়ের সাহিত্যবিচারে লেনিনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—If the artist we are discussing is really a great artist, he must have reflected at least some of the important aspects of the revolution in his works (Articles on Tolstoy),

সুতরাং, জীবনানন্দের প্রথমার্ধের কবিতা সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার আগে তৎকালীন পারিপার্শ্বিকের নিখুঁত বিশ্লেষণ কর্তব্য। বিশ-ত্রিশ দশকের বাঙলাদেশের ক্রমভঙ্গুর সামাজিক অবস্থায়, অর্থনৈতিক ক্রমবর্ধমান দুর্মূল্য এবং বেকারির প্রাচুর্যের প্রতিক্রিয়ায় আপাতদৃষ্টিতে কবি-মানসে হতাশা এবং পলায়নবাদের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। আর রাজনৈতিক অনগ্রসরতা এবং সামাজিক পশ্চাদমুখীনতায় অপরিণত ও অনগ্রসর কবিমানস সমস্যার মূল সন্ধানে প্রায়ই অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে। ফলে, আপন হৃদয়-উত্থিত প্রচণ্ড আক্রোশ স্থির লক্ষ্যের অভাবে প্রচণ্ড বিক্রমে স্রষ্টাকেই আঘাত করে।

এই অবস্থায় সংবেদনশীল কবি-মানস আঘাতের প্রচণ্ডতার আতঙ্কে পশ্চাদগামী হয়। এমনি অবস্থায় মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে

'শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন,'

অথবা

'আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় বেদনায় আক্রোশে ভরে গিয়েছে।'

সেই আবেষ্টনীতে এই আকুল আর্তনাদ করা ছাড়া জীবনানন্দের পক্ষে আর কিছু সম্ভব ছিল না। এই মতের সমর্থনে লেনিনের উক্তি, "But the contradiction in Tolstoy's views and doctrines are not fortuitous, they express the contradictory conditions of Russian life in the last third of the nineteenth century (Articles on Tolstoy) মণীন্দ্রবাবু নিজেও একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে আপন সমস্যা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সমস্যার অন্তর্গত। তাঁর আলোচনার প্রথমার্ধে তিনি এ প্রসঙ্গের কিছুটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন কিন্তু তারপরই ইচ্ছাকৃত তথ্যগোপনের অপরাধে তিনি নিশ্চিতরূপে অভিযুক্ত।

আসলে, এ ধরনের আলোচনার মূল ত্রুটি বোধহয় আরও গভীরে। বিচারের মাধ্যমে তত্ত্বে উপনীত না হয়ে নির্দিষ্ট তত্ত্ব সামনে রেখে বিচার করলে দ্বিধাগ্রস্ততার হাত এড়াবার উপায় নেই। বিশুদ্ধ তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে সমাজ-জীবনে দ্বৈতাদ্বৈতের নিত্য চলমান সংঘর্ষকে অস্বীকার করা হয়। আর একথা তো সর্বজনস্বীকৃত যে ইণ্টারপ্রিটেশন চিরকালই সম্পূর্ণ। গটা প্রোগ্রামের সমালোচনায় এঙ্গেলস্‌ও এই 'লাসালী' ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন—"the real weakness in the childish notion of the coming revolution which is supposed to begin by the whole world dividing itself into armies ; we here, the 'one reactionary mass' there."

মনে হয় মণীন্দ্রবাবু তাঁর আলোচনার বহুপূর্বেই মনে মনে জীবনানন্দকে সেই one reactioany mass এর দলে কল্পনা করেছেন, নইলে জীবনানন্দের শেষজীবনের কবিতা আলোচনায়ও তাঁর অসাফল্যের কারণ কি ? যদিও এ কথা তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে জীবনানন্দের শেষার্ধের কবিতা কিছু পরিমাণে প্রগতিশীল, তবুও তার সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে যে এটা বোধহয় জীবনানন্দের একটা ফ্যাশান মাত্র, যেহেতু তখন বাংলার আধুনিক

কবিদের মধ্যে সবাই অল্পবিস্তর সমাজসচেতন অতএব জীবনানন্দও যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বে সেই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। (শুধু মণীন্দ্রবাবুর নয়, বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রগতিশীল সমালোচকদেরও জীবনানন্দ সম্বন্ধে একই ভ্রান্তি ঘটেছে। গতবারে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এ ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এ বিষয়ে বোধহয় তিনিই একক।) অথচ 'সাতটি তারার তিমির' (জীবনানন্দের এটিই সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ) জীবনানন্দের প্রতিভার সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ পরিণতির উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর, জীবনানন্দের এই সর্বশেষ গ্রন্থ জীবন-রস-উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্যে জীবনানন্দ-বিরোধীদেরও বিস্মিত করেছে। তাঁর কবি-মানস অনেক খণ্ড উপলব্ধির মধ্যে, অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে, অনেক সত্যাসত্যের নিত্য সংঘর্ষে এই সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি কোনো দেশে কোনো কালেই আকস্মিক নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশে তিনি এমন একটা সময়ের কথা কল্পনা করেছেন

'যখন দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।'

আর, তখনকার অবক্ষয়ী পরিবেশের মধ্যেই তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার পুনরুদ্ধার করলেন, এবং সেইজন্যই মনে হল,

'ভোরবেলা পাখীদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের গানে,'

এই সুস্থ, সবল প্রাণব্যঞ্জনাই চিরকালীন সত্য, নইলে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেই সভ্যতার অবসান ঘটত, 'তা না হ'লে সকলি হারায়ে যেত ক্ষমাহীন রক্তে নিরুদ্দেশে"। রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকারিত্ব অর্জনে জীবনানন্দ যে অসাফল্য অর্জন করেননি তার প্রমাণ উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের দৃঢ় জীবন-নিষ্ঠা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উচ্চারণেও তিনি প্রগতিশীল শিবিরের অন্তর্ভুক্ত,

'সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হোল রক্তে— উপেক্ষায়
বুকের সন্তান তবু নবীন সঙ্কল্পে আজো আসে।'

এশিয়ার বিভিন্ন উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু, সার্থক, সৎ, জীবন-নিষ্ঠ শিল্পীর মতোই আত্ম-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি নির্দ্বিধ। অতীত জীবনের শূন্যচারী উদ্দেশ্যবিহীন কল্পনালোকে পাদচারণের নিষ্ফলতা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। তখন,

'ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই
দেখা গেল পথ আছে—ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে,
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বারবার আমাকে চেনায়।'

সাধারণ মানুষ যে আগামীকালে পথ-প্রদর্শনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এ ধারণা উল্লিখিত অংশে পরিস্ফুট, কিন্তু, মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধাগ্রস্ততায় 'আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক'। এ তথ্য নির্ভুল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের সর্বশেষে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত যখন হারানো-পথের সন্ধান লাভ হয়, তখন 'অস্বাভাবিকতা' আর কবিহৃদয়কে আচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম হয় নি, কারণ, চূড়ান্ত উপলব্ধি তার লাভ হয়ে গেছে,

'তবুও নক্ষত্র, নদী সূর্যনারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে, তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গড়ে ভেঙ্গে গড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব,'

এমনকি, শেষপর্যন্ত এ ধরনের চিন্তাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো যে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'মানবিক রণ ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন।' অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের দুর্বলতায় জীবনানন্দের পক্ষে নিশ্চয়ই আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তাই সীমিত আবেষ্টনীর মধ্যে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বমানবের সুস্থ, আনন্দময় জীবন যাপনের স্বপ্ন-দর্শনেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

সুতরাং, মণীন্দ্রবাবুর অনুকরণে জীবনানন্দ-প্রতিভাকে এক 'মহৎ-সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি' বলা যুক্তি হীন। অথবা, সামাজিক ব্যবস্থার এক বিশেষ পরিণতি-প্রাপ্তির পূর্বে কোন মহৎ-প্রতিভার পক্ষেও পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব, (এ প্রসঙ্গে শেষ জীবনে রবীন্দ্র-আক্ষেপ স্মরণীয়। সেই হিসেবে জীবনানন্দও নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধ পারিপার্শ্বিককে তিনি নিশ্চয়ই ফাঁকি দেননি।

—**বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য**

লেখকের বক্তব্য

'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপেষু—

কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে আমার আলোচনার প্রতিবাদলিপি পড়লাম। পত্রলেখক অনেক খাঁটি কথা বলেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ কাল্পনিক, তাই উক্ত সুভাষিতাবলী প্রায় অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদের উৎসাহে তিনি আমার আলোচনাটিকে যথেষ্ট যত্নসহকারে পড়েও দেখেননি; তাঁকে আবার পড়তে অনুরোধ করি, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে গায়ে ব্যথা হবে না তা হলে।

আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতির পর্যায়-ক্রমিক উল্লেখ করে জীবনানন্দ দাশের কাব্যসার্থকতার মানচিত্র রচনা করতে চেয়েছিলাম ঐ আলোচনায়। আবার আলোচ্য কবি যে একটা সাহিত্যিক ভ্যাকুয়ামের মধ্যে কাজ করে যাননি, সেটাও খেয়াল রাখতে চেষ্টা করেছি। তাই প্রথমেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর তুলনা-প্রতিতুলনা উঠেছিল। এবং সেই নজিরেই জীবনানন্দের ভাববস্তুগত তৎকালীন পশ্চাদ্‌মুখিতার জন্যে সমাজমানসকে দায়ী না করে কবির ব্যক্তিমানসকেই দায়ী করতে হয়েছিল।

এইখানে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে আমার অবশ্য মতভেদ আছে। 'যে কোন ব্যক্তিমানস তার পারিপার্শ্বিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন' এ একটা সাধারণ সত্য মাত্র—ব্যক্তিমানস কতখানি সচেতন তার উপর 'সুস্পষ্ট' প্রতিফলন নির্ভর করে। এবং 'পারিপার্শ্বিকতা'ও তেমন কিছু নির্বিশেষ অবস্থা নয়; যে কোনো সময়েই আমাদের মতো বিমিশ্র সামাজিক অবস্থায় অগ্রবর্তী এবং পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে থাকে। লেখক কোন মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হবেন তা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিমানসের প্রস্তুতির উপর। এটা যদি না হতো তাহলে আত্মশুদ্ধির কোনো স্থানই থাকত না সাহিত্যে—কী লিখব, কেন লিখব, এ সব কথাও উঠত না। ইতিহাসের অগ্রগতিতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ দর্শক নয়, সচেতন অংশগ্রহণকারী এটা মনে রাখা দরকার।

পত্রলেখক অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো প্রশ্ন না তুলেও বলতে চাই, রুশ সাহিত্যের আলোচনায় টলস্টয়ের সম্বন্ধে লেনিন যা

বলেছিলেন, তা হয়তো বাংলা সাহিত্যের বিচারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বিষয়েই প্রয়োগ করা চলে ; কারণ আর কোনো কবি-সাহিত্যিকই আমাদের দেশে লেনিনের ধারণামতো 'really a great artist' নন, তাঁদের রচনায় 'important aspects of revolution' খুঁজতে যাওয়াও সব সময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। শুধু কে কতটা চেষ্টা করেছেন এবং কে করতে পারেন নি তারই আলোচনা চলতে পারে। এর বেশি করতে গেলেই উল্টো পাকের 'লাসালী ভ্রমে' জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

শ্রীভট্টাচার্যের আরেকটি ক্ষোভের কারণ, তাঁর ধারণা আমি জীবনানন্দের শেষ জীবনের 'প্রগতিশীলতা' 'ফ্যাশান' বলে ধরে নিয়েছি। কারণ আমি বলেছি, 'চল্লিশের যুগে' অন্যান্য কবিদের মতো জীবনানন্দও স্বদেশ ও স্বসমাজের যন্ত্রণা ও প্রতিবাদের অংশীদার হয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হবার কী আছে? বিশেষ করে শ্রীভট্টাচার্যের মতো সমালোচকের, যিনি মনে করেন, "যে কোন ব্যক্তিমানস পারিপার্শ্বিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন মাত্র"! কবি জীবনানন্দ অন্যান্য কবির অনুকরণে জীবননিষ্ঠার দিকে আগ্রহী হয়েছিলেন, এই স্বকপোলকল্পিত দুশ্চিন্তার বদলে এটা মনে করলেই তো মিটে যায় যে, যে সমস্ত বাস্তব কারণে অন্যান্য সমসাময়িক কবি নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী জীবননিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, সেই কারণগুলিই জীবনানন্দ দাশকেও প্রভাবিত করেছিল। পত্রলেখক শেষের দিকে জীবনানন্দকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার উৎসাহে তাঁর চিঠির প্রথম প্রতিজ্ঞাই ভুলে গেছেন।

অতিবিস্তারে আবশ্যক নেই। সূত্রাকারে সব কথাই আমার সাধ্যমতো ঐ প্রথম আলোচনাটিতে আছে। উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

—মণীন্দ্র রায়

ননী ভৌমিক

॥ বারো ॥

লাল ধুলোর একটা শহর।

শহরটা এপাশ-ওপাশ করে। রোজগার করে, খরচা করে। ভালোবাসে, ঘৃণা করে। গোঙায়, স্বপ্ন দেখে। তারপর সহসা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে একটা আশ্চর্য মোহময় বিন্দুর দিকে। সে বিন্দুর নাম যুদ্ধ।

একফোঁটা বিষের মতো সে বিন্দু টলটল করে শূন্যে। তারপর স্ফীত হতে-হতে সবকিছু আচ্ছন্ন করে এক অপ্রাকৃত ডানার মতো তীরবেগে নেমে আসে, মিলিয়ে যায়। ছায়া-ছায়া, আর অবাস্তব আর উন্মাদ। মিলিয়ে যায় আর আবার ফিরে আসে। আর অনেক দূরে নরম গালিচার শেষ প্রান্তে, একটা বিবর্ণ মামুলি মূর্তি ফাটা পলেস্তার মতো নড়ে ওঠে,—সম্রাট! সম্রাট! তারপর নড়তে-নড়তে, লম্বা হতে-হতে অপ্রাকৃত একটা ইস্পাতের প্রেত হয়ে ঝনঝন করে এগোয়। ঝনঝন করে বেজে ওঠে ইস্পাতের আর-একটা প্রেতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর অপ্রাকৃত এক ধাক্কায়। আর নির্ভুল যান্ত্রিকতায় একটা অচেনা নগর হঠাৎ ছাই হয়ে হাঁপায়। একটা অচেনা ক্ষোভ হঠাৎ নোঙরা হয়ে ওঠে মানুষের ছেঁড়া-ছেঁড়া মাংসের ডেলায়। যুদ্ধ। অদ্ভুত একটা সত্য। অদ্ভুত একটা অবাস্তবতা। সাতসমুদ্রপারের, সাতসমুদ্র-পার-হয়ে আসা একটা ছায়ায়। আর আগুনলাগা একটা দুর্গের নিচতলার বাসিন্দা হ্যালা-বোকা ধাড়ি একটা খোজা গোলামের মতো মফস্বল শহরটা মাঝে মাঝে হি-হি করে হাসে। মাঝে-মাঝে ঝিমোয়। মাঝে মাঝে গুজব শোনে আর গুজব শোনে আর গুজব শোনে।

তারপর একদিন চমকে ওঠে। ও কী! ও কারা!

লালধুলোর একটা রাস্তা। রাস্তাটা মোচড় খেতে-খেতে বেঁকে গেছে

শালবনের দিকে, গ্রামের দিকে, রাঢ়ের বুকের দিকে। সেই রাস্তা দিয়ে অস্পষ্ট গর্জনের মতো কী একটা এগিয়ে আসছে। এলোমেলো আকৃতির মতো কিছু একটা নড়ে উঠেছে। একটা মিছিল। মিছিল—কিন্তু এ শহরে আরো অনেকবার যে মিছিল দেখা গেছে, সে মিছিল নয়। যে মিছিল কোনো দিন দেখা যায় নি, সেই মিছিল, চাষীর মিছিল। পা ফেলতে শেখে নি এখনো, লাইন মেলাতে শেখে নি। তবু আসছে। বুড়ো, জোয়ান, তামাটে কালো, সাঁওতাল সদ্‌গোপ, জাত-বেজাত চাষা। ফাটা-ফাটা খালি পা তাদের ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে আসা ধুলোয়। হাতে কারো লাঠি, কারো হাতে কাঁড় ধনুক। পিঠে কারো গামছায়-বাঁধা মুড়ি, কারো বগলে তালিমারা ছাতি। আর মিছিলের সামনে আশ্চর্য অপরিচিত একটা নিশান,—কেমন সর্বনাশা লাল রঙের একটা ঝাণ্ডা। সাহেবের কাছে সাঁওতালী নাচ দেখাতে নয়, আদালতের ডিক্রি শুনতে নয়, জমিদারবাড়িতে দণ্ডবৎ করতে নয়। স্থূল হাতের মুঠোয় এলোমেলো আনাড়ি এক উত্তেজনা জাগিয়ে, চৌকো বয়স্ক ঝড়দাগা মুখগুলোয় অদ্ভুত এক স্বপ্ন কাঁপিয়ে, ভাঙা-ভাঙা হেঁড়ে গলায় অনভ্যস্তের মতো চিৎকার করতে-করতে এগিয়ে আসছে— লড়াইয়ের লেগে —না এক পাই! না এক ভাই! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! লাঙল যার, জমি তার। বলো ভাই, লাল ঝাণ্ডা কি—জয়!

শহরের দোকানদারেরা স্বাভাবিক চাপল্যে হাসতে গিয়ে হঠাৎ হাসতে পারে না আর। ভদ্র দর্শকেরা বিজ্ঞ দু-একটা মন্তব্য করতে গিয়েও হঠাৎ হাঁ করে চেয়েই থাকে। এ কী! কী এর মানে? কী শুরু হবে এবার?

পূর্ণচন্দ্রও দেখছিলেন মিছিলটা। হঠাৎ চমকে উঠলেন—মিছিলের সামনে হাঁপাতে-হাঁপাতে যে-লোকটা হাঁটছে, তাকে তিনি চেনেন। সেই রমেশবাবু না? আদালতে শিবুদের সঙ্গে একই কাঠগড়ায় দেখেছিলেন লোকটাকে, তাঁরই বাড়িতে লুকিয়েছিল কয়েকদিন তাও টের পেয়েছিলেন, সেই লোকটা?

আর তার চেয়েও চমকে উঠলেন আর-একটা লোককে দেখে। একটা চাষী। না, চাষী আর নয় ভাগচাষী। না, ভাগচাষীও আর নয়—পূর্ণচন্দ্র তাঁকে ছুটিয়ে দিয়েছেন জমি থেকে। একটা হাভাতে উচ্ছন্ন চাষী বনমালী। ফাটা-ফাটা খালি পা। মাথার কাঁচাপাকা চুল এখন একেবারে শাদা হয়ে গেছে। বগলে একটা পুঁটলি। দুই জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বনমালীও

চেঁচাচ্ছে, লাঙল যার, জমি তার। ধূসর চোখ দুটো জ্বলছে এক সমবেত ভয়ঙ্কর স্বপ্নের নেশায়।

লাঙল যার জমি তার? তার মানে? পূর্ণচন্দ্র সন্দিগ্ধের মতো জিগ্যেস করেন পাশের একটি লোককে—তার মানে জমিদারের জমি নয়? যে মনে করো টাকা দিয়ে কিনল, তার জমি নয়?

'তাই তো বলছে মাশায়!' দর্শকদের মধ্যে থেকে হাড়ি-বাউড়িদের একটা ছেলে বিনীতভাবে বলে, আর পূর্ণচন্দ্রের চোখের সামনেই কেমন উৎসুক উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'তাই কখনো হয়? আইন কোথায়?' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন পূর্ণচন্দ্র, আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কেমন যেন মনে হয় তাঁর, হয়তো তাও হবে, হয়তো তাই হবে। এ মিছিলের মধ্যে এমন কী একটা যেন ছাইচাপা আগুনের মতো উসকিয়ে উঠেছে, যাতে মনে হয় তাই হবে একদিন।

কিন্তু কেন হবে? পূর্ণচন্দ্র উত্তেজনায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। ইচ্ছে হয় কারো সঙ্গে তর্ক করেন তিনি। মোহিনীদেবীর সঙ্গে করেন। এ যেন আর কারো নয় মোহিনীদেবীরই চক্রান্ত। তাঁরই জিদটা মিছিল হয়ে এসেছে। কিন্তু ও তো আমার জমি! আইনত আমার!

অস্থিরভাবে পূর্ণচন্দ্র বাড়ি ঢুকতেই মোহিনীদেবী আস্তে বেরিয়ে আসেন বৈঠকখানা থেকে। বলেন, 'বাবাকে দেখবেন একবার? উনি বোধহয়—'

মিছিলের কথাটা আর তোলা হয় না। 'কেন, কী হয়েছে?'

মোহিনীদেবী ছাড়াছাড়াভাবে জানান ঘটনাটা। শিবু ফেরার পর থেকে উনি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে ওই কাপাসচারাগুলোর পেছনে লেগেছিলেন। নিত্য নতুন কবিরাজী সার আর আড়ক দিয়ে ওদের পরিচর্যা চলছিল। কয়েকদিন আগে একটা কুঁড়িও দেখা গেছে। উত্তেজনায় সেদিন থেকে রোজই একটু বেশি পরিমাণে মদ খেতে শুরু করেছিলেন। আজ ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে শোনেন, ফিসফিসিয়ে ডাকছেন, 'বৌমা আসো তো একটু। উঠবার পারতেছি না—'

মোহিনীদেবী ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু খানিক

পরেই ধপ করে একটা শব্দ শুনে দেখেন, রামচন্দ্রবাবু আবার গড়িয়ে পড়েছেন বিছানায়। মোহিনীদেবীর প্রশ্নের উত্তরে কোনো জবাব দিতে পারেন না। শুধু বোঝা যাচ্ছিল অশীতিপর একটা হাড়ের খাঁচা বিছানার সঙ্গে লেপটে কী যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা সইতে চেষ্টা করছে। ডাক্তার দেখে গেছে একবার, কিন্তু কী হবে তাতে ?

'যখন কথা কইতে পারলেন তখন আপনাকে খোঁজ করছিলেন !'

'আমাকে !' পূর্ণচন্দ্র বিহ্বল হয়ে পড়েন একেবারে। এতদিন পরে নিজে থেকে রামচন্দ্রবাবু তাঁর পুত্রকে ডেকে পাঠালেন ! এতদিন পর অভিমান গেল তার !

আড়ষ্ট পায়ে পূর্ণচন্দ্র রামচন্দ্রের ঘরে ঢোকেন। অনেকক্ষণ পরে যখন ফেরেন তখন কেমন স্তব্ধ মনে হয় তাঁকে।

'কেন ডেকেছিলেন জানো ? উইল করে রেখেছেন, তাই পড়তে বললেন। যে বাড়িখানায় আছি এটাও উনি আগেই বিক্রি করে রেখেছেন লছমীদাসের কাছে, কাউকে জানান নি। এই সব ওঁর এক্সপেরিমেণ্টের নেশায়। সব মিলিয়ে নগদ আছে বোধহয় গড়ে তিন হাজারের মতো। তার পাইপয়সা হিসাব করে দিয়েছেন কিসে খরচ করতে হবে—নিজের শ্রাদ্ধের খরচটা, পুরুতের খরচটা পর্যন্ত। বাকি টাকার এক লম্বা ফর্দ আছে। যদি তাঁর রঙিন কাপাস সত্যিই ফলে, তবে সে টাকাটা দিয়ে তার চাষ করতে হবে শিবুকে। যদি না ফলে তবে এতদিন ধরে যে-সব ছুতোর-মিস্ত্রি-তাঁতীর সঙ্গে পাগলামি করেছেন তাদের নামে নামে টাকাটা ভাগ করে দিয়েছেন। আমাদের জন্যে কিছু না, এমনকি বাড়িখানা পর্যন্ত প্রাণে ধরে রেখে যেতে পারেন নি। উইলে লিখেছেন, 'অপরের উপার্জিত ধনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা আমার পুত্রকন্যাদিগের উচিত হয় না। তাহারদিগকে আমি আশীর্বাদ করিতেছি।'

পূর্ণচন্দ্র একটু দম নেন। চোখ দুটো বুঝি জ্বালা-জ্বালা করে তাঁর। তারপর আচমকা উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আর তিন শ টাকা ফুলমতিয়া অবর্তমানে তার বংশধর যদি কেউ থাকে তার জন্যে—'

এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে আসে বাড়িটা। বহু দূরের চাপা-পড়া অতীত থেকে একটা নাম উঠে এসে সহসা স্তব্ধ করে দেয় সবাইকে। একটা

নাম, নাকি একটা কলঙ্ক? নাকি একটা উন্মত্ততা? এ বাড়ির বর্তমান কেউ তা জানে না। পূর্ণচন্দ্র ভেবেছিলেন আর কেউ জানবে না। কিন্তু মারা যাবার ঠিক আগে নিজে হতেই রামচন্দ্রবাবু আবার তা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে গেলেন।

পূর্ণচন্দ্র তখন ছোটো, তবু জানতে হয়েছিল তাঁকে। যন্ত্র বানাবার নেশা রামচন্দ্রবাবুকে তখনো এতটা পেয়ে বসে নি। ইংরেজী কাব্য তখনো তাঁর প্রিয়। অথচ কাব্যে যা পেয়েছেন জীবনে তা পাওয়া হয়ে উঠছে না। স্ত্রী সেবা করেছে, মুগ্ধ করতে পারে নি। সেই সময় এসেছিল ফুলমতিয়া—আদালতের এক পিয়নের সভবিধবা। রামচন্দ্রবাবুর আশ্রয় চেয়ে বলেছিল, ‚বাঁচান বাবুজী! বিলাতী হাকিম পিয়ারসন সাহেব নাকি তাকে রাত্রে কুঠি যেতে হুকুম করেছে।

রামচন্দ্রবাবু হাকিম ছিলেন না, হাকিমের কর্মচারীমাত্র। তাই সর্বনাশের ভয় ছিল সমূহ। তবু মেতে উঠলেন ফুলমতিয়াকে বাঁচাতে। তার জন্যে আলাদা একটা ঘর ঠিক করে দিলেন নিজের খরচায়। আর তারপর নিজেই মেতে উঠলেন নতুন এক মাদকতায়—ফুলমতিয়ার মাদকতা। বালক পূর্ণ-চন্দ্রকে অনেক দিন ফুলমতিয়ার বাড়ি থেকে ডেকে আনতে হয়েছে রামচন্দ্রকে অনেক দিন দেখতে হয়েছে, নিরক্ষরা ফুলমতিয়ার ঈষৎ মুগ্ধ ঈষৎ বিব্রত দৃষ্টির সামনে আত্মবিস্মৃত নেশায় জড়িত কণ্ঠে ইংরেজী কাব্যের লাইন আবৃত্তি করে চলেছেন মধ্যযৌবনের রামচন্দ্র।

লোকনিন্দা হয়েছিল। সংসারে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, পিয়ারসনের কানে খবর পৌছতে দেরি হয়নি। কিন্তু রামচন্দ্রবাবু বন্ধুদের সদুপদেশে কান না দিয়ে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, ‘পিয়ারসন তাঁর কামরায় পিয়ারসন। কামরার বাইরে পিয়ারসনও মহারানীর প্রজা, আমিও মহারানীর প্রজা। দেখতে চাই কে জেতে!’

শেষ পর্যন্ত সংঘাত একটা বাধল, কিন্তু অন্যদিক থেকে। পিয়ারসন বোধ-হয় সত্যিই মহারানীর খাঁটি প্রজা। তাই রামচন্দ্রবাবুর ওপর হুমকি না দিয়ে হুমকির পরিমাণ বাড়ালেন ফুলমতিয়ার ওপর। তারপর ফুলমতিয়ার শূন্য ঘর থেকে রামচন্দ্রবাবু ফিরে এলেন কেমন একটা হাহাকার-করা হাসি নিয়ে। বন্ধুবান্ধব যাকে পেলেন তাকেই ডেকে ডেকে অকারণে শোনাতে

লাগলেন, যাক, তিনি বেঁচে গেলেন। পিয়ারসনের সঙ্গে লড়ে সর্বনাশ সইতে হল না তাঁকে। ফুলমতিয়া তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজেই ইচ্ছে করে চলে গেছে পিয়ারসনের কুঠিতে আয়া হবার জন্যে—

তারপর থেকে ফুলমতিয়ার নাম এ বাড়িতে আর কেউ কখনো শোনে নি।

স্তব্ধতা ভেঙে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রের গায়ে হাত বুলোতে শুরু করেন মোহিনীদেবী। আর সচকিত হয়ে পূর্ণচন্দ্র টের পান তাঁর জ্বালা-জ্বালা চোখ দুটো কখন ভিজে উঠেছে। রামচন্দ্রের জন্যে কখন তিনি কাঁদতে শুরু করেছেন ছেলেমানুষের মতো। 'উনি—উনি—উনি আমার বাবা! কিন্তু কেউ ওঁকে কোনো দিন বুঝতে পারল না। কেউ না। আমিও না। না আমিও বুঝি না—'

মোহিনীদেবীর নীরব হাতখানা আরো ঘন হয়ে আসে পূর্ণচন্দ্রের পিঠের ওপর। ধীরে ধীরে বলেন, 'পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছিলাম। কী দু-একটা ওষুধ দেবে বলেছে। সেগুলো তো নিয়ে আসতে হবে—'

ওষুধ নিয়ে যখন ফিরে আসেন তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। অন্দরের মধ্যে মোহিনীদেবী ছাড়াও আরো কয়েক জন নিচু স্বরে কথা কইছে। একেবারে কাছে এসে লোক চিনতে হয় পূর্ণচন্দ্রকে। সত্যবাবু আর সেই রমেশবাবু, সেই যে লোকটাকে আজকেই দেখে এসেছেন মিছিলে, সেই যে লোকটা তাঁর এই বাড়িরই দোতলায় আশ্রয় নিয়েছিল গোপনে।

'ওষুধ নিয়ে এসেছেন?' কেমন দুর্বল শোনায় মোহিনীদেবীর গলার আওয়াজ। যেন আরো কী বলতে গিয়ে দম নিয়ে থেমে যান। তারপর ফিসফিস করে ওঠেন, 'শিবু আবার গ্রেপ্তার হয়েছে। আজ আবার হাজিরা দিয়ে আসার দিন ছিল। সেখান থেকে আর ছাড়ে নি। সত্যবাবু খবর এনেছেন।'

'আবার? আবার কেন? ও তো—'

মোহিনীদেবী উত্তর দেন না। উত্তর দেন রমেশবাবু, 'না, এবার ও এখনো পর্যন্ত কিছু করে নি। কিন্তু যুদ্ধ যে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলস। শুধু ও নয়, আরো কয়েকজনও গ্রেপ্তার হয়েছে। শুনছি আমার নামেও নাকি ওয়ারেণ্ট আছে।'

এগিয়ে এসে একেবারে সামনে দাঁড়ান রমেশবাবুর। পথ আগলে বলে ওঠেন, 'দাঁড়ান! আপনি! আপনি যতবার এসেছেন আমার জন্যে শুধু সর্বনাশই নিয়ে এসেছেন! তবু বলি, যদি বিপদ না থাকে, তবে আজ রাতটা এখানেই থেকে যান—'

রমেশবাবু হাসলেন, 'আমি জানতাম আপনি সত্যিকারের মা হবেন একদিন। আমাকেও খাঁটি দেশের ছেলে হতে হবে যে!'

'কিন্তু এই কি হওয়া? এ কেমনধারা হওয়া! এত তাজা-তাজা ছেলে, এত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, এত সুন্দর-সুন্দর মানুষ এ সবকিছুকে নষ্ট করে, নষ্ট হতে দিয়ে কী করলেন আপনারা! কী করলেন আপনি—হ্যাঁ আপনি!'

'ঠিক বলেছেন মা, এদেশের দুর্ভাগ্য তারা নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু একবার ভেবে দেখুন তো মা, এত তাজা-তাজা ছেলে আমাদের দেশে। এত ভালো-ভালো মেয়ে। এত সুন্দর-সুন্দর লোক! ধাত্রী মেলে নি, তবু এত অপূর্ব যন্ত্রণা! শিকড়ে পৌঁছয় নি, তবু এত আশ্চর্য স্বপ্ন। আমার কথা জিগ্যেস করছেন? সেই জন্যেই তো ভাবছি, ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে এ কেবল ধুলোর ঝড়েই হেঁটে বেড়ানো সার হলো, যদিও সে ধুলোটা রক্তের ধুলো। আজ এতদিন বাদে মনে হয় মাটি পেয়েছি অথচ আমার নিজের খাটবার শক্তি শেষ হয়ে এসেছে। তাই শেষ শক্তিটুকু আর নষ্ট হতে দিতে চাই না।' কখন গভীর হয়ে এসেছিল রমেশবাবুর গলা। সেই গভীরতাকে অল্প একটু লঘু করে সত্যবাবুর দিকে তাকান, 'তবে একটা জিনিস কিন্তু লাভ হয়েছে সত্যবাবু, ঘৃণা করতে শিখেছি। এ দেশটা এত দিনেও বোধহয় যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা করতে জানত না। এবার জানবে। আর আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস শিখতে হবে আমাকে। আত্মত্যাগটা জানতাম, এবার শিখব আত্মীয়তা। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন না সত্যবাবু? আমাদের সঙ্গে থাকবেন না?'

সত্যবাবু অন্যমনস্কের মতো সায় দেন, 'আপনার সঙ্গে না থাকলেও চাষীদের সঙ্গে না থেকে কোথায় যাব? ওই হাই কম্যাণ্ডের কাছে? না। আমি তো আসলে চাষা। হয়তো সেই জন্যেই ধর্মের মতো কিছু না পেলে যেন মন ওঠে না। সে তো আপনি দিতে পারেন না। দিতে পারতেন একটি লোক—তিনি গান্ধিজী। ওই একটি লোকই অন্তত একবার আমাদের

মতো লোকের দিকে তাকিয়েছিলেন, গাঁয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। আর যদি না তাকান ক্ষোভ থাকবে, কিন্তু কৃতজ্ঞতা খোয়াতে বলবেন না রমেশবাবু।'

সত্যবাবু রমেশবাবু ধীরে ধীরে খিড়কির দরজার দিকে এগোতে থাকেন। সদর দরজার রাস্তা তাঁদের বন্ধ হয়ে গেল কত দিনের জন্যে কে জানে। আর তাঁদের পিছু পিছু নিঃশব্দে, যেন জানাই আছে এমন নিশ্চিন্ত ধীর পায়ে এগিয়ে আসে প্রতিমা।

'প্রতিমা তুমি? কোথায় চলেছো?'

অন্ধকারে অদ্ভুত শান্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, এক আইবুড়ো মেয়ের শান্ত গলা, 'আমাকে সঙ্গে নেবেন না রমেশদা? বাড়ির মধ্যে বসে-বসে কেমন করে কাটাবো? আপনাদের কাজে ভাগ দিন। নইলে ছ বছর পরে শিবুদাকে দেবার মতো কী থাকবে আমার!'

খিড়কির দরজা দিয়ে তিনটে মূর্তিই ধীরে ধীরে মিশে যায় বাইরের অন্ধকারে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি এসে থামে সদর দরজায়। খুকি এতক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে ছিল একটু দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কিছুদিন থেকে অমনি নিঝুম হয়েই সে থাকছে সারা দিন। ঘোড়ার গাড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ ত্রস্তে উঠে যায় দরজার দিকে, তারপর ফিরে এসে অস্ফুট স্বরে মোহিনীদেবীকে বলে, 'মা, ও এসেছে! সেই অমল! এ বাড়িতে ঢুকতে মানা করেছিলাম, তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। না না, ওর সঙ্গে যা ভাবছ, এখনি তা নয়। ও আমাকে পৌঁছে দেবে। নার্সিংএ ঢোকার একটা ব্যবস্থা ও করে রেখেছে, সেইখানেই থাকব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। যাব? তুমি নিজে মুখে একবার বলো, যাব?'

মোহিনীদেবী চমকান কিনা বোঝা যায় না। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে খুকির গায়ে হাত বুলোতে থাকেন, 'যাবি? নিজের পায়ে দাঁড়াবি? তবে যা, যদি পারিস দাঁড়া। তোর ঠাকুরদাদের কালে ভালোবাসা বইয়ে পড়া যেত, জীবনে পাওয়া সম্ভবই হত না। আমাদের কালে আমরা পেয়েছি ভাগ্যের দান হিসেবে। দেখছি, তোদের কালে ভাগ্যের সে দানটাও অচল হয়ে গেল। হয়তো এই ভালো। ভালোবাসা অর্জন করাই হয়তো সবচেয়ে মঙ্গল। তবে যা, আমিও বলছি যা—'

পূর্ণচন্দ্রের কাছে খুকির ঘটনাটা স্পষ্ট করে এতদিনও বলা হয় নি। খুকিকে যেতে দেখে তিনি চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও কি ! কোথায় চলল ও ?'

ঠোঁট চেপে আপন মনে মোহিনীদেবী বলেন, 'ওর ভাগ্যের কাছে।'

তারপর অদ্ভুত শূন্য হয়ে যায় বাড়িটা! অদ্ভুত রকমের খাঁ-খাঁ-করা ঝিঁঝি-ডাকা ফাটল-ধরা। আর অদ্ভুত খালি-খালি লাগে বুকের ভেতরটা। খালি খালি অথচ কেমন যেন ভরাট! অনেকদিন আগে পূর্ণচন্দ্র অবাক হয়ে তাঁকে জিগ্যেস করতেন, কী চাও তুমি বলো তো, কী চাও! মোহিনীদেবী নিজেও জানতেন না কী চাইছেন তিনি। একটা মেয়ে যতদূর বেড়ে উঠতে পারে ততদূর বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। পূর্ণচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে বলতেন, তিনি সুন্দর হচ্ছেন, পনেরো বছরেও সুন্দর, পঁয়ত্রিশ বছরেও সুন্দর। কিন্তু তারপর? তারপরেও কিছু একটা হতে চাইতেন তিনি, নিজেও তা জানেন নি। আজ হঠাৎ মনে হয় তিনি জানেন। তিনি মা হতে চাইছিলেন। রমেশবাবুর কথাটা যেন অশ্রুত একটা গুঞ্জনের মতো মন ভরে তুলতে থাকে তাঁর। কথাটা যেন বড়ো হতে-হতে শূন্য ঘরখানাকে ভরে ফেলে! তিনি মা। শিবুর মা, খুকির মা, রমেশবাবুও মা। প্রত্যেকের মধ্যেই কেমন যেন একটা অসহায়তা আছে। তিনি ছাড়া দেখবার কেউ নেই, আরাম দেবার কেউ নেই। তিনি এগিয়ে দিলে তবে ওরা সবচেয়ে ভালোভাবে এগুতে পারবে। তিনি সান্ত্বনা দিলে তবে ওরা সবচেয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

'এতদিন বাদে এইভাবেই তাহলে শেষ?' অন্ধকারে কেমন ঝিম-ধরা শোনায় পূর্ণচন্দ্রের প্রৌঢ় কণ্ঠস্বর। আর, অস্পষ্টভাবে মনে হয় মোহিনীদেবীর—সকলেরই মা তিনি, বোধ হয় এই লোকটারও মা। পূর্ণচন্দ্রেরও মা। যেন অনেক ছোটো, অনেক অসহায় কাউকে আরাম করে তুলছেন এমনিভাবে আরো ঘন হয়ে আসেন পূর্ণচন্দ্রের দিকে। অন্ধকারে তাঁর সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'হয়তো এইভাবেই আর একটা শুরু।'

'কিন্তু কী নিয়ে শুরু? কী রইল আমাদের? কেরানিগিরি শেষ

হয়েছে। জমিটুকু ছিল, আজকের মিছিল দেখে মনে হচ্ছে সে ভরসাও বোকামি। তাহলে কী নিয়ে শুরু ?'

'ভালোবাসা নিয়ে। অন্যদের চেয়ে এই একটা দিকে আমরা ভাগ্যবান। তাছাড়া আমিও তো রোজগার করছি, আপনিও খাটতে পারেন—'

শিশুর মতো পূর্ণচন্দ্র আরো কাছ ঘেঁসে আসেন মোহিনীদেবীর। শিশুর মতো চোখ মেলে আরো কিছু যেন শুনতে চান তিনি। আশ্চর্য এমন কিছু। রূপকথার মতো এমন কিছু। বলেন, 'কতোদিন তুমি কবিতা আওড়াওনি। একটা বলবে ? তোমার রবিঠাকুরের কবিতা ?'

মোহিনীদেবী চুপ করে থাকেন, 'আজকে বলার মতো কবিতা হয়তো তিনিই লিখতে পারতেন। কিন্তু এদিকে ঐ যুদ্ধ, আর ঠিক ঐ সময়েতেই উনি শয্যা নিয়েছেন।

তারপর ধড়মড় করে ওঠেন মোহিনীদেবী। কাজ পড়ে আছে। অনেক অনেক কাজ! আলোটা জালতে হবে বৈকি। সেলাইগুলো নতুন করে গুছিয়ে নিতে হবে। অন্য আর কোনো কাজ করতে পারেন তিনি? দেখতে হবে চেষ্টা করে। আর রামচন্দ্রবাবুকে গিয়ে দেখতে হবে। আর—

আর এতক্ষণে হঠাৎ মনে হয় বীরু নেই। আজ দুদিন থেকে বীরু বাড়ি আসেনি। কোথায় গেল ছেলেটা ? ওই এক ছেলে! ও যেন বাড়ে! যেমন করে পারে, যেদিকে খুশি ও যেন বেড়ে ওঠে!

দরজায় আবার টোকা পড়ে। এবার লছমীদাস। রামচন্দ্রবাবুর অসুখ শুনে খবর নিতে এসেছে। না, না, ওঁকে কিছু বলার দরকার নেই! এখনো ভালোই আছেন তাহলে। সেইজন্যেই আসা। না, না, বাড়িখানার অবশ্য ওই এখন মালিক। কিন্তু ছি, ছি। সে তো রামচন্দ্রবাবুকে বলেই রেখেছে যতদিন উনি বেঁচে থাকবেন লছমীদাস এ বাড়িতে হাত দেবে না। আর সময়ই বা কোথায়! লড়াইয়ের বাজার, যত ঝামেলা। সেই সব দেখতেই সময় চলে যাচ্ছে। ভালো আছেন তাহলে!

রামচন্দ্রবাবুর বিছানার কাছে যেতে অস্ফুটস্বরে তিনি শুধু জিগ্যেস করেন, 'বৌমা ?'

'হাঁ।'

'কছিলাম কি কাপাসের ঐ কলিটা দেখছ নাকি ?'

একটু থেমে মোহিনীদেবী বলেন, 'দেখেছি।'

'ফুটছে?' অশীতিরপর হাড়ের খাঁচাটার ভেতরে শ্লেষ্মার একটা উত্তেজিত টান অনুভব করা যায় স্পষ্ট করে, 'রঙ দেখা যায় কিছু ?'

মোহিনীদেবী মুখের মধ্যে আঁচল চেপে বানিয়ে বানিয়ে বলেন, 'হাঁ, দেখা যাচ্ছে। একটু লাল রঙই যেন মনে হচ্ছে।...'

'তবে তো হচ্ছে-এ-এ—' অস্পষ্ট বিকৃত উচ্চারণে গভীর ঘড়ঘড়ে গলায় রামচন্দ্রবাবু ফিসফিস করতে থাকেন, জীবনে তবে তো একটা কাম হচ্ছে-এ-এ—'

আর কানা চোখের কোণ দিয়ে ধীরে ধীরে জল গড়িয়ে আসে তাঁর।

স্টেশনের পথে লাল ধুলো উড়োতে উড়োতে একটি লোক হাঁটছে। গায়ে তার এক বিদেশী কাটের গরম কোট। বিদেশী কাট—কিন্তু পুরনো আর ছেঁড়া-ছেঁড়া আর কাদামাটি-নোঙরা-লাগা। পায়ে তার একজোড়া বিদেশী বন্দরে কেনা আধুনিক জুতো। আধুনিক, কিন্তু বহু ব্যবহারে থেবরে-যাওয়া, ফিতে-ছেঁড়া, আঙুল-বেরিয়ে-পড়া। পরনে লুঙ্গি, বগলের নিচে একটা তেল-চিটে প্রকাণ্ড রুমালে বাঁধা ছোট্ট একটু পুঁটুলি। পেছন থেকে দেখা যায় বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে হাঁটছে লোকটা। নুয়ে পড়ে আর দুলে দুলে, জাহাজীরা যেমন করে হাঁটে। আর হিল-ক্ষয়ে-যাওয়া জুতোর ধাক্কায় ধাক্কায় কুয়াশার মতো লাল একটা ধুলোর রেশ ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠেছে বাতাসে।

পেছন থেকে বীরু এসে সঙ্গ ধরে লোকটার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'তুমি কলকাতা যাচ্ছ আবার ?'

ইয়াসিন তার কোঁচকানো ধূসর সুর্মা-উঠে-যাওয়া চোখজোড়া তুলে বলে, 'ওই খোঁকাবাবু যে! হাঁ খোঁকাবাবু চললম কলকাতাতেই বটে। ভেঁবে-ছিলাম বুড্ডা হঁয়ে গেলাম। আর দরিয়ায় যাব না। লেকিন আমার বেটা আবদুল—উয়ারা তো কাজ লিয়েছে রানীগঞ্জের কলে। বলে, বাজান ই হপ্তায়

যা মিলছে তা নিজেদের পেটে দিব না তুমাকে খাওয়াইব!' তো কাকে কি বলবে বলো? ব্যাটাকেই বলবে কি শালা চুথিয়া কোম্পানিটোকে বলবে! তো বসেই ছিলাম—শালা যা আছে খেঁয়ে লাও পরে দেখা যাবে। তা এই ভ্যাখো ক্যানে তলব পাঠিয়েছে জাহাজ হতে। বললম আর যাব নাকো, বুড়া হঁয়েছি, ডাঙাতেই কবর লিব উ তোমার দরিয়াতে লয়। তো ফির তলব করে বলে পাঠিয়েছে কি লড়াই লেগেছে। বহুত লোক দরকার! তুমি পুরানা লোক আছ—তুমাকে ভি ছাড়া চলবে না। তাই যেছি, বলি দেখি—'

'কোথায় উঠবে গিয়ে কলকাতায়?'

'আমি? উ জাহাজীদের ডেরা আছে যে গো খোঁকাবাবু। হোথা হতে তোমার নম্বর লিয়ে, টিকস করে, মেডিকেল সার্টিফিকিট হঁয়ে গেল তো বাস জাহাজে—'

'আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে? যাবার ভাড়া আমার আছে। তোমাদের ওখানে কয়েকদিন থাকব। তারপর একটা কিছু দেখে নেওয়া যাবে না কলকাতায়?'

'জরুর! কেনে লিয়ে যাব না! চলো কেনে। বেটা ছেলে বটো—ডর কি আছে? ই দুনিয়া, আমার কথাটো খেয়াল কর খোঁকাবাবু, ই দুনিয়ার হালচাল বহুত খারাপ আছে। আর ইয়ের ছামুতে তুমি ডরাইলে তো বাস খতম। আর না ডরাইলে তো বাস ঠিক আছে। চলো কেনে—'

হাঁ, যাবে বীরু। সামনে একটা অস্পষ্ট জগৎ, বড়োদের জগৎ। সে জগৎটায় এতদিনও সে ঢোকেনি। শুধু কাছাকাছি থেকেছে। শুধু দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আগুনের মতো এক-একটা হলক এসে পড়েছে তার গায়ে। এবার ভেতরে ঢুকবে সে, ঘা মারবে ঘা খাবে। ভয় পাবে না সে, ভয় পেলে খতম!

একটু পেছিয়ে বীরু শেষবারের মতো পেছনে তাকিয়ে দেখে। ধুলো-ধুলো পথটা মোচড় খেতে খেতে গিয়ে মিশেছে একমুঠো ধূসর একাকার দালানকোঠা, স্কুল-আদালত, দোকানপাটের কোলে। তার আবাল্যের শহর। এই শহরের গণ্ডিটাকে সে এই মুহূর্তে যত ঘৃণা করছে এমন আর কখনো করেনি। তবু কখন এক সময় কাঁদতে শুরু করে বীরু। শহরটার জন্যে কান্না। যে কৈশোর সে ফেলে চলে এল তার জন্যে কান্না। আর কান্না

দিদিমার জন্যে, রতনের জন্যে কান্না। সেকেণ্ড পণ্ডিতের জন্যে কান্না, জ্যোতির জন্যে কান্না। মোহিনীদেবী, পূর্ণচন্দ্র, রামচন্দ্রের জন্যে কান্না। কচি একটা মুখের জন্যে। সুধার মুখ। যে মুখ একদিন ঢিপ করে বীরুকে প্রণাম করে লজ্জায় নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিল। আর বয়স হবার আগেই সে মুখ অকালধর্ষণে বীভৎস হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সে মুখের ছবিটা একাকার হয়ে মিশে যায় শহরের ছবিটার সঙ্গে আর শহরের ছবিটা মিশে যায় এক অস্পষ্ট সংজ্ঞার সঙ্গে—সে সংজ্ঞার নাম বাঙলাদেশ।

'খোকাবাবু হাঁটতে লারছ?' ইয়াসিন মুখ ঘুরিয়ে জিগগেস করে।

আর চোখ-ফাটা জ্বালায় গড়িয়ে-গড়িয়ে-নামা কৈশোরের শেষ কান্নাটুকু, প্রেমের প্রথম কান্নাটা আনাড়ির মতো মুছে নিয়ে বীরু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সঙ্গ ধরে ইয়াসিনের।

॥ সমাপ্ত ॥

॥ আলোচনা ॥

যামিনী রায় ও শিল্পবিচার প্রসঙ্গে

পরিচয় সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীমান অশোক মিত্র শিল্পবিচার ও যামিনী রায় কোন বিষয়েই আমার প্রশ্নগুলির আলোচনা করতে পারেননি। শ্রীমানের শিল্প-সমালোচনার ভুলভ্রান্তি বেছে গাঁ উজাড় করার ইচ্ছা আমার ছিল না, নেইও। চিত্রকলার বিষয়ে, ভারতীয় চিত্রকলার বিষয়ে এবং যামিনী রায় মহাশয়ের কাজের বিষয়ে শ্রীমানের অসতর্ক অসম্মানজনক হঠোক্তি-প্রসঙ্গে আমি শুধু কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলুম, কিন্তু তিনি উত্তরে ক্ষিপ্তপ্রায় কটুকাটব্য করছেন বর্তমান লেখককে, অবশ্য সজ্ঞানে নয়, যারপর নাই ক্রুদ্ধ হয়ে। কিন্তু ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

আমি শ্রীমান মিত্রের আত্মজীবনীর জের টেনে শুধু পরিচয়-পাঠকদের দুটি কথা জানানো কর্তব্য মনে করি। শ্রীমান মিত্র বহুকাল ধরে রমের বই আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন এবং সত্যই আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি রম সাহেবের কয়েকটি পৃষ্ঠা "দুষ্টুমি" করে আত্মসাৎ করেছেন স্বীকারোক্তি না করে। আমি অবশ্য বরাবরই এ রকম "দুষ্টুমি"র বিরুদ্ধে। কিছুকাল আগেও তাঁকে আমি এই মর্মে পরামর্শ দিই, যেমন শ্রীমানের 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা"-র পাণ্ডুলিপি পাঠের সময়ে সব মূল বইগুলির তালিকা দিতে বলি। ভারতীয় চিত্রকলার কয়েকশো-পৃষ্ঠা-ব্যাপী পাণ্ডুলিপি পাঠের সময়েও শ্রীমানকে আমি সাবধান করি। কিন্তু নগণ্য বৃদ্ধের কাছে ধর্মের কাহিনী সবাই কি শোনে? অনুবাদ বা নির্যাস বহু বই থেকে করলেও সেটা সোজাসুজি করাই ভালো, তা সে হোক্ না আমাদের দেশের অজন্তার বা আর কোনো বিষয়েই। বিশৃঙ্খল স্বকীয়তার চেয়ে পরিচ্ছন্নতাই শিল্পে-তিহাসে কাম্য।

শ্রীমানের ধারণা তিনি শূদ্রের পুরোহিত এবং বাংলাদেশের কিশোর তথা পূর্ণবয়স্ক সাধারণ মানুষেরা আমরা সবাই শূদ্র এবং শূদ্রেরা গভীর কিছু, সীরিঅস কিছু, সৎ কিছু বোঝে না, তাই তিনি নাকি তাঁর ভারাক্রান্ত লেখায়

এক কল্পিত হাল্‌কামি আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ মনোভাবে বাঙালী পাঠককে অকারণে হেয় মনে করাটাই সমর্থন পায়। লেখকের চিন্তার যা শ্রেষ্ঠ, সাধ্যমতো তাই পরিবেশন করাই লেখকের কর্তব্য এবং জিজ্ঞাসু পাঠক ঠিকই বুঝে নেবেন শেষ পর্যন্ত। সাহিত্যক্ষেত্রে ভাবা উচিত পাঠকমাত্রেই "ব্রাহ্মণ" এবং লেখকমাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যের অধিকার অর্জনের নম্র চেষ্টা। পরিচয় পত্রের তথা বাংলার সাধারণ পাঠক সম্বন্ধে এই অবজ্ঞা আছে বলেই শ্রীমান মিত্র 'রম' বিষয়ে চাতুরীর আশ্রয় নেন। সেই জন্যই তিনি তাঁর কল্পিত সাধারণ পাঠককে, বিশেষ করে মার্কস্‌বাদী পাঠককে ছলে কৌশলে অভিভূত করে দেবার আশায় 'রম'—রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ইত্যাদি বকেন এবং তারপরে কয় পৃষ্ঠার তাজ্জব উদ্ধৃতির পরে আবার লিখে দেন: "ইসোনিজ, মস্কো"। কিন্তু বাঙালী পাঠককে এবং মার্কসবাদী পাঠককে এ রকম খেল্ দেখিয়ে কি অভিভূত করা যায়? তাঁরা বিচার করতে পারেন, তাঁরা জানেন যে মস্কোতে মতামতের স্বাধীনতা প্রচুর এবং অনেকের বইই কোনো না কোনো সময়ে মস্কো থেকে বেরিয়েছে। পাভ্‌লেঙ্কো সত্যই খুব ভালো রুশ ঔপন্যাসিক, তাই বলে কি আধুনিক চিত্রকলার বিষয়ে তাঁর মতামত সর্বতোভাবে মানতে হবে? যুক্তির অবতারণায় মাছি মারার দরকার নেই। রম্ মস্কোর লোক, ইহুদি কিনা, বুদ্ধিবাদী কিনা, তাঁর কি কি বই শ্রীমান মিত্র জোগাড় করেছেন, ইতিহাস ও শিল্প আলোচনায় পেরেভেরজেভ্ পোক্রোভস্কির যান্ত্রিক ঝোঁক রুশদেশে কিভাবে শোধিত হল, এ সব কথা এখানে গৌণ। কারণ, অশোক মিত্র রমের লেখা বুঝতেই পারেন নি। রম্ যে নামগুলি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, সেইগুলিই অশোক মিত্র না বুঝে বিজ্ঞাপনের "একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম" বংশপঞ্জী হিসাবে অপব্যবহার করেছেন। তাঁর মর্মবিদারক অনুবাদেই তাঁর ভয়ঙ্করী বিদ্যার ভ্রান্তি স্পষ্ট। প্রথম বাক্যটিই ধরা যাক্: Painting as we know it **in the creations** of the Venetians" ইত্যাদিকে তিনি করেছেন: "আমরা **ইওরোপীয় চিত্রকলা** বলতে যা বুঝি তা হচ্ছে ভিনিশান্ শিল্পী **প্রভৃতির সৃষ্টি**"। "... is **conceived** as an intergral whole"—এর বাংলা করেছেন: "এক অখণ্ড সমগ্ররূপে **সঞ্চারিত** হয়েছে"! কিংবা তাঁর শেষ বাক্যটাই ধরুন: "his striving for hermony, **calm and abstract beauty,** free of **subject matter**"-এর

বাংলা করেন : **ছবিতে আনতে চান** হার্মনি, **শুদ্ধতা, শান্তি, সুশীতল অনুভূতি, বস্তুবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য**"! এবং far removed from everyday life"—এর বাংলা করেন : "দৈনন্দিন জীবনের ঘাম, লড়াইএর কোনও সম্বন্ধ নেই"। অশোক মিত্র এত ঘামেন ও লড়েন যে মাতিস বিষয়ে লুই আরাগঁ-র কথায় কান দেবার সময় পান না, তাই তাঁর চোখে পড়ে না মাতিসের প্রামাণ্য সমালোচক জঁা কাস্যু যাকে বলেছেন মাতিসের তিরিশ দশকের ছবির গঠনবিস্তার, তার প্রাচুর্য, তার গভীরতা, যার ফলে আসে জীবনের ও গতির একটা মহান্ অর্থময়তা। তবু অশোক মিত্র তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের গর্বে ভারতীয় শিল্পালোচনাতেও দেশী শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে!

শিল্পসাহিত্যের বিচারে সর্বদাই জাগ্রত মনন দরকার। যেখানে দেবদূতেরাও পা ফেলতে ভয় পান, সেখানে অধীর দাপাদাপি বিপজ্জনক। আর এত তাড়াই বা কেন? শ্রীমান মিত্রের "পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা" পুস্তকের শেষে পড়েছি যে তাঁর জন্ম ১৯১৭ সালে। বইটই লেখার বিষয়ে তিনি আরেকটু ধৈর্য ধরুন। তাহলে তিনি শিল্পকার্য বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু রুচিজ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এবং তখন সেই ছেলেটির মতো তিনি কথায় কথায় চটে যাবেন না, পশ্চিমের শুকনো হাওয়ায় পাতার কাঁপন দেখে খাপ্পা হয়ে যে বলেছিল : জল পড়ে পাতা নড়ে, জানো না বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন? জল না পড়লে পাতা নড়বে না।

বিশেষ করেই রুচি ও বোধের দরকার ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনায়, কারণ ইউরোপীয় শিল্পালোচনার মান ও জ্ঞান এ বিরাট দেশের শিল্পালোচনায় এখনও চালু হয়নি, বিদেশী ও স্বদেশী মনীষীরা অনেক প্রাথমিক কাজ করে গেলেও। পরশপাথর হয়তো কিছু অশোক মিত্রকে খুঁজে খুঁজে ফিরতে হবে কিন্তু মন স্থির না করলে খেয়ালও থাকবে না কখন পাথর হাতে এল আর গেল। তাঁর শেষ পারাগ্রাফের বিষয়ে তাই কিছু বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, কারণ পর্বটি শেষ হয়েছে not with a bang, but a whimper (এলিঅট : কাব্য সঙ্কলন : ফেবর এণ্ড্ ফেবর, লণ্ডন)।

বিষ্ণু দে

অশোক মিত্রের পত্র

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের উপভোগ্য লেখাটি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানবেন। এই প্রথম বোধ হয় তিনি মোটামুটি সহজবোধ্য ভাষায় লিখলেন: হয়ত সীমানা আন্দোলনের ফল। ইতি ২রা ফেব্রুয়ারি। **অশোক মিত্র**

সম্পাদকের বক্তব্য

এই বিষয়ে আর কোন বাদানুবাদ পরিচয়ে প্রকাশিত হবে না।

সম্পাদক পরিচয়।

॥ পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে ॥

সবিনয় নিবেদন,

পৌষ '৬২ সংখ্যায় শ্রীহিতেন ঘোষের লেখা 'পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে' পড়লাম।

শারদীয় সংখ্যায় শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্তের আলোচনা পড়েই প্রতিবাদ-স্পৃহা জেগেছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগ অভাবে হয়ে ওঠেনি।

হিতেনবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রথম প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত একমত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তিনি শ্রীসত্যজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন সেটা ধোঁয়াটে।

আমার যতদূর মনে হয় পথের পাঁচালী উপন্যাস আর নাট্যরূপ সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ। অর্থাৎ এই উপন্যাসের 'দৃশ্যরূপে' কিছু গোলমাল তিনি দেখতে পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রাচীন সাহিত্যের পুনর্লিখন প্রস্তাব যদি হাস্যকর হয়, তবে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী"র চিত্ররূপই বা এদিক থেকে অনুমোদনীয় হবে কেন?—না হওয়ার কারণই বা কি? তবে আজকে কেউ মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যীয় অনুবাদের চিত্ররূপ আশা করে না—একথা সত্যি। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'কে দৃশ্যবস্তুতে পরিণত করতে গেলে, তার বিষয়কে দৃশ্যত্ব দান করতে গেলে তার (উপন্যাসের) আদিমরূপ রক্ষা করা কখনই সম্ভব হয় না। দৃশ্যত্ব দান না করতে হলে শুধু আবৃত্তি করতে হয়। নাটকীয় উপাদানের মধ্যে দৃশ্যত্ব ও কথোপকথন দুটোই প্রাণস্বরূপ। তার কিছু হানি মোটেই সত্যজিৎবাবু করেন নি। তবে তার মধ্যে গতি বা action আবিষ্কার সহজ নয়। অন্তত এই 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে।

দে. প্র. চ.

সমালোচনা

বই

উনবিংশ শতাব্দীর পথিক ॥ অরবিন্দ পোদ্দার ॥ ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ তিন টাকা ॥

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ মুখ্যত এই কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে এই বইখানিতে উনিশ শতকের সমাজ-বিকাশের ধারার এক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে।

উনিশ শতকের সমাজ-বিকাশের বৈচিত্র্যময় ধারার বর্ণনা বইখানির মূল বিষয়বস্তু নয়, বরং তৎকালীন ঘটনা-সম্ভারের যথাযথ বিশ্লেষণ লেখকের প্রধান লক্ষ্য। লেখক নিজস্ব মত অনুযায়ী উনিশ শতকের সমাজ-বিকাশের ধারা এবং তার সংস্কৃতি ও ভাবধারার একটি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এই বইখানিতে উপস্থিত করেছেন। এই দিক থেকে দেখলে বইখানির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। লেখকের বিশ্লেষণ কতটা ইতিহাস-সম্মত, কতটা বিচারগ্রাহ্য তা অবশ্যই ভেবে দেখার প্রয়োজন।

প্রথমেই খুব সংক্ষিপ্ত কথায় লেখক-কৃত বিশ্লেষণের মোদ্দা কথাটা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

লেখক মনে করেন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র এবং কতকাংশে বিবেকানন্দ উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের পথিকৃৎ, তদানীন্তন কালের "সমাজ-বিপ্লবের"ও তাঁরা পুরোহিত! এই জাতীয় জাগরণের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন—ইংরেজের কাছে সেদিনের শিক্ষিত

সম্প্রদায় নতুন জ্ঞান, নতুন বিজ্ঞান, নতুন মানস-চিন্তা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা তাঁরা ভাবেন নি, বরং ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের উন্নতি! লেখকের কথায়—

"ইংরেজ প্রভু, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসক, তার কর্মে নবীন গতি, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব বাণী, সে বুদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব, আর ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য সমষ্টিগতভাবে না হোক ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে অসামান্য সমৃদ্ধির দ্যোতক; সুতরাং এই সব ব্যবহারিক সুফল থেকে যদি বঞ্চিত হতে না হয়, তাহলে ইংরেজকে সমর্থন কর, তার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হও—ইহাই কালের নীরব নির্দেশ।

"ঐ আমলের বাঙালী চিন্তানায়কবৃন্দ কালের নির্দেশ পালন করেছেন, অন্যথা করেন নি। ("উনবিংশ শতাব্দীর পথিক"—পৃঃ ১০)

পাছে কেউ আপত্তি তোলে এই বলে যে ইংরেজের অনুগ্রহ ভিক্ষাই হল 'কালের নির্দেশ'—এ কি রকমের কথা হল—তাই অরবিন্দবাবু সাবধান হয়ে বলতে চেয়েছেন যে তখনকার দিনে জনগণের আন্দোলন বলে কোন কিছুই ছিল না, আর ছিল না বলে এই অনুগ্রহ ভিক্ষাই সেদিনের একমাত্র বিপ্লব!

লেখকের কথায়—"অবশ্য, কালের যাত্রাপথে অর্থনৈতিক এবং স্থানিক বহু সামাজিক কারণে বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে, আবার সে বিদ্রোহ দমিতও হয়েছে। সেই বিদ্রোহের প্রতি দরদ, সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং বিদ্রোহকে সমর্থনও কেউ কেউ করেছেন, আবার ঐ-সব বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ 'বিপ্লব চাই' এ-কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সত্য সত্যই বিপ্লব চাওয়ার জন্যে যে রাজনৈতিক চেতনা, কালপ্রবাহ সম্পর্কে যে বোধ (আধুনিক অর্থে), তার উদ্বোধন তখনও হয় নি, এবং হয় নি বলেই তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে 'বিপ্লব' ভারতবর্ষীয় সভা অথবা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী গুপ্ত সভাসমিতি স্থাপনেই পর্যবসিত হয়েছে। বিপ্লবের আধুনিক অর্থ এবং তৎকালীন অর্থ তাই এক নয়; তৎকালীন অর্থ বড় জোর ইংরেজী শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্তের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, এবং ইংরেজের

কর্তব্যভার লাঘব করার জন্যেই তাঁরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে নয়।" (উনবিংশ শতাব্দীর পথিক—পৃঃ ১৩৬)।

অরবিন্দবাবুর মতে তাহলে সোজা কথায় যা দাঁড়াল তা হল এই—উনিশ শতকের বাঙলায় সমাজ-বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় দুটো কথা। প্রথম, উনিশ শতকে জনগণের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই, দুচারটি যা কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছে তার ভূমিকা নগণ্য, ইংরেজের শাসনের গায়ে তা আঁচড় লাগাতে পারে নি মোটেই। দ্বিতীয়, জনগণ যদিও তখন মূক ও বধির, ইংরেজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এক শ্রেণী এই মূক ও বধির জনসাধারণের মুখে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ইংরেজের অনুগ্রহপ্রার্থী বুদ্ধিজীবীরাই তখন নব মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা, এঁরাই ইংরেজের সহযোগী হলেও তদানীন্তন সময়ের মানদণ্ডে 'বিপ্লবের' একমাত্র পতাকাবাহী।

কোন ভুল বোঝার অবসর না দেওয়ার জন্য প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে অরবিন্দবাবুর উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে যে কিছু কিছু আংশিক সত্য রয়েছে তা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। আংশিক সত্য এইখানে যে উনিশ শতকের কৃষক-বিদ্রোহগুলির সত্যিই যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। প্রধান দুর্বলতা হল এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, আজকের মতো উন্নত ধরনের শ্রেণীচেতনার দ্বারা এই বিদ্রোহগুলি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে নাই! সেইজন্যই এই বিদ্রোহগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। আরও একটা আংশিক সত্য এইখানে যে ইংরেজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা উনিশ শতকের অবস্থার মানদণ্ডে অবশ্যই ছিলেন প্রগতিশীল। কারণ তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও ইংরেজী ব্যবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করে যেটুকু গণতান্ত্রিক সংস্কারবাদের পথ পরিষ্কার করে গেছেন তার মূল্য কম নয়। এক কথায় বলা চলে যাঁরা উনিশ শতকের কৃষক-বিদ্রোহগুলির ভূমিকা বাড়িয়ে দেখেন অর্থাৎ বিদ্রোহগুলিকে বুর্জোয়া বিপ্লবের দ্যোতক বলে মনে করেন অথবা যাঁরা উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন আমরা তাঁদের সঙ্গে এক-মত নই। এই ধরনের অনৈতিহাসিক অতিবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই বর্জনীয়।

কিন্তু উপরোক্ত এই অতিবিপ্লবীদের সঙ্গে যেমন আমাদের মূলগত মতপার্থক্য রয়েছে, তেমন অরবিন্দবাবুর সঙ্গেও আমাদের মৌলিক মতপার্থক্য

রয়েছে। উপরোক্ত অতি-বিপ্লবীরা যেমন কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করেছেন এবং বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখেছেন, তেমনি অরবিন্দবাবুরও আবার কৃষকবিদ্রোহগুলির ভূমিকা অস্বীকার করেছেন এবং বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে বড্ড বড় করে দেখেছেন।

অবশ্য, উপরোক্ত অতি-বিপ্লবী ও অরবিন্দবাবুর মধ্যে তফাত এইখানে যে অতি-বিপ্লবীরা দাবি করতে পারেন এক ধরনের 'মৌলিকত্ব', অর্থাৎ যতই আজগুবি কথা হোক না কেন, তাঁরা বলতে পারেন তাঁদের আগে এমন কথা আর কেউ বলতে পারেন নি! অরবিন্দবাবু এ-বিষয়েও হতভাগ্য! 'মৌলিকত্ব' দাবি করার সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত। বঞ্চিত এইজন্য যে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশেরা আবহমান কাল থেকেই বলে আসছেন। বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশদের যে কোন কেতাব খুলুন, দেখবেন—কৃষকবিদ্রোহগুলি সম্পর্কে একদিকে উন্নাসিক মনোভাব, ধরনটা এইরকম যে ঐগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, অন্যদিকে উনিশ শতকের 'রেনেসাঁস' নিয়ে কত বাগাড়ম্বর।

বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশদের এই ভাবধারার সঙ্গে অরবিন্দবাবুর ভাবধারা মিলিয়ে দেখুন—এই দুইয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে। সাধারণভাবে উনিশ শতকের কৃষক-বিদ্রোহগুলি ও সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে অরবিন্দবাবু লিখছেন—

"বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগনায় রীতিমত অরাজকতা দেখা দেয়। গভর্নমেণ্ট অবশ্য এই বিদ্রোহ বিনা আয়াসেই দমন করিতে সক্ষম হন"। ("বঙ্কিম মানস," পৃঃ ৪৯)

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশদেরও হার মানিয়েছেন। তিনি লিখছেন "সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নহে, ইহা ভারতীয় সামন্তরাজদের আত্মকর্তৃত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা। কিন্তু তথাপি বিদ্রোহের বিস্তৃতিতে ইহা কোন কোন অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী লোক-সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।"

কিন্তু অরবিন্দ বাবু যাই বলুন—হাজার দুর্বলতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে একটানা প্রতিরোধের এক গৌরবময় ইতিহাস—এ-কথা আর অস্বীকার

করার উপায় নাই। এমনকি বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যেও যাঁরা তথ্যানুসন্ধানী ও সত্যনিষ্ঠ তাঁরাও উত্তরোত্তর এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করেছেন। যা ঘটেছে তাকে কালের নির্দেশ-নামা থেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বাদ দিলেই বাদ দেওয়া যায় না।

মনে রাখা দরকার ইংরেজি শিক্ষিত প্রগতিকামী বুদ্ধিজীবীদের কার্যকাল আরম্ভের অনেক আগে থেকেই এই কৃষক বিদ্রোহগুলির ভূমিকা শুরু হয়েছে। কখনও পশ্চিম বঙ্গে, কখনও দক্ষিণ বঙ্গে, কখনও উত্তর বা পূর্ব বঙ্গে আলাদা-আলাদা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হলেও কৃষক বিদ্রোহের একটানা প্রতিরোধ ইংরেজ শাসনকে সবচেয়ে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি বিদ্রোহের (যা শুধু বাঙলা দেশে ঘটেছিল) নাম উল্লেখ করছি ঃ—

(১) উত্তর বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—(১৭৬০ –১৭৭৪) (২) বিষ্ণুপুরের বিদ্রোহ—(১৭৭৩)। (৩) বীরভূমের বিদ্রোহ (১৭৮৫)। (৪) বারাসতের বিদ্রোহ—(১৮৩১)। (৫) ফরিদপুরের বিদ্রোহ—(১৮৪৭)। (৬) সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬)। (৭) সিপাহী বিদ্রোহ—(১৮৫৭), (৮) নীল বিদ্রোহ (১৮৫৬-৬০) (৯) পাবনার কৃষক বিদ্রোহ—(১৮৭০) আমি পূর্বেই বলেছি এই বিদ্রোহগুলির দুর্বলতা ছিল প্রচুর। আলাদা আলাদা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হওয়ায় এইগুলিকে ইংরেজের পক্ষে দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

ইতিহাসে এই কথাই বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে কৃষক বিদ্রোহ সফল হতে হলে প্রয়োজন—হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব নয় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব। এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের কথাই ওঠে না। বুর্জোয়া শ্রেণীর গোত্রধর হিসাবে এই সময়ে যে বুদ্ধিজীবীরা উদ্ভূত হয়েছিলেন তাঁরাও এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে পারেন নাই। নেতৃত্ব দেওয়া দূরের কথা, তাঁরা এই বিদ্রোহের সংসর্গ বাঁচিয়ে চলেছিলেন, অনেকে সক্রিয়ভাবে এর বিরোধিতাও করেছিলেন। কাজেই এই বিদ্রোহগুলি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে কোনদিন উঠতে পারে নি।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে এইগুলি বিপ্লবই নয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে কি আর কখনও বিপ্লব হয়নি? ইতিহাসে দাস-বিদ্রোহ, ভূমিদাস বিদ্রোহের ভূমিকা কি উপেক্ষণীয়!

ঠিক সেই রকম আমাদের দেশের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহগুলিও তদানীন্তন সময়ের মানদণ্ডে বিচার করলে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বিদ্রোহগুলি বিদেশী শাসনকে যে-ভাবে আঘাত হেনেছিল তদানীন্তন অবস্থায় আর কোন আন্দোলনই তা পারে নাই। ইংরেজরা বিনা আয়াসে এই বিদ্রোহগুলি দমন করেছিল—অরবিন্দবাবুর এই থিসিস ইতিহাসগ্রাহ্য নয়। এই আন্দোলনগুলি সম্পর্কিত যে কোন ব্রিটিশ রিপোর্ট পড়ুন, দেখবেন তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকেরা এই সব আন্দোলনকে কি রকম ভয়ের চোখে দেখেছিলেন এবং কি রকম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল তারও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

১৮৮০ সালে ভারতের পুঞ্জীভূত কৃষকদের এই বিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়েই ডাফরিন হিউম সাহেবকে বুদ্ধিজীবীদের ভিড়াবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এ-কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

অবশ্য ইংরেজ যে উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস আন্দোলনকে প্রথম দিকে সাহায্য করে থাকুক, অথবা আরও পুর্বে যে উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরেজরা ইংরেজিশিক্ষিত অনুগ্রহপ্রার্থী বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি করে থাকুক, পরে তার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। পরাধীন দেশের এই বুদ্ধিজীবীরা বুর্জোয়া চেতনার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠার পর থেকে ইংরেজের সঙ্গে তাদের বিরোধ শুরু হতে থাকে।

এই বুদ্ধিজীবীদের মনে ইওরোপের বুর্জোয়া প্রগতিশীলতার নেশা লাগে। এঁরা শুরু করেন মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সংস্কার এঁদের আন্দোলনের হয়ে ওঠে জয়টীকা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতির ভাবনায়-চিন্তায় বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভাবধারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভাবধারা এঁদের তদানীন্তন সময়ের মানদণ্ডের বিচারে দেশগঠনের কাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সন্দেহ নাই। তাই এই আন্দোলনের ভূমিকাও যে প্রগতিশীল তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার্য।

তবে প্রগতিশীল বলেই এই আন্দোলনকে বিপ্লববাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করলে একটু বাড়াবাড়ি করা হবে। এই আন্দোলন মূলত সংস্কারবাদী। তাই এই আন্দোলনের নেতাদের দেখি রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করলেও তাঁরা ইংরেজ শাসনের আওতার মধ্যেই এই সংস্কার দাবি করেছেন।

আরও দেখি এই আন্দোলনের নেতারা সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও সামন্ততন্ত্রের মূল রূপ ভাঙবার উপায় হিসাবে মুখ্যত কৃষি সংস্কারের দাবি তাঁরা কখনও উত্থাপন করেন নাই। এই আন্দোলনের এই মূলগত দুর্বলতার দিকটা সম্পর্কে অবহিত না থাকলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

এক কথায়, তদানীন্তন সময়ে ভারতের সমাজ ছিল পরাধীন সমাজ এবং বিদেশী শাসকেরা এই পরাধীন সমাজ-গঠনের কাজে সহায় হিসাবে পুরাতন সামন্ত সমাজের মূল কাঠামোকে বজায় রাখতে চেয়েছিল। তাই তখনকার দিনে ভারতের মূল প্রশ্নটি ছিল স্বাধীনতার সমস্যা আর সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের সমস্যা।

কাজে কাজেই এই স্বাধীনতা ও সামন্তবাদ ধ্বংসের প্রশ্নটি তদানীন্তন সময়ে আন্দোলনকে যতটুকু অগ্রসর করতে সাহায্য করেছে সেই আন্দোলন ততটুকু প্রগতিশীল। কৃষক বিদ্রোহগুলি ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই কাজে খুব সাহায্য করেছে এই বিদ্রোহগুলি তাই যথেষ্ট প্রগতিশীল। আবার দুর্বলতা সত্ত্বেও বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনও এই কাজকে অগ্রসর করতে সাহায্য করেছে, তাই এই আন্দোলনের প্রগতিশীলতাও উপেক্ষণীয় নয়। কাজেই অরবিন্দবাবু যদি উপরোক্ত কৃষক আন্দোলনগুলির বিদ্রোহাত্মক ঐতিহ্য অস্বীকার করে সংস্কারবাদী ধারাটাকেই একমাত্র প্রগতিশীল ঐতিহ্য হিসাবে তুলে ধরেন এবং এইটিই একমাত্র সত্য ধরে নিয়ে রায় দেন যে সেদিন ইংরেজের অনুগ্রহ ভিক্ষাই ছিল "কালের নির্দেশ", তাহলে বলব নিজের কষ্টকল্পিত নির্দেশটি কালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পাবার সহজ পন্থাটি অরবিন্দবাবু যত তাড়াতাড়ি বর্জন করবেন ইতিহাস ও সাহিত্য-সাধনার পক্ষে ততই মঙ্গল।

নরহরি কবিরাজ

॥ **অম্লমধুর** ॥ নারায়ণ চৌধুরী ॥ ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ মূল্য আড়াই টাকা ॥

যতদূর জানা আছে, কোন এক বিজ্ঞাপনবিশারদ প্রকাশন-ব্যবসায়ী তাঁদের প্রচার-পুস্তিকায় রম্যরচনা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভাষার কারচুপি হিসাবে উৎপত্তি হলেও—রম্যরচনা কথাটিকে

উপেক্ষা করার উপায় নেই—কেননা, বাঙলা সাহিত্যের জমিতে হালে যে ফসল ফলছে তার বেশ বড় একটা অংশই এখন এই অভিধায় চিহ্নিত—এটা আশা বা আশঙ্কার কারণ যাই হোক।

রম্যরচনা বলতে ঠিক কী যে বোঝায় বলা শক্ত। নক্‌শা, ভ্রমণ-কাহিনী থেকে শুরু করে ইংরাজিতে যাকে সচরাচর Essay বলা হয় সেই ধরনের রচনাও এই নামের নামাবলী এঁটে প্রকাশকের শেল্‌ফে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করে অবস্থান করছে, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই ভিড় পাঁচমিশালি ধরনের হলেও এর মধ্যে একটা তবু ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়—তা হল, ভাষার প্রসাধনে প্রীতি এবং আপাতরমণীয়তার প্রতি অন্ধ অনুরাগ—যার উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন।

আদর্শ হিসাবে কথা সাজানোর পারিপাট্য, রমণীয়তা সব সাহিত্যিক রচনারই গুণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটেই কি শেষ কথা? বলার কথা আছে বলেই পাঠকের মনে তা সংক্রামিত করার জন্যেই কি লেখক কলম নিয়ে বসেন না? বলার কথাটিকে আরও ভালো করে, রসালো করে পরিবেশনের জন্যেই তো প্রসাধনের প্রয়োজন বলে জানি। কিন্তু এখনকার ঝোঁকটা হচ্ছে, কথাবস্তুর অভাবকে বা মামুলি কথাবস্তুকে ভাষার চটুলতা (অনেক ক্ষেত্রে যা চাপল্যেরই প্রকারভেদ) দিয়ে ঢেকে রাখা। এখনকার ফ্যাশনের দাবি হচ্ছে, এমন লেখা লেখো যা হচ্ছে অনিদ্রারোগের ওষুধ, যা লোকে শুয়ে শুয়ে পড়বে, ট্রেনে কি ট্রামে যেতে পড়বে, এমনকি কমোডে বসেও পড়বে এবং পড়েই যা স্বচ্ছন্দে ভুলে যাবে। অর্থাৎ দাবিটা হচ্ছে বেদনাহীন প্রসবের মত ভাবনাহীন পড়ার। বলতেই হচ্ছে, একে যাঁরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য এবং প্রাণশক্তির লক্ষণ বলে মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের মৌলিক গরমিল রয়েছে।

প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে নারায়ণবাবু অপরিচিত নন। অনেকক্ষেত্রে মতের গুরুতর অমিল থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অনেক প্রবন্ধে আমরা চিন্তার খোরাক পেয়েছি। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পর্কেও এ-কথা বলতে পারলে আমরা অখুশি হতাম না। কিন্তু মনে হচ্ছে, নারায়ণবাবুও ফ্যাশনের দাবির কাছে হার মেনেছেন। ফলে মতের তীক্ষ্ণতা ও নির্দিষ্টতা অনুপস্থিত, রম্যতা-সাধনও অসফল।

অম্লমধুরে সংকলিত প্রবন্ধগুলি Essay-জাতীয়। আর Essay-জাতীয় রচনার সাফল্যের মূলকথা হচ্ছে লেখকের চিন্তার স্বকীয়তা এবং রচনার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিভাত করা। নারায়ণবাবুর বর্তমান পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে এ-দুটি গুণেরই অভাব দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হয়েছি।

শচীন বসু

মহবৎ ॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ ক্যালকাটা পাবলিশার্স ॥ আড়াই টাকা ॥

তরুণ লেখক চিত্তরঞ্জন ঘোষের কয়েকটি গল্পের সংকলন। নিছক গল্প বলেই তিনি তৃপ্ত নন—প্রত্যেকটি গল্পের পিছনে একটি মানবিক সামাজিক প্রশ্নও তিনি উপস্থিত করতে চেয়েছেন এবং কয়েকটি গল্পে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই তা করেছেন। প্রথম গল্পের বই বলে লেখক স্বভাবতই নানাদিকে হাত বাড়িয়েছেন। নিম্নমধ্যবিত্তের চরিত্র থেকে শুরু করে গ্রাম্য গরিব এবং চটকলমজুর পর্যন্ত, এবং নির্বাক বেদনা থেকে শুরু করে তীব্র ব্যঙ্গ পর্যন্ত নানা চরিত্র ও নানা স্বর নিয়ে কাহিনী গড়েছেন, যদিও আমার কাছে তাঁর নাগরিক জীবনের কাহিনীগুলিকেই বেশি সার্থক বলে মনে হয়েছে। এই দিক দিয়ে 'ত্রোটিন' এবং 'কানুন' গল্পটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি গল্পের মধ্যেই যে একটি সপ্রশ্ন বেদনাবোধ লেখক যে রকম সূক্ষ্ম আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাতে তাঁর পরবর্তী পরিণতির জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম। লেখকের কথনভঙ্গির মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের বেশ একটি আমেজ ফুটেছে। জানি না এ গুণটিকে তিনি তাঁর সাধারণ স্টাইলের অঙ্গীভূত করে রাখবেন নাকি পুরোপুরি ব্যঙ্গ গল্পের মধ্যেই তাকে বিশেষ করে শানিয়ে তুলবেন।

অনতিঅতীতের বাঙলাদেশে তবু এক পরশুরাম ছিলেন ইদানীং তাঁকেও খুঁজে পাচ্ছি না, যদিও রাজশেখর বসু বর্তমান। পাঠক হিসেবে আমি তাই খুশি হবো যদি বাঙলা সাহিত্যে স্যাটায়ারের পুনরুজ্জীবন সত্যিই দেখতে পাই। রসের ভিয়ানে সবটাই নিতান্ত রমণীয় ও 'করুণ রঙীন' না হয়ে অন্তত কিছু অংশে কিছুটা হাসির জলুনি থাক, কিছুটা খরস্রোত ও ক্ষুরদীপ্তি।

ননী ভৌমিক

চলচ্চিত্র

শ্রীমতী মারী সীট্‌ন ও কলকাতায় চলচ্চিত্র আন্দোলন

প্রধানত আইজেনস্টাইন সম্পর্কে তাঁর প্রামাণ্য বই-এর জন্যই শ্রীমতী সীট্‌নের খ্যাতি। এবং আইজেনস্টাইনের ছবি বা লেখার সঙ্গে আমাদের দেশের সবিশেষ পরিচয় না থাকলেও তাঁর নাম বহুদিন থেকেই মন্ত্রের মতো কার্যকরী হয়ে আছে। এজন্য শ্রীমতী সীট্‌নকে আহ্বান করে ভারতসরকারের শিক্ষাবিভাগ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়ের এই যোগসূত্রটি না থাকলে বিদেশী সমালোচকের পক্ষে ভারতে বক্তৃতা দিয়ে সফল হওয়া কঠিন হত। অবশ্য শ্রীমতী সীট্‌নের ভারতসফরের সাফল্য অনেকখানি তাঁর নিজগুণেও বটে। তিনি শুধু সুবক্তা নন, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ও বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের মেজাজ, এবং জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী ঠিকমতো বক্তব্য পেশ করার বিদ্যা তাঁর আয়ত্ত।

কলকাতায় শ্রীমতী সীট্‌ন তাঁর 'সেমিনার'এ ছটি বক্তৃতা দেন— ১) চলচ্চিত্রবোধ; ২) আইজেনস্টাইনের জীবন ও শিল্পকর্ম; ৩) ফিল্ম—সোসাইটি আন্দোলন; ৪) ডকুমেণ্টারি চলচ্চিত্র ৫) আঁকা ছবির চলচ্চিত্র ৬) মেক্সিকোতে আইজেনস্টাইন। বক্তৃতার সঙ্গে ছিল অপর্যাপ্ত উদাহরণ। উদাহরণের গুণে তাঁর অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ বক্তৃতাও উজ্জ্বল হয়েছে। দেখা গেল যে আইজেনস্টাইনের বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা যত সার্থক হয়েছে ততখানি অন্য বিষয়ে নয়। অবশ্য তার একটি কারণ এই হতে পারে যে অন্যান্য বিষয়গুলি বড়ো বেশি বৃহৎ, এক-একটি বক্তৃতায় সেরে দেবার মতো নয়। তাহলেও আক্ষেপ থেকে যায় যে চলচ্চিত্রবোধের বক্তৃতায় চলচ্চিত্রের গুরু চ্যাপলিনের স্থান নির্ধারিত হল না, বিভিন্ন দেশের ভাবধারার কথা বলতে গিয়ে তিনি ফরাসী রোম্যান্টিক বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে গেলেন, ফরাসী, ইতালীয়, রুশ ও ইংরিজী বাস্তবতার সম্পর্কে আলোচনা হল না। তেমনই আবার ডকুমেণ্টারির বিষয়েও ধারাবাহিক কোনো

বিবরণ বা ডকুমেণ্টারির মূলসূত্র বা তার বিকাশের গতি স্পষ্ট হল না। ফিল্ম-সোসাইটি বিষয়ে বক্তৃতাটি অবশ্য খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল, যদিও উদাহরণের নির্বাচনে পরীক্ষানিরীক্ষার যেদিকটিতে তিনি ঝোঁক দেন তা খানিকটা উদ্ভট এবং নিরর্থক। পরীক্ষাগত চলচ্চিত্রের যে সমস্ত দিক কালে চলচ্চিত্রের প্রধান ধারার মধ্যে এসে মিশে তাকে সমৃদ্ধ করেছে, সেই দিকগুলি তাঁর বক্তৃতায় অবহেলিত হল বলে মনে হয়। যেমন অরসন্ ওয়েল্‌স্‌এর 'সিটিজেন কেইন' কে এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল বা আভঁ-গদি বলা অবশ্যই উচিত, এবং পরবর্তী চলচ্চিত্রে তার অসাধারণ প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। আইজেনস্টাইনের ছবিতে যদি পরীক্ষা না থাকে তবে পরীক্ষা খুঁজি কোথায়? আইজেনস্টাইন সম্পর্কে প্রধান বক্তৃতায় শ্রীমতী সীটন এই পরীক্ষার দিকটিতে বিশেষ জোর দিয়েছেন, কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রধান ধারার উপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ করেন নি। বস্তুত তাঁর বক্তৃতার মধ্যে ব্যবসায়িক, জনপ্রিয় চলচ্চিত্রকে যেন খাটো করেই আর্ট-ফিল্ম বলে একটি বিশিষ্ট ধরনের ছবিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অথচ ঐ ব্যবসায়িক সিনেমার শীর্ষে রয়েছেন চ্যাপলিন, গ্রীফিথ, জন ফোর্ড, রেনোয়া বা ক্লেয়ার। তাঁরা সেইখানে পৌঁছেছেন যেখানে চলচ্চিত্র যেমন জনসাধারণের হয়েছে তেমনই আবার শিল্পও হয়েছে। বিশ্বজনীন শিল্প-সার্থকতার এই যে ভূমি আজ চলচ্চিত্রে রয়েছে, অন্যান্য শিল্পে প্রায় নেই বললেই হয়, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি শ্রীমতী সীটনের বক্তৃতায় শুধু গৌণ নয় প্রায় অবলুপ্ত।

অপরপক্ষে আইজেনস্টাইনের বিষয়ে শ্রীমতী সীটন-এর জ্ঞান ও চিন্তা পরিধি ও গভীরতায় যথেষ্ট, ফলে এই বিষয়ে তাঁর দুটি বক্তৃতাই, বিশেষত প্রথম বক্তৃতাটি, অতি মনোজ্ঞ হয়েছিল। ভাবে, ভাষায় ও বাচনভঙ্গীতে, বিশ্লেষণে, এত সমৃদ্ধ বক্তৃতা ইদানীং শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আইজেনস্টাইন সম্বন্ধে তাঁর বই-এ যা আছে, বক্তৃতায় তারই সারাংশ পাওয়া গেল, কিন্তু বলার গুণে ও উদাহরণের সার্থকতায় তার প্রভাব গভীর।

সব মিলিয়ে বলতেই হবে শ্রীমতী সীটন্‌-এর ভারতসফর বিশেষভাবে সার্থক। এই প্রথম এদেশে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বক্তৃতা চলচ্চিত্র-

মহলের মাঝখানে বসে শোনা গেল, এবং এই প্রথম বিদেশ থেকে শুধু চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বলার জন্য কোনো সমালোচককে আহ্বান করা হল। শ্রীমতী সীট্‌ন-এর চিন্তা ও বক্তৃতার উঁচু মান—যা অন্য কোনো শিল্প আলোচনার মানের চেয়ে খাটো নয়—তাতেই তাঁর শ্রোতামহলের উপর রীতিমতো প্রভাব বিস্তার করেছে। যেসমস্ত বক্তব্য তিনি বলেছেন সেগুলি যে কিছুই পূর্বে এদেশে বলা হয়নি তা নয়, কিন্তু গুণী বিদেশী সমালোচক সেগুলি অধিকারের সঙ্গে বলার ফলে লোকে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছে ও অনেকখানি গ্রহণ করেছে।

শ্রীমতী সীট্‌ন্‌-এর কলকাতায় আসার একটি সাক্ষাৎ ফল হল কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির পুনর্গঠন। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে এবং তাঁর উপস্থিতির ফলে অন্যান্য অনেকের উৎসাহে এই ফিল্ম সোসাইটি আবার জোড়া লাগল। এবারে এই সোসাইটি অনেক ব্যাপকভাবে সৎ চলচ্চিত্রের আন্দোলন পরিচালনা করবেন। দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচয়, সার্থক সমালোচনা, নতুন ধরনের চলচ্চিত্র তৈরীর মন ও জ্ঞান সৃষ্টি করা, লোকের মনকে সৎ চলচ্চিত্রের দিকে আকর্ষণ করা,—এই কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির উদ্দেশ্য। নয় বৎসর আগে যখন এই সোসাইটির গোড়াপত্তন হয়, তথনকার চেয়ে সাধারণের মন আজ অনেক অগ্রসর, চলচ্চিত্রমহল অনেক বেশি সহানুভূতিশীল, মায় সরকারও অনেকাংশে সহযোগী। আশা করা যায় যে এমতাবস্থায় কলকাতায় চলচ্চিত্র আন্দোলন শীঘ্রই শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

বিয়োগপঞ্জী

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

একসময়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে আক্ষেপ শুনেছি যে প্রবোধচন্দ্র বাগচী অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেও বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপের কারণ প্রবোধচন্দ্র মোচন করেন নি, কেননা তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। কিন্তু যোগ দেবার পর শুধু অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে সন্তুষ্ট না থেকে তিনি মনপ্রাণ নিয়োগ করেছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কর্তব্য সম্পাদনে। এই কাজে গুরুতর রোগকে উপেক্ষা করার ফলেই তাঁর আয়ুর অকস্মাৎ অবসান ঘটল। বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদে যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটবে বলে মনে হয় না—অতটা দুরবস্থা এখনো আমাদের হয় নি। কিন্তু সাহিত্য-ও-গবেষণাক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু যে শূন্যতার সৃষ্টি করল তা বিশেষভাবে শোচনীয় এই কারণে যে বিশ্বভারতীর কাজের চাপে তিনি গুরুতর রক্তের চাপ অবহেলা না করলে, ঐ শূন্যতা সম্ভবত ঘটত না।

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে প্রবোধবাবুর এককালে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই যোগের সূত্র ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। তখনকার পরিচয়ের সাপ্তাহিক অধিবেশন মাসে অন্তত একবার হত প্রবোধবাবুর বাড়িতে ও এইখানে নিয়মিত আসতেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। ফরাসি সংস্কৃতির উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এঁরা দুইজনেই। অপরপক্ষে, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন ফরাসির তুলনায় জার্মান সংস্কৃতি যে অনেক উঁচু দরের এই নিয়ে তর্ক করতেন তখন আসর জমত ভালোই। তখনকার পরিচয়ের অধিবেশনে দেখা যেত বটকৃষ্ণ ঘোষকে—প্রবোধবাবুর বহু আগেই তাঁর আয়ু ফুরিয়েছে। অনেকের মনে থাকতে পারে একসময়ে শনিবারের চিঠিতে বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রবোধবাবুকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু পরিচয়ের সভায় এঁদের দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু দেখি নি। প্রবোধবাবুর বিতর্কের কলম যে বেশ জোরালো ছিল তার

প্রমাণ পাওয়া যায় আশানন্দ নাগের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে তিনি কখনও সৌজন্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

হিরণকুমার সান্যাল

অজয় চট্টোপাধ্যায়

তরুণ চিত্রশিল্পী অজয় চট্টোপাধ্যায়ের অকালবিয়োগে সকলেই মর্মাহত হবেন। অজয় সরকারী আর্ট স্কুল থেকে সদ্য উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর আঁকা স্কেচগুলি গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে যে বাস্তববোধ ও সজীব প্রাণধর্মের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দিয়ে অজয় তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেছিলেন তাতে আশা করার মতো অনেক কিছু ছিল, যা পূর্ণ হল না।

ননী ভৌমিক

●

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দল

ভারতচীনমৈত্রীসমিতির আমন্ত্রণে চীন থেকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উ হানের নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে এসেছেন তাঁদের স্বাগত জানাই। চীন এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার প্রীতিকর কাজের উদ্যোগ শুধু সরকারী স্তরে নয় বেসরকারী স্তরেও গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে, এইটে মস্ত আশার কথা।

চীনা প্রতিনিধিদলের মধ্যে কবি ও অধ্যাপক লু-কান-জুর সঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে বাঙালী কবিসাহিত্যিকদের যে একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান হয় সেটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আশাকরি দুই দেশের সংস্কৃতি দুই দেশের কাছে ক্রমশই আরো নিকট ও আরো শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠবে।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

ভারতসোবিয়েতমৈত্রীসমিতির উদ্যোগেও এই মাসেই কলকাতায় আর একজন অতিথি এসেছিলেন, যাঁর নাম কলকাতার শিক্ষিত সাধারণের কাছে যতটা প্রিয় ও পরিচিত বোধহয় আর কোনো বিদেশী লেখকই ততটা হতে পারেন নি। তিনি সোবিয়েত লেখক এরেনবুর্গ।

বক্তৃতা করার চেয়ে কলকাতার অন্তরঙ্গ পরিচয় গ্রহণের জন্যই তিনি

বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে খুব ভালো লাগল, যদিও মিলনমন্দিরের অভ্যর্থনাসভায় তিনি যে অপরূপ ভাষণটি দিয়েছিলেন তা না শুনতে পেলে কলকাতাবাসীর মস্ত ক্ষতি হত সন্দেহ নেই।

কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গেও এরেনবুর্গ একটি ঘনিষ্ঠ আসরে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে তাঁর অনবদ্য সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সোবিয়েত সাহিত্যের বিষয়ে যে রকম স্বচ্ছন্দ ও স্বকীয় ভঙ্গিতে আলোচনা করেন তার স্মৃতি দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো।

বঙ্গসংস্কৃতি

এরেনবুর্গ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালী না হয়ে জন্মাতে পারতেন না, আবার যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন তা বিশ্বমানবের কাছেও গ্রহণীয়।

একটু ভিন্ন উপলক্ষ্যে কথাটা স্মরণ করতে চাই। কারণ সংস্কৃতির জাতীয় বিকাশ এবং মহাজাতীয় ঐক্যের মধ্যে যাঁরা সমন্বয় না পেয়ে সংঘাত দেখেন, একটির অবলুপ্তি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেন না, তাঁহাদের 'বিবেচনা' সম্প্রতি বাঙলাদেশের পক্ষে করাল হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'—জাতীয় সংগীতের এই মর্মবাণীটিকে তাঁরা সংশোধন করে শুধু একরাষ্ট্র ভারতীয়ত্বের ধারণায় উন্মাদ হতে চাইছেন।

এই পরিস্থিতিতে বঙ্গসংস্কৃতির স্বরূপ, তার গৌরব ও বৈশিষ্ট্য, তার বাঙালী জাতীয়তা ও ভারতীয় মহাজাতীয়তা সম্পর্কে নতুন করে এবং গভীর ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলন প্রতিবারের মতো এবারেও বাঙালী সংগীত, নৃত্য, আলোচনা প্রভৃতির যে আয়োজন করেছেন, আশা করি তা থেকে একটি বৃহৎ সার্থকতা সম্ভব হবে।

এবং খ্যাতনামা সংস্কৃতিবিদ্‌দের একাংশের মধ্যে বিহ্বলতা সত্ত্বেও, বঙ্গবিহার একীকরণের সর্বনাশা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যে সমবেতভাবে সজাগ হয়ে উঠতে দেরি করেন নি, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এবং বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ দেবার সময় যখন এল তখন যে তাঁরা আন্দোলনে কণ্ঠ মেলাতে দ্বিধা করেন নি, তার জন্য সাগ্রহ অভিনন্দন জানাই।

ননী ভৌমিক

পরিচয়

ফাল্গুন, ১৩৬২

[বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তির প্রশ্নে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। নীচে আমরা তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বক্তব্য থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধার করে দিলাম।]

—সম্পাদক

ভাষাভিত্তিক রাজ্য

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই রাজ্য মিশিয়ে এক রাজ্য গড়ার যে প্রস্তাব শাসনকর্তৃপক্ষেরা দেশের কাছে উপস্থিত করেছেন তার বিচারে ভারত রাষ্ট্র গঠনের গুটিকয়েক গোড়ার কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আমাদের সংবিধানের অষ্টম তপশীলে ভারতবর্ষের চোদ্দটি প্রধান ভাষার একটি তালিকা আছে। তার মধ্যে সংস্কৃত ও উর্দু এই দুটি ছাড়া বাকি বারোটি ভাষা ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষা। ভারতবর্ষের বারোটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বিভাগের প্রতিটি বিভাগে এর একটি-না-একটি ভাষা একান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা, তাদের মুখের ভাষা, লেখার ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। উর্দু এরকম আঞ্চলিক ভাষা নয়। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের কিছু লোক এ ভাষায় কথা বলেন, লেখেন ও সাহিত্য রচনা করেন। সে সব অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে এ ভাষার সম্বন্ধ নেই। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের আমলে রাজদরবারে এ ভাষার সংস্কৃত রূপ সৃষ্টি হয়েছিল। এ ভাষায় সাহিত্য

রচনা হয়েছিল, যার কিছু অংশ উঁচু শ্রেণীর সাহিত্য। রাজার ভাষা বলে অমুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এ ভাষা ব্যবহার করতেন এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিদায় হবার পুর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গায় এক শ্রেণীর অমুসলমান লোকও এ ভাষা ব্যবহার করতেন। যেমন উত্তর প্রদেশে অনেক হিন্দু ভদ্রলোকের মুখের ভাষা উর্দু। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল থেকেই কোথাও কোন শ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় লেখা নানা প্রাচীন শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা সেই সব শাস্ত্রের আলোচনায় সংস্কৃত পুথি রচনা করতেন, এখনও অল্প কিছু করেন, যাতে সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে পুঁথির প্রচার হয়। উর্দু ও সংস্কৃত বাদে বাকি বারোটি আঞ্চলিক ভাষা হচ্ছে—(১) অসমীয়া (২) বাংলা (৩) গুজরাটী (৪) হিন্দী (৫) কানাড়ী (৬) কাশ্মীরী (৭) মলয়ালম (৮) মারাঠী (৯) ওড়িয়া (১০) পাঞ্জাবী (১১) তামিল (১২) তেলেগু।

ভারতবর্ষের যে বারোটি ভৌগোলিক বিভাগের এই বারোটি ভাষা চলতি ভাষা তাদের যোগফল গোটা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মানচিত্রে এই বারোটি বিভাগ স্থাপন করলে ভারতবর্ষের আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৯৫০ সালে India in Maps নামে যে মানচিত্রের পুঁথি প্রকাশ হয়েছে তার দশম পৃষ্ঠায় ভাষার ভিত্তিতে ভাগ দেখিয়ে ভারতবর্ষের যে মানচিত্র আছে তা দেখলেই এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হবে। ভাষার মাপকাঠিতে ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিভাগ আকস্মিক ঘটনা নয়। কোন রাজা বা রাজশক্তির প্রভাবে এ বিভাগ ঘটেনি। বহু শতাব্দী, অনেক জায়গায় হাজার বছরের উপরে, নানা ঐতিহাসিক শক্তি যা মানুষের সমাজ ভাঙে গড়ে, সেই সব শক্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের এই ভাষাগোষ্ঠীগুলিকে গড়ে তুলেছে। যে কারণে প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর লোকের ভাষা এক, সেই কারণে তাদের আচার ব্যবহার জীবনযাত্রা-প্রণালী, মনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের মধ্যে যে ঐক্য অন্য ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে ঠিক সে রকম সম্ভব নয়। এক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব, যেমন আর্য সভ্যতা কি দ্রাবিড় সভ্যতা, বহু ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে অনেক ব্যাপারেও মনোভাবে ঐক্য এনেছে, কিন্তু সে ঐক্য এক-ভাষাভাষী লোকেদের মধ্যে ঐক্যের মত নিবিড় ও বহুব্যাপী নয়। কোন

সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক, প্রতি ভাষাগোষ্ঠীর এই রকম অল্প লোকের অন্য ভাষাগোষ্ঠীর অল্প লোকের সঙ্গে মনের আত্মীয়তা ঘটেছে। যেমন সংস্কৃত যখন আর্য সভ্যতার বাহক ছিল তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্তের পণ্ডিতের সঙ্গে অন্য প্রান্তের পণ্ডিতের মনের যোগ অনেক সময় নিজ নিজ ভাষাগোষ্ঠীর অপণ্ডিত জনসাধারণের সঙ্গে মনের যোগের চেয়ে গভীরতর ছিল। সেই রকম ইংরেজদের আমলে ইংরেজী ভাষা ও বিদ্যায় শিক্ষিত ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের মনের ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির মিল এই নূতন বিদ্যায় অশিক্ষিত নিজ ভাষাগোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে মিলের চেয়ে বেশি ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু প্রতি ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণের সঙ্গে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণের এ মিল কখনও ঘটেনি। কারণ ঘটার কোন উপায় ও কারণ ছিল না। যে জ্ঞান ও ভাব সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিতদের এক করেছিল, কি ইংরেজী-শিক্ষিত লোকদের এক করেছিল, সে জ্ঞান ও ভাব তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে অতি অল্পই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হয়েছিল। এবং নিরক্ষর দেশে প্রচারের সম্ভাবনাও অতি অল্প ছিল।

দুই

সেইজন্য ইংরেজ রাজত্বের সময়েই যখন ভারতবর্ষের মনীষীরা ইংরেজমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের কল্পনা করেছিলেন তখন প্রতি ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের শিক্ষিত করার জন্য তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, এবং রাষ্ট্রের কাজ চলবে এমন ভাষায় যা সেই শিক্ষিত জনসাধারণের নিজের ভাষা—এই কল্পনা করেছিলেন। এবং সে কল্পনাকে রূপ দিতে হলে ভাষাকে ভিত্তি করে যে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিকে গড়া অবশ্যম্ভাবী এ বিষয়ে তাঁদের মনে কোনই দ্বিধা ছিল না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই চিন্তাধারা ও কল্পনাকে রূপ দেবার প্রয়োজনেই বার বার ঘোষণা করেছে যে স্বাধীন ভারতবর্ষের গড়ন ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সমষ্টি। আমাদের সংবিধান রচনা পর্যন্ত এই চিন্তাধারাই অব্যাহত ছিল। নইলে India, that is Bharat, shall be a Union of States, এর কোন অর্থ হয় না যদি Stateগুলি হয় এক-একটি ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডমাত্র, যে ভূমিখণ্ডের লোকদের মধ্যে কেবল এইটুকু আত্মীয়তা

যে তারা এক শাসনাধীনে বাস করে, যেমন ইংরেজের আমলে বা পাঠান-মোগল আমলে করত।

কিন্তু কংগ্রেসের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসার পর এখনকার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়া ভারতবর্ষের ঐক্যের পরিপন্থী। কোন বিজ্ঞ কংগ্রেসী এ রকম রাজ্য গড়ার নাম দিলেন Linguism। কিন্তু নানা ভাষার আঞ্চলিক বিভাগে ভারতবর্ষের বিভাগ একটা কঠিন মানবীয় সত্য, যেমন উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র নিরেট প্রাকৃতিক সত্য। হিমালয়কে পরিহাস করে ঢিপি কি সমুদ্রকে ডোবা নাম দিয়ে চক্ষু বুজলেই তারা দূর হয় না। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর গড়ন এই রকম সত্য। তাকে অগ্রাহ্য করে ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। ক্ষমতার খেয়ালে অন্য রকম চেষ্টায় ভারত রাষ্ট্রের স্বাভাবিক গড়ন কিছুদিন পিছিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কিছু দুঃখ ভোগের পর ঐ স্বাভাবিক গড়ন স্বীকার করতেই হবে।

তিন

ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সমষ্টি দিয়ে ভারত রাজ্য গড়নে যাঁরা ভারতবর্ষের ঐক্য নষ্টের আশঙ্কা দেখেন এবং বহুভাষী লোকের এক রাজ্যই ঐক্যের উপায় মনে করেন, ঐক্যের যে নানা স্তর তাঁরা সে কথা চিন্তা করেন নি। ইংলণ্ড কি ফ্রান্সের মতো একভাষাভাষী দেশের রাষ্ট্রের যে ঐক্য বহুভাষাভাষী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের সে ঐক্য সম্ভব নয়। যাঁরা সম্ভব মনে করেন তাঁরা অবাস্তব কল্পনাকে খেয়ালের বশে সত্য মনে করেন। তাঁরা মনে করেন বহু পরিবার ভেঙে এক পরিবার করলেই সকল পরিবারের লোকেদের মধ্যে ঐক্য এসে যাবে।

ভারতবর্ষ যে রাষ্ট্র গড়বে তা পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রের এক নূতন রূপ। ভারতবর্ষের ভাষাগোষ্ঠীগুলি বিস্তারে ও জনসংখ্যায় পশ্চিম ইউরোপের বহু রাষ্ট্রের সমতুল্য। পশ্চিম ইউরোপ এক রাজ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। আমাদের ইতিহাস ও আমাদের শুভবুদ্ধি ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্রে গড়ে তোলা সম্ভব করেছে। নইলে বিহারীর সঙ্গে তামিলের মিল সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে,

ভাষায় ফরাসীর সঙ্গে ইতালীয়ানের মিলের চেয়ে অনেক কম। আমরা ভারতবর্ষের এই বিচিত্র ভাষাগোষ্ঠীগুলিকে এক মহারাষ্ট্রে গড়ে তোলা সংকল্প করেছি কোন রাজশক্তির বাইরের চাপে নয়, এর একভাষী গোষ্ঠীর আধিপত্যের ফলে নয়। সকল ভাষাগোষ্ঠীর সমান অধিকারের ও সমান সহযোগিতার বন্ধনে। এই নূতন স্থষ্টির জন্য চাই নূতন নির্মাণ-কৌশল। পুরাতন ও পরিচিতের নকল এখানে অচল ও অনর্থকারী। এই মহারাষ্ট্রের স্থষ্টি ও স্থিতি সম্ভব হবে যদি প্রতি ভাষাগোষ্ঠীকে ভারতরাষ্ট্রের ঐক্যের মধ্যে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভা অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশের স্থযোগ দেওয়া হয়, যে ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিক রূপেই অপর ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে কিছু মিল কিছু গরমিল নানা ভাষাগোষ্ঠীর লোককে এক রাজ্যে এক শাসনে মেশানো তাদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরম অন্তরায়। এবং ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের উপর একরঙা তুলি টেনে ভারতবর্ষের সভ্যতার স্বাভাবিক পরিণতিকে অস্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে গিয়ে তাকে নষ্ট করা। আত্মবিকাশের বাধায় অসন্তোষের বীজ। এতে পলিটিশিয়ান ও রাজকর্মচারীদের administrationএর স্থবিধা হয়। কিন্তু administrationএর নির্বিশেষ মহাকাশে কোন প্রতিভার উদয় হয় না। কোন ভাব ও কর্মের বড় স্থষ্টি সম্ভব হয় না। সেখানে কেবল মোটা বেতনের কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও স্বার্থসর্বস্ব বণিকশ্রেণীর অবাধ বিচরণের স্থান! যারা সম্পূর্ণ Linguism এর বিরোধী, নিরপেক্ষভাবে সকলের উপর ক্ষমতা চালনা ও সকলের অর্থে নিজের থলি বোঝাই হলেই তারা পরম তুষ্ট।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ভাষা ও রাষ্ট্র

সারা ভারত এক রাষ্ট্র হলেও কার্যত আমরা এক-একটি স্থনির্দিষ্ট ভাষা ও ঐতিহ্যের মধ্যে বসবাস করি, অনেকটা য়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের মতো। ইংরেজ, জর্মন, ফরাশি যেমন আলাদা, অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ ইতিহাসের পটভূমিও ব্যাপ্ত হয়ে আছে, পঞ্জাবি, গুজরাতি, বাঙালি ইত্যাদিকেও

সেই রকম ধারণা করলে ভুল হয় না। য়োরোপীয় বা ভারতীয় সংস্কৃতি নামক একটা সমগ্রকে আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশের ব্যক্তিস্বরূপও সুস্পষ্ট। ক্যাথলিক ধর্ম ও লাতিন ভাষা বা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার বন্ধনে ইওরোপ অথবা ভারতবর্ষ অতীতে যে-ভাবে এক হতে পেরেছিলো, আজকের দিনে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

...তথাকথিত প্রাদেশিকতা ভুলে গিয়ে নিজেকে ভারতীয় বলে অনুভব করার উপদেশ আজকাল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে বাঙালি বা মারাঠি বলে ভাবা যদি প্রাদেশিকতা হয়, নিজেকে ভারতীয়, বা ইংরেজ বা চৈনিক বলে ভাবাও কি তা-নয়—এই আজকের দিনে, যখন এক পৃথিবীতে এক মানুষের আসন রচিত হচ্ছে দিকে-দিকে? কিন্তু যেহেতু 'য়োরোপীয়' বা ভারতীয় নামক কোনো ভাষা নেই, তাই ফরাশি, জর্মন, ইংরেজ, রাশিয়ানের মতো আমাদেরও প্রথম পরিচয় হবে তামিল, কানাড়া, মারাঠি, বাঙালি, গুজরাতি বলে। সেটা প্রকৃতিরই বিধান; আমার গায়ের রং কালো বলে যেমন নালিশ করা চলে না, এও সেই রকম। এবং এই বৈচিত্র্যের অর্থ বিরোধ নয়, বিচ্ছেদ নয়; এই বৈচিত্র্যই ভারতের ঐতিহ্য ও ভবিতব্য, তার চিন্ময় সম্পদ। বিভিন্ন পক্ষের বৈশিষ্ট্য লোপ করে দিয়ে মিতালি গড়ে ওঠে না; চারিত্রিক ঐশ্বর্য বিকশিত হলেই সত্যিকার মিলন সম্ভব হয়।

বুদ্ধদেব বসু

বাংলা বিহার সংস্কৃতি সংহার

প্রশ্ন। যে বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি পরাধীন অবস্থায়ও বিকাশ লাভ করেছে, ১৯১২ পর্যন্ত বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও বিকাশলাভ করেছে, তা এখন বিহারের সঙ্গে বাঙলা সংযুক্ত হলে লুপ্ত হবে, এমন অদ্ভুত কথা বলছেন কেন?

উত্তর। অনেক বেশি লজ্জাকর কথা আপনারা বলছেন বলে। পরাধীন

অবস্থায়ও বাঙলা সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে, একথা কতকাংশে ঠিক। কিন্তু তার অর্থ কি এই—পরাধীনতার জন্যই বাঙালী সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে? আবার পরাধীনতাই কাম্য? বরং উলটো। পরাধীনতার জন্য বাঙালীর ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক স্ফূর্তি ব্যাহত হয়েছিল। দ্বিতীয় কথা, ১৯১২ পর্যন্ত যে বাঙলা-বিহার সংযুক্ত ছিল সে-বাঙলা ছ কোটি বাঙালীর, আড়াই কোটি বাঙালীর নয়। সেজন্যই সেদিন বিহার তার স্বাতন্ত্র্য দাবি করেছে। এবং স্বতন্ত্র হয়ে স্বস্থবোধ করেছে। তা ছাড়া, শুধু সংখ্যার প্রশ্ন নয়। সেদিন বাঙলা-বিহারের শাসন গণতন্ত্রনীতিতে চলেনি, সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে চলেছে। তার অর্থটা প্রণিধানযোগ্য: ইংরেজ-শাসিত বাঙলা-বিহারে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা ছিল—বাঙলা ও হিন্দীর প্রতিষ্ঠা সেই শাসকমণ্ডলে ছিল তখন সমান ও অতি সামান্য। ইংরেজী সেদিন আমাদের ব্যাহত করলেও আমরা বাঙালীরা ইংরেজের অনিচ্ছাদত্ত সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য পরিপাক করে নিয়ে তার বলে নিজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তাকে পরিপুষ্ট করতে পেরেছি। কিন্তু সে অবস্থা তো এখন ১৯৫৬তে নেই। আজ দেশের শাসকমণ্ডল হিন্দীবাদী। হিন্দী স্বাভাবিকভাবে প্রসার লাভ করবে, এত দেরি তাঁরা সইতে নারাজ। তাই হিন্দীকে এখন ৪।৫টি রাজ্যের ও কেন্দ্র সরকারের অর্থে ও সহায়তায় পরনিগ্রহে ও আত্মপ্রসারে তাঁরা উদ্যোগী করেছেন—ফলে দক্ষিণাপথে ও বাঙলায় হিন্দীর বিরুদ্ধে বিরোধিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ হিন্দীর ঐশ্বর্য এখনো এত নয় যে, ইংরেজীর স্থান সর্বদিকে নিয়ে তা আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকেও পুষ্ট করবে। আমরা তাই বেশ অনুভব করি, হিন্দী পশ্চিম বাঙলায় আমাদের আচ্ছন্ন করছে, কিন্তু আমাদের ছায়াদান করছে না, প্রাণদান করছে না। বিহার অবশ্য মোটেই হিন্দীভাষী রাজ্য নয়, হিন্দী তার 'কুলটস্প্রাখে' অর্থাৎ শেখাভাষা। বিহারের নিজের ভাষা ও কৃষ্টিসমূহ (মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, মগহী) হিন্দীর চাপে খর্বিত ও মূর্ছিত। হিন্দী ও হিন্দীবাহিত উত্তর ভারতের সংস্কৃতিকে এই বিহারী জনসংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বিহার ক্রমশ হিন্দীর মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতি তৈরী করতে পারে। তা না পারলে বিহার উত্তর প্রদেশের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। এবং তার পক্ষে তাহলে স্বাভাবিক পরিণতি হবে বিহার ও উত্তর প্রদেশের সংযুক্তি। কিন্তু এখন বাঙলার সঙ্গে বিহারকে

মিলিয়ে দিলে বিহার দোটানায় পড়ে না পারবে হিন্দীবাহিত তার নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে, না পারবে বাঙলার চাপে হিন্দী সংস্কৃতিকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে ; পারবে শুধু উত্তর-প্রদেশীয় হিন্দীর অবজ্ঞাত বাহকরূপে বিহার-বাঙলার সাংস্কৃতিক integrity বা অখণ্ডতাকে ব্যাহত করে বাঙলার অধঃপতন ঘটাতে। এজন্যই আমি বলি এই দুই রাজ্যকে একাকার করলে বিহারের অঙ্কুরায়মান সংস্কৃতি ও বাংলার বিকাশমান সংস্কৃতি দুয়েরই বিশীর্ণতা অনিবার্য।

'রাজ্য'হীন জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি

প্রশ্ন। গণতন্ত্রে সংখ্যাধিক্যের ভয়ের বশে আপনিও আত্মহারা হয়েছেন। 'রাজ্য' না থাকলেই কোনো জাতি বা সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে না, এমন কথা কেন বলছেন? 'রাজ্য' তো কত সময় ভারতবর্ষের কত জাতির ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, অনেক সময়ই হিন্দীভাষীদেরও রাজ্য ছিল না, বাঙালী জাতিরও রাজ্য ছিল না। তবুও হাজার বছর ধরে বাঙালী জাতিও গড়ে উঠেছে। এখন কেন তবে রাজ্য না থাকলেই বলেন বাঙালী জাতি মরে যাবে, বাঙলা সংস্কৃতি লুপ্ত হবে?

উত্তর। কেন বলি তার উত্তর—হাজার বৎসর তো মিথ্যা নয়। মানুষের ইতিহাসেও নয়, আমাদের দেশের মন্থরগতি ইতিহাসেও নয়। হাজার বৎসর আগে ইউরোপে ও এশিয়ায় মধ্যযুগ বা সামন্তযুগ চলছিল। তখনো 'রাষ্ট্র' বলতে বোঝাত শুধু সেই রাজশক্তি যা রাজস্ব আদায় করত, দেশরক্ষা করত এবং দুষ্টের দমন করত। সে যুগে শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, মানসিক ব্যাপারে সাধারণ মানুষের জীবনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব কোথাও বেশি ছিল না। বিশেষ করে আমাদের দেশে তো তা আরও কম ছিল। এ অবস্থাটা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—আমাদের 'সমাজই' ছিল প্রধান, আধুনিক অর্থে 'রাষ্ট্র' বা 'নেশন' আমরা গঠন করিনি। আমাদের সমাজ ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। তা ছিল সংস্কৃতির পালক। দিল্লী বা গৌড়ে যে-ই রাজা হোক্ তাতে আমাদের সমাজের ও সংস্কৃতির বিশেষ যেত আসত না। তার ধারা মোটের উপর ঠিক অব্যাহত থাকত। ইউরোপেও অনেকটা এ অবস্থাই ছিল, সব দেশেই তা থাকে। আর মডার্ন স্টেট ও 'নেশন' চলেছে মাত্র দুই বা আড়াই শতাব্দী আগে—প্রথম (১৭৮৮-১৭৮৯)

ইউরোপে। আমাদের দেশে মডার্ন স্টেট প্রথম স্থাপন করে ইংরেজ। তার ঘাতপ্রতিঘাতেই আমাদের 'নেশন'-বোধও জন্মে এবং তা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের পুরনো পল্লী-সমাজ ভেঙে যায়। মডার্ন স্টেট সমাজের বাহুমাত্র নয়; মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। যানবাহন ও সমাজ-শক্তির তাই আধার। আদানপ্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আধুনিক রাষ্ট্র তাই সমাজকে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরে। চাল-ডাল, ব্যবসা-বাণিজ্য, লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, প্রভৃতির ভার ও দায়িত্ব ক্রমেই রাষ্ট্রের হাতে গিয়ে পড়ে। কোনো জাত নিজ রাষ্ট্র হারালে আজ আর কিছুতেই সবল থাকতে পারে না। তার সংস্কৃতিও আর অগ্রসর হতে পারে না। আর্থিক, নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব জিনিসেরই এখন রাষ্ট্রের সহায়তা না হলে চলে না। বিশেষ করে যদি ওয়েলফেয়ার স্টেট স্থাপিত হয় তা হলে সমাজ বা ব্যক্তির জীবনের কোনো অংশই তার এলাকার বাইরে পড়ে থাকতে পায় না। তাই এযুগে রাজ্য না থাকলে কোনো জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব থাকে না, রাজনৈতিক অস্তিত্ব না থাকলে কারও জাতীয় অস্তিত্ব থাকে না। আর জাতীয় অস্তিত্ব গেলে সাংস্কৃতিক দান আসবে কি করে?

এজন্যই ইহুদিরা 'ইস্রায়েল' নামে একটা রাষ্ট্র-গঠন আদায় না করে পারেনি; একটা রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি চাই যেখানে সে দাঁড়াতে পারে। এই জন্যই বারবার বলছি—'পশ্চিম বাঙলা রাজ্য' লুপ্ত হলে ভারতের বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির অধোগতি অনিবার্য; বিহারী রাজ্য না থাকলে ভারতের বিহারী জাতি ও বিহারী সংস্কৃতি এক মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেটের অর্থ বুঝলে কেউ আর বলবে না—রাষ্ট্র না থাকলেও জাতি থাকতে পারে,—রাজ্য খুইয়েও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

গোপাল হালদার

বাঙলার ছেলে মেঘনাদ সাহা

কুঞ্জবিহারী পাল

খ্যাতিমানদের মধ্যে এক শ্রেণী আছেন যাঁরা অনেকটা বিনা আয়াসে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করে উন্নতির চরম শিখরে উঠে যেতে পারেন। মনে হয়, খ্যাতি যেন তাঁদের জন্যেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু আর এক শ্রেণী আছেন যাঁদের প্রতি পদে বাধা প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে এগুতে হয়। সাফল্যের এভারেস্টে উঠতে হলে এঁদের অগ্রসর হতে হয় অতি সজাগ দৃষ্টি নিয়ে, অতিকষ্টে একটি একটি সিড়ি কেটে কেটে। ডাঃ মেঘনাদ সাহা ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, যৌবন কেটেছে অতন্দ্র পরিশ্রমের তপস্যায়। তারপর একসময় এসেছে সাফল্য, সম্মান—জগৎজোড়া আসন, যার তুলনা হয় না।

ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা জগন্নাথ সাহার গ্রামেই ছিল ছোট্ট একটি মুদীর দোকান। এ দোকানের সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করতে হত বেশ বড় একটি পরিবারকে। কাজেই পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন অ-আ ক-খ শিখিয়ে পিতা দোকানের কাজে লাগিয়ে দিলেন মেঘনাদকে। এ কাজে কিন্তু মেঘনাদের কোন পারদর্শিতা দেখা গেল না। কয়েক মাসের মধ্যে এত লোককে বাকিতে মাল দেয়া হয়েছিল যে আশঙ্কা হল এরকম চালালে দুদিনই লাটে উঠবে দোকান। ব্যর্থ ব্যবসায়ী মেঘনাদকে অগত্যা মাইল সাতেক দূরে সিমুলিয়া গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থাই করতে হল। এক সহৃদয় ব্যক্তির বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। বারো বছর বয়সে এখান থেকেই বৃত্তি নিয়ে

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মেঘনাদ। এরপর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, জুবিলি স্কুল এবং ঢাকা কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে মেঘনাদ কলকাতায় এলেন প্রেসিডেন্স কলেজে বি. এস-সি পড়বার জন্যে। বলা বাহুল্য, পড়াশুনা চালানোর খরচ তাঁকে তুলতে হয়েছে বৃত্তির টাকা থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সহপাঠীদের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। এখান থেকে গণিতে অনার্স নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনি ১৯১৩ সালে। দু বছর পর গণিতেই এম. এস-সি পাশ করলেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেই। এরপর ফাইনান্স পরীক্ষা দিতে মনস্থ করলেন; কিন্তু কলেজ জীবনে বাঘা যতীন ও অনুশীলন সমিতির পুলিন দাশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলে সরকার থেকে ফাইনান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি তিনি পেলেন না। কে জানে, এ অনুমতি পেলে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক মেঘনাদ সাহাকে হয়তো আমরা পেতাম না—বড়ো জোর পেতাম কোনো নিপুণ সরকারী কর্মচারীকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন তখন মনীষী আশুতোষ। তিনি মেঘনাদকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের লেকচারার হিসেবে আহ্বান জানালেন। পরে অবশ্য পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে তিনি লেকচারার হলেন। আগেই বলা হয়েছে, মেঘনাদ ছিলেন গণিতের ছাত্র; কাজেই নিজে নিজে পড়াশুনা করেই তিনি পদার্থবিদ্যায় জ্ঞানার্জন করেছেন। এ সময় মেঘনাদকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। ছাত্র পড়ানোর অবসরে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। অতিরিক্ত অর্থের জন্যে টিউশনিও করতে হত। আজকালকার গবেষক ছাত্রদের মত অধ্যাপকদের নিকট থেকে কোন সাহায্য তিনি পাননি একথাটিও মনে রাখার দরকার। তাছাড়া গবেষণার যন্ত্রপাতি একদম ছিল না বললেই চলে। এই অবস্থাতেও দু বছর পর ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্-সি ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর পান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি। এই বছরই গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে ডাঃ সাহা বিলেত যান। লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে পদার্থবিদ্ ফাউলারের কাছে প্রায় দেড় বছর কাটিয়ে ডাঃ সাহা

অধ্যাপক নার্নস্টের কাছে কিছুদিন গবেষণা করে দেশে ফিরে আসেন ১৯২১ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু বছর চাকুরি করলেন এরপর। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কাজেই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে ১৫ বছর কাটিয়েছেন ডাঃ সাহা। এখানে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছেন। সে সময় এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র 'ডাঃ সাহার ছাত্র' বলতে গর্ববোধ করতেন। ১৯২৫ সালে ডাঃ সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতশাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্যে এর দু বছর পর ১৯২৭ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এলাহাবাদে থাকার সময় তিনি বহু গঠনমূলক কাজও করেছেন। ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৪ সালে ডাঃ সাহা বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। এর পরের বছর কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংস্থার মুখপত্র 'সায়েন্স এণ্ড কালচার' পত্রিকাটি আজ কি বিজ্ঞানী কি অবিজ্ঞানী সকলের কাছেই বিশেষভাবে পরিচিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপকের পদ খালি হয় ১৯৩৮ সালে। এ পদে ডাঃ সাহা মনোনীত হলে তিনি পুনরায় তাঁর পুরাতন কর্মক্ষেত্রে চলে আসেন। এই বছরই নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং পণ্ডিত নেহেরুর সহযোগিতায় ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি স্থাপিত হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি আর একবার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। এ সময় হতে দশ বছরের চেষ্টায় কলকাতায় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস স্থাপন করতে সমর্থ হন ডাঃ সাহা। এ ছাড়া মেডিকাল ফিজিকস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনাও ডাঃ সাহার ছিল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি একরকম শেষ করে গেছেন তিনি। ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ গৌরবস্থল। ১৯৩৫ সালে তিনি তিনি সর্বপ্রথম রাশিয়া ভ্রমণ করে সেই বিরাট দেশের ততোধিক বিরাট বিজ্ঞান-গবেষণাগারগুলি এবং সেখানকার কর্মপদ্ধতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন। আরও কয়েকবার তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন।

দামোদর নদ পশ্চিমবঙ্গে 'দুঃখের নদ' বলেই পরিচিত। ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্যার পরই ডাঃ সাহা এবিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৯২৩ সালে হল উত্তর বঙ্গে ব্যাপক বন্যা, ঘরে ঘরে হাহাকার উঠল। ডাঃ সাহার অন্তরও কেঁদে উঠল। তিনি নানা প্রবন্ধে, বক্তৃতায় দেশবাসী তথা সরকারকে অবহিত করতে চেষ্টা করেন যে, একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই নদীসমস্যার সমাধান হতে পারে। ১৯৪৩ সালে আবার এল দামোদরের বন্যা। এবারে ডাঃ সাহা উঠেপড়ে লাগলেন এ সমস্যা সমাধানের জন্যে। এবং মূলত তাঁরই চেষ্টায় আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি কর্পোরেশনের অনুকরণে স্থাপিত হল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। আজ ভয়াবহ দামোদর বন্ধন স্বীকার করেছে ডাঃ সাহা তথা বিজ্ঞানের কাছে—সে আজ আর দুঃখের নদ নয়, হতে চলেছে প্রাচুর্যের নদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ডাঃ সাহা একবার ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সব দেশ বিজ্ঞানে কি অদ্ভুত উন্নতি করেছে তা দেখবার সুযোগ তাতে পান ডাঃ সাহা। এছাড়া আরও একটা বিষয় এ সময় তিনি লক্ষ্য করেন। ওসব দেশের বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানকর্মীরা বেশ সঙ্ঘবদ্ধ—তাঁদের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং সরকার সচেতন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা তার উল্টো। কাজেই দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পর স্থাপিত হল 'বিজ্ঞান কর্মী সঙ্ঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের বহু দিন তিনি সভাপতি ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' ডাঃ মেঘনাদ সাহার সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় যে বর্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না তিনি করেছেন এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যে। বহুদিন থেকেই এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৪ সালে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং তারপর এর সভাপতিরূপে তিনি বহু কাজ করে গেছেন। যাদবপুরে বর্তমানে যেখানে এ প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত তার জন্যে স্থান সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের মূলেও ছিলেন ডাঃ সাহা। ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি এখানকার অধ্যক্ষের

পদে যোগদান করেন। এ গবেষণাগারটির সঙ্গে একটি শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক বিজ্ঞানীকে পেয়েছি, যাঁদের অবদান স্মরণীয়। এমন অনেক অধ্যাপককে পেয়েছি যাঁদের অধ্যাপনার ভূমিকা বিপুল। এমন কিছু সংগঠককেও আমরা পেয়েছি যাঁরা চলতি দুনিয়ার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে যাতে ভারতবর্ষ চলতে পারে তার জন্য উদ্যোগের প্রবর্তন করে গেছেন। কিন্তু মেঘনাদ সাহার মধ্যে আমরা আমরা একই সঙ্গে পেয়েছি এই সবকটি গুণের অপূর্ব সমাবেশ, বহুধা প্রতিভার একক মানবমূর্তি। তাঁর পেছনে অন্তঃশীলার মতো কাজ করে গেছে যে স্রোতোধারা তার নাম বোধ হয় দেশপ্রেম। এ দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে অতি বাল্যকাল থেকেই দেখা দিয়েছে। তখন তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন চলেছে বাংলায়। এসময় রাজ্যপাল রম্‌ফিল্ড ফুলার সাহেব একবার কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে এলেন। স্কুলের ছাত্ররা এ পরিদর্শন ব্যাপারটা বয়কট করেন। ফলে অন্যান্য বহু ছাত্রের সঙ্গে অন্যতম বয়কটকারী মেঘনাদকে স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হল। তাঁর বৃত্তিও কাটা গেল। দেশপ্রেমের যে বীজ অতি ছোটবেলায় তাঁর অন্তরে রোপিত হয়েছিল, তারই পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই পরবর্তীকালে। কলেজ জীবনে মেঘনাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বাঘা যতীন ও পুলিন দাশের সঙ্গে। উত্তর বঙ্গে বন্যার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। বস্তুত দেশসেবার হাতেখড়ি তিনি নিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট থেকে। একথা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন বহুবার। তাই যখন প্রয়োজন এল, দেশবিভাগের অবশ্যম্ভাবী সমস্যা উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন যখন উঠল, ডাঃ সাহা এগিয়ে এলেন তাঁর সেবার হাত নিয়ে, সর্বহারাদের ব্যথায় ব্যথিত চিত্তে নেমে এলেন তাদেরই মাঝখানে। যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বাল্যকালে; বাঘা যতীন পুলিন দাশের সান্নিধ্যে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের শিক্ষায়, তারই ফলিত রূপ আমরা তাঁর পরবর্তী বিশেষ করে শেষ জীবনের কার্যাবলীতে অবাক হয়ে দেখেছি। ১৯৫২ সালে কলকাতার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হলেন বিপুল

ভোটাধিক্যে। বিজ্ঞান ছেড়ে রাজনীতিক্ষেত্রে কেন তিনি নামলেন তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, দেশের এমন একটা অবস্থা আসে যখন বিজ্ঞানীকেও তাঁর গবেষণাগার ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আমাদের দেশের আজ সেই অবস্থা। তিনি বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু উদ্বাস্তু সমস্যা, শিক্ষা, আণবিক শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর লোকসভার বক্তৃতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া দেশগঠন-মূলক কাজে, দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলজনিত বিষয়ে তিনি সর্বদাই সরকারের সহযোগিতা করেছেন। সরকারী পরিকল্পনা কমিশনের তিনি একজন সদস্য ছিলেন এবং তারই একটি সভায় যোগদান করতে যাওয়ার সময় পথেই দেহত্যাগ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজনীতিক্ষেত্রে সরকারী তথা কংগ্রেসের পক্ষে যোগ দিলে তিনি হয়তো অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আদর্শের বিনিময়ে নিজেকে বড়ো করবার কোন সুযোগসন্ধানী মোহ তাঁর ছিল না।

ডাঃ সাহা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কাজ করেছেন। তবে জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিষয়েই তাঁর দান সমধিক উল্লেখযোগ্য। গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করে জ্যোর্তিবিজ্ঞানক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করেছিলেন। ডাঃ সাহার আবিষ্কৃত থিওরি অব আইওনাইজেশন গ্যালিলিওর পর জ্যোর্তি-বিজ্ঞানে পৃথিবীর দশটি প্রধান আবিষ্কারের একটি বলেই পরিগণিত। যে কোন সাদা আলো কোন ত্রিকোণ কাঁচের ভেতর দিয়ে চালিয়ে তা সাতটি রঙে বিভক্ত হয়ে গিয়ে বর্ণালীর সৃষ্টি করে। সূর্য এবং নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সূর্য এবং তারকাদের গঠনবিধি বলা যায়। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বহু বিজ্ঞানী বহু গবেষণা করেছেন। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে কতগুলো অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা তত্ত্বের অবতারণা করতে হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এ সমস্যার সমাধান হয় না। ডাঃ সাহার থিওরির সাহায্যে এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হল—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন বলে তিনি স্বীকৃতি লাভ করলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বহু তথ্যসম্বলিত প্রবন্ধগুলি দেশ-বিদেশের নামকরা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত। এ ছাড়া তিনি কত প্রবন্ধ যে নানা জায়গায় প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পরবর্তীকালে

জ্যোতির্বিজ্ঞানের এ বিভাগ সম্বন্ধে যাঁরাই কোন গবেষণা করেছেন ডাঃ সাহার তত্ত্বের সাহায্য তাঁদের নিতেই হয়েছে।

একাধারে বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ, সংগঠক ছিলেন ডাঃ সাহা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিস্ময় জাগায়। প্রবন্ধের উপসংহারে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে একথা সকলেই বিদিত আছেন। পশ্চিমবঙ্গের দাবি প্রতিষ্ঠাকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডাঃ সাহার নিকট হতে যে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন, একথা অনেকেরই জানা নেই। পূর্বেও বলা হয়েছে, সরকারী নীতির দোষত্রুটি দেখিয়ে সমালোচনা তিনি করেছেন, কিন্তু যখনই দেশের মঙ্গলের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছে তখনই বিনা দ্বিধায় তিনি এগিয়ে আসতে দেরি করেন নি। তিনি ছিলেন প্রকৃতই এমন গঠনমূলক কর্মী যিনি সৃষ্টির অপরিমিত প্রাণশক্তিতে উল্লসিত কিন্তু প্রয়োজন হলে আবার সেই সৃষ্টির জন্যই সংগ্রামের সামনে দাঁড়াতে কুণ্ঠাহীন। অকালে তিনি চলে গেছেন; নানা সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের তাঁর মতো দুর্লভ কর্মীর বড় প্রয়োজন ছিল এ সময়!
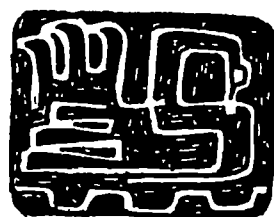
কবিতা

আমার সোনার বাঙলা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

ভাষার সীমানা মানি, প্রকৃতির নিজস্ব ভূগোলে
ভাষা যেন স্বচ্ছ স্রোত ক্ষুরধার দুরন্ত নদীর,
সহজ বিস্তার তার পাথুরে মাটিতে দাগ কেটে
একটি মানচিত্র আঁকে, দেশের সীমানা গড়ে তোলে।

যে-ভাষা শুনেছি আমি আঁতুরের আচ্ছন্ন স্বপ্নেও
মার ঘুমপাড়ানিয়া গানে গানে যে ছন্দের রেশ,
আমার হৃৎপিণ্ডে কাঁপে তারি প্রেম দুর্দমনীয়
হৃদয়ের মানচিত্রে রক্তে আঁকে অভিন্ন স্বদেশ।

রূপকথার দুয়োরানী, জন্মভূমি এ-দেশ আমার!
রাজা-মন্ত্রী আরো যত দুঃস্বপ্নের অনুচরদল
আজ তার ভাগ্য নিয়ে পাশা খেলে, জোটে পাশাপাশি,

নীলকমল ভাই জাগে, এ-মাটিকে রুখেই আবার
রক্তে-ভেসে-যাওয়া মুখে গান গেয়ে ওঠে লালকমল :
আমার সোনার বাঙলা আমি যে তোমায় ভালবাসি।

জেগে আছি

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

আমার চোখের চাওয়া আশ্বিনের দিগন্তবিলাস,
আমার মনের গতি গতিময় মদির হাওয়ায়,
নদীর নটিনী স্রোতে আমার উজাড় ভালবাসা—
পাখির অক্লান্ত কণ্ঠে সুরে সুরে উধাও প্রণয় !
এদেশ ওদেশ নয়, বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ পরিবেশ
গড়েছি বিশ্বের বুকে, অবিচ্ছিন্ন এক মোহানায়
স্বতন্ত্র সত্তায় জাগি, জেগে আছি আমি বাংলাদেশ !

কবির কল্পনা দিয়ে দিনে দিনে গড়েছি নিজেকে,
ভাষার ললিত লাস্য স্পন্দমান আমার হৃদয়—
শিশুর মুখের ছবি যন্ত্রণায় ফুলের উৎসব !
কখনো ধানের খেতে কামনার সোনালি আমেজে
কখনো দিঘির ঘাটে বধূদের মন্থর চলায়
আমার প্রসন্ন খেলা, কখনো বৈশাখে এলোকেশ
দুরন্ত ঝড়ের মুখে আগুনের শিখার মতন
আকাশে ছড়িয়ে নাচি ভয়ঙ্করী আমি বাঙলাদেশ !

চক্রান্তের তন্ত্রলোকে যে তান্ত্রিক শ্মশানসভায়
আমাকে আহ্বান করে, ঋতুছন্দা আমার বুকের
ঠাকুমার রূপকথা, কালে কালে ঘুমপাড়ানি গান,
নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নবান্নের ঘুঘুডাকা দিন
যে চায় আহুতি দিতে—জানে না সে মোহাচ্ছন্ন মন :
হাওয়ার মঞ্জীরে মেতে, চোখ জ্বেলে মেঘের লীলায়
তাকে দেবে মৃত্যুবর আমার বৈশাখী জাগরণ !

তারপর শুধু শান্তি ; মৈত্রীর শাশ্বত সমাবেশ
জেগে রবে এ তীর্থেই ; সমস্ত দেশের কল্পনায়
স্বপ্নের প্রতিমা হয়ে জেগে রবো আমি বাঙলাদেশ!

মিথ্যা

শিবশম্ভু পাল

অজস্র ফুলের হাসি যে গাছের পাতায় পাতায়
স্বপ্নের আলেখ্য আঁকে সেখানেতে তারা সব এলো
রাত্রির পোশাকে সেজে ; রক্তাক্ত হাতের ক্রূরতায়
ফুলেদের প্রাণগুলো ছিঁড়ে নিয়ে কি মজাই পেলো!
'আর ওরা ফুটবে না'—এই ভেবে পরম আরামে
শীষ দিয়ে তারা ডাকে অলজ্জ বেহায়া মেয়েটাকে।
শুরু হয় শকুনের রলরোল উচ্চতম গ্রামে
তাকে নিয়ে—যে ওদের চেতনার অন্ধকারে থাকে।

ভুল, মস্ত বড় ভুল। উদ্ধত ফুলেরা সব ফের
কাকলীমুখর হবে সেই গল্পে যার শেষ নেই।
তাদের জীবন সে তো মাটিতে সুদৃঢ় শিকড়ের
বন্ধনে পবিত্র ; তাই ওরা তো আবার ফুটবেই।

মাথার ওপরে খোলা আকাশের ব্যাপ্ত ইতিহাস।
পাতায় পাতায় হাওয়া এনে দেয় বাঁচার আশ্বাস॥

তোমার বিকাশে

দীপক মজুমদার

আমাকে বরণ করে নিয়ে চলো
সমুদ্র থেকে আকাশে।

মেঘের প্রান্তর ভরে সূর্যপথ
গোধূলির ঘ্রাণ
অজস্র ফুলের হাসি সেইসব তোমার বিকাশে

এই তিস্তা খরস্রোতা জীবনের নাচে
কিংবা ওই ত্রিপথগা, উদ্বেল ফাল্গুনে
ফসলের মাঠে মাঠে সোনার তরঙ্গে যারা বাঁচে

নিয়ে চলো সেইসব জন্মদিনে
নিখিলের জন্মদিনে
উধাও দুরন্ত ঋজুপথে।

আমি আমার চোখে মুখে ছড়াবো
একরাশ শোরগোল ফেটে পড়ার মতো
বিদ্যুৎ আর বজ্র, শব্দ আর রেখা
মিশে যাবো
দিল্‌খোলা হাসির হাওয়ায়।
যত নদী আছে তার গান
যত শস্যের ভাষা
যত দিন আছে তার আলো

যত পাহাড়ের মুঠি
আনো আনো
দেহে মনে পূর্ণতার সে প্রদীপ জ্বালো।

সমুদ্র স্বাধীন নয়
প্রতিদিন বেদনায় ভেঙে
মৃত্যু তার অহরহ নজরেও পড়ে না সে গ্লানি।
সমুদ্র বলিষ্ঠ নয়
মড়কে, যুদ্ধের কালো ঝড়ে
অকস্মাৎ ছুরিতে দাঙ্গায়
দিশাহারা, বাস্তুহারা ভাঙে ঢেউ বালিয়াড়ি তটে।

আকাশ তুমি তো তাকে মুক্তি দেবে
সন্ধ্যায় সকালে
রঙ দেবে মুঠি মুঠি গানে গানে বেঁধে দেবে সেতু।
আকাশ তুমি তো তাকে প্রাণ দেবে
বীর্যমন্ত দেহ
আকাঙ্ক্ষার দুই বাহু দেবে তাকে তোমাকে সে পাবে।

আমাকে বরণ করে নিয়ে চলো
সেদিনের জন্মক্ষণে
সমুদ্র থেকে আকাশে।

প্রত্যাবর্তে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বর্শার ফলার মতো আকাশ সূচলো
নদীর রেখার মতো ধারালো তার দৃষ্টি
আর তার কথা অতিকায় ঘন্টার ধ্বনির মতো
রাত্রির নৈঃশব্দ্য গুঁড়িয়ে দেয়
ধ্বনির বিশাল স্পন্দন

ঘাসের ওপরে জমাট মূর্ছাহত শিশির
মুহূর্তের জটিলতায় দাঁড়িয়ে আবহমান কাল
অসংখ্য পাতার আড়ালে
অসংখ্য দিনরাত্রির অন্তরালে
পাহাড় ডিঙিয়ে মন্থর উপত্যকায়
নদী পেরিয়ে আচ্ছন্ন মাটিতে
বিশাল ধ্বনির মতো একটি স্পন্দন তার
অবিরত আছড়ায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে
অবিরত কথা কয় বাতাসে বাতাসে
অবিরত দৃষ্টি হয় চোখে চোখে
হৃদয় গুঁড়িয়ে শুধু
একটি কথা হয়ে যায়

একটি কথা হতে চায়
গভীর খাদ থেকে উজ্জীবনের উত্তরণ
দুঃস্বপ্নের অরণ্য থেকে স্বপ্নের বসতিতে
অসহায় সমুদ্র থেকে নির্ভয় তরী বেয়ে
নিদ্রার নৈঃশব্দ্যে নয়, স্মৃতির উন্মোচনে

আমার আকাশ বর্শার ফলার মতো সূচলো
আমার দৃষ্টি তাই ধারালো নদী
আর সেই অতিকায় ঘন্টার ধ্বনির মতো
আমার কথা দিনরাত্রি তছনছ করে দেয়
আমার বিশাল হৃদয় স্পন্দমান

প্রেসক্রিপশন

পূর্ণেন্দু পত্রী

ডাক্তার

উদোর পিণ্ডিকে বুধোর ঘাড়ে লাগিয়ে
দেশটাকে এবার তুলবোই জবরদস্ত চাগিয়ে।
শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি যা কিছু,
ছুটে আসবে পঞ্চবার্ষিকীর পিছু পিছু।
এই যে বঙ্গে আর বিহারে এত ঝগড়াঝাঁটি গলদ,
কিছু থাকবে না যখন এক হবো দুই বলদ।

রোগীরা

বলিহারি বদ্যি-বেটার চিকিচ্ছে,
কেউ জানে না দাওয়াই বলে কী দিচ্ছে।

ডাক্তার

যারা রাজনীতি-টীতি বোঝে না তারাই চেঁচায়,
সোজা কথাটাকে নিয়ে জিলিপির মতো পেঁচায়।
ভাবছো সংখ্যা-তত্ত্বে তারা পারবে মেজরিটি গড়তে!
কিন্তু বিদ্যে-বুদ্ধির দাপটে আমাদের সঙ্গে কে পারবে লড়তে।
আছে ঝাড়ফুঁক, আওড়াবো মন্ত্র,
চালু করবো এক সোশালিস্ট প্যাটার্নের গণতন্ত্র।
দুদিকে সেম সেম মানে সমান সমান সংখ্যা,
কালনেমি এমনি করেই গড়তে চেয়েছিল লঙ্কা।

রোগীরা

এ যে দেখি সত্যির-বোল সত্যি,
খাতায় লিখছে আমাদের সর্বনাশের পথ্যি।

ডাক্তার

যারা মজুর খেপায়, মোড়লি করে চাষার,
তারাই কেবল বুকনি ছাড়ছে ভাষার।
বাঙলাভাষা এমন মরণজয়ী, এত তার তেজ,
ঘাড়ে চাপলেই সে কামড়ে ধরবে হিন্দীর লেজ।
দেখ তোমাদের বরাতটা নেহাতই পয়লা নম্বর,
তাই পেয়েছো আমার মতো একজন নেতা, পার-পয়গম্বর।
দেশবাসীর যাতে সুখে স্বর্গবাস হয় সেইটেই আমার চেষ্টা,
নির্ঘাত ঘুচিয়ে দেবো সক্কলের ভবকালের তেষ্টা।
কটা বচ্ছোর খেয়ে দেখ আমার জোলাপ,
দেখবে তোমাদের চিতায় ফুটেছে ঘাস, ভিটেয় লাল-গোলাপ।
ভারতবর্ষে আমরণ শুনবে শান্তির গান, তাল ঝিঁঝিট,
আপাতত জানমান খুইয়ে আমাকে দাও কিছু রক্তের ভিজিট।

রোগীরা

মায়ের কাছে একি মাসীর গপ্পো রে,
হায় বিধি, কি ফেললে যমের খপ্পোরে।
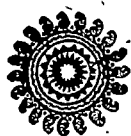
নীলকণ্ঠ

আনন্দ দে

ঘুম ভাঙতেই বিরক্তিতে আরতির মুখটা বিশ্রী হয়ে যায়। এতো উজ্জ্বল আলোর সকালটাও খুবই খারাপ লাগতে থাকে। প্রায়ই এই রকম হবে, রোজই বলা চলে। কান্না-কান্না-কান্না। কেবল কাঁদবে মেয়েটা, এতো কাঁদতেও পারে বিনা কারণে কিংবা সামান্যতম ছুতোয়। আদর খেয়ে খেয়ে কী বায়নাকুটেই হয়েছে! বছর পাঁচেক বয়েস হলো, তবু এতো কিরে কান্না বাপু! বিরক্তিতে বেজার হয়ে ওঠে আরতি। কষে ধমক দিতে যায় কিন্তু কাছে গিয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কেবল। পারে না ও কিছু বলতে কিংবা গায়ে হাত তুলতে। মায়া-মায়া লাগে। হাজার হলেও এটিই ওর ছোট বোন। ওই-ই তো আদর করে নাম রেখেছে মিষ্টি। মিষ্টি কাঁদলেই ও ছুটে এসে কোলে নিয়ে নানারকম করে ভোলাবার চেষ্টা করতো, বলতো, চুপ করো সোনা, তোমাকে লজেন্স এনে দেবো অফিস থেকে আসার সময়। কাঁদতে কাঁদতে শুনতো মিষ্টি কথাগুলো, তবু কাঁদতো, শেষে একবার কেঁদে উঠে হঠাৎ চুপ করে যেতো দিদির কথায়। হয়তো বিশ্বাস রাখতো দিদির ওপর।

অফিসফেরত আরতি কোনদিন লজেন্স, কোনদিন বিস্কুট আনতো মিষ্টির জন্যে। এখনও আনে। তবু যেন দিনকে দিন মেয়েটার কান্না বাড়ছে। আর সকালবেলাটায় ওর যতো কান্না, যতো রাজ্যের বায়না। ভোরের পাতলা ঘুমটা কোনও দিনই আরতির ধীরে-সুস্থে রয়ে-বসে আরামের সঙ্গে

ভাঙবে না, ভাঙবে আজকাল বাচ্চা মেয়েটার বিকৃত কণ্ঠের বিশ্রী কান্নায়। ইচ্ছে হয় আরতির ঠাসঠাস করে মেয়েটার তুগালে চড় কষিয়ে দেয়।

সমস্তটা দিন যেন ওর নষ্ট করে দেয় মেয়েটা এই সকাল বেলায়। মেজাজটা ওর তিতো-বিরক্ত হয়ে যায়। আট বছরের চাকরির মধ্যে পাঁচ বছরের সকালটার ইতিহাস মনে করে আজ ওর বেশি করেই যেন খারাপ হয়ে যায়। মাস-বছর হিসেবে বাচ্চা মেয়েটার কান্নার স্বর-স্থর-নিনাদ কী রকম করে চলে আসছে সেটা মনে হতেই আরও খারাপ লাগে।

কিন্তু মনের বিরক্তি মনেই চাপতে হয়। মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলোকেই যথাসম্ভব শিথিল করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে চায়ের সন্ধানে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়। বাবা নিশ্চয় বেরিয়েছেন তুচার আনার আনাজপাতি আর টুকরো কয়েক মাছ আনতে বাজারে। রান্নাঘরের ভার মা-র ওপর, আর তাঁর সাহায্যে পরের বোনটি, চিনু।

বাবা কি আজও বাজারে গেছেন?—প্রশ্ন করে আরতি। ছোট্ট একটি 'হুঁ' করে মা চায়ের বাটিটা এগিয়ে দেন।

কেন, রনটুটাকে পাঠালে চলতো না? আবার পড়বেন আর ভোগাবেন আমায়।

মা-র মুখের রেখায় পরিবর্তন নেই। চায়ের বাটিটা আরতির দিকে ঠেলে দিয়ে উনুনে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দেন, নটার মধ্যেই মেয়ের অফিসের ভাত দিতে হবে। স্থতরাং মেয়ের প্রশ্নের উত্তর এখন না দিলেও চলবে। আর উত্তরই বা কি দেবেন। বারণ করলেও কর্তা তো শুনবেন না, এদিকে মেয়ের কথা শুনতে হবে।

রনটুটাটা কোথায় গেলো?—আরতি চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করে।

এই তো ছিলো, কোথায় আবার বেরিয়েছে দেখো।

কোথায় বেরিয়েছে মানে? পড়তে শুনতে হবে না, না কি টো-টো করে ঘুরলেই চলবে?

তার আমি কী করবো, বলে গ্যাখ তুই।

সব কী আমায় দেখতে হবে না কি?—কথাগুলোর মধ্যে আরতির বিরক্ত মনের তীব্র ঝাঁঝ থেকে যায়।—কেউ না-হক বাজারে যাবে, কেউ

টো-টো করে ঘুরবে, কেউ সকাল থেকে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করবে, স-ব আমায় দেখতে হবে—আবার সেই সঙ্গে চাকরি করতে হবে।

কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায় না আরতি। উঠে আসে ওখান থেকে। নিজের ঘরে এসে গুম হয়ে বসে থাকে।

আরতির চাকরির ওপরে সংসারটা দাঁড়িয়ে। অভয়বাবুর পেন্সনের গুটিকয়েক টাকায় কোনরকমে ঘরভাড়াটা দেওয়া যায় উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে। সংসারের আর সবকিছুর জন্যে আরতির আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। অভয়বাবু যে বারে পেন্সন পেলেন আরতি সেইবার মফস্বল শহরের কলেজ থেকে বি. এ-টা পাশ করেছে কি করেনি। পোস্ট অফিসের কেরানী অভয়বাবুর সারা জীবনে জমেনি কিছু, যা জমেছিলো দুচার বিঘে ধানী জমি কিনেছিলেন তা দিয়ে; ভরসা ছিলো পেন্সন নিয়ে সেগুলো দেখা-শুনো করবেন আর ছেলেমেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখাবেন। তাই আরতির পাশের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রস্থ করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তার আগেই কলকাতায় পাড়ি দিতে হলো। দাঙ্গায় কোনরকমে টিঁকে গেলেও নতুনতর উৎপীড়নের আশঙ্কায় দেশ ছেড়ে সকলে চলে আসতে নির্বান্ধব পুরীতে সমর্থ মেয়ে নিয়ে থাকাটা তিনি ঠিক বোধ করলেন না। কলকাতায় এসে আত্মীয়ের আত্মীয়, পাড়া সম্পর্কে গ্রাম সম্পর্কে পাতানো আত্মীয়ের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে এখন এই দমদমের বাসায় এসে উঠেছেন সপরিবারে। উঠে এসে বিপদ বাড়লো, পেন্সনের টাকাও আসে না, আসলেও নিয়মিত না, আর হাতের পুঁজিপাটাও শেষ। শেষে নিশ্বাস ফেললেন অভয়বাবু যখন একটা সরকারী অফিসেই আরতির চাকরি জুটে গেলো।

সেই থেকে সমস্তটা সংসার অবলীলাক্রমে আরতির কাঁধে এসে পড়লো। প্রথম-প্রথম খুশি হয়ে উঠেছিলো আরতি। খুবই। অভয়বাবুও বলতেন, আরু আমার ছেলের চেয়েও বেশি। ভাবিনি কোনদিন ওর ওপরে আমার এতোটা নির্ভর করতে হবে।

নির্ভর করবে বলে সারা জীবনই নির্ভর করবে তোমরা?—আরতির মনে ক্ষোভের প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে যায়। একঘেয়ে ক্লান্তিকর চাকরির জোয়ালে আটকে থাকতে হবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কতো মাস কতো বছর। মাকড়সার জালে আটকে-পড়া মাছির মতো ছটফট করতে হবে শুধু।

ভাবতে ভাবতে ওর মাথা ঘুরে যায়; দম বন্ধ হয়ে আসে। উঠে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ায় আরতি। ঘুম-ঘুম ফোলা-ফোলা চোখের কোলে বয়েসের কালি পড়েছে যেন। সেই টিকালো চিবুকের ধার আর নেই, নেই চোখের সেই শানিত দীপ্তি যা আয়নায় দেখে দেখে আরতির নিজেরই আশ মিটতো না ; এলো খোপার নিচে হাত দিয়ে আরতি কতোদিন অবাক হয়ে গেছে এতোই সুন্দর তার ঘাড়, গলা। মরালগ্রীবা—কথাটা আরতি মনে মনে আওড়াতো আর হাত বুলিয়ে দেখতো। সত্যিই সুন্দর ছিল সে। এই সেদিনও—কতো দিন হবে? পাঁচ বছর, হাঁ পাঁচ বছর আগেও, যখন সে অফিসে নতুন নতুন তখনও অফিসের ছেলেবুড়ো তার দিকে চুরি করে করে তাকাতো। কালো, তবু সে সুন্দর। একথা ভেবেই বর্ণের অকৌলীনত্ব সম্বন্ধে তার কোন অভিমান নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের আঁচলটা ফেলে দেয় আরতি—ব্লাউজটা যেন তেমন করে আর উদ্ধত হয়ে ওঠে না।

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনে আরতি সরে যায় আয়নার কাছ থেকে জানলার ধারে। আকাশটা কতো দূরে সরে গেছে মনে হয় ওর। অনেক দূরে। সেই কলেজে পড়ার সময়ে মনে হতো ছাদে উঠলেই যেন ঐ আকাশটার নাগাল পাওয়া যাবে, হাত দিয়ে ধরতে পারবে নীল-নীল আকাশটাকে। আজকের মতো এতো নীল ছিল না সেদিনের আকাশ, সেদিনের দিন।

দিদি, অ্যাই দিদি, অফিসে যাবিনে?

চিনুর কথাগুলো আরতির কানে ঢোকে, কিন্তু মগজে যায় না যেন। শুনতে পেয়েও উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না তার। কেবল ঘুরে চিনুর দিকে তাকায়।

যাবি নে?

আরতি মাথা নাড়ে। তাতে হাঁ কি না বুঝে উঠতে পারে না চিনু। তাই আবার জিজ্ঞেস করে, যাবি নে, অ্যাঁ?

যাবো, যাবো। বাবারে বাবা, অফিসে গেলেই যেন তোমরা সব বাঁচো। —আরতি বিরক্তিতে একেবারে ফেটে পড়ে। —যাবো না যাও, যাবো না, কোনদিনই যাবো না।

চিনু থতোমতো খেয়ে যায়। দিদির মেজাজটা যে কিছুদিন, কিছুকাল ভালো নেই সেটা সে জানে, কিন্তু হঠাৎ এমনি করে তাকে ধমক দেবে সেটা বুঝতেই পারে নি।

বেলা হয়ে যাচ্ছে তাইতে তো বলতে এলাম। —বড়ো করুণ শোনায় চিনুর কথাগুলো। চিনুর ওপর এমন করে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে আরতির কেমন দুঃখ হয়। ও অফিসে গেলে সত্যিই সকলে বাঁচে। মাস-শেষের টাকাগুলো না এলে যে কেউ বাঁচবে না এতো সবাই জানে। তাই অফিসের খাওয়ার সময় না খেয়ে কিংবা আধ-পেটা খেয়ে আরতি যাতে অফিসে না যায় তারই জন্য চিনু তাড়া দিতে এসেছিল। আরতি সে-কথা বোঝে।

আরতি দরজার বাইরে আসতে না আসতে খুন্তি হাতে মা ছুটে এলেন রান্নাঘর থেকে।

কী হলো রে ?

কথা না বলে বেরিয়ে গেল আরতি। ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকে চিনু।

হয়েছে কি ? কী বলছিস তুই ?

তবু চিনু চুপচাপ।

আবার তুমি সেই শাড়ির বায়না ধরেছিলে ? পাজী মেয়ে কোথাকার !

সমস্তটা কথা শুনতে পায় আরতি বাথরুম থেকে। চিনুর চোখ দুটো জলে চকচক করছে, এ যেন সেখান থেকেই দেখতে পায়। তারই জন্য মা চিনুকে না-হক কতগুলো গালাগাল করলেন। বিরক্ত মন ব্যথায় বিস্বাদ ঠেকে। ঘটিঘটি জল ঢেলেও তেমন করে স্নানটা তার হয় না। মাথাটা যেন গরম হয়ে ওঠে। নিজের উপরে ওর রাগ চড়ে যায়। বাস্তবিক গত মাসেও সে শাড়ি কিনে দিতে পারেনি চিনুকে, এ মাসেও সম্ভব হলো না। এবং সেটা টানাটানিতে যতোটা তার চেয়ে বেশি বোধ হয় আরতির গাফিলতিতে। সেদিন রেস্তোরাঁয় সমীরেশের সঙ্গে না গেলেই হতো। দোষ অবশ্য সমীরেশের ছিলো না, সে-ই-ই দিতে চেয়েছিলো রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে, কিন্তু আরতি বাধা দিলো—রোজ রোজ তুমি কেন দেবে ? আজ আমার দেওয়ার পালা।

মানিব্যাগশুদ্ধ হাতটা চেপে ধরেছিল আরতি। যদিও তখনই তার মনে হয়েছিলো, এই চার টাকার সঙ্গে আর গোটা দুই টাকা যোগ করলে চিনুর জন্যে শাড়িটা হয়ে যাবে। তবু সে চার টাকা ফেলে দিলো। কেন রোজ রোজ সমীরেশ দেবে। এই আট বছর নিজের জন্যে ক টাকা খরচ করেছে আরতি। কখানা শাড়ি তার, ব্লাউজই বা কটা। কটা সিনেমা দেখেছে। কবার বোটানিকসে গেছে কিংবা কদিন অফিস কামাই করেছে। সুতরাং চারটে টাকা আর খুচরো দুআনা গুনে গুনে দিল আর অভিজাত রেস্তোরাঁর সম্মান রাখার জন্যে চার আনা বখশিশ বেয়ারাকে।

হাতটা সরাবার চেষ্টা না করে সমীরেশ প্রশ্ন করেছিল, আর কদ্দিন এমনি তোমার পালা আমার পালা চলতে থাকবে।

সদ্য-কলেজে-ঢোকা মেয়ের মতো হেসে বলেছিল আরতি, এই কটা দিন!

কটা দিনের সংখ্যা যে কতো আরতি জানে না, সমীরেশও না। কটা দিন করে করে তো বেশ কটা বছর কেটে গেলো।

শাড়ির পাড়টা বুকের ওপর টেনে দিয়ে ঘুরে আয়নায় নিজের চেহারাটাকে আড়চোখে আজানু দেখে নিয়ে আরতি রান্নাঘরে ঢোকে। সমীরেশের কথা মনে হলেই ওর মনটা শরতের মেঘের মতো হালকা হয়ে যায়। আজ কিন্তু ভারটা কেটে গেলো না। স্নান করা থেকে সাজগোজ করা সবই অভ্যস্ত নিখুত নিয়মে চললেও থমথমে মুখ নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। মনের ভারটা খানিকটা হালকা হলেও মুখের রেখাগুলোকে যথেষ্টরকম বিরক্তিমাখা করে রাখতে হয়। না হলে চিনুর কাছে যেন কেমন লাগে, ওরই জন্যে তো অনর্থক বকুনি খেলো চিনু।

খেলি নে দিদি? আরতি দু-চার গ্রাস মুখে দিয়ে উঠে পড়ার উদ্যোগ করতে চিনু উদ্বেগ নিয়ে বলে। যেন আরতি না খেলে চিনুর খিদে পাবে, মাও দুষবে।—খেলি নে?

নাঃ, ভালো লাগছে না।—থালাটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে ঢকঢক করে খানিকটে জল খায়। তারপরে আবার আয়নার সামনে গিয়ে শেষবারের মতো পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে নেয়, একটু এদিক-ওদিক টেনে দেয়, তারপর 'আসি' বলে অ্যাটাচিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 'আসি'-টা কার উদ্দেশ্যে

বলে ঠিক বোঝা যায় না, মাকেও হতে পারে, চিনুকেও হতে পারে এবং কাউকে না-ও হতে পারে। এমনি-এমনি। অভ্যাস। কিন্তু বিনা বাধায় চৌকাঠ পর্যন্তও আরতি পেরোতে পারেনি।

দি-দি, লজেন্, বিস্কুট—। দরজাটার আড়ালে মুখ ঢেকে মিষ্টি স্বর করে বলে ওঠে।

আরতি এক মুহূর্ত থামলো, তারপরে মিষ্টির চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বললো, আচ্ছা, মনে আছে।

মনে আছে আরতির আজ সমীরেশের সঙ্গে দেখা হবে।

সমস্তদিন ফাইলপত্তরে মনটা আটকে রেখে কাটিয়ে দিল আরতি। একাজ-সেকাজে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে উঠলো। পরিপাটি করে প্রতিটি ফাইল ঘাঁটলো, দেখলো। গলদ নেই কোথাও, গাফিলতি না, বে-দরদ নেই—এতোটুকু।

জিগ্যেস করেছিলে বাবাকে?—সমীরেশ অধীর আগ্রহে আরতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাঁ।—আরতির উত্তর যতোটা ছোট, ব্যঞ্জনাটা তার চেয়ে অনেক বড়ো।

কী বললেন?

বললেন অনেক কিছু।—আরতির গলায় তেমনি নিস্পৃহতার রেশমী বুনোন।

কী তবু?

বললেন, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে—বাক্যটাকে অসমাপ্ত রেখে আরতি চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

আর?—সমীরেশ অধীর হয়ে ওঠে, এতোও থেমে থেমে কেটে-কেটে কথা বলতে পারে!

আর বললেন,—নাঃ থাকগে।

বলোই না?

বললেন,—একটু থেমে আরতি স্পষ্ট করে বলে,—[illegible] আছে গোটা দশেক টাকা হবে, পয়লায় ফেরত দেবো?

আ হাঃ, তা নয় হলো, কিন্তু কী তিনি বললেন সেটা বলে ফেলো না? এমন রেখে-ঢেকে চেপে-চেপে তোমরা কথা বলো!

সমীরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আরতি একটু হাসে, বলে, বলছি তো! বললেন—

কেকের কোণা ভাঙতে ভাঙতে শান্ত গলায় বলে যে বাবার মতে পাত্র হিসেবে সমীরেশ খুব কাম্য নয়।

আরতি সমীরেশের মুখের দিকে তাকাতে পারে না, সমীরেশও না।

ট্রামে উঠে আরতি ভাবে, বাবাও বুঝি এই কথাই বলতেন।

মধুসূদনের কাব্য-পাঠের ভূমিকা

ক্ষেত্র গুপ্ত

এক

মেঘনাদবধকাব্যের সমাজবাস্তবতার ব্যাখ্যায় অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় য়ুরোপীয় রেনেসাঁর একটি কেন্দ্রীয় প্রতীক খুঁজেছেন। "ইউরোপীয় রেনেসাঁ নিছক মতামতের ব্যাপার নহে, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহা আনিয়াছিল এক যুগান্তকারী উন্মাদনা।...এই উন্মাদনার প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে সিসটন চ্যাপেলে অঙ্কিত মিকায়েল অ্যাঞ্জেলোর বিরাট চিত্রকে—'আদমের নবজন্ম'। গ্রীক-যুগের পর মানবদেহকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইতেছে নবতর জ্যোতিতে; সে-দেহ অনাবৃত ও অলজ্জিত; তাহার সবল বাহু উপবাস-অক্লিষ্ট, জীবনের ও আলোকের দিকে প্রচণ্ড আগ্রহে প্রসারিত।"

মধুসূদনের কাব্য-সৃষ্টি, প্রাণের প্রেরণা ও সমাজ-মননের মহাকবি-সুলভ দুর্লভ নির্ভুলতার মধ্যেও এমনি একটি প্রতীক খোঁজা হয়তো যান্ত্রিক বলে সর্বথা পরিত্যাজ্য হবে না। বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতির এই নূতন আদমের চরণে কিন্তু কঠিন নিগড়— আর সেই শৃঙ্খল-ঝঙ্কার জীবনের ও আলোকের প্রচণ্ড কামনার মধ্যেও ধ্বনিত,—সমগ্র কবিসত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার অনুপ্রবেশ, কবি-সৃষ্টির অণুতে অণুতে তার সঞ্চরণ, জাতীয় জীবন-চর্যার কেন্দ্রীয় সত্য-রাজ্যে তার ভূগর্ভস্থ মূলজালের বিপুল বিস্তার।

সেতু-বদ্ধ সমুদ্রের প্রতি রাবণের গ্লানি-জড়িত ধিক্কারে আর উদাত্ত আহ্বানে—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন গুণে কহ দেব শুনি,
কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম-পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি।
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা;
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র তব পদে এ মম মিনতি।

বিদ্ধ হয়েছে বাঙলার সমগ্র সমাজ-ইতিহাসের নির্যাস, আপন ব্যক্তিসত্তা তথা কবি-প্রাণের বিপুলতর সম্ভাবনার কিন্তু স্বল্পতর সাফল্যের এবং পর্বতকল্প ব্যর্থতার,—উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের নানা খণ্ডিত চেষ্টার অব্যাখ্যাত দ্বন্দ্ব-দ্বিধা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ প্রাণের লীলার সম্যক প্রতিনিধিত্ব।

মধুসূদনের কবি-প্রাণের বুভুক্ষু গরুড়মূর্তি যখনই কল্পনা করবার চেষ্টা করেছি, রাবণের আকণ্ঠ-অশ্রু-নিমজ্জিত বিপুল পর্বতদেহে আর বীতংস-বদ্ধ কেশরী-প্রাণ রত্নাকরে তার তুলনা পেয়েছি। কবি মধুসূদন, কাব্যোদ্ধৃত

নায়ক রাবণ আর সেতুবন্ধ মহাসাগর এক হয়ে গেছে সে-কল্পনায়। উপল-মুখর, শৃঙ্খল-ব্যথিত সমুদ্র-স্তননের কোদণ্ড-ঘর্ঘর রাবণের ক্রন্দনে শুনেছি, অনুভব করেছি রাবণের স্রষ্টার মর্মযাতনায়,—মেঘনাদের মৃত্যু যাঁকে অনেক কান্না কাঁদিয়েছে (cost me many a tear)। সমগ্র কাব্য-বিস্তারে অমিত্র-ছন্দের কম্পমান প্রবাহে তো সেই মহাসাগরেরই আহ্বান। কিন্তু তবু তো বীরবলে সে জাঙ্গাল ভেঙে অপবাদ দূর করা গেল না,—'রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা'—এ কবি-কণ্ঠ সমুদ্রবেলায় বৃথাই আছড়ে মরল।

দুই

উনিশ শতকের বাঙলায় ও বাঙলা-সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়—অবশ্য ছোটগল্পের 'মোমেণ্টের' মতোই এ এক অনিবার্য বিস্ময়। কিন্তু অধিকতর বিস্ময় আজও মধুসূদনের কাব্য-ব্যাখ্যায় মহাকাব্য আর বীররসের সার্থকতা খোঁজার কালেজী চেষ্টায়। মোহিতলালের গ্রন্থটিও তার উপরে যবনিকা টানতে পারল না। প্রমাণ-প্রয়োগ সে-ক্ষেত্রে অবারিত এমন কি কখনও বা তীক্ষ্ণ—কিন্তু বহুল পরিমাণে অপচিতও। তবুও কবি-প্রাণকেআর তথ্যোত্তীর্ণ সমাজ-সত্যকে সমালোচনার ভিত্তিভূমিতে গ্রহণ করবার ব্যাকুলতা মুষ্টিমেয় হলেও কিছু প্রাবন্ধিকের রচনায় মুখর।

গৌড়জনকে নিরবধি সুধাপান করাবার বাসনায় বীররসে ভেসে মহাগীত রচনা করবার কবি-কৃত প্রতিশ্রুতি কেমন করে 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'র অকালমৃত্যুতে আরম্ভ হয়ে, মেঘনাদ-প্রমীলাকে অগ্নিময় বেদনার কুণ্ডে নিক্ষেপ করে, 'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে' সমাপ্তি পেল, তার ব্যাখ্যা রসতত্ত্বের আলোচনায় কোথায় মিলবে? বীররস-করুণরসের পারস্পরিক অনুপাত ও সম্বন্ধ-নির্ণয়ের মধ্যে এ-সমস্যার সমাধান নেই;—এর উত্তর-সন্ধানে কবি-প্রাণের দিকে চোখ ফেরাতে হবে,—রসবাদের বাধা এড়িয়ে জীবন-বোধকে করতে হবে অঙ্গীকার; আর তাকাতে হবে কবি-মনের পশ্চাৎভূমি—জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন-বন্ধুর প্রবহমানতার দিকে।

মধুসূদনের কাব্যটি মহাকাব্য হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে বিচারকের উচ্চ মঞ্চ থেকে রায় দেবার কি সার্থকতা, জানি না। মহাকাব্যের একটি প্রচলিত কিংবা কল্পিত সংজ্ঞার মাপকাঠিতে বিচার এবং শাস্তি কিংবা মুক্তি দেবার

প্রথার মধ্যে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের দীর্ঘ একশত বৎসর ধরে ঘুরপাক খেয়ে তলিয়ে যাওয়া, আর যাইহোক নিশ্চিন্ত থাকার কথা নয়—আনন্দের কিংবা গৌরবের তো নয়ই। মধুস্থদনের এই স্বষ্টিটি যদি প্রাণোজ্জ্বল হয়ে থাকে, যদি বাঙালী তার জীবন-সঙ্গীতের ঝঙ্কার এর ছন্দ-স্পন্দে অনুভব করে,—'মহাকাব্য' সংজ্ঞা-নিরপেক্ষভাবেই এটি বাঙালীর চিত্তের মুক্তির এবং মুক্ত-চিত্তের কাব্য হিসেবে নিঃসন্দেহে অবিচলিত। পুথির পাতা থেকে গ্রহণ করা মহাকাব্যের গজকাঠিটি পুথির পাতায় লুকিয়ে রেখে কবির দিকে তাকাবার ডাক আসবে তখন—অস্বীকার করা যাবে না তাকে, আর স্বীকৃতির এই নূতন পথ বেয়ে কবি-প্রাণের শিকড়ে শিকড়ে এই জীবন-রসের বার্তা পাওয়া যাবে, অন্তত উনিশ শতকের বাঙলাদেশের রসে যে এই শিকড় পুষ্ট আর তারই রঙে যে এ-পত্র উজ্জ্বল সে-প্রমাণ মিলতে দেরি হবে না।

অবশ্য শতকে শতকে সমাজ-জীবনের মুখ চেয়ে সাহিত্য রচিত হবার প্রশ্নে আপত্তি অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু ঐতিহাসিক উদাহরণকে তাঁরা অস্বীকার করবেন কোন যুক্তির বলে? মধুস্থদন এমনি এক অনস্বীকার্য ইতিহাস। তাই বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তাঁর স্থানটিকে সঙ্কীর্ণ করবার একটা ছেলে-মানুষী চেষ্টাও সম্প্রতি কোন কোন সমালোচনার বইয়েতে দেখা গেছে। অবশ্য ইতিহাসের এ-প্রশ্নের তাঁরা কি জবাব দেবেন, জানি না—উনিশ শতকের কবিদের কাব্য-উপন্যাসে যে মানবতা-বোধ, যে সত্য-প্রীতি, ব্যক্তি-মানুষের মুক্ত-প্রাণ অঙ্কনের ব্যাপক চেষ্টা, যে জাতীয়তাবোধ এবং ঐশ্বর্যবাদ সুস্পষ্ট, তা কি একান্তই আকস্মিক? আর আঠেরো শতকের কাব্য-কবিতায় ধর্মভীরুতার শতচ্ছিন্ন আবরণের মধ্য থেকে বিধ্বস্ত বিকৃত জীবন-কামনার যে অস্পষ্ট প্রকাশ, উপমা-অনুপ্রাস আর ছন্দনির্মাণের সাহায্যে কল্পনার দৈন্যকে ঢাকবার যে সার্বজনীন চেষ্টা, আর অশ্লীলতার পঙ্কজলে নিমজ্জন,—সেও কি আকস্মিক? ধর্মভীরু রামপ্রসাদের কালীকীর্তনের পাশেও কেন স্বষ্ট হয় বিদ্যাসুন্দরের উদ্দাম কামলীলার মিথুন-মূর্তি? ইতিহাসকে যাঁরা মেনেছেন, সব আকস্মিকের আশা না ছেড়ে তাঁদের উপায় নেই,—যে আকস্মিকতা এ-রাজ্যে আবির্ভূত সেও যে অনিবার্যতার পথ বেয়ে এ-সংবাদ তাঁদের অজানা নয়। ইতিহাস কারও ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির ব্যাপার নয় বলেই মধুস্থদনের পদস্থাপনা উনিশ শতকেরই বাঙলার বুকে আর বিশ্বের আকাশে তাঁর

বাহু-প্রসারণ। ক্ষুদ্র তৃণ কেবল মাটির, আর বটবৃক্ষের বিপুল বিস্তার আকাশেরও।

তিন

চিত্তের মুক্তিতে আর জীবনের বন্ধনে ;—কল্পনার, অনুভূতির, জ্ঞানের, চিন্তার বিপুল পক্ষবিস্তারে আর বস্তু-সম্পদের, প্রাণের উপকরণের দুর্লঙ্ঘ্য দৈন্যে দ্বিধা-বিদীর্ণ উনিশ শতকের বাঙলা। বণিকতন্ত্রের পণ্যের জাহাজে নব-জাগৃতি এসেছে এই দেশে—তাই তার ব্যাপকতা কলকাতার মননেই সীমিত হয়ে রইল, গ্রাম-বাঙলার বিস্তৃত জনপদে ধ্বংসের এক অভিশাপেই তার সমাপ্তি। অর্থনীতির পুরোনো প্রথা ভাঙল, নূতনের জন্ম হল না—ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে নবজাতকের জন্মলগ্ন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল। অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনায় উনিশ শতকের গ্রাম-বাঙলা কাঁপছে—থরোথরো বাঙলার কিষাণ রক্তমেঘের প্রত্যাশায়, সাঁওতালের শানিত তীরে নূতন যুগের অভ্রান্ত ইশারা, নীলকুঠিতে বন্দী তোরাপের ক্রোধের লাভা বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়। ইতিহাসের নজিরে—

"১৭৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে কতগুলি যে কৃষকবিদ্রোহ হয়ে গেছে তার সংখ্যা গণনা করা একেবারে অসম্ভব। শুধুমাত্র বৃহৎ বৃহৎ কৃষকবিদ্রোহগুলির সংবাদ কিছুটা আমরা জানি। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা। এই বিদ্রোহ ১৭৬০-১৭৭৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বৎসর ধরে চলেছিল। এই বিদ্রোহ কুচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বাঙলার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ যখন চলছিল ঠিক তখনই বাঙলার আর এক প্রান্ত বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৭৭২-১৭৮৫)। তারপরে ১৮৩১ সালে পূর্ববঙ্গে ফরাজী আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৪৭ সালে ফরিদপুরে এই আন্দোলন বিস্তারলাভ করে। ১৮৫৫-৫৭ সালে বর্তমান বাঙলা, বিহার ও সাঁওতাল পরগনার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ করে। ১৮৫৭ সালে এই সমস্ত বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে।

"সিপাহী বিদ্রোহের রক্তকাণ্ডের পরে কৃষক-বিদ্রোহের ধারাটি স্তব্ধ হয়

নাই, বরং পরবর্তী সময়ে (১৮৫৭-১৮৮০) কৃষক-বিদ্রোহের তীব্রতর প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। নীল কৃষকদের আন্দোলন ও ফরাজী আন্দোলন বাঙলার কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ১৮৬০-১৮৭০ সালের মধ্যে। এই সময় পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহ বহুদিন ধরে চলেছিল। ১৮৭৩ সালে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে পাবনায় কৃষক-বিদ্রোহ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলে। বস্তুত এই সময়ে বাঙলার এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে কৃষক-বিদ্রোহ ছড়ায় নাই।" [নরহরি কবিরাজ ঃ পরিচয় পত্রিকা]

কিন্তু কে তাদের হাত ধরে ভগ্নচূড় চণ্ডীর মন্দির থেকে যন্ত্রদেবতার বেদীতলে নূতন প্রাণের উদ্বোধনে দাঁড় করাবে? কোথায় য়ুরোপীয় শক্তিমত্ত প্রাণচঞ্চল বিজ্ঞানায়ুধ বুর্জোয়ার দল? হায়, উপনিবেশের বিকলাঙ্গ বুর্জোয়া-শিশুর সমস্ত শক্তি ধনিকতন্ত্রের গুণকীর্তনেই অপচিত। 'স্বাধীনতা'র কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কাব্য শেষ হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের বিকৃত নিন্দায়; ব্রিটিশ যুবরাজের কলকাতা আগমনে হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা' স্তুতিবাচনে আকণ্ঠ গ্লানি-জর্জর—

যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়,
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই ব্রিটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি,
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

অথবা,

আমি বৎস তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

কি কব কুমার হৃদি-বক্ষ ফাটে
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে !
ব্রিটিশ-সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিংবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পুজিব সবারে।

অথবা ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে—

ভাব ওহে বঙ্গবাসী ভাব একবার
কি কাল-রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার,　　ব্রিটনের হুহুঙ্কার,
ব্রিটিশ কেশরীনাদ শুন একবার,
ঘুমাও না বঙ্গবাসী,　　ঘুমাও না আর,
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।

এবং 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীর ভবিষ্য-বাণীতে ব্রিটিশ-শাসনের অনিবার্যতার উজ্জ্বল নির্দেশে, নীলচাষীদের সর্বাত্মক ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্রতি কারও কারও সমর্থন-জ্ঞাপনে, সিপাহী-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ধিক্কার-বর্ষণে বাঙলার বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয়। কিন্তু, "এই বিদ্রোহগুলির (কৃষক) পাশাপাশি একটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। এই আন্দোলন ছিল শহুরে বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের প্রবক্তা বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এঁরাই ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। এঁরা পাশ্চাত্ত্য পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির প্রচারে মনোনিবেশ করেন। পাশ্চাত্ত্যের প্রগতিশীল ভাবধারার এঁরা ছিলেন প্রচারক। বিদেশী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দেশীয় পুঁজিবাদের এঁরা ছিলেন উদ্গাতা। এঁদের প্রচারিত নূতন সংস্কৃতি পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির তুলনায় ছিল

প্রগতিশীল। কিন্তু এই বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি কোনদিন উচ্চারণ করে নাই।"……[ঐ]

জাতীয় ইতিহাসের দ্বিধা-দীর্ণ এই ট্রাজেডি,—নেতৃত্বহীন কৃষক-বিদ্রোহের অসফল পরিণতিতে আর ভিত্তিহীন বুর্জোয়া চিন্তার আকাশ-চুম্বী প্রসারে। রঙ্গলালের কাব্যে মেবারী বীরদের কণ্ঠে তাই উনিশ শতকের বাঙালীর মুক্তির কামনা—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত তাই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-যুবক মাধবাচার্যের নামাবলীতে আবরিত, ব্যঙ্গের বক্রোক্তিতে ব্রিটিশ শাসনের মূল উদ্দেশ্য তাই ভিক্টোরিয়া-বন্দনার কণ্ঠ ভেদ করেও ক্ষণিক দীপ্তিতে প্রকাশিত—

চিরশিক্ষা ব্রিটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাব—টুট টুট টুট॥
স্পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি,
'মিলক্ কাউ' ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি॥

কিন্তু কণ্ঠের সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে যে স্বাধীনতার কথা কাব্য-বন্ধে, গদ্য-নিবন্ধে, সংবাদিকতায় আর শিক্ষাবিস্তারে ধ্বনিত হয়েছে, রূপ পেয়েছে সমাজ-সংস্কারের বিবিধ চেষ্টায় তা হল চিত্তের স্বাধীনতা, প্রাণের মুক্তি—ব্যক্তিত্বের নবজাগরণ। কিন্তু বস্তুভিত্তির বন্ধন তো উন্মোচিত হল না—কৃষক-বিদ্রোহের সঙ্গে বিপুল দুরত্বের নিগড় চিত্তের স্বাধীনতার কামনাকে করল শৃঙ্খলিত। উনিশ শতকের বাঙলার কবিকণ্ঠের সঙ্গীত তাই খাঁচার পাখির তীব্র আর্তনাদ—

মোর শকতি নাহি উড়িবার!

সৃষ্টি-মূলক নানা রচনায় এ শতাব্দীর প্রাণের দ্বন্দ্বের খণ্ডিত প্রকাশ। মুক্ত প্রেমের বন্দনায় মুখর বঙ্কিমের লেখনও হিন্দুয়ানির দেয়ালে দেয়ালে প্রতিঘাতে ক্লান্ত, ব্যক্তিসত্তার কাব্যপ্রকাশে মুক্তকণ্ঠ বিহারীলাল জীবন-বিরোধী ধর্মীয় রহস্যলোকে অস্পষ্ট, হেমচন্দ্রের কবি-প্রাণ দেবতা ও দানবের যুদ্ধে—সংস্কার ও প্রাণের দ্বন্দ্বে নিঃশেষিত। কিন্তু যুগ-চেতনার কেশর চেপে

সিংহকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তার যাতনা-জর্জর বজ্র-কণ্ঠকে যদি কেউ প্রকাশ করে থাকেন অখণ্ড প্রাণময়তায়, তিনি মধুসূদন। মধুসূদনে উনিশ শতকের বাঙালী-জীবন ও বাঙলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব। প্রেমের মুক্তি-ঘোষণায় তিনি দ্বিধাহীন, পাপপুণ্যবোধ-অতিক্রমী তাঁর ব্যক্তি-মানুষের সমর্থন, ধর্মের রহস্যের স্থানে জীবন-রহস্যের উদ্বোধনে তিনি অবিচলিত এবং ঐহিক ঐশ্বর্য-বোধে তাঁর কাব্য স্বর্ণোজ্জ্বল। কিন্তু সেতুবন্ধ সমুদ্রের সেই বেদনাহত কণ্ঠ—মধুকবির চরণ-যুগলের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল—ব্যক্তি-মানুষের পরাজয়ে, প্রেমের অকাল-মৃত্যুতে, নিয়তিবাদের অজানিত ব্যঞ্জনায় সঞ্চারিত।

চার

মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বে উনিশ শতকের সুগভীর অস্থিরতা। আকাশকে ছিঁড়ে দুহাতের মুঠো ভরবার প্রত্যাশা মাটির ধুলোর সংঘাতে এখানে চূর্ণ। মহাকাব্য রচনার বাসনা কোন অদৃশ্য-সূত্রে সহস্র-মুদ্রা উপার্জনের প্রয়োজনের সঙ্গেযুক্ত। স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণদ্যুতিতে কি তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছায়া পড়েনি? "নতুন যন্ত্রযুগের সব আবিষ্কারকে ম্লান করে দিয়েছে মুদ্রা। মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতিই নবযুগের সমাজের বনিয়াদ। যা কিছু হচ্ছে, যত উদ্যম, যত প্রেরণা গবেষণা আবিষ্কার সবই এই মুদ্রার মোহে।......টাকা ধনতান্ত্রিক যুগের ধর্ম, টাকাই স্বর্গ! সবার উপরে টাকাই সত্য। টাকা শুধু গতিশীল নয়, টাকা সৃষ্টিশীল। ...যন্ত্রযুগে বংশগৌরব কুলমর্যাদা কিছু নেই। বংশানুক্রমিক পেশাগত শ্রেণী-ভেদও টাকা ভেঙে দিয়েছে। তার বদলে টাকা নিজের কৌলীন্য সগৌরবে হাজির করেছে। টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম তো নিশ্চয়ই, তুক্‌তাক, ঝাড়ফুক স্তোত্রমন্ত্র সবই 'টাকা টাকা টাকা।' তাছাড়া টাকাই গোত্র টাকাই বংশ টাকাই শ্রেণী। নতুন যে শ্রেণী-বিন্যাস হল সমাজে সে হল টাকার বিন্যাস। সবার চাইতে বড় কুলীন টাকা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ টাকা।"

[বিনয় ঘোষ : বাঙলার নবজাগৃতি]

স্বভাবতই মধুসূদনের এ চরিত্র-প্রবণতাকে অর্থ-গৃধ্নুতা বলে উড়িয়ে দেওয়াটা কিছু নয়। নবযুগের এক মৌল সত্যরূপেই এ প্রতিভাত। মধ্য যুগের সন্ন্যাস-ধর্মের বহুখ্যাত নিরলঙ্কার জীবন তাই অত স্পষ্ট ভাষায় মধুসূদনের কাব্যে একাধিকবার ধিক্কৃত :—

বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি রত্নরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চিরপরিধান সম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু কাঁদি বন-দেবীপদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুন্তল-মুকুতাহার, কাঞ্চি কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে স্মরি মৃগমদে !

[সোমের প্রতি তারা]

আপন আশ্রম-জীবনের প্রতি শকুন্তলার ইঙ্গিতে ঃ

চির-অভাগিনী আমি ! জনকজননী,
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !

[দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা]

'ভিখারী রাঘব রামের' প্রতি ঘৃণায় কি এর কোন ব্যঞ্জনা নেই ? স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য বর্ণনায় মধুসূদনের যে উল্লাস তারও উৎস কি এখানে নয় ?—

নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি,
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূট শৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর ! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্রমিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?

[ষষ্ঠ সর্গ]

মধুসূদনের এই কবি-প্রকৃতির নাম দেওয়া যেতে পারে ঐশ্বর্যবাদ। কিন্তু মধুসূদন তাঁর কাব্য-কল্পনাকে জীবন-বেদনার সঙ্গে সমন্বিত করতে চেয়েছেন। শুধু বর্ণনায় নয়, বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে ঐশ্বর্যদীপ্ত প্রাচুর্যকে চেয়েছেন। স্বর্ণলঙ্কার মেঘনাদ হবার স্বপ্ন কবির দু চোখের ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত—সম্পূর্ণ নিখুঁত অপাপবিদ্ধ। কিন্তু কামনার ধনকে কবে মানুষ জীবনে পেয়েছে, কল্পনা কবে বস্তুমূর্তি পরিগ্রহ করেছে, "স্বশরীরে কোন নর গেছে মোক্ষধামে।" —এ বেদনা তো কবি-প্রাণে চিরন্তনী। মধুকবির চিত্তে এই চিরন্তন আর্তি সাময়িক বস্তুবিন্যাসে বিদ্ধ—আপন কাব্য-কল্পনায় শুধু নয়, জীবনধারণের প্রাত্যহিকতায় সুতীক্ষ্ণ শরাঘাত। উপনিবেশ-বুর্জোয়ার বস্তুভিত্তির দৈন্য আর কামনার মুক্তপক্ষগতি মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের আধারে ধৃত।

তাই সুগভীর আর সুবিস্তৃত কবি-প্রতিভার অধিকারী হয়েও মানসিক স্থৈর্য আর ভারসাম্যের অভাবে মাত্র চারটি বৎসরের সংকীর্ণ আকস্মিকতার সাধনায়ই তাঁর সমাপ্তি। লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্বে তাঁর কবিসত্তা—আর ব্যক্তি-সত্তাও—অবক্ষয়িত। বিহারীলালের মতো 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, এসো না এ যোগীজন'-ভবনে বলতে পারলে হয়তো তিনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু মধুসূদন অত সহজে নিজের দিকে চোখ ঠেরে প্রাণের সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হতে চান নি। তাই স্বর্ণলঙ্কার মেঘনাদ না হয়ে তাঁকে ভগ্নলঙ্কার রাবণ হতে হয়েছে। আর মাত্র চার বৎসরের কাব্যসাধনার পরে, আপনার বিভক্ত আত্মার দিকে তাকিয়ে আর্ত চীৎকারে কাব্যলোক থেকে বিদায় নিতে হয়েছে :—

> বিসর্জিব আজি মাগো, বিস্মৃতির জলে
> (হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
> ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ হোমানলে
> মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি!
> শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
> যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ বিস্মরি
> সংসারের ধর্ম, কর্ম! ডুবিল সে তরি,
> কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
> অল্পদিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে

শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর হে বরদে, মাগি শেষবারে—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ-ভারত-রতনে!

[সমাপ্তে: চতুর্দ্দশপদী]

[পূর্বানুবৃত্তি]

জে. বি. প্রিস্টলির
'ইন্সপেক্টর কল্‌স্‌'
অবলম্বনে

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

চন্দ্রমাধব সেন,—বিখ্যাত ধনী, কয়েকটি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও ডিরেকটর ॥ রমা সেন,—চন্দ্রমাধব সেনের স্ত্রী ॥ শীলা সেন,—ঐ কন্যা ॥ তাপস সেন,—ঐ পুত্র ॥ গোবিন্দ,—ঐ ভৃত্য ॥ অমিয় বোস,—চন্দ্রমাধব সেনের বন্ধুপুত্র ॥ তিনকড়ি হালদার,—পদ্মপুকুর থানার সাব-ইন্‌স্পেকৃটর ॥ স্থান, পদ্মপুকুরে চন্দ্রমাধব সেনের বাড়ির ড্রয়িংরুম ॥ কাল, ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের এক সন্ধ্যা ॥

(গোবিন্দর প্রবেশ)

গোবিন্দ। আজ্ঞে, থানা থেকে সাব-নেসপেক্‌টার বাবু এসেছেন—

চন্দ্রমাধব। কে এসেছে ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে সাব-নেসপেক্‌টার বাবু—

চন্দ্রমাধব। (বিরক্তির সহিত) সাব-ইন্‌স্পেক্‌টর ? কিসের ?

গোবিন্দ। আজ্ঞে পুলিসের। পদ্মপুকুর থানা থেকে আসছেন। নাম বললেন তিনকড়ি হালদার।

চন্দ্রমাধব। তিনকড়ি হালদার! (বোধ হয় মনে করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ও নামে কাহাকেও মনে পড়িল না।) তা চায় কাকে?

গোবিন্দ। আজ্ঞে বললেন, আপনার সঙ্গে জরুরী দরকার—

চন্দ্রমাধব। আমার সঙ্গে? নন্‌সেন্স্‌! (উঠিবার উপক্রম করিয়া) আচ্ছা, বাইরের ঘরে বসা, আমি—(পুনরায় বসিয়া পড়িয়া) আচ্ছা থাক, এখানেই পাঠিয়ে দে। (গোবিন্দর প্রস্থান)—ও হয়েছে—বুঝলি, রমেশ বোধ হয় কোন দরকারে পাঠিয়েছে। (অমিয়কে) আমার ভাগ্নে রমেশ, সাউথের ডি-সি, থাকেও ঐ পদ্মপুকুর থানার ওপরে, তাই বোধ হয়—

অমিয়। (ঠাট্টার ছলে) কিংবা হয়তো দেখুন, আমাদের তাপস কিছু করে-টরে বসেছে কিনা!

চন্দ্রমাধব। (ঐ একই স্বরে) তা হতে পারে! তোমাদের—মানে আজকালকার ছেলেদের—বিশ্বাস নেই কিছু!

তাপস। (অস্বস্তির সহিত অমিয়কে) তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?

অমিয়। (হাসিয়া উঠিয়া) কি মুশকিল! কিচ্ছু বলতে চাই না! আচ্ছা পাগলকে নিয়ে পড়া গেছে যাহোক! ঠাট্টা বোঝ না?

তাপস। (পূর্ববৎ, অস্বস্তির সহিত) না, ঠাট্টা যদি ওরকম হয়, তাহলে বুঝি না!

চন্দ্রমাধব। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তাপস! আজ তোর কি হয়েছে বল তো?

তাপস। (উদ্ধত স্বরে) হবে আবার কি? কিচ্ছু নয়!

চন্দ্রমাধব। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তাপস! (আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর তিনকড়ি হালদারের প্রবেশ। তাঁহার পরিধানে সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টরের পরিচ্ছদ। গুরুত্ব আরোপ করিয়া কথা বলার অভ্যাস, এবং কথা বলেন খুব সাবধানে, যেন কোথাও ফাঁক না থাকিয়া যায়, অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় কথা না বলিয়া ফেলেন। লক্ষ্য করিবার মতো আরও একটি বিশেষত্ব আছে। কাহারও সহিত কথা বলিবার সময় তাঁহার অপ্রীতিকর প্রখর দৃষ্টি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে রীতিমত বিচলিত করিয়া তোলে।)

তিনকড়ি। নমস্কার; আপনিই মিস্টার চন্দ্রমাধব সেন?

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ। আপনি?

তিনকড়ি। সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর তিনকড়ি হালদার—পদ্মপুকুর থানা থেকে আসছি।

চন্দ্রমাধব। (চেয়ার দেখাইয়া দিয়া) বসুন—(তিনকড়ি বাবু বসিলে, সিগারেট কেস খুলিয়া সম্মুখে ধরিলেন) সিগারেট ?

তিনকড়ি। নো থ্যাঙ্ক্‌স্‌!

চন্দ্রমাধব। (নিজে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে) আপনি বুঝি সিগারেট খান না ?

তিনকড়ি। খাই, তবে অন্ ডিউটি নয়।

চন্দ্রমাধব। (তিনকড়ির মুখের দিকে তাকাইয়া) আপনি পদ্মপুকুরে নতুন এসেছেন, না ?

তিনকড়ি। হ্যাঁ নতুনই, আজ নিয়ে পাঁচ দিন।

চন্দ্রমাধব। আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আমার ভাগ্নে রমেশ, মানে আপনাদের সাউথের ডি-সি, ও তো থাকে ঐ থানার ওপরেই। ওর ওখানে প্রায়ই যাই তো—কিন্তু আপনাকে কখনও—

তিনকড়ি। (বাধা দিয়া) না, আমাকে আর দেখবেন কি করে—আমি তো মোটে পাঁচদিন হল এসেছি।

চন্দ্রমাধব। না, মানে আমিও তাই বলছিলাম। কিন্তু, আপনি এসময়ে—রমেশ কোন দরকারে পাঠিয়েছে নিশ্চয় ?

তিনকড়ি। না, মিষ্টার সেন।

চন্দ্রমাধব। (অসহিষ্ণু হইয়া) তবে ?

তিনকড়ি। আমি এসেছি দু-একটা খবর জানতে। অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

চন্দ্রমাধব। খবর জানতে ? এখানে ?

তিনকড়ি। হ্যাঁ। আজ বিকেলে একটি মেয়ে কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে মারা গেছে। হসপিটালে পাঠানো হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু কিছুতেই বাঁচানো গেল না ; ভেতরটায় কিচ্ছু ছিল না—সমস্ত জ্বলে গিয়েছিল !

তাপস। (শিহরিয়া উঠিয়া) উঃ ! বলেন কি ?

তিনকড়ি। (তাপসকে) হ্যাঁ, সে বড় ভীষণ যন্ত্রণা, চোখে দেখা যায় না ! (চন্দ্রমাধবকে) বুঝতেই পারছেন—সুইসাইড—

চন্দ্রমাধব। সে তো বুঝতেই পারছি—it's a horrible business! কিন্তু আমার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি?

তিনকড়ি। মেয়েটি যেখানে থাকত সেখানে আমি গিয়েছিলাম। তার একটা চিঠি আর ডায়েরি আমি পেয়েছি। জানেন তা, অভিভাবকহীন অবস্থায় বিপদে-আপদে পড়লে মেয়েরা অনেক সময় অন্য নাম নেয়? এ-মেয়েটিও নিয়েছিল। আমি অবশ্য আসল নামটা ডায়েরি থেকে বার করে নিয়েছি—সন্ধ্যা চক্রবর্তী—

চন্দ্রমাধব। সন্ধ্যা চক্রবর্তী?

তিনকড়ি। হ্যাঁ সন্ধ্যা চক্রবর্তী। মেয়েটিকে মনে আছে আপনার?

চন্দ্রমাধব। (ধীরে ধীরে) না—মানে—নামটা যেন কিরকম শোনা-শোনা বলে মনে হচ্ছে—কোথায় যেন শুনেছি! কিন্তু সে যাই হোক—এ-সবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি?

তিনকড়ি। আপনাদেরই একটা কন্‌সার্ণ—দয়াময়ী কুটীরশিল্পপ্রতিষ্ঠান—মেয়েটি সেখানে এক সময় কাজ করত।

চন্দ্রমাধব। ও তাই বলুন। কিন্তু সেখানে তো আর একটা মেয়ে কাজ করে না। আর যারা করে তাদেরও কেউ পার্‌মানেণ্ট্‌লি নেই—আজ দুজন আস্‌ছে, কাল দুজন যাচ্ছে।

তিনকড়ি। এ-মেয়েটি খুব একটা সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না মিস্টার সেন। আমি তার বাসা থেকে একটা ছবিও জোগাড় করেছি—আপনি হয়তো ছবিটা দেখলে চিনতে পারবেন (তিনকড়ি হালদার একটি পোস্ট-কার্ড সাইজের ছবি পকেট হইতে বাহির করিয়া মিস্টার সেনের নিকট গেলেন। অমিয় ও তাপস দুইজনেই ছবিটি দেখিতে গেল। কিন্তু তিনকড়িবাবু ছবিটিকে আড়াল করিয়া ধরায় তাহারা দেখিতে সক্ষম হইল না। তিনকড়িবাবুর এইরূপ ব্যবহারে তাহারা বিস্মিত তো হইয়াছিলই, বিরক্তও হইয়াছিল। দেখা গেল মিস্টার সেন ছবিটি খুব ভাল করিয়া দেখিতেছেন এবং মনে হইল যেন চিনিতেও পারিয়াছেন। তিনকড়িবাবু ছবিটিকে পকেটে রাখিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

অমিয়। (বিরক্তির সহিত) আচ্ছা তিনকড়িবাবু, ছবিটা আমাকে দেখতে দিলেন না কেন? বিশেষ কোন কারণ আছে কি?

তিনকড়ি। (শান্ত অথচ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) হয়তো আছে।

তাপস। আমার বেলায়ও তাই, তিনকড়িবাবু ?

তিনকড়ি। নিশ্চয়। আপনি কি ভাবছিলেন একটা আলাদা কিছু হবে ?

অমিয়। কিন্তু কারণটা কি ?

তাপস। সেটা তো আমার মাথাতেও ঢুকছে না—

চন্দ্রমাধব। আমিও কিন্তু তিনকড়িবাবু ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন আপনি ওদের—

তিনকড়ি। আজ্ঞে আমার কাজ করার রীতি-ই এই। এক-একবারে এক-একজন। নইলে, সকলকে একসঙ্গে ধরলে বড় গণ্ডগোল হয়।

চন্দ্রমাধব। (কিছুটা চঞ্চল হইয়া) তাহলে অবশ্য বলবার কিছু নেই—

তিনকড়ি। (চন্দ্রমাধবের এই চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিলেন) আপনি তাহলে মেয়েটাকে চিনতে পেরেছেন, কি বলেন মিস্টার সেন ?

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। মেয়েটি দয়াময়ীতে কাজ করত—আমরা তাকে বরখাস্ত করি—

তাপস। (উত্তেজিত হইয়া) বাবা, তাহলে কি সেইজন্যেই মেয়েটি—

চন্দ্রমাধব। তাপস ! চুপ করে বসতে পারিস বস্—নইলে এ ঘর থেকে যা ! (তিনকড়িবাবুকে) কিন্তু এ আজ দুবছর আগের কথা তিনকড়িবাবু, ফিফ্‌টিটুর সেপ্টেম্বরে—

তিনকড়ি। হ্যাঁ, সেপ্টেম্বরের শেষে।

অমিয়। আমি এখন তাহলে বাইরে যাই, কি বলেন কাকা ?

চন্দ্রমাধব। না না, বাইরে যাবার মতো হয়েছেটা কি ! কি তিনকড়িবাবু, অমিয়র এ ঘরে থাকাতে আপনার নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই ? (হয়তো আপত্তি থাকিতে পারে এই মনে করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন) —মানে, আমার বন্ধু বোস ইনডাসট্রিজ-এর শেখর বোস ? নাম শুনেছেন নিশ্চয় ? বাংলাদেশের একটা অতবড় বিজনেস ম্যাগনেট। অমিয় তাঁরই ছেলে—

তিনকড়ি। কি বললেন ? অমিয় বসু—না ?

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ—মানে, অমিয় আর আমার মেয়ে শীলা—সামনের মাসেই ওদের বিয়ে। তাই আজ একটু—

তিনকড়ি। (চিন্তা করিতে করিতে অমিয়কে) ও, আপনি আর শ্রীমতী শীলা—আপনাদের এই সামনের মাসেই বিয়ে, না ?

অমিয়। (মৃদু হাসিয়া) এখনো অবধি আশা তো সেই রকমই, তবে—

তিনকড়ি। (গম্ভীরভাবে) না অমিয়বাবু তাহলে আপনার বাইরে না যাওয়াই ভাল ! আপনি বরং এ ঘরেই থাকুন।

অমিয়। (বিস্মিত হইয়া) আশ্চর্য ! তা না হয় রইলাম, কিন্তু—

চন্দ্রমাধব। (অধৈর্য হইয়া) দেখুন তিনকড়ি বাবু, আপনি যে ভাবছেন মিস্টিরিয়াস কেলেঙ্কারি গোছের একটা কিছু হয়েছিল—তা মোটেই হয়নি এর মধ্যে বাঁকা-চোরা কিচ্ছু নেই ! স্ট্রেট কেস্ ! তাও হয়েছে কবে ? না দুবছর আগে। তার সঙ্গে এ সুইসাইডের সম্পর্কটা কি ? কিছুই নয় !

তিনকড়ি। না মিস্টার সেন, আমি আপনার কথা মেনে নিতে পারছি না।

চন্দ্রমাধব। কেন পারছেন না ?

তিনকড়ি। কারণ খুব সোজা। চাকরি যাওয়ার পর যা কিছু ঘটেছে, তা হয়তো ঘটত না, যদি না তার ঐ চাকরিটা যেত। হয়তো ঐ পরের ঘটনাগুলোই তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। দেখুন—হয়তো ঐ চাকরি যাওয়া থেকে তার আত্মহত্যা অবধি সব এক চেনে বাঁধা !

চন্দ্রমাধব। আপনি যদি ওভাবে বলেন, তাহলে অবিশ্যি আপনার কথা খানিকটা ঠিক। কিন্তু আমি ওভাবে বলি না—কাজেই এ ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি যা বলছেন ও তো একটা কথার কথা ! ওভাবে কাজ করতে গেলে কি চলে ? চলে না। কত লোকের সঙ্গে আমাদের কাজ ! আপনি কি বলতে চান তাদের জীবনে যা কিছু ঘটেছে সব দায়-দায়িত্ব আমাদের ? বলুন না —আপনিই বলুন—কথাটা কি খুব অক্ওয়ার্ড নয় ?

তিনকড়ি। নিশ্চয় অক্ওয়ার্ড বই কি, খুবই অকওয়ার্ড।

চন্দ্রমাধব। আমাদের অবস্থাটা কি হবে একবার ভাবুন দেখি ? কি একটা ইম্‌পসিবল্ সিচুয়েশনের মধ্যে গিয়ে পড়ব বলুন তো ?

তাপস। ঠিক বলেছ বাবা। তুমি তো একটু আগেই বলছিলে, আগে নিজে তারপর অন্য কেউ—

চন্দ্রমাধব। যাকগে, ওসব বাজে কথা এখন থাক—

তিনকড়ি। কি কথা মিস্টার সেন?

চন্দ্রমাধব। ও কিছু নয়। আপনি আসবার আগে আমি এদের দু-একটা গুড্ অ্যাড্ভাইস দিচ্ছিলাম। যাকগে ওসব কথা, এখন্ কাজের কথায় আসা যাক। হ্যাঁ, কি যেন নাম বলছিলেন মেয়েটির? ও মনে পড়েছে—সন্ধ্যা চক্রবর্তী। হ্যাঁ, মেয়েটি আমাদের দয়াময়ীতে কাজ করত—এম্ব্রয়ডারি সেকশনে। বেশ চালাক চতুর, দেখতে শুনতেও ভাল। হাতের কাজও চমৎকার। বোর্ড-মিটিঙে তো আমরা ঠিকই করেছিলাম—ওকে সেকশন-ইনচার্জ করে দেব। কিন্তু হঠাৎ গোলমাল বাধাল পুজোর বন্ধের ঠিক পরেই। সকলে মিলে স্ট্রাইক করে কাজ বন্ধ করলে! কি? না, প্রত্যেকের পাঁচ টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন—আমরা refuse করলাম—

তিনকড়ি। না, ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেন, refuse করলেন কেন?

চন্দ্রমাধব। (বিস্মিত হইয়া) কেন refuse করলাম। —মানে?

তিনকড়ি। হ্যাঁ, refuse কেন করলেন?

চন্দ্রমাধব। (ক্রুদ্ধ হইয়া) দেখুন তিনকড়িবাবু, business আমার, আমার ইচ্ছেমতো সেটা আমি চালাই। এ নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার আছে বলে আমার তো মনে হয় না।

তিনকড়ি। আপনি কি করে জানলেন? দরকার হয়তো সত্যিই আছে, তাই মাথা ঘামাচ্ছি।

চন্দ্রমাধব। কিন্তু আপনি ওরকম চোখ রাঙিয়ে কথা বলছেন কাকে?

তিনকড়ি। তা যদি আপনার মনে হয়, তাহলে I am sorry। আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি মাত্র।

চন্দ্রমাধব। কিন্তু আমি যা বলছি তা যুক্তিসঙ্গত—আর আপনি যা বকছেন, তা অবান্তর!

তিনকড়ি। কিন্তু আমি আপনাকে যা জিজ্ঞেস করেছি, তা আমার ডিউটির মধ্যে বলেই করেছি, নইলে করতাম না।

চন্দ্রমাধব। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন! চাকরির দিক থেকে আপনারও যেমন একটা ডিউটি আছে, ব্যবসার দিক থেকে আমারও তেমনি একটা ডিউটি আছে!

তিনকড়ি। সেটা কি, জানতে পারি?

চন্দ্রমাধব। কেন পারেন না, নিশ্চয় পারেন! আমার ডিউটি হল labour costকে যতটা সম্ভব কমের মধ্যে রাখা। আমরা ওদের মাসে তিরিশ টাকা করে দিচ্ছিলাম। সেই জায়গায় যদি পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিতে হত, তাহলে labour cost কত বাড়ত জানেন? Sixteen percent এর ওপর! এবার আপনার কেনর উত্তর নিশ্চয় পেয়েছেন? সব জায়গায় যা দেয়, আমরাও তাই দিচ্ছিলাম। তাদের পছন্দ হয় কাজ করুক, না হয় অন্য কোথাও যাক! আমি তো তাদের বলেই দিয়েছিলাম—It is a free country—এখানে না পোষায়, অন্য কোথাও যাও। আমি তো আর কাউকে ধরে রাখিনি।

তাপস। তা হলে এটা free country নয়! এ দেশে অন্য কোথাও যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়—না গেলেই কাজ পাওয়া যায়?

তিনকড়ি। ঠিক কথা।

চন্দ্রমাধব। (তাপসকে) আচ্ছা, তোর কি সব ব্যাপারে কথা বলা চাই! আমি তো তোকে বলেছি তাপস—চুপ করে বসে থাকতে পারিস বস, নইলে যা। সব তাতে কথা। (তিনকড়িবাবুকে) হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন? ও, স্ট্রাইকের কথা। স্ট্রাইক অবশ্যি বেশিদিন চলে নি—

অমিয়। তা কখনো চলে! পুজোর বন্ধের পরই যে! হাতে তো কারো একটি পয়সা নেই—অফিস থেকে লোন না পেলে খাবে কি?

চন্দ্রমাধব। হলও ঠিক তাই! চারদিন পেরিয়ে পাঁচদিন গেল না, স্ট্রাইকও শেষ! আমরা অবশ্যি কোন স্টেপ নিইনি। সকলকেই নিলাম—তবে হ্যাঁ, তিন-চারজন রিংলিডার বাদে। তা আপনার ঐ সন্ধ্যা চক্রবর্তী—তিনি ঐ তিন-চারজনেইর একজন! অনেকদূর এগিয়েছিলেন কিনা—তাই চাকরিটা গেল!

অমিয়। তা তো যাবেই! চাকরি এখানে থাকে কি করে?

তাপস। কেন থাকবে না? বাবা ইচ্ছে করলেই থাকত। বাবার ইচ্ছে

ছিল না, তাই তার চাকরিও রইল না ! বাবা তো তাড়িয়েই খালাস—মেয়েটার অবস্থাটা ভাব তো একবার—

চন্দ্রমাধব। রাবিশ! তুই এসব ব্যাপারে জানিস কতটুকু? আজ পাঁচ টাকা দে, কাল দশ টাকা চেয়ে বসবে! দে আবার দশ টাকা—দেখবি, পরদিনই বলছে, গোটা দুনিয়াটা আমাদের দাও!

অমিয়। ঠিক কথা।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, তা ঠিক কথা—তবে ঐ চাইবে, ঐ পর্যন্ত—নিয়ে বসবে না।

চন্দ্রমাধব। (তিনকড়িবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া) আচ্ছা, কি যেন বললেন আপনার নামটা?

তিনকড়ি। তিনকড়ি হালদার।

চন্দ্রমাধব। ও, তিনকড়ি হালদার—না! আচ্ছা রমেশের সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়? রমেশ—মানে—আপনাদের ডি সি?

তিনকড়ি। ডি সি যখন, তখন দেখা-সাক্ষাৎ হয় বই কি। তবে খুব বেশী নয়—

চন্দ্রমাধব। আপনি বোধ হয় জানেন না—রমেশ আমার ভাগ্নে। এখানে তো আসেই—তাছাড়া প্রায় রোজই ক্লাবে আমাদের দেখা হয়। আমিও আপনাদের পুলিস-ক্লাবে টেনিস খেলতে যাই কিনা—

তিনকড়ি। কি করে জানব বলুন?—আমি টেনিস খেলিও না, আর খেলা দেখিও না।

চন্দ্রমাধব। (বিরক্তি-মিশ্রিত স্বরে) আঃ—কে বলছে যে আপনি টেনিস খেলেন বা দেখেন! আপনি যে টেনিস খেলেন না, তা আমিও জানি—কিন্তু—

তাপস। (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) কিন্তু যাই বল বাবা, এটা খুবই লজ্জায় কথা—

তিনকড়ি। কেন, লজ্জার কি আছে এতে? আমি খেলা জানি না, তাই খেলি না, আর দেখতে ভাল লাগে না, তাই দেখি না।

তাপস। না না, খেলা নয়—আমি ঐ মেয়েটির কথা বলছি, মানে ঐ সন্ধ্যা চক্রবর্তী! কেনই বা সে বেশী মাইনের জন্য চেষ্টা করবে না? আমরা চেষ্টা করি না আমাদের জিনিস যাতে বাজারে বেশী দামে কাটে? আর

পাঁচটা মেয়ের চেয়ে সে একটু বেশী স্পিরিটেড, কিন্তু তাই বলে আর চাকরিটা যাবে? (চন্দ্রমাধবকে) তুমি তো নিজেই বলছিলে বাবা, মেয়েটি কাজ করত ভালই! তাই যদি হয়, তবে তাকে ছাঁটাই বা করলে কেন? কি জানি বাবা, আমি তো এর কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না! আমি হলে তো রেখেই দিতাম!

চন্দ্রমাধব। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তুই চুপ করবি কিনা! উঃ, আমি হলে তো রেখেই দিতাম! আরে রাখবি কোত্থেকে?—সে ক্ষমতা আছে তোর? অমুককে রাখব, তমুককে ছাঁটাই করব, এসব করতে গেলে মাথার দরকার—তোমার ও মোটা মাথার কর্ম ওটা নয়! আশ্চর্য, এত পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শেখালাম, এতটুকু বুদ্ধি হল না তোর! যে গাধা সেই গাধাই রয়ে গেলি!

তাপস। (ক্ষুব্ধ স্বরে) এ সব কথা কি তিনকড়িবাবুর সামনে না বললেই নয় বাবা?

চন্দ্রমাধব। তিনকড়িবাবুর সামনে আমার আর কোন কথা বলারই দরকার নেই! বলবার আছেই বা কি? ঐ সব ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ আমাদের পছন্দ হয়নি, তাই তাকে ছাঁটাই করেছিলাম! তারপর তার কি হয়েছিল না হয়েছিল, তার কোন খবরই আমি রাখি না। কি হয়েছিল তিনকড়িবাবু? Did she get into trouble?

তিনকড়ি। (ধীর স্বরে) ট্রাব্‌ল্—মানে—হ্যাঁ ট্রাব্‌ল্ও বলতে পারেন—

(শীলার প্রবেশ)

শীলা। (প্রবেশ করিতে করিতে লঘু স্বরে) ট্রাব্‌ল্? কিসের ট্রাব্‌ল্ বাবা—পেটের নাকি? (তিনকড়িবাবুকে দেখিয়া) oh sorry! আমি জানতাম না, আপনি এখানে আছেন! হ্যাঁ বাবা—মা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, তোমাদের কি খুব দেরি হবে? তাহলে না হয়—

চন্দ্রমাধব। না না, দেরি কিসের? কথাবার্তা আমাদের শেষ হয়ে গেছে—(তিনকড়িবাবুকে দেখাইয়া দিয়া) এবার উনি উঠবেন—

তিনকড়ি। কিন্তু আমি তো এখন উঠব না।

চন্দ্রমাধব। তার মানে?

তিনকড়ি। কথাবার্তা তো আমাদের এখনও শেষ হয় নি।

চন্দ্রমাধব। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তার মানে? যা জানি সবই তো আপনাকে বললাম!

শীলা। (কৌতূহলী হইয়া) কি হয়েছে বাবা?

চন্দ্রমাধব। কিছু হয়নি। তুই এখন এঘর থেকে একটু যা তো শীলা—আমরা এক্ষুনি আসছি।

তিনকড়ি। কিন্তু আমার যে ওঁকেও দরকার মিস্টার সেন।

চন্দ্রমাধব। তার মানে?

তিনকড়ি। মানে, ওঁকেও আমার দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে—

চন্দ্রমাধব। (ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) না—ওকে আপনার কোন কথা জিজ্ঞেস করবার নেই! দেখুন তিনকড়িবাবু, যেটুকু ডিউটি সেটুকু করুন! তার বাইরে এ ভাবে ওপর-পড়া হয়ে কথাবার্তা বললে—আমি আপনার নামে রিপোর্ট করব! যেটুকু বলবার তা তো আমিই আপনাকে বললাম! তারপর তার কি হল না হল, তার সঙ্গে আমার কি? এরকম একটা বেয়াড়া ব্যাপারের মধ্যে আমার মেয়েকে টেনে আনবার কি অধিকার আছে আপনার?

শীলা। কি হয়েছে বাবা? ইনি তো দেখছি পুলিসের লোক। কোত্থেকে আসছেন ইনি?

তিনকড়ি। আজ্ঞে আমি আসছি পদ্মপুকুর থানা থেকে। ওখানকার সাব-ইন্‌স্‌পেকটর—নাম তিনকড়ি হালদার।

শীলা। কিন্তু আপনি এখানে—মানে—

তিনকড়ি। আমি একটু এন্‌কোয়ারিতে এসেছি। আজ বিকেলে একটি মেয়ে কার্বলিক অ্যাসিড্ খেয়ে মারা গেছে—

শীলা। কি সর্বনাশ! কার্বলিক অ্যাসিড্?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ। মরবার আগে সে কি যন্ত্রণা!

শীলা। (অসহায় কণ্ঠস্বরে) কিন্তু কেন খেল বলুন তো?

তিনকড়ি। কি জানি? বোধ হয় মনে হয়েছিল আর বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

চন্দ্রমাধব। কিন্তু তাই বলে আপনি বলতে চান—দুবছর আগে তাকে ছাঁটাই করেছিলাম বলে, আজ দুবছর পরে সে আত্মহত্যা করেছে?

তাপস। কিন্তু বাবা, হয়তো ওই ছাঁটাই থেকেই তার দুঃখের শুরু—

শীলা। সত্যি বাবা? তুমি তাকে ছাঁটাই করেছিলে?

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ করেছিলাম। মেয়েটা দয়াময়ীতে কাজ করত। খুব গণ্ডগোল আরম্ভ করেছিল, তাই তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। অন্যায় কিছু আমি করিনি—

অমিয়। না, অন্যায় কিসের? আমাদের হলে আমরাও তাই করতাম। (শীলাকে অতিমাত্রায় বিচলিত দেখিয়া) কিন্তু তুমি এত moved হচ্ছ কেন? সে তো তোমার কেউ নয়—

শীলা। কি জানি—তা তো জানি না। আমার খালি মনে হচ্ছে—আমরা যখন এখানে এত হাসি-ঠাট্টা করছি, তখন আর একজন কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে হসপিটালে যন্ত্রণায় ছটফট করছে! (তিনকড়িবাবুকে) আচ্ছা কত বয়েস হবে মেয়েটির? খুব বেশী নিশ্চয় নয়?

তিনকড়ি। না না, খুব বেশী কোথায়? তেইশ-চব্বিশের মধ্যে—একেবারে ফোটা ফুলের মতো দেখতে। তবু তো আজ আমি তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিনি। যখন গেছি তখন সে যন্ত্রণায় ছটফট করছে!

চন্দ্রমাধব। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, এখনও কি যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না আপনার?

অমিয়। আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না—এ ভাবে এন্‌কোয়ারি করে আপনার লাভটা কি? আপনার জানা দরকার—দয়াময়ী থেকে চাকরি যাওয়ার পর যা যা হয়েছিল। কিন্তু আমরা তার কি জানি বলুন?

তিনকড়ি। একেবারেই কি কিচ্ছু জানেন না মিস্টার বোস?

চন্দ্রমাধব। (অমিয় ও শীলার দিকে ইঙ্গিত করিয়া, বিস্মিত কণ্ঠস্বরে) তার মানে? আপনি বলতে চান—হয় এ নয় ও মেয়েটির সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দ্রমাধব। আপনি তা হলে শুধু আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এখানে আসেন নি?

তিনকড়ি। আজ্ঞে না।

চন্দ্রমাধব। (নরম স্বরে) এ কথাটা আগে বললেই পারতেন কোন গণ্ডগোলই

হত না! আমি কি করে জানব বলুন? আমি ভাবছি, আমার যা বলার সবই তো আমি বলেছি—তবে কেন শুধু শুধু আপনি আমাদের উত্ত্যক্ত করছেন। কিন্তু আপনি সব fact পেয়েছেন তো?

তিনকড়ি। কিছু কিছু পেয়েছি বই কি।

চন্দ্রমাধব। খুব একটা মারাত্মক কিছু নয়—কি বলেন?

তিনকড়ি। মানে—একটি মেয়ে কার্বলিক অ্যাসিড্ খেয়ে মারা গেছে। এটা যদি মারাত্মক কিছু হয় তবে মারাত্মক—নইলে নয়।

শীলা। তার মানে? আপনি বলতে চান ঐ মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে আমরা দায়ী?

চন্দ্রমাধব। তুই চুপ কর দেখি—যা বলবার আমি বলছি। (নরম স্বরে তিনকড়িকে) আচ্ছা তিনকড়িবাবু, তার চেয়ে আসুন না—আমি আর আপনি—মানে একটু নিরিবিলিতে বসে ব্যাপারটা সেট্‌ল্ করে ফেলি?

শীলা। কিন্তু বাবা, তুমিই বা কথা বলবে কেন? ওঁর তো তোমার কাছে এনকোয়ারি শেষ হয়ে গেছে। এখন তো উনি বলছেনই; হয় অমিয় না হয় আমি—

চন্দ্রমাধব। আরে, তোরা ছেলেমানুষ এ সবের বুঝিস-কি? আমি তোদের হয়ে কথাবার্তা বলে যা হোক একটা কিছু ঠিক করে নিচ্ছি—

অমিয়। কিন্তু আমার তরফ থেকে ঠিক করার কিচ্ছু নেই কাকাবাবু। সন্ধ্যা চক্রবর্তী বলে কাউকে আমি চিনিই না।

তাপস। ও নামে আমিও তো কাউকে চিনি না।

শীলা। কি নাম বললে? সন্ধ্যা চক্রবর্তী?

অমিয়। হ্যাঁ—

শীলা। আমি তো শুনিই নি কোনদিন—

অমিয়। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া) এখন কি রকম মনে হচ্ছে তিনকড়িবাবু?

তিনকড়ি। কেন? ঠিক আগে যেমন মনে হচ্ছিল। আমি তো আগেই আপনাদের বলেছি, মেয়েরা বিপাকে পড়লে অনেক সময় নাম পালটায়। এ-মেয়েটিও পালটেছিল। তিরিশ টাকার জায়গায় পঁয়ত্রিশ টাকা চাওয়ার জন্যে মিস্টার সেন যখন তাকে ছাঁটাই করলেন, তখন হয়তো

তার মনে হল সন্ধ্যা চক্রবর্তী নামটা অপয়া—তাই সে নতুন একটা নাম নিলে—

তাপস। খুবই স্বাভাবিক—

শীলা। পাঁচটা টাকা বাড়ালে কী এমন ক্ষতি হত বাবা? হয়তো ঐ জন্যেই—

চন্দ্রমাধব। রাবিশ। চাকরি গেছে দুবছর আগে, আর আত্মহত্যা করেছে সে আজ। তার জন্যে কি আমি দায়ী? আচ্ছা তিনকড়িবাবু, চাকরি-যাওয়ার পর কি হয়েছিল, কিছু জানেন আপনি?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ। মাস-দুয়েক চাকরি ছিল না। বাপ-মা মরা মেয়ে, কাজেই যাবারও কোন জায়গা ছিল না। দয়াময়ীতে চাকরি করত, কাজেই বুঝতেই পারছেন, জমাতেও কিছু পারে নি। দুমাস বেকার অবস্থায় কাটাবার পর, অবস্থা যা হবার ঠিক তাই হল। আত্মীয়-স্বজন নেই যে কারো কাছে চলে যায়, তেমন বন্ধু-বান্ধব নেই যে তাকে সাহায্য করে, হাতে এমন পয়সা নেই যে দুদিন বসে খায়! কাজেই অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছেন! প্রথম কদিন চলল অর্ধাহার, তারপর প্রায় অনাহার! এর চেয়ে ডেস্‌পারেট্ অবস্থা আর কি হতে পারে বলুন?

শীলা। এর চেয়ে ডেস্‌পারেট্-অবস্থা তো ভাবাই যায় না! সত্যিই বড় লজ্জার কথা! এ-ভাবে যদি একটি মেয়েকে আত্মহত্যা করতে হয়—

তিনকড়ি। শুধু একটি মেয়ে কেন? আজকের দিনে কলকাতার মত প্রত্যেকটা শহরে গিয়ে আপনি দেখুন—দেখবেন, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঠিক এইভাবে দিন কাটাচ্ছে। তাই যদি না হবে—তবে আজকের দিনে এমপ্লয়ারের সাধ্য কি যে, যে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকায় একটা কুকুর-বেড়াল পোষা যায় না, সেই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকায় একটা মানুষ রেখে কাজ করায়! হাজার হাজার বেকার সন্ধ্যা চক্রবর্তী আত্মহত্যার দিন গুনছে বলেই না আজ মালিকদের এত সুবিধে। আজ তারা বেশ ভাল করে জানে—কোথায় গেলে তারা cheap labour পাবে! আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন—

শীলা। কিন্তু এই সন্ধ্যারা ত cheap labour নয়—এরা যে আস্ত মানুষ তিনকড়িবাবু!

তিনকড়ি। আমারও তো মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। মনে হয় আমরা যদি মাঝে মাঝে ওদের ছেঁড়া কাঁথার ওপর যাই, আর ওরা যদি আমাদের এই সোফা-কৌচের ওপর আসে, তাহলে আর কারো কিছু হোক আর না হোক আমাদের অন্তত কিছুটা ভাল হয়।

শীলা। তা যা বলেছেন। আচ্ছা তারপর কি হল?

তিনকড়ি। ওই এক ভাবেই চলছিল—আর চলতও তাই। কিন্তু মাস-খানেক কাটার পর মনে হল, বোধহয় তার সুদিন আবার ফিরে আসছে। ধর্মতলার ঐ বড় চেন্‌স্টোরটা আছে? ওখানে তার একটা চাকরি জুটে গেল—ক্লোদিং সেক্‌শনের কাউন্টার্ গার্ল্।

শীলা। চেন্‌স্টোর্! আমাদের জিনিস-পত্রও তো সব ওখান থেকে আসে। ওখানকার কাজ তো বেশ ভাল কাজ। ওদের মাইনেও ভাল, বেশ লাকি বলতে হবে!

তিনকড়ি। তারও নিজেকে খুব লাকি বলেই মনে হয়েছিল। আগের কাজটা ছিল ছোট একটা ঘরের মধ্যে। ঘিঞ্জির মধ্যে বসে সারাদিন শুধু ছুঁচের কাজ। এ ধরুন, বড় জায়গা, চারধারে দিনের বেলায় নিওন লাইটের আলো, মাইনেও সামান্য একটু বেশী। তার ওপর আবার ডিপার্টমেন্ট্‌টাও পোশাকের। জানেনই তো মেয়েরা একটু শাড়ি-টাড়ি নাড়াচাড়া করতে বেশী ভালবাসে! মনে মনে ঠিক করলে, জীবনটাকে বেশ গুছিয়ে নিয়ে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। মানে, কি বলব, আপনি তো খানিকটা বুঝতেই পারছেন তার মনের ভাব-ভাবনাটা!

চন্দ্রমাধব। তারপর, ওখানেও আবার গণ্ডগোল বাধল বুঝি?

তিনকড়ি। মাস-দুয়েক বেশ কেটে গেল। দুমাস পর সবে একটু স্থিতু হয়ে বসতে আরম্ভ করেছে—ম্যানেজারের হুকুমনামা সই হয়ে এল—চাকরি নেই।

চন্দ্রমাধব। নিশ্চয়, কাজ-কর্ম সুবিধেমত করত না—

তিনকড়ি। আজ্ঞে না—দোকানে জিজ্ঞেস করলে তো উল্টোটাই শোনা যেত।

চন্দ্রমাধব। একটা কিছু গণ্ডগোল নিশ্চয় হয়েছিল—

তিনকড়ি। আজ্ঞে শোনা তো কিছু যায় নি। সে শুধু খবর পেয়েছিল কোন এক কাস্টমার নাকি তার নামে কম্‌প্লেন্‌ করেছে আর চাকরি যাওয়ার কারণই নাকি তাই!

শীলা। (উত্তেজিত ও ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে) কবে হয়েছিল ব্যাপারটা বলতে পারেন?

তিনকড়ি। গেল বছর জানুয়ারির শেষে—

শীলা। মেয়েটিকে কি রকম দেখতে?

তিনকড়ি। (উঠিয়া, পকেট হইতে ছবি বাহির করিয়া) আপনি যদি একটু এদিকে আসেন—(শীলা তিনকড়িবাবুর নিকটে আসিলে, তিনি সকলকে আড়াল করিয়া অতি সাবধানে আলোর দিকে রাখিয়া ছবিখানি শীলাকে দেখাইলেন। ভাল করিয়া দেখিবার পর শীলার মুখ-চোখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। বোঝা গেল ছবিটি দেখিয়া সে চিনিতে পারিয়াছে। চিনিতে পারিবামাত্র অশ্রুরুদ্ধ অস্ফুট চিৎকার করিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তিনকড়িবাবু ছবিটি যথাস্থানে রাখিয়া শীলার গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিয়া মনে হইল কি যেন চিন্তা করিতেছেন। বাকি তিনজনের চোখে-মুখে বিস্ময়, অবস্থা হতভম্বের ন্যায়।)

(ক্রমশ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত

[পূর্বানুবৃত্তি]

রণজিৎ গুহ

ভারতের ভূমিব্যবস্থার বিবর্তন ও ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক যে মোটেই অপ্রত্যক্ষ নয় তার তথ্যগত প্রমাণ দুদিক থেকে পাওয়া যায় :

(১) ১৭৭৬ সালের পর থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে যতবারই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতার উপর পার্লামেণ্টারী হস্তক্ষেপ হয়েছে, তার প্রত্যেকবারেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি কিছু না কিছু স্বীকৃতি লাভ করেছে ;

(২) এই যুগে যাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান প্রবক্তা তাঁদের সকলেরই মোটামুটি ঝোঁক ছিল শিল্পস্বার্থের পক্ষে, যদিও একথা মনে না রাখলে ভুল হবে যে ব্যক্তিভেদে এই ঝোঁকের মাত্রাভেদ ছিল এবং ষোলোআনা ধনতান্ত্রিক আদর্শের তুলনায় কিছুটা সনাতনপন্থী খাদও ছিল তাঁদের অনেকের চিন্তায়।

পার্লামেণ্টে বাঙলার ভূমিসমস্যা

ইজারাদারি ব্যবস্থার ফলে উৎখাত জমিদারদের আবার পত্তন করার কথা ১৭৮৩ সালে ডাণ্ডাসের প্রস্তাবিত বিলেই ছিল। কয়েকমাস পরে ফক্সের খসড়া আইনে সেকথা আরও স্পষ্টভাবে উত্থাপন করা হয়। "জমিদার ও

অন্যান্য যাদের উপর খাজনা আদায়ের ভার ছিল তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে ভূস্বামী বলে ঘোষণা করা এবং খাজনার হার সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় ভাবে বেঁধে দেবার যে-পরিকল্পনা মিঃ ফ্রান্সিস শুরু করেন, মিঃ ডাণ্ডাসের বিলেও যার খানিকটা আইনে পরিণত করার কথা উঠেছিল, সেই প্রস্তাব (ফক্সের খসড়ায়) স্বীকার করে নেওয়া হয়।"[১] ফক্স পার্লামেণ্টের সমর্থন পেলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ একই প্রস্তাব পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪) মারফত আইনে পরিণত হলো। এই আইনের ৩৯ নং ধারায় পার্লামেণ্ট কোম্পানিকে নির্দেশ দিল "এতদ্দেশের প্রাচীন বিধান ও স্থানীয় রীতিনীতির ভিত্তিতে জমির বন্দোবস্ত, রাজস্ব-সংগ্রহ ও বিচার-ব্যবস্থার জন্য নিয়মাবলী প্রবর্তন করতে।" (24 Geo. III, cap. 25).

প্রথম প্রবক্তা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে পার্লামেণ্টে এই আইনের লড়াই শুরু হবার অনেক আগেই অবশ্য আদর্শের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম প্রবক্তা আলেকজাণ্ডার ডাও। ১৭৭০ সালেই তিনি বাংলাদেশের শাসন-সংস্কারের একটি প্রস্তাব তাঁর "হিষ্ট্রি অব্ হিন্দোস্তান" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে পরিশিষ্ট আকারে মুদ্রণ করেছিলেন। এই রচনাটির নাম তিনি দিয়েছিলেন: "বাংলাদেশের অবস্থা নির্ণয়; তৎসহ, উক্ত রাজ্যের অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।"

কৃষি ও বাণিজ্যে ব্যাপক সংকট এবং নিলাম ডেকে স্বল্পমেয়াদী ইজারায় জমি বন্দোবস্ত দেবার ফলে গ্রাম-বাংলার সর্বনাশের কথা উল্লেখ করে ডাও লিখেছেন:

> "ইজারার মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিলে হয়তো এই সব কুফল অনেকটা দূর হতে পারে; তবুও একথা নিঃসন্দেহ যে ভূসম্পত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেই তবে আরও সত্বর, আরও কার্যকরীভাবে এদেশের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে। সুতরাং পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে অন্যূন বর্তমান রাজস্বের হারে বাংলা ও বিহারের সমস্ত জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা কোম্পানিকে দেওয়া হোক।"

ফিলিপ ফ্রান্সিসের মতোই আলেকজাণ্ডার ডাও বিশ্বাস করেছিলেন যে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানির মুলুকে রামরাজ্য গড়ে উঠবে। "সম্পত্তির নিশ্চয়তা এলেই কৃষিতে সুফল দেখা যাবে। কৃষকেরা নিজ নিজ জমিতে প্রভূত উন্নতি ঘটাবে। রাজস্ব আদায়ের নাম করে যে উৎপীড়কের দল দেশের প্রাণশক্তি শোষণ করে নিচ্ছে, তাদের পিছনে মোটা টাকা খরচ না করেও নিয়মিতভাবে খাজনা আদায় হবে······কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা দেশের চেহারা বদলে যাবেঃ ইতস্তত ছড়ানো শহরগুলির জায়গায়——সুসমৃদ্ধ মহানগর সব গড়ে উঠবে। ভারতবর্ষের চারিদিক থেকে লোক ধনরত্ন নিয়ে এসে জড়ো হবে বাংলাদেশে ; মুদ্রার ঘাটতি আর থাকবে না, দেশের শিরায় শিরায় বইবে বাণিজ্যের স্রোত, শিল্পের এত উন্নতি হবে যে তেমন আর কেউ দেখেনি।"[২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বিতীয় উল্লেখ দেখা যায় ১৭৭২ সালে প্রকাশিত এইচ্‌ পাতুল্লো প্রণীত পুস্তিকায় ("অ্যান্‌ এসে আপ অন্‌ দি কাল্‌টিভেশান অব্‌ দি ল্যাণ্ডস্‌ অ্যাণ্ড ইম্‌প্রুভমেণ্ট অব্‌ দি রেভেনিউজ অব্‌ বেঙ্গল")। এই রচনাটির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে লেখক ইজারাদারির কুফলগুলির সঙ্গে সমকালীন ফ্রান্সের কৃষিসংকটের তুলনা দিয়েছেন, এবং জমিতে ব্যক্তিস্বত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তিনি যে-ভাবে কৃষি ও বাণিজ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তি বিস্তার করেছেন তাতে মনে হতে পারে যে ফরাসী প্রাকৃতধনবাদী অর্থনৈতিক আদর্শ থেকেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

ডাও ও পাতুল্লোর মতামতের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য এইটুকুই যে তাঁরা এত আগেই বুঝেছিলেন যে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যস্বার্থের প্রয়োজনে পুনর্গঠন করা দরকার। কিন্তু কোম্পানির শাসননীতির উপর এই ধারণা তখন কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি, কারণ ব্রিটিশ অর্থনীতির ভারসাম্যে যে গুরুতর পরিবর্তন না এলে এই নবোদ্ভিন্ন আদর্শকে বাস্তব করে তোলা সম্ভব নয় তা ঘটতে তখনও বেশ কিছুদিন বাকি। সাম্রাজ্যের একটি বিরাট স্তম্ভ যখন আমেরিকায় ধ্বসে পড়ল এবং তার ফলে পুরানো ধরনের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জঞ্জাল ডিঙিয়ে অবাধবাণিজ্যস্বার্থের নিশ্চিত অগ্রগতির রাস্তা খুলে গেল, তখনই শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনেরউপযোগী বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হলো। তাই এই নতুন ব্যবস্থার উৎপত্তির ঐতিহাসিক

তারিখ ১৭৭০-৭২ নয়, ১৭৭৬ সাল ; এবং ডাও ও পাতুল্লো তার আদি প্রবক্তা হলেও মূল প্রবর্তক হিসাবে ফিলিপ ফ্রান্সিসই ইতিহাসে স্বীকৃত।

ফিলিপ ফ্রান্সিস

ইতিহাসের পণ্ডিতরা ফিলিপ ফ্রান্সিসের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণত তুরকম রায় দিয়ে থাকেন। একদল লেখক তাঁর সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রসঙ্গকে বড়ো করে দেখেন ; ফলে ফ্রান্সিসকে প্রধানত শঠ ক্ষমতালিপ্স কুচক্রী রূপেই চিত্রিত করা হয়। আরেকদল লেখক কোম্পানির শাসন যন্ত্রটিকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে কৌশলে পরিচালনা করার ব্যাপারে হেস্টিংসের আশ্চর্য দক্ষতার কথা মনে রেখে ফ্রান্সিসেকেও অনুরূপ উৎকর্ষের মাপকাঠিতে বিচার করার চেষ্টা করেন, ফলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে ফ্রান্সিস এক কাণ্ডজ্ঞানহীন অবান্তর তত্ত্ববাগীশমাত্র। তু পক্ষের রায়ের মধ্যে প্রধান ভুলটা হচ্ছে এই যে ফ্রান্সিসের ব্যক্তিত্বকে তার সমগ্র ঐতিহাসিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ নেহাত একপেশে হয়ে পড়ে।

ফ্রান্সিস যে হেস্টিংসকে তাঁর উন্নতির পথে কাঁটা বলে মনে করতেন এবং এই কাঁটাটি তুলে ফেলার জন্য রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব রকম চেষ্টাই তিনি করেছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কলকাতায় বসে সুদীর্ঘ অভিযোগপত্র গোপনে বিলাতে পাঠিয়ে, সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা মন্ত্রণা দিয়ে অনুচরদের সাহায্যে পার্লামেন্টের নানা মহলে কলকাঠি নেড়ে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরি করার চেষ্টায় তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, লাট পরিষদের সভায় প্রথম বিতর্ক থেকে শুরু করে পার্লামেন্টে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারের শেষ অধিবেশনটি পর্যন্ত তিনি প্রতিপক্ষকে মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হতে না দিয়ে যেমন একাগ্রভাবে শরসন্ধান করে গেছেন, তার ইতিহাস নিয়ে একখানি আধুনিক মুদ্রারাক্ষস রচনা করা চলে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে এই যে তাঁর এই জটিল উপদলীয় চক্রান্তকে তিনি আগাগোড়া একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করেছেন এবং সেই নীতি থেকে কখনোই বিচ্যুত হয় নি। হেস্টিংস-ফ্রান্সিস বিবাদের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাই সোফিয়া ওয়াইট্জম্যান বলেছেন

যে "এই দ্বন্দ্বের গোড়ায় ছিল এমন এক মৌলিক নীতিগত সংঘর্ষ যারই ফলে প্রাচ্যের এক স্বৈরতন্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন মোগল-ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যব্যবস্থায় পরিণত হতে পারত।"৩

ফার্মিংগার ও ওয়াইট্‌জম্যান উভয়েই অবশ্য ফিলিপ ফ্রান্সিসের তাত্ত্বিক ধারণাগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিশ্লেষণেও সমস্যার গোড়ায় টান পড়ে নি। একথা দুজনেই বারবার বলছেন যে ফিলিপ ফ্রান্সিসের ভাবাদর্শ প্রাক্‌বিপ্লবী ফরাসী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু আঠারো শতকের শেষপর্বের ঐতিহাসিক অবস্থায় বাংলা-দেশের অর্থনীতি ও শাসনরীতিকে এই আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠন করার প্রয়োজন কেন অনিবার্যভাবেই অনুভূত হয়েছিল, সে কথা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা তাঁরা করেননি। ফলে তাঁদের বিশ্লেষণও শেষ পর্যন্ত ফিলিপ ফ্রান্সিসের ব্যক্তিত্ব বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তফাত শুধু এই যে পূর্বোক্ত লেখকেরা মনে করেন স্বার্থান্বেষাই ফ্রান্সিসের চিন্তা ও কর্মের চালিকা শক্তি আর ওয়াইটজম্যান প্রমুখের মতে তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অলীক তত্ত্ববিলাস।

কোম্পানির প্রথম যুগের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের একটা মস্ত বড়ো অমিলের কথা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা দরকার। ক্লাইভ, ভেরেল্‌স্ট, কার্টিয়ার ও হেস্টিংস প্রত্যেকেই অতি অল্প বয়সে কোম্পানির কনিষ্ঠ কেরানী পদে এদেশে তাঁদের জীবন শুরু করেছিলেন। বাংলার লাট হবার আগে শেষোক্ত তিনজনকে যথাক্রমে এগারো, বিশ ও তেইশ বছর ধরে নানা অধস্তন পদে চাকরি করে কাটাতে হয়েছে! ফলে তাঁদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম যৌবন থেকেই কোম্পানির শাসনব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে গড়ে ও বেড়ে উঠেছে; সুতরাং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত কর্মচারী হিসাবে কোম্পানির আমলাতন্ত্রের ভালোমন্দ সবকিছুই তাঁদের উপর গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। তাই একদিকে যেমন কোম্পানির স্বার্থ তাঁরা খুব খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টা করতেন এবং সেই স্বার্থসাধনের জন্য যতটুকু যোগ্যতা দরকার তাও তাঁদের ছিল, অপরদিকে সঙ্কীর্ণ আমলাতান্ত্রিক প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে কোম্পানিস্বার্থের চেয়েও বৃহত্তর রাজনৈতিকস্বার্থের গুরুত্ব ধারণা করা তাঁদের

পক্ষে অসম্ভব ছিল। এইদিক থেকে কোম্পানির দায়িত্বশীল কর্মচারীর মডেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

ফিলিপ ফ্রান্সিস একেবারেই ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং তাও সামান্য কর্মচারী হিসাবে নয়, পার্লামেণ্টারী সুপারিশের জোরে মনোনীত লাটপরিষদের সদস্য হিসাবে। তিনি ও অন্যান্য সদস্যরা যখন কলকাতা পৌঁছলেন তখন তাঁদের তোপধ্বনি দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। তাছাড়া বাংলাদেশে আসার এক যুগ আগে থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল। ১৭৬১ সালে পিটের সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর হাতেখড়ি হয়। হুইগ ও র‍্যাডিক্যাল দলের কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। "জুনিয়াস লেটার্স" লিখে তিনি রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধে হাত পাকিয়েছিলেন। সুতরাং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না; বরং সর্বদাই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার একটা ঝোঁক ছিল। এইখানেই হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। হেস্টিংস কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে গোড়া থেকেই তার শাসনব্যবস্থার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন; ফ্রান্সিস পেশাদার পলিটিশিয়ানের মতো গোড়া থেকেই নিজেকে ঐ শাসন ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র রেখেছেন। হেস্টিংসের কাছে কোম্পানির স্বার্থই বড়ো কথা, একমাত্র কথা; ফ্রান্সিসের কাছে ব্রিটিশ রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থই সবচেয়ে বড়ো। যেহেতু এই যুগেই কোম্পানিস্বার্থের সঙ্গে ব্রিটেনের রাষ্ট্রিক স্বার্থের একটা মৌলিক সংঘর্ষ গড়ে উঠছিল, তাই হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসের বিবাদও দুই পরস্পর-বিরোধী মূলনীতির সংঘর্ষে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনাকে উপলক্ষ্য করেই এই আদর্শগত সংঘাত প্রকাশ পায়; তাই বাংলার ভূমিসমস্যার এই বিশেষ ইতিহাসকে তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে আলাদা করে বিচার করলে অবাস্তব হয়।

এদেশের ভূমিসমস্যা আঠারো শতকের ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ভাগ্যের সঙ্গে যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল, এই সমস্যা সম্পর্কে ফিলিপ ফ্রান্সিসের মতামতও ঠিক তেমনি সমকালীন ইউরোপের ভাবাদর্শের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। ফ্রান্সিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তত্ত্বটিকে তাই তাঁর সমগ্র ধ্যান-

ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার না করলে বিশ্লেষণের গোড়ায়ই একটা প্রকাণ্ড গলদ থেকে যায়।

ফ্রান্সিসের বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা ইত্যাদি নানা রচনার মধ্যে তাঁর চল্লিশবৎসরব্যাপী চিন্তাধারার বিশদ পরিচয় আছে, সহজেই তাকে তখনকার দিনের বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল আদর্শের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের সগোত্র বলে চেনা যায়। ফ্রান্সিস প্রচুর লিখতেন, তাই প্রমাণের অভাব নাই। তাছাড়া, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশের মধ্যে একটা ধারাবাহিক সঙ্গতিও আছে, ফলে বিশ্লেষণও সহজ। সঙ্গতিগুণ ফ্রান্সিসের চিন্তা ও কর্মজীবনের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য, কারণ সেযুগের ইংরাজ পলিটিশিয়ানরা রাজনৈতিক মতামতের অসঙ্গতিকে মোটেই পাপ বলে মনে করতেন না। মার্কিন সাম্রাজ্য হাতছাড়া হতেই উইলিয়ম পিট ভয়ে ভয়ে অবাধবাণিজ্যবাদ পরিহার করেছিলেন; ফরাসী বিপ্লব শুরু হতেই ফক্স ও বার্ক তাঁদের প্রাক্তন উদারনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে রাতারাতি রাজতন্ত্রের সমর্থক বনে গেলেন, কিন্তু ফ্রান্সিসের হাঁটুর জোর ছিল, হুইগ ইংল্যাণ্ডের কুটিল দলাদলি ও সহজ আদর্শচ্যুতির মধ্যেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূল থেকে সরে যাননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার স্বাধীনতা, ফরাসী বিপ্লব, অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও ইংল্যাণ্ডের ঘরোয়া রাজনীতির কয়েকটি মূল প্রসঙ্গে তাঁর মতামত আলোচনা করা যেতে পারে।

আমেরিকা প্রসঙ্গে

প্রথম যৌবনে ফ্রান্সিস "এই দৃঢ় মত পোষণ করতেন যে উপনিবেশের উপর কর চাপাবার অধিকার মাতৃদেশের আছে," এবং 'বোস্টন টি-পার্টির' খবর তাঁকেও খুব উত্তেজিত করেছিল।[৪] কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েক মাস আগে থেকেই তাঁর মতামতে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ১৭৭৬ সালের ২২শে জানুয়ারি কলকাতা থেকে তিনি এক চিঠিতে লেখেন:

> "ইংরাজের হাতে ইংরাজের এই রক্তপাতের দ্বারা যে কোন নৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে তা আমি বুঝি না। রাজস্ব? আমেরিকার উপর একশো বছর ধরে প্রত্যক্ষ কর চাপালেও বর্তমান অস্ত্র-সজ্জার খরচ উঠবে না। বাণিজ্য? তোমাদের নৌবহরই সমুদ্র

শাসন করছেঃ আমেরিকানদের তা নেই, হবার সম্ভাবনাও নেই ভবিষ্যতে। এর কোনটিই যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সাম্রাজ্যের সার বাদ দিয়ে কেবল তার বাইরের ঢংটা নিয়েই লড়াই হচ্ছে; আর তাতে যদি হাজার হাজার লোকের রক্তক্ষয় হয় এমনকি সাম্রাজ্যের ভিতসুদ্ধ নড়ে যায় তাতেও যেন আপত্তি নেই।…খালি বাইরের ঢং দিয়েই কোনও জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করা উচিত নয়।"[৫]

লক্ষ্য করুন যে এই চিঠির তারিখ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে লাট কাউন্সিলে পেশ করা ফ্রান্সিসের বিখ্যাত দলিলটির তারিখ একই। সেই দলিলেও তিনি সাম্রাজ্যনীতির একটি নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন, বস্তুত বাংলার জমিদারি বন্দোবস্তকে তিনি একটা নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হিসাবেই ধারণা করেছিলেন। আমেরিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয় এদিক থেকে তাঁকে যে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল তা উল্লিখিত বক্তব্য থেকে অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

পরে পার্লামেণ্টেও তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর মত ঘোষণা করেছিলেন। র‍্যাডিকালদের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর মতের মিল খুবই স্পষ্ট।

ফরাসী বিপ্লব প্রসঙ্গে

ফিলিপ ফ্রান্সিসের রাজনৈতিক সৎসাহসের বিস্ময়কর প্রমাণ মেলে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর মনোভাবে। এই প্রমাণের তাৎপর্য যে কত গভীর তা বলাই বাহুল্য। কারণ ফরাসী বিপ্লব ও ফরাসী রাষ্ট্রের প্রতি কার কতখানি আনুগত্য তাই ছিল সে যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে কার কতখানি নিষ্ঠা তা বিচারের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি, যেমন হয়তো বলা যায় যে অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি কার কি মনোভাব তাই হচ্ছে আমাদের যুগে শ্রমিকস্বার্থের প্রতি কার কত নিষ্ঠা তা যাচাই করার নিভু‍ল কষ্টিপাথর।

আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংল্যাণ্ডের তরুণ রাজনৈতিক নেতারা অনেকেই র‍্যাডিকাল মতামতের বেলুন উড়াত আসলে জনমতের

সাহায্য নিয়ে রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ধাক্কায় তাদের সেই ভণ্ডামির মুখোশ খুলে পড়ে, কারণ "র‍্যাডিকালরা সকলেই তখন বাধ্য হলো এই ঘটনার প্রতি, এবং প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাদের মতামত পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে।"[৬] ফলে, সঙ্কীর্ণ দলাদলি ও নীতিবর্জিত সুবিধাবাদের ভিত্তিতে এতদিন যে ঐক্য বজায় ছিল র‍্যাডিকাল আন্দোলনের মধ্যে তা এবার ভেঙে গিয়ে দুটি পরস্পর-বিরোধী মত দেখা দিল। দক্ষিণপন্থীরা চার্লস জেম্‌স ফক্সের নেতৃত্বে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। বার্ক নিজে র‍্যাডিকাল দলের সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু এতকাল তিনি নানা বিষয়ে তাদেরই মতো প্রগতিবাদী ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর বাগ্মিতা সকলের গলা ছাপিয়ে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হল। এমনকি টোরিরা পর্যন্ত বার্ককে বাহবা দিতে লাগল। প্রতিক্রিয়ার এই প্রতিযোগিতার মধ্যেও যাঁরা সেদিন বিশ্বাস হারাননি, সেই মুষ্টিমেয় ইংরেজ পলিটিশিয়ানদের মধ্যে ফিলিপ ফ্রান্সিস অন্যতম।

বার্ক ও ফ্রান্সিস হরিহরাত্মা ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে বার্ক পার্লামেন্টে ও সারা দেশে যে নাম কিনেছিলেন তার পিছনে ছিল ফিলিপ ফ্রান্সিসের তালিমের জোর। সেই বার্কের লেখা "রিফ্লেকশান্‌স অন্‌ দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশনের" খসড়া পড়ে ফ্রান্সিস যে চিঠি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

> "আপনার বন্ধু অনেকেই, কিন্তু নিশ্চিত জানি যে এসব কথা নিয়ে আপনার মতের সরাসরি প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করার সাহস শুধু আমারই আছে।……
>
> ফরাসী রানীর সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা নেহাত চালিয়াতি মাত্র। নাকি আপনি এমনই সৌন্দর্যের পূজারী যে খব্‌সুরত দেখলে যে কোনও ব্যভিচারিণীর পক্ষেই তলোয়ার খুলে লড়ে যেতে রাজি আছেন? আমার একান্ত অনুনয় যে একবার ফিরে তাকান, গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখুন যে এই ভূমিকা আপনার সাজে কিনা। আপনি নিজের

ক্ষতি করতে যাচ্ছেন তা যেন হাতে ছোঁওয়া যায়, আমি তা প্রায় স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি……”

বার্ক স্বীকার করেছেন যে এই চিঠি পেয়ে তাঁর সারারাত ঘুম হয়নি।[৭]

ফিলিপ ফ্রান্সিসের জীবনী-লেখক পার্কস্ ও মেরিভেল্‌ও বলেছেন যে ফরাসী বিপ্লবের বিষয়ে ফ্রান্সিসের মনে গোড়া থেকেই কোনও দ্বিধা ছিল না। “আঁসিয়ে রেজিম্ ফ্রান্সে যে সর্বনাশ করেছে এবং স্বৈরতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সাধারণ কুফল সম্পর্কে তাঁর সংস্কার ও সুচিন্তিত ধারণা দুয়েরই খুব সুতীব্র প্রকাশ দেখা যায় তাঁর প্রথম দিকের রচনাবলীতে। সাংবাদিকতায় ও রাজনীতিতে তাঁর ষাট বছরের কর্মজীবনে কখনও এই সব প্রসঙ্গে এতটুকু দ্বিধা বা পরিবর্তন দেখা যায়নি। তাঁর রচনার কোথাও বিপ্লবীদের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি একটি লাইনও লেখেননি; কিন্তু বাড়াবাড়ি ছিল বলেই তাঁদের সংগ্রামের ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে যুক্তি হাজির করা হয় তাও তিনি কখনও স্বীকার করেননি।”[৮]

শুধু ফরাসী বিপ্লবকেই নয়, সংগ্রামসিদ্ধ নতুন বুর্জোয়া রাষ্ট্রকেও তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৭৯১ সালে ফ্রান্স সফরের পর তিনি তাঁর বন্ধু ডয়েলিকে যে চিঠি লেখেন (৪ঠা অগাস্ট, ১৭৯১), তা উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা, সম্ভাবনা ও সৃজনী প্রতিভায় তাঁর গভীর প্রত্যয়ের স্বাক্ষর। ফ্রান্সিসের অগ্রসর ভাবাদর্শের মৌলিক পরিচয় হিসাবে এই চিঠির একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হলো:

“আমি যথাসাধ্য সব কিছুই স্বচক্ষে, বিচার বিবেচনা করে, সন্ধান করে দেখেছি; এবং দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারি যে এক উত্তর আমেরিকার কথা বাদ দিলে ফ্রান্সের পক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এদের এখনও অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হবে কিন্তু প্রয়াস, প্রতিবন্ধ ও বিপত্তি ছাড়া পৃথিবীতে মহান্ ও গরীয়ান্ কিছু কখনও সম্ভব হয়েছে কি? বিশ্বাস করুন যে ওরা ঠিকই জানে যে কী কাজ ওরা হাতে নিয়েছে, এবং যে সব অসার সমালোচনা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এত বাড়াবাড়ি করা হয়, বাহবা দেওয়া হয়, তা শুনে ওরা হাসে। অবশ্য বাইরে থেকে হামলা হলে কি দাঁড়াবে জানিনা, তবে তার কোনও লক্ষণ

তো আমি দেখছি না। ...সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে দেশের স্বার্থে যা কিছু করা সম্ভব, আমার মতে ন্যাশনাল এসেম্বলি তা করছে।"[৯]

ফ্রান্সিসের অনুমানে সামান্য ভুল ছিল। নতুন বিপ্লবী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের বিপদকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। ১৭৯৩ সালে ইংরাজ সরকারই যখন এই অভিযানে উদ্যোগী হয় তখন পার্লামেণ্টে বিপুল সংখ্যাধিক্যের মত উপেক্ষা করে যে ছেচল্লিশ জন সদস্য ফ্রান্সের প্রতি বৈরীনীতির বিরোধিতা করেছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁদের অন্যতম। জন ব্রিস্টোর কাছে এক চিঠিতে (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৩) তিনি তখন লেখেন যে মিত্ররাষ্ট্ররা যদি ভেবে থাকেন যে ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা তাঁদেরই কর্তব্য, তাহলে উনিশ শতকের আগে আর ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই।[১০] অন্তত এই বিষয়ে ফ্রান্সিস কোনও ভুল করেননি।

সাধারণতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাস

উনিশ শতকের প্রারম্ভে যখন সারা ইউরোপের দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় শুরু হলো সেই যুগে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ফ্রান্সিসের এই আনুগত্য স্বভাবতই সাধারণতন্ত্রী বিশ্বাসে (রিপাব্লিকানিজ্ম) পরিণত হয়ঃ ফ্রান্সিসের মানস ইতিহাস যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ক্রমবিকাশের সূত্র অনুযায়ী বিবর্তিত হয়েছে এই তার আরেকটি দৃষ্টান্ত। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র কর্তৃক ইউরোপীয় জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হরণের তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানান। ১৮১২ সালে যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের সম্মিলিত জেহাদ চলছে তখন তিনি "কোয়ালিশনের" তিন প্রধান শক্তি রাশিয়া ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার সমালোচনা করে লর্ড থেনেটের কাছে লেখেন (৬ই সেপ্টেম্বর ১৮১২) যে রাশিয়ার পক্ষে ইউরোপে ও ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করার চেষ্টা দুই-ই সমান অযৌক্তিক। রাশিয়া যে ভাবে লিভোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে "গত একশো বছরে এই বর্বরেরা ইউরোপের যে-দেশেই প্রবেশ করেছে সেখানেই তারা অধিবাসীদের উপর দস্যুতা, দাসত্ব ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে।" প্রাশিয়া কর্তৃক হল্যাণ্ড ও

শ্যাম্পেন আক্রমণের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই যে, "প্রাশিয়ানরাও প্রায় ঐ একই ধরনের বর্বর দস্যুদলের পর্যায়ভুক্ত।"[১১]

নেপোলিয়নের ভূমিকা সম্পর্কেও ফিলিপ ফ্রান্সিসের মন্তব্য বেশ লক্ষ্য করার মতো। উল্লিখিত পত্রেই তিনি নেপোলিয়নকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়তির অভিশাপ, "প্রতিহিংসার দানবীয় দূত" বলে বর্ণনা করেন। নেপোলিয়নের হাতে প্রাশিয়ার পরাজয়ে তিনি অধর্মেরই পরাজয় দেখেছিলেন: "কোন জাতির পক্ষে যদি নৈতিক অপরাধের ভাগী হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে বলতে হবে যে (প্রাশিয়ার) এই শাস্তি খুবই পাওনা ছিল।" নেপোলিয়ন "হয়তো পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন," এই আশা প্রকাশ করে ফিলিপ ফ্রান্সিস উনিশ শতকে জাতীয় রাষ্ট্রাধিকার প্রবর্তনের আন্দোলনে নেপোলিয়নের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় সঠিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

১৭৯০ সালের পরে ইংল্যাণ্ডের ঘরোয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সিস বামপন্থী র‍্যাডিকালদের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ফরাসী বিপ্লবের পক্ষে এবং মিত্রপক্ষ কর্তৃক সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা, নাগরিক স্বাধীনতা ও ভোটাধিকার প্রসারের দাবি, হেবিয়াস কর্পাস রদের প্রতিবাদ এবং দাস-ব্যবসায় ঘুচানোর জন্য বামপন্থী র‍্যাডিকালরা প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনের ভিত্তিতে যে কটি বড়ো বড়ো আন্দোলন চালায়, তার প্রত্যেকটিরই সঙ্গে ফ্রান্সিস খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। "সোসাইটি অব্ ফেণ্ডস্ অব্ দি পিপ্ল" নামক র‍্যাডিকাল প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। পার্লামেন্টেও ১৭৯০-৯৬ সালে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, পার্লামেন্টের সংস্কার, দাস-ব্যবসায় ও ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন।[১২]

আন্তর্জাতিক ও ব্রিটিশ রাজনীতির নানা প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের মতামতগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে তিনি সামন্তবাদের পতনের যুগে উদীয়মান বুর্জোয়া ভাবাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে যে যুক্তিবাদী বুর্জোয়া

চিন্তানায়কেরা আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের সূচনা হিসাবে ভাবাদর্শের জগতেও এক মহাপ্রলয়ের ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন, ফ্রান্সিস তাঁদেরই শিষ্য। তাই এমনকি ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর বহু রচনায় তিনি বারবার মঁতাস্ক্যু, কেজ্‌নে, তুর্গো প্রভৃতি মনীষীদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সোজাসুজি ঋণ স্বীকার করে গেছেন। সুতরাং তাঁর প্রেরণার উৎস কোথায় এবং তাঁর ধ্যানধারণার মূল সামাজিক ভিত্তি কী সে সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে না।

শুধু প্রশ্ন এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনায় তিনি তাঁর বুর্জোয়া আদর্শগুলি কিভাবে, কতখানি বা আদৌ ব্যবহার করেছিলেন কি না।

[ক্রমশ

(১) মিল্ : "হিষ্ট্রি অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" (৪র্থ খণ্ড), ৩৮৪ ॥ (২) ডাও : "হিষ্ট্রি অব্ হিন্দোস্তান" (৩য় খণ্ড), ৮৪-৫ ॥ (৩) ওয়াইট্‌জম্যান : "ওয়ারেন হেষ্টিংস য়্যাণ্ড ফিলিপ ফ্রান্সিস", ১ ॥ (৪) পার্কস্ ও মেরিভেল : "মেময়াস অব্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস" (১ম খণ্ড), ১৬২ ॥ (৫) সি. ডয়েলিকে (২২ শে জানুয়ারী ১৭৭৬) : "দি ফ্রান্সিস" লেটার্স" (১ম খণ্ড), ২৪৯ ॥ (৬) প্লম্বে : "ইংল্যাণ্ড ইন্ দি এইটিন্‌থ সেঞ্চুরী", ১৪৬ ॥ (৭) "দি ফ্রান্সিস লেটার্স" (২য় খণ্ড), ৩৭৭-৮০ ॥ (৮) পার্কস্ ও মেরিভেল্ : ঐ (২য় খণ্ড), ২৮০-১ ॥ (৯) "দি ফ্রান্সিস লেটার্স", (২য় খণ্ড), ৩৯০ ॥ (১০) ঐ, ৪০৪ ॥ (১১) ঐ, ৬৬৭-৮ ॥ (১২) পার্কস্ ও মেরিভেল : ২৮০ ॥

সমালোচনা

কানাগলির কাহিনী ॥ অচ্যুত গোস্বামী ॥ র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, কলিকাতা ॥ সাড়ে চার টাকা ॥

বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ॥ নারায়ণ সান্যাল ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিঃ ॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

সাম্প্রতিক সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তার কারণ নিয়ে মতদ্বৈধ হতে পারে, কিন্তু যেটি অত্যন্ত স্পষ্ট তা নিয়ে বিতর্কের কোনই অবকাশ নেই। তা হচ্ছে, দ্রুত-পরিবর্তিত বাঙালী সমাজজীবনের সমগ্র চরিত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব; দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, সর্বোপরি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ—গত দশ বছর ধরে একটার পর একটা আঘাত আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত ও জটিল করে তুলেছিল। এই বিপর্যস্ত ও জটিল জীবনের স্বরূপ বুঝে ওঠা যে খুবই কষ্টসাধ্য তা স্বীকার করতেই হবে। বুদ্ধি দিয়ে হয়তো তা অনেকেই বুঝি, আর বুঝি কি নির্মম, কি ভয়ঙ্কর তার স্বরূপ। কিন্তু হৃদয় এই ভয়ঙ্কর স্বরূপকে স্বীকার করতে ভয় পায়। শুধু তাই নয়, তাকে ভুলতে চেষ্টা করে। ভুলতে না পারলেও, সাময়িকতার গণ্ডী দিয়ে তাকে বেঁধে স্বস্তির পথ খোঁজে। আমরা ভাবতেই চাই না, যাকে সাময়িক মনে করি তা যে কতদূর বাস্তব কত গভীর সত্য; আর, তা কেমন

করে আমাদের অমোঘ ভবিতব্যের নিদেশ দিচ্ছে। এই বিপর্যস্ত জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম এই জীবনেই মহাকাব্যের উপাদান দিনে দিনে কতখানি জড়ো হয়ে উঠছে।

ছিন্নমূল বিপর্যস্ত উদ্বাস্তুজীবন এমনি একটি উপাদান। এই অতিপরিচিত অতিআলোড়িত অথচ অতিউপেক্ষিত 'পতিত' জীবন আবাদ করলে সত্যিই সোনা ফলত। এ জীবনের ক্লেদ, গ্লানি, মূল্য হারানোর মালিন্য আর প্রাণশক্তির অপচয়ে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি এর বেদনা, নূতন মূল্যবোধের গৌরব আর প্রাণশক্তির আত্মপ্রকাশের অদ্ভুত প্রয়াস। সমগ্র দৃষ্টিতে এ জীবনের স্বরূপ বুঝে ওঠা কঠিন, খুবই কঠিন, সাহিত্যে তার প্রকাশ আরও কঠিন। কিন্তু এত কঠিন বলেই দায়িত্ব রাজনীতিকের চেয়ে সাহিত্যিকেরই বেশি। আশার কথা, অতি সম্প্রতি একদল সাহিত্যিকের দৃষ্টি এদিকে পড়তে শুরু করেছে। তার প্রমাণ দুজন নবাগতের দুখানি উপন্যাস—অচ্যুত গোস্বামীর 'কানাগলির কাহিনী' এবং নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি, এল, ক্যাম্প'।

অচ্যুত গোস্বামী নবাগত অর্থে উপন্যাসের ক্ষেত্রে নবাগত। বিদগ্ধ সমালোচক ও পণ্ডিত প্রবন্ধকার হিসাবে তিনি বহুপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর, একটু অতিশয়োক্তি হলেও 'কঠঠর' পণ্ডিত ভি জে জেরোম-এর 'দি ল্যান্টার্ণ ফর্ জেরেমি'র মতোই বিস্ময়কর।

কানাগলির কাহিনীর স্থান মানিকতলা অঞ্চলের এক জবরদখলকরা বাগানবাড়ি। কাল উনিশ শ সাতচল্লিশের শেষ থেকে উনিশ শ পঞ্চাশের গোড়ার দিক পর্যন্ত। পাত্রপাত্রী একদল মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু নরনারী। বাড়িখানার দোতলার প্রতিটি ঘরে একটি করে গোটা পরিবার, নীচের বাসিন্দা একদল ধোপা, তারাও উদ্বাস্তু। এতগুলি উদ্বাস্তু পরিবারের মুখ্যত মাথা গুঁজবার ঠাঁই বজায় রাখবার সংগ্রামই 'কানাগলির কাহিনী'র কাহিনী। এ কাহিনীর নায়ক কল্যাণদা, অর্থাৎ কল্যাণ সেন নামধারী মফঃস্বলের এক আদর্শবাদী কংগ্রেসসেবক। স্বাধীন দেশের সরকারের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, অটুট আস্থা; মানুষের উপরেও তাঁর অগাধ ভালবাসা। দেশত্যাগের সময় তিনি ভেবেছিলেন নতুন পরিবেশে নতুন করে জীবন গড়ে

তুলবেন। কিন্তু এই বাড়ির সর্বশেষ আগন্তুক বাসিন্দা হলেও নিজের স্বভাবের দোষে (?) 'দাদা' হয়ে পড়লেন।

ঘরে ঘরে বিচিত্র পরিবার, বিচিত্র তাদের রুচি ও শিক্ষা ; কেউ স্বার্থপর, কেউ ভালো, কেউ মন্দ, একদল কর্মহীন তরুণ—পটল, রবি, শচীন, কাটাকাপড়ের ব্যবসায়ী অটল, একদল তরুণী—কল্যাণবাবুর মেয়ে সুনন্দা, মনোরমবাবুর মেয়ে ছন্দা, সুধীনবাবুর ভাইঝি আলতা, অক্ষম স্বামীর ম্যাট্রিক-পাশ-করা স্ত্রী সুধা, অটলের কলেজে-পড়া বোন-তটিনী। আর, নীচের তলায় ধূর্ত রজক লক্ষ্মণ, সোডার চোরাকারবারী রুক্মিণী, তার স্বামী হরেকেষ্ট, লক্ষ্মণের ছেলে পরান। পরিবারে পরিবারে রেষারেষি, নীচতা জীবনের শ্রীহীনতা! ঘৃণা বিদ্বেষ ভালবাসা, নারীপুরুষের অর্থনৈতিক জীবনে স্বাবলম্বী হবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, বিকৃত যৌনক্ষুধার অশ্লীল প্রকাশ! তবু বাড়ির মানুষগুলোর বিচিত্র জীবনের একটা সমভিত্তি আছে, একটা ঐক্যের সূত্র আছে। তা হচ্ছে, সকলেই বাঁচতে চায়, সকলেই প্রতিষ্ঠ হতে চায়, মাথা গুঁজবার ঠাঁই চাই সকলেরই। ঐক্যের এই সূত্র অজানিতে এসে পড়ল কল্যাণবাবুর হাতে। জীবন তার প্রকাশের পথ খুঁজে নেবেই, কল্যাণবাবু জীবনশক্তিতে বিশ্বাসী, তাঁর প্রাণশক্তিও প্রচুর। তাই এই আবেষ্টনীতে অতি সহজেই তিনি হয়ে পড়লেন নেতা। তিনি মফঃস্বলের কংগ্রেস নেতা, সরকার আর তার মতিগতির খবর তিনি সকলের চেয়ে ভালো রাখেন। বাড়িখানার উপর তাঁদের দাবি পরীক্ষা শুরু হল। কল্যাণবাবু সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও নিলেন—একটি সমবায়ের পরিকল্পনা। কাজে নেমে একটার পর একটা আঘাত আসে, কিন্তু কল্যাণবাবু অবিচল, সরকারের উপর তাঁর আস্থা টলবার নয়। কিন্তু এমন এক একটা পরিস্থিতি সামনে এসে দাঁড়ায় যে তাঁর আদর্শবাদ, জীবনব্যাপী বিশ্বাস দিয়েও তার স্পষ্ট অর্থ খুঁজে পান না। মনুষ্যত্বের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তিনি নিরন্তর পরিশ্রম করে যান। পারমিট, কনট্রাক্ট আর লাখ টাকা রোজগারের গোপন পন্থার সন্ধান পেয়েও অভাবী মানুষ কল্যাণ সেন বারবার প্রত্যাখ্যান করেন, বারবার সৎপথে থাকার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল, বাড়িতে তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠিত হল না, সমবায় পরিকল্পনা বানচাল হল, তাঁর হাতে গড়া ইস্কুলে তিনি অপমানিত হলেন,

তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত আস্থা পরাজিত হল। তিনি হার মানলেন : কিন্তু ভূতপূর্ব কল্যাণ সেন হার মানলেও জন্ম হল নতুন কল্যাণ সেনের, নিজের অজানিতেই তিনি কখন পালটে গেলেন, পালটে গেল মূল্যবোধ। অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিচিত্র দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবসত্তার পরিবর্তনের ছবি আঁকা ঔপন্যাসিকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, সেই কৃতিত্ব আরও বড় হয়ে ওঠে যদি সেই পরিবর্তন হয় মহত্তর জীবনে উত্তরণ। কল্যাণ সেনের চরিত্র সৃষ্টিতে অচ্যুতবাবু নিঃসন্দেহে সেই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। দাবি করতে পারেন আরও এই জন্য যে, এ পরিবর্তন কেবলমাত্র একটি ব্যক্তি-চরিত্রেই সীমাবদ্ধ করেন নি, আরও অনেককে—এক কথায় গোটা 'যৌথ পরিবার'কেই সেই মহত্তর পরিবর্তনের অংশভাক্ করেছেন।

কল্যাণবাবু ও বিভিন্ন চরিত্রের এই পরিবর্তনের ধাপগুলি কোথাও যান্ত্রিক নয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কোথাও চমক নেই, ছোটবড় ঘটনাগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। প্রতিবেশিত্বের অতিনৈকট্যে ও ভাগ্য-বিড়ম্বনার সমসূত্রে গাঁথা মানুষগুলো নিছক বাঁচার তাগিদে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে অজানিতে পরিবর্তিত হয়েছে, পরিবেশকেও পরিবর্তিত করেছে। এই পরিবর্তন কখনো কখনো বা অস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। "কেউ হয়ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'কী ছিলাম, কী হয়েছি।' কিন্তু সেই লোকটিও জানেন, ক্রমরূপায়িত জীবনের আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে তাঁর মনের কোণটিও রসসিক্ত হয়ে উঠেছে।" (পৃ ১১০)। এক কথায় জীবন-রসই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তন কল্যাণবাবু যখন অস্পষ্টভাবে অনুভব করলেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা : "নিজের মধ্যে নতুন কিছুকে আবিষ্কার করার সেই অপরিমিত বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটতে চায় না। বুকটা একটু দুরদুর করছে বৈকি—কল্যাণবাবুর অমন শক্ত বুকও। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।" (পৃঃ ৩৪৪)। এই পরিবর্তন এত স্বাভাবিক এত অবশ্যম্ভাবী যে দারোগার অপমৃত্যুকে যখন বিবর্তনের অমোঘ নিয়মের পর্যায়ভুক্ত করে অতীতের স্বার্থপর মনোরমবাবু বক্তৃতা দিতে বসেন তখন এতটুকু অতিরঞ্জন বা যান্ত্রিক বলে মনে হয় না। কমিউনিস্ট তটিনীর মৃত্যুতে "পটল যখন জিজ্ঞেস করল, মৃত্যুর চেয়ে বেশী করে মরে এমন আর কী আছে, বলতে পারিস, রবি ?"

"রবি বললে, মাইয়াগোর সবই ভাল আছিল। চেহারায় সুন্দর। পড়নে শুননে ভাল। শুধু শেষ কালডায় ভুল কইরা বসল। একেবারে মইর‍্যা না গিয়া যদি জখম টখমও হইত।"

"কাদম্বিনী জিজ্ঞেস করছিলেন, দুগা চাউর্‌গ্যা লাইন পেছনে থাকলে ক্ষেতিডা আছিল কী কনতো দিদি।"

"মনোরমা বলছিলেন, কি জানেন দিদি, আমরা যেখানে বাস করছি, সেটা আর এক দুনিয়া। এখানে কারও জীবন নিরাপদ নয়। ঘরের কোণে লুকিয়ে চৌকির খুঁটি ধরে বসে থাকলেও না।" (পৃঃ ৩৩০)—তখন বিভিন্ন চরিত্রের আলাপের এই বিজ্ঞতা কোথাও পীড়া দেয় না কারণ চরিত্র-গুলোর বিকাশের মধ্য দিয়ে এই বিজ্ঞতা এক উপলব্ধির পর্যায়ে উঠেছে।

এই কাহিনীর একাধিক শাখা আছে যেমন, পরান, রুক্মিণী, সুধা, অমলেন্দু, সুনন্দা-পটলের পৃথক পৃথক কাহিনী, কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও তারা সকলেই মূল কাহিনীর অনুপূরক। কেবল পরান-রুক্মিণীর কাহিনী কথঞ্চিৎ অবান্তর বলে মনে হয়, পরান চরিত্রটি বহুলাংশে অবান্তরও বটে। সুধার চরিত্রের মধ্যে খানিকটা ত্রুটি স্বীকার করতেই হবে। এই চরিত্রটির ঘাত-প্রতিঘাত ও পরিবর্তন একটি সুপরিকল্পিত ছকের মধ্যে পড়ায় তার বিদ্রোহ, দেহবিক্রয়, অমলেন্দুর উপদেশ ও সাহায্যে তার সামাজিক ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন তাই অন্যান্য চরিত্রের চেয়ে অনেক কম উজ্জ্বল। অমলেন্দুর চরিত্রে কাজের চেয়ে কথা বেশী, এটিও ছকে-বাঁধা চরিত্র, সেইজন্যই বর্ণহীন। এগুলি সত্যিকারের ত্রুটি। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতি একেবারে অনুপস্থিত। এটিও মারাত্মক ত্রুটি।

খানিকটা ছকবাঁধা হলেও তটিনী চরিত্রে কিন্তু অবাস্তবতার ত্রুটি স্পর্শ করতে পারেনি। এই চরিত্রটি একদল বিমূঢ় মানুষের সামনে এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে। চরিত্রটির মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি রোমান্টিক কল্পনা মূর্তিলাভ করেছে। কিন্তু এই রোমান্টিক কল্পনা বাস্তবতার বিরোধী কখনোই নয়, যেমন বিরোধী নয় 'সিচুয়েশন' হিসাবে পটল ও সুনন্দার রোমান্টিক মিলন। এই ধরনের রোমান্টিকতা জীবনের বর্ণদ্যুতি, একে বাদ দিলে জীবনের বর্ণবৈচিত্র্যতার উজ্জ্বলতাটুকু হারায় নিশ্চয়ই।

সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও 'কানাগলির কাহিনী' আশ্চর্য সুন্দর একখানি

উপন্যাস, যা পড়ে শুধু তৃপ্তিলাভ করা যায় না গভীরভাবে ভাবতে ভাল লাগে। অসংখ্য খণ্ডকে একত্র করে এক সামগ্রিক জীবনের চিত্র এমন নিপুণ হাতে আঁকা শক্তির নিঃসন্দেহ পরিচয়। আর এই শক্তির প্রকাশ কত বলিষ্ঠ তার প্রমাণ কাহিনীর শেষ দিকের দারোগার অপমৃত্যুর দৃশ্যে।

অচ্যুতবাবুকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে একটি কথা নিবেদন করি। 'কানা গলির কাহিনী'তে যে উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন তা উদ্বাস্তু জীবনের অংশমাত্র। আরও উপাদান একত্র করে তিনি এবার লিখুন রাজপথের কাহিনী; যা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরীর চারপাশে যে নতুন জীবন গড়ে উঠেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় তার তুলনা নেই।

'কানাগলির কাহিনী'র যদি সেই জীবনে যদি উত্তরণ ঘটে তাহলে মহা-কাব্যের সম্মান অর্জন করবে।

পরিশেষে, একটি কথা না বললে নয়, বইখানিতে এত মুদ্রণত্রুটি যে মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'কানাগলির কাহিনী'র পাশাপাশি নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি, এল, ক্যাম্প' হতাশ করবে। উপন্যাসের নামকরণে ও প্রস্তাবে যা মুখ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাই গৌণ, মুখ্য বক্তব্য একটি অতি পুরাতন সেন্‌টিমেন্টাল প্রেমের কাহিনী। উদ্বাস্তু জীবনের স্বরূপটি সম্পর্কে যেমন তাঁর ধারণার অভাব তেমনি অভাব সহানুভূতির। কাহিনীর স্থান একটি পি, এল অর্থাৎ পারমানেণ্ট লায়েবিলিটি ক্যাম্প। এখানকার বাসিন্দারা পঙ্গু এবং সরকারের স্থায়ী পোষ্য। এখানে অ্যাসিস্টাণ্ট এঞ্জিনীয়র এলেন ঋতব্রত বসু, তিনি কর্মঠ, সৎ ও দৃঢ়চেতা; তিনি কবি ও সাহিত্যিক এবং সাহিত্যসাধনার সূত্রে রেখা মিত্তিরের সঙ্গে তাঁর অনির্ণীত ভাগ্য-প্রেমের সম্পর্ক আছে। এখানে তিনি এসে পড়লেন এক অদ্ভুত জগতে। এখানে কনট্রাকটার শঠচূড়ামণি, ডাক্তার লম্পট, সুপারিন্‌টেনডেণ্ট হৃদয়হীন, আর উদ্বাস্তুরা কর্মবিমুখ, ইতর এবং অমানুষ। এখানে তাঁর সংঘর্ষ বাঁধল কনট্রাক্টকটারের লোভে বাধা দিতে গিয়ে, সে সংঘর্ষ আরও তীব্র হল ডাক্তারের লাম্পট্যের পথে কণ্টক সৃষ্টি করতে গিয়ে এবং চূড়ান্ত হয়ে উঠল একটি সুন্দরী মেয়েকে

অশ্লীল পরিবেশ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টায়। সব কিছুর সমাধান হল বিয়ের মধ্যে। মোটামুটি এই হল কাহিনী।

প্রথমেই আপত্তি, পি, এল, ক্যাম্পের বাসিন্দারা, বিশেষ করে যারা কাহিনীর গতিবেগ সৃষ্টি করেছে—তাদের সম্পর্কে। যেমন, 'বড়খোকা' চরিত্রটি। এটি সম্পূর্ণ অসত্য চরিত্র। ক্যাম্পজীবনের পরিচয় থেকে দাবি করতে পারি, পি, এল, ক্যাম্পে 'বড়খোকা'র স্থান কল্পনারও অতীত। এই চরিত্রটি না থাকলে কমলা ও ঋতব্রতকে কাছাকাছি আনা কঠিন। সেইজন্যই যে এই চরিত্রটির অবতারণা তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। গোটা ক্যাম্পের যে ন্যক্কারজনক চিত্র লেখক এঁকেছেন, তাতে পাঠকের মনে হবে, ন্যক্কারজনক একদল মানুষ যেন জড় হয়েছে শুধু নায়ক কুসুম আর কমলাকে বিড়ম্বিত করতে। এই পরিবেশে নায়ক যেন দৈত্যপুরীতে রাজকুমার; তাই দৈত্য বধ ও বন্দিনী রাজকন্যা উদ্ধারেই কাহিনীর সমাপ্তি।

সরকারী উদ্বাস্তুনীতি সম্পর্কে কোথাও একটু কটাক্ষ নেই, এমনকি, উদ্বাস্তু জীবনের এই ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারী নীতির দায়িত্ব লেখক একটুও স্বীকার করেননি। চরিত্রগুলোর একটার মধ্যেও ব্যক্তিগুণ নেই, সবই ছকবাঁধা টাইপ। সিংজীর কার্যকলাপ প্রায় ডিটেকটিভ কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর। ল্যটি জানা পাগলকে দিয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা বৃথা; ওটা একটা স্টাণ্ট মাত্র। স্টাণ্ট অবশ্য সর্বত্রই। কুসুমের কাহিনীর মধ্যেকার স্টাণ্ট তো 'সাহেব বিবি গোলামের' সর্বশেষ স্টাণ্টের মতই খেলো। সঞ্জীব চৌধুরী এ কাহিনীর 'দস্যুমোহন'। কাহিনীতে অতর্কিতে তাঁর আবির্ভাব, সংকটের মুহূর্তগুলিতে অন্তর্যামীর মত আত্মপ্রকাশ ও সংকট উদ্ধার। অসীম তাঁর প্রতিপত্তি, অগাধ তাঁর প্রভাব। সঞ্জীব চৌধুরী ব্যতীত ঋতব্রত বসুর সংকট সমাধান অসম্ভব ছিল। কাহিনীর পরিণতিতে তাই স্বাভাবিকতা নেই, আছে অদ্ভুত ধরনের 'ভেল্কি'। বিড়ম্বিত উদ্বাস্তু জীবনের সমস্যার সমাধানও লেখক সঞ্জীব চৌধুরীর মুখ দিয়ে যা নির্দেশ করেছেন, তাও এই 'ভেল্কি'র পর্যায়ে। লেখক প্রশ্ন করেছেন, 'সুযোগ পেলে ওরা আমার সামাজিক হয়ে উঠবে ?

'দি আনসার ইজ সিম্পল্।'

'উত্তরটা সরল ?

'সরল নয় সরলা।'

'সরলা' নায়িকা কমলার সঞ্জীব চৌধুরীর দেওয়া নাম। অর্থাৎ কমলা 'সরলা' হলেই সমস্যার সমাধান!

স্টাণ্টের নেশা নারায়ণবাবুর এত বেশি যে তাঁর উপন্যাসের ফর্ম পর্যন্ত স্টাণ্টে ভরা। কখনো উত্তম পুরুষে, কখনো প্রথম পুরুষে, কখনো ফ্ল্যাশ-ব্যাক আর কাট্-ডিজল্ভের মধ্য দিয়ে তিনি কাহিনীর গতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর চাতুর্য সন্দেহ নেই এবং এ চাতুর্যে অনেক কিছু অসঙ্গতিই ঢাকা পড়ে, কিন্তু জীবন সম্পর্কে উপলব্ধির অগভীরতা এতে ঢাকা পড়ে না। নারায়ণবাবুর গল্প লেখার হাত ভাল স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু স্টাণ্টের মোহ ছাড়তে না পারলে সার্থক সৃষ্টির সম্ভাবনা কম। এইজন্যই বকুলতলা পি, এল, ক্যাম্প সার্থক নয়, বড়জোর একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস।

অশোক সান্যাল

কয়েকটি সনেট ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ॥ একক প্রকাশনী ॥ দেড় টাকা ॥
আজন্ম ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ॥ জলার্ক ॥ এক টাকা ॥
রৌদ্রজ্যোৎস্না ॥ সুশীলকুমার গুপ্ত ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ এক টাকা ॥
অশোকের সময়ের গ্রাম ॥ দুর্গাদাস সরকার ॥ একক প্রকাশনী ॥ চার আনা ॥

কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'কয়েকটি সনেট' কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। স্বল্পকালের ব্যবধানে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আজন্ম' প্রকাশিত হয়েছে। একজন কবিকে দুখানি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে একই সময়ে পাওয়া—যে কোনও পাঠকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। দুখানি কাব্যগ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন নির্বাচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। 'কয়েকটি সনেট' নামকরণেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরিচিতি পাওয়া যাবে। কবির নিজস্ব কোনও বিশেষ বক্তব্য বা ধারার পরিচয় 'কয়েকটি সনেটে' না পাওয়া গেলেও সমকালীন কাব্যের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের নাট-মন্দিরে তিনি যে অন্যতম কুশলী কুশীলব পাঠক সে বিষয়ে পাঠক সন্দিহান হবেন না। তবু একটি নালিশ হয়তো পাঠকদের মনে হতে পারে—আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দীর্ঘ চোদ্দ

বছরের কাব্যসাধনার মধ্যে কাব্য আন্দোলনের কোনো বিশেষ প্রবাহ তিনি স্পষ্ট করে মুক্ত করতে পারলেন না কেন? তিনি পথান্তরে ভ্রমণের শ্রম বা ক্লান্তি সহ্য করতে নারাজ ছিলেন বলেই কি অষ্টকে ষষ্টকে নিজেকে বেঁধে ফেলেছিলেন। এমনকি সাম্প্রতিক সনেট রচনার ইতিহাসেও যে পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে—শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'কয়েকটি সনেট' পড়তে পড়তে দৈবাৎ তা মনে পড়বে। মুখবন্ধে কবি বলে নিয়েছেন "১৯৩৯ সাল থেকে খাঁটি ইতালীয় ও ইংলণ্ডীয় সনেট লেখার যেসব পটু ও পঙ্গু চেষ্টা করেছি—বর্তমান কাব্যগ্রন্থটিতে সেই সব চতুর্দশপদী কবিতাই উৎকলিত হল।" তিনি যে শক্তিশালী কবি এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবু কবিতাকে মুক্ত ভ্রমণের স্বীকৃতি না দেবার ভূমিকা তিনি 'কয়েকটি সনেটে' গ্রহণ করেছিলেন বলেই কি পাশাপাশি লিরিকেও কষ্টকল্পনার ছোঁয়া লেগেছে? 'আজন্মে' প্রকাশিত কয়েকটি লিরিক কবিতা কিন্তু সত্যই লিরিক হয়ে উঠেছে বলে কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে ধন্যবাদ জানাই। রোমান্টিক কবিসত্তার সঙ্গে সমাজবোধের বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষিত সত্য সংযুক্ত হয়ে কতটা সার্থক কাব্য শক্তিশালী কবি রচনা করতে পারেন—তার ঐতিহাসিক নজির আমাদের হাতের কাছে আছে। কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মধ্যে সেই সার্থকতার ইঙ্গিত অস্পষ্ট হলেও পাওয়া যায়। সেইখানেই তিনি সার্থক। তাঁর 'আজন্ম' ও 'কয়েকটি সনেট' পাঠকের কাছে বিশিষ্ট পথের পদাতিকের পরিচয় না করিয়ে দিলেও, পাঠক কবির কবিত্ব সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করবে না। এযুগে কবিতা-লেখকদের মধ্যে কবিত্ব সম্পর্কে যে সংশয় আছে—তিনি তা থেকে অনেক দূরে।

কবি সুশীলকুমার গুপ্তের 'রৌদ্রজ্যোৎস্না' ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে না। এবং সমাজসত্তার সঙ্গে তাঁর কবিসত্তা সম্পূরক—তা তাঁর প্রকাশিত 'রৌদ্রজ্যোৎস্নায়' পাওয়া যাবে। নামকরা কবি ও সমালোচকের সটীক লেফাফায় মোড়া প্রচ্ছদ-নিরপেক্ষ ভাবেও পাঠক অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে। কবির রোমান্টিক কবিসত্তা পাঠককে আশাবাদী করতে সুযোগ দেয়। 'ইতিহাস নারী' রৌদ্রজ্যোৎস্নার অন্যতম স্মরণীয় কবিতা। 'স্বীকৃতি' 'সবিতা' কবিতাগুলি কেন আপ্তবাক্যের মত বিপ্লবের স্মৃতিবহন করে? প্রথম রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাজপথে মিছিলের পদাতিক কবি জ্যোৎস্না-

লোকিত নগরীর নেপথ্যচারী আত্মমগ্ন ধ্যানেরও রূপকার। আপ্তবাক্যের মতো মনে হলেও তাঁর উজ্জ্বল উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি নিঃসন্দেহে বিস্ময় জাগাবে।

"বিদ্যুতের প্রখর আলোকে,
শ্রাবণ দুর্যোগরাতে লেখে দীপ্ত যুগের আগামী
সার্থক আমার কাব্য, ধন্য তার জন্মদাতা আমি।"

বৈপ্লবিক সদিচ্ছার পরিপূরক বিলাসী কবিকর্ম অথবা সংগ্রামের নাম-ভূমিকায় কবিকর্মের তিনি কুশীলব—কোনটা তাঁর অন্বিষ্ট, 'রৌদ্রজ্যোৎস্না' পাঠের পর পাঠকের সন্দেহ থেকে যায়।

কবি দুর্গাদাস সরকার নবাগত। নবাগত হিসাবে তাঁর পথ যতটা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত ছিল, 'অশোকের সময়ের গ্রাম' পাঠ করলে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। মাত্র ষোলো পৃষ্ঠার মধ্যে নবাগত কোনও কবির ভূমিকা প্রসঙ্গে ঔচিত্যবাচক কোনও সিদ্ধান্ত না করাই সমীচীন। সুনির্বাচিত চিত্রকল্প প্রয়োগ, শব্দ চয়ন এবং বক্তব্যনির্ধারণে তাঁর দক্ষতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাঙলা কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট পরিচিতিই বহন করে। কিন্তু যে কোনও দশকের বক্তব্যবিকাশের ঢংটাই আয়ত্ত করা শক্তিশালী কবির পরিচয় নয়। সুখের কথা কবি দুর্গাদাস সরকার স্বকীয়তা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। 'অনামিকা ভাদুড়ীর' স্বপ্নপ্রয়াণ কিন্তু জীবনানন্দীয় কাব্য-পরিমণ্ডলেই তাঁকে নিয়ে যাবে। তাঁর এ বিষয়ে অবহিতি প্রয়োজন। 'অশোকের সময়ের গ্রামে' কবির রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি পাঠককে আপ্লুত করে, কিন্তু পাঠককে কোথায় উন্নীত করে—তা অস্বচ্ছ থেকে যায়। কবির একটি সুনির্বাচিত কাব্যসঙ্কলন আমরা আশা করি।

তরুণ সান্যাল

জনসমুদ্রে ॥ রামেন্দ্র দেশমুখ্য ॥ অগ্রণী বুক ক্লাব ॥ এক টাকা ॥

বিগত পঁচিশ বছর ধরে বাংলা কবিতার পরীক্ষামূলক প্রয়াসের মূল্য কাব্যপিপাসু মাত্রের কাজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। মত ও পথের বিভিন্নতা, রুচি ও ভঙ্গির বৈষম্য, ভাব ও ভাবনার ব্যবধান যদিও ঘটছে, তবুও আশার কথা, আধুনিক

বাংলা কবিতা আজ আর এক নিশ্বাসে নস্যাৎ করার মতো দুর্বল নয়। এ অবস্থায় পৌছনো একদিনে সম্ভব হয় নি। সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হাত লাগিয়েছেন, রামেন্দ্র দেশমুখ্যের নাম তাঁদের সঙ্গেই উচ্চার্য।

'জনসমুদ্রে'র কবি ভূমিকায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ১৯৪৮-৪৯ সালের সচেতন কৃষক-মধ্যবিত্তের সংগ্রাম যে একটা বিশেষ রূপ নিয়েছিল, তারই স্বীকৃতি বহন করে 'জনসমুদ্রের' যাত্রারম্ভ। সংগ্রামশীল জনতার প্রতিরোধ, তার জ্বালা, তার যন্ত্রণা, তার জয়-পরাজয় আবেগবান কবিচিত্তে যে দোলা দিয়েছে, এই কাব্যগ্রন্থ এক হিসাবে তারই দিনলিপি। জনতার আন্দোলন যাঁদের অনীহা জাগায় এ কবি সে পাঠকের তৃপ্তি দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। জড়ত্বহীন কণ্ঠের সবল প্রতিবাদের ভাষায় 'জনসমুদ্রে'র কবিতাগুলি লিখিত। রাজনৈতিক সচেতনতাকে গোপন করার প্রয়াসে কবি কালব্যয় করেন নি। তবু 'একশ চুয়াল্লিশ' 'অগ্নিধর' 'বহ্নি বাংলা' 'জংগী শ্রমিককে' 'আমি এলাম' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে বক্তব্যের অতিপ্রত্যক্ষতায় কাব্যানুভূতি যে কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি,-একথা জোর করে বলা যায় না। জনজীবনের যে সংগ্রাম কবির উদ্দীপনা জাগিয়েছে তার কাব্যিক প্রকাশের দায়িত্বও কবিকে গ্রহণ করতে হয়। নাহলে নেহাত সাংবাদিক স্বার্থের পোষকতা করা ছাড়া কবিতা আর কোনো মহৎ আবেগ সঞ্চারের যোগ্যতা হারায়। আবেগ প্রকাশে উত্তেজনা যতটা আছে, গভীরতা ততটা নেই। ফলে কবিতাগুলির আবেদন স্থায়ী হবার সুযোগ পায় নি।

অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। এবং সেই ব্যতিক্রমেই 'জনসমুদ্রের' কবির সার্থকতা সূচিত। 'কবিতার রূপ' 'ডাইনী' 'যাযাবর' 'লালপাগড়ী' 'মিছিল' 'কলকাতা' 'অবরুদ্ধ শহরে' এবং 'মেঘের নাম পারুল' উল্লেখযোগ্য কবিতা।

> দুলছে কোণাকুণি আকাশ, দুলছে পৃথিবীর পিঠ,
> ফেণার ফুলঝুরিতে তোমার শুভশ্রীর আভাস,
> হাজার ঢেউ-এর মাথায় তোমার অবিশ্বাস্য ডিঙি,
> আমার হৃদয় রাঙিয়ে তুমি আসছ, ওগো আসছ,

জনসমুদ্রের চূড়ায় একটি আয়ত পদ্ম হাতে আলুলায়িতা,
তুমি লক্ষ্মী, আমার অনুভূতির আকুলতা,
তোমার জন্যে আমি কতকাল বাঙ্ময় হয়ে আছি—

চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্যে, অভ্রান্ত শব্দযোজনায় ও আবেগ-গভীরতায় স্তবকটি উদ্ভাসিত।

'কলকাতা' কবিতাটির মধ্যেও কবির অনুভূতি আশ্চর্য সুন্দর ভাবে প্রকাশিত—

ঝরনার কাছে শুনি তোমার কান্না,
সমুদ্রে শুনি তোমার মহাজনতার কল্লোল;
শালের বনে তোমার মিছিলের দূরাগত মর্মর
খনিতে দেখি তোমার বহ্নিরূপ ফেটে পড়ছে
আহা কলকাতা।

উপমা প্রয়োগে কবির দক্ষতা লক্ষ্য করার মতো—

হাহাকার করছে একদিগন্ত মাটি
অনুর্বরা রমণীর হৃদয়জোড়া গোপন কান্নার মত।

চিত্রকল্পরচনায় রামেন্দ্র দেশমুখ্য কোথাও কোথাও আশ্চর্য অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। যেমন—

জোনাকীর পঙ্‌ক্তি দিয়ে অন্ধকারে মাটির উপরে
গেঁথেছি যে মালা।
ফিরায়ে দিয়েছি শেষে জোনাকীর লাঞ্ছিত শরীর
তট্‌লগ্ন শামুকের মুখে

জনসমুদ্র কবির বিভিন্ন সময়ে লেখা কবিতার সংকলন। প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যে কবির সোচ্চার ঘোষণাবৃত্তি এবং আঙ্গিক-ঔদাসীন্য শেষের দিকের কবিতায় অনেকখানি সংশোধিত। সরলীকরণের ঝোঁক কাটিয়ে কবি যদি জটিল জীবনাবর্তের বাস্তবতাকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যভাত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে জনসমুদ্রের কবির কাছ থেকে নিঃসন্দেহে সার্থক রচনা আশা করতে পারি। কেননা, রামেন্দ্র দেশমুখ্যের কবিধর্মের সততা ও জীবননিষ্ঠা জনসমুদ্রেই প্রতিফলিত।

বিমল ভৌমিক

জার্নাল ॥ সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কাহিনী, কলকাতা ॥ দাম দু টাকা ॥

কৃতিত্ব অপেক্ষা প্রতিশ্রুতি যেখানে বেশি তেমন বই হাতে এলে স্বস্তি বোধ করবার উপায় থাকে না—একই কালে মনে জাগে আশা ও আশঙ্কা। শ্রীযুক্ত সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জার্নাল' তেমনি বই। আশা অকারণ নয় বলেই আশঙ্কার কারণগুলি ছোটো করে দেখব না।

'জার্নাল'-এর প্রথম পরিচয় এই যে, সওয়া শ পৃষ্ঠায় দশটি কাহিনীর বই। কিন্তু 'কাহিনী' বলা ঠিক কিনা তা চিন্তনীয়। কাহিনী একটা নিশ্চয়ই আছে। কোথাও তা প্রধান, যেমন 'অপনয়নে', কোথাও তা প্রায় একটা উপলক্ষ্য —যেমন 'রিকসা'য়। আসলে কোনো একটা বিশেষ ভাব বা মুড বা বোধকে প্রত্যক্ষ করে তোলাই হল জর্নালের গল্পগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। তা করতে গিয়ে কোনো কোনো কাহিনীতে লেখক কথা-বস্তুর কাঠামোটিকে অবহেলা করেন নি—কিন্তু প্রায়ই তা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাতে আসে-যায় না; ছোটোগল্পের একটা প্রধান শাখাই এরূপ মুড-আশ্রয়ী, অনুভূতি-সর্বস্ব, কাব্যধর্মী। কিন্তু এই ভাব-অনুভাবের রূপায়ণে লেখক যে বিশেষ আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন বাঙলা কথাসাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন, এবং পাঠক তাতে অনভ্যস্ত বলেই হোক আর লেখক তাতে মাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি বলেই হোক—যেখানে কথার কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে সেখানেও তা স্থির দাঁড়ায় না, স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, কেমন ঝাপসা দুর্বোধ্য হয়ে হারিয়ে যায় বা এলিয়ে পড়ে। 'স্যানেটোরিয়াম,' 'কবর', অপনয়ন' প্রভৃতি কাহিনীতে তথাপি তা দাঁড়িয়েছে এবং প্রথম দুটিকে সার্থক বলা যায়।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বিশেষ আঙ্গিক। আঙ্গিক অবশ্য রূপায়ণেরই একটা অঙ্গ, তবে কথার সঙ্গেও তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ আঙ্গিক কী? হয়তো দৃষ্টান্ত দিলে তা বোঝা সহজ হত। স্থানাভাবে শুধু প্রথম পৃষ্ঠার একটি বাক্যই তুলে দিচ্ছি।

"আর এক সিঁড়ি—এত পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে, রুগ্ন শিথিল পদক্ষেপে কবুতর-সন্ধ্যের সলজ্জ মিনতি জেগে থাকে। অবাক।"

"কবুতর-সন্ধ্যের সলজ্জ মিনতি" নিশ্চয়ই পাঠককে অবাক না করুক চমকিত করে—এবং চমৎকৃত করে।

এরূপ অজস্র চিত্রকল্প তাঁর প্রতি গল্পের প্রতি পৃষ্ঠায়। এমনকি, এক-একটি বাক্যের মধ্যেও একাধিক এরূপ চিত্রকল্পের ভিড়। তার ফলে যা হয় তার কতকটা আভাস পাওয়া যায় এরূপ স্মৃতিমথিত চেতনাচিত্রে :

"এ কোন্ নারী করুণাময় মিনতি নিয়ে নিজকে অবারিত করে দিলে। এত উন্মুক্ত অবাধ দেহের, কমা আরতি জানালে। সমস্ত জরাতি কালের ক্ষণিক বিভঙ্গ সেই রাত্রির মিশমিশ কাল চুলে চুমিয়ে রয়েছে।"

দৃষ্টান্তটি ভালো হল না। কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যায়—'জর্নালের' গল্পগুলি শুধু কাব্যধর্মী নয়, আঙ্গিকও কাব্যধর্মী। আর যদি কোনো বিশেষ নামে এই গল্পরীতিকে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে একে বলতে পারি 'ইমেজিস্ট' গল্প।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কল্পনার অজস্রতায় সত্যই অবাক হতে হয়। যৌবনের ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ছে। এবং তাতে তিনি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। আর সেই 'কথার জন্য কথা' তাঁকে যখন টেনে চলছে তখন গল্পকে তিনি ঝেড়ে ফেলে দেন, পাঠকও তাঁকে অনুসরণ করতে অক্ষম হয়। ইমেজের ভিড়ে পাঠকের দৃষ্টি ক্রমে ক্লান্ত হয়, চোখ বুজে আসে, এবং শেষ পর্যন্ত 'এ কোন্ নারী' তা না বুঝে, শব্দের চুনকারিতে মিশ্রিত ইমেজের অতিচারে পাঠক বই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সংযম ও মাত্রাজ্ঞান—ঐশ্বর্যবানেরও প্রয়োজনীয় সাধনা।

এ ছাড়া, আরো দু-একটি ছোটোখাটো কথা আছে। সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কল্পনা রূপাশ্রয়ে ফোটে না, শব্দ-বা-ধ্বনি-আশ্রয়ে তা অনেক সময় চলে। (যেমন, 'চুল' থাকাতে 'চুমিয়ে'—অনুপ্রাসের আকর্ষণে)। এটা উচ্চ ধরনের 'ইমেজিস্ট' লক্ষণ নয়, বাক্য-কৌশল মাত্র।

তা ছাড়া, কাহিনীতে ও বর্ণনায় যে বাড়াবাড়ি ও দুঃসাহসিকতা আছে তা সময়ে মনে হয় চালবাজি অথবা বাহাদুরি। বলিষ্ঠ শিল্পবোধ তা আপনার নিয়মে সংহত করে নেবে, বিশ্বাস করি।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্চর্য কল্পনাশক্তি, বৈদগ্ধ্য ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা সাহিত্যিক সৃষ্টিতে সার্থক হবে, এই আশা করেই কয়েকটি আশঙ্কা প্রকাশ করলাম।

গোপাল হালদার

অশ্বিনীকুমার দত্ত ॥ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন ॥ এক টাকা ॥

একশ বছর আগের বাঙলা দেশে যে চারিত্র্য ও প্রাণশক্তির বিস্মিত আবির্ভাবে আমরা ধন্য হয়েছি তার সদর্থক দিকটা আমাদের প্রেরণার অঙ্গীভূত করে নেওয়ার প্রয়োজন আজ যতো বেশি বোধ হয় আর কখনো তেমন হয় নি।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের ও স্বদেশী যুগের অন্যতম নায়ক অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি আজ সেই জন্য বিশেষ করে আমাদের স্মরণীয়। একশ বছর আগে তাঁর জন্ম এবং প্রায় অর্ধশত বর্ষ পূর্বে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতের মুহূর্তে ইংরেজের সশস্ত্র শক্তিকে অগ্রাহ্য করে বরিশালের জনতা এবং অশ্বিনীকুমার বাঙলাদেশকে সচকিত করে দিয়ে গেছেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত অশ্বিনীকুমার দত্ত বইটি অশ্বিনীকুমার জন্মশতবার্ষিকীর পক্ষ থেকে পুনরমুদ্রিত হয়েছে। মূল্যবান ও সংক্ষিপ্তেএই জীবনীটির মধ্যে সহজ রচনাশৈলী, পরিচ্ছন্ন কাহিনী এবং অশ্বিনী কুমারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সমন্বয় ঘটেছে তাতে পাঠক সাধারণ কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। আনন্দের কথা হত যদি একই সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্তির একটা বাস্তব ব্যাখ্যাও আমরা পেতাম। ডক্টর সেন অবশ্য সে অভাব মেটান নি। ইতিমধ্যে বইটি থেকে একটি অংশ উদ্ধার করি—

"মৃত্যুর প্রায় দেড়শবৎসর পূর্বে তিনি (অশ্বিনীকুমার) সরকারী উকিল মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, ''নির্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা করি না, আবার এই পৃথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে চাই।" "কোন দেশে ?" এই ভারতবর্ষে" "কোন প্রদেশে ?" "সোনার বাংলায়" "কোন জেলায় ?" "তাও আবার বলিতে হয় ? বরিশালে। কিন্তু একটা কথা বলিতে পারিতেছি না, কাহার ঘরে জন্মিব। বাপ হইবার উপযুক্ত লোক আর দেখিতেছি না। একজন ছিল, আপনি তাহাকে ফাঁসী দিয়াছেন।" "কে সে ? "আবদুল।"

"আবদুল দুর্দান্ত দস্যু, নির্মম নরহন্তা কিন্তু অত্যন্ত নির্ভীক। ফাঁসীর আগের রাত্রিতেও নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়াছিল।"

প্রধানত আধ্যাত্মিক বলে প্রচারিত হলেও অশ্বিনীকুমারের এই আলাপের মধ্যে হয়তো একটা সত্য আছে যা আজকের হিন্দুমুসলমান বাঙালীর কাছে নমস্য।

সত্যেশ রায়

পরিচয়
চৈত্র, ১৩৬২

'রাজ্য', ভাষা ও সংস্কৃতি

গোপাল হালদার

পশ্চিম বাঙলা ও বিহারের বিলোপ সাধন করে 'পুর্ব প্রদেশ' গঠনের প্রস্তাব যখন পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উত্থাপন করেছিলেন তখন একটি কথা বেশ জোর করেই বলেছিলেন, 'সংস্কৃতির জন্য কেউ মাথা ঘামায় না। মানুষ চায় খেতে-পরতে।' যেসব রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সে প্রস্তাব নয়া দিল্লীতে উদ্ভাবিত হয়, এবং যে মনোভাব নিয়ে তা ডাঃ রায় পশ্চিম বঙ্গে প্রবর্তিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা মূলত কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয়েছে, আমরা তা মনে করি না। তবে কার্যসিদ্ধির জন্য ডাঃ রায়ের কথা পরিবর্তন করতে হয়েছে। তিনি নয় বা দশ দফা 'ব্যবস্থা'র বুলিও আওড়াচ্ছেন। এমনকি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখে এখন 'বাঙলার সংস্কৃতি'রও নাম শোনা যাচ্ছে।

এসব 'ব্যবস্থা' বা অ্যারেঞ্জমেণ্ট, 'প্রথা' বা কন্‌ভেন্‌শন, 'বোঝাপড়া' বা আন্‌ডারস্ট্যান্‌ডিঙ প্রভৃতির অর্থ ও মূল্য কী? (১) 'রক্ষাকবচ'-এর অর্থ নিশ্চয়ই এই যে বাঙালী ও বিহারী দুটি এক ভাষা বলে না, এক জাতি নয়, তাদের মধ্যে এখনো অবিশ্বাস সুপ্রচুর এবং তাদের 'এক

আইনসভা, এক মন্ত্রিমণ্ডল, এক শাসনবিভাগ এবং এক বিচারবিভাগ'এর মধ্যে জোর করেও আনা যায় না। (২) অথচ, এসব ব্যবস্থার কয়টি সত্যই গ্রাহ্য হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই; এবং (৩) যদিই-বা এই দশ ছেড়ে এমন একশো দফা ব্যবস্থাও এখন প্রণীত হয় সেসব ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের কর্তৃত্ব সর্বাংশেই থাকবে প্রস্তাবিত সংযুক্ত রাজ্যের আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের আয়ত্তে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই ভাবী মন্ত্রিমণ্ডলের ইচ্ছাধীন। নিশ্চয়ই এসব কথা বর্তমান অবস্থায় পশ্চিম বাঙলার বাঙালীদের গণনায় তুচ্ছ নয়; যদিও সকলেরই মৌলিক আপত্তি এই যে, এই সংযুক্তি প্রস্তাবে ভারতীয় ঐক্যের ঐতিহাসিক ধারা ও মূলনীতিকে ছিন্ন করে একটা ভ্রান্ত ও সর্বনাশা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির যা প্রাণসত্য—সকল সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়ে ভারত-সংস্কৃতির প্রকাশ—তা বিসর্জন করবার আয়োজন হচ্ছে। আমরা, বাঙালী সংস্কৃতির ধারকেরা, এই জন্যেও সংস্কৃতিসংহারের প্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃত হতে পারি না—কারণ, বাঙালী সংস্কৃতির মূলও এই দুই সত্যের মধ্যে নিহিত।

বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য এই যে, এখন পর্যন্ত অন্যান্য জাতিসত্তার বিলোপের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি, বরং স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত আরও সুনিশ্চিত করা হচ্ছে (যেমন অন্ধ্রে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে)। একমাত্র পশ্চিম বাঙলা-বিহারেই সংযুক্তির জন্য জবরদস্তি চলেছে; এমনকি, পশ্চিম বাঙলা-আসাম, পশ্চিম বাঙলা-ওড়িষ্যা বা বিহার-ওড়িষ্যার সংযুক্তিরও কোনো কথা শোনা যায় না। স্বভাবতই এসব কারণে আমাদের এই সন্দেহই দৃঢ়তর হচ্ছে যে এটি প্রস্তাব নয়, একটি চক্রান্ত। এই প্রস্তাবের পিছনে আছে—(১) পশ্চিম বঙ্গের অ-ভারতীয় ও ভারতীয় শোষকদের সেই সুবিদিত চক্রান্ত যা শোষণস্বার্থে বাঙালী গণ-আন্দোলনকে এই সংযুক্তি-কৌশলে খর্ব করবার অভিলাষী; (২) কংগ্রেসের দলগত চক্রান্ত যা বাঙলার জনচেতনাকে এই সংযুক্তি-কৌশলে পঙ্গু করে দিয়ে ভাবী সংযুক্ত রাজ্যে কংগ্রেসের দলগত কর্তৃত্ব নিষ্কণ্টকে ভোগ করতে উদ্যোগী; (৩) কংগ্রেসের ও ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী হিন্দীবাদী নেতৃ-গোষ্ঠীর চক্রান্ত—যেন-তেন-প্রকারেণ যারা হিন্দীর 'রাজ্যজয়' করতে বদ্ধ-

পরিকর এবং বিহারকে আশ্রয় করে এই সংযুক্তি-কৌশলে হিন্দীর সেই রাজ্যগত আধিপত্যও বাঙালীর উপর স্থাপন করতে সচেষ্ট। বলা বাহুল্য, ডাঃ রায়ের দশ দফা কেন একশো দফা 'ব্যবস্থা'য়ও এই চক্রান্তসিদ্ধির পক্ষে কিছুমাত্র বাধা ঘটবে না। এই ত্রিবিধ চক্রান্ত অবশ্য শুধু পশ্চিম বাঙলার বিরুদ্ধে নয়, কার্যত বিহারেরও বিরুদ্ধে—বিহারের গণ-আন্দোলন, বিহারের গণ-চেতনা ও বিহারের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাও তাতে বিপন্ন হতে বাধ্য।

এইজন্যই লক্ষণীয়—ডাঃ রায় প্রভৃতি বাঙালী মার্জার-নেতারা 'উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন'এর যুক্তিটি ঘুণাক্ষরেও বিহারবাসীদের নিকট তোলেন না; আর্থিক উন্নয়ন বা শিল্পসংগঠনের কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করবার চেষ্টাও করেন না, এবং কংগ্রেসের বাধ্যবাধকতা এবং রাজ্য ও রাষ্ট্রগত ক্ষমতার অপপ্রয়োগের দ্বারাই তাঁরা এই সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবটি জনমতের বিরুদ্ধে আইনসভার দলীয় ভোটের চোরাগলি দিয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া ছাড়া পথ দেখেন না। বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ এই সংযুক্তি প্রস্তাবকে প্রথমাবধিই নিঃসংশয়ে বর্জন করেছে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সভা থেকে পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিকদের সভা তার প্রমাণ এবং ডাঃ রায়ের 'রক্ষিত' সংবাদপত্রের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে পশ্চিম বাঙলার জনসমাজ নিজেদের মতকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে।

আশ্চর্য এই যে, এই সর্বনাশা প্রস্তাবের স্বপক্ষে দলগত প্রসাদজীবী ও জনকয় ব্যারিস্টার, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিজীবী ছাড়া আর কারো সমর্থন সংগ্রহ সম্ভবপর হয়নি। তথাপি দীর্ঘ দেড় মাসের প্রাণপণ প্রয়াসের ফলে সম্প্রতি রাজশেখর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি (অবশ্যই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা 'তারপদ' বা সজনীকান্ত দাসও এই সঙ্গেই আছেন, অনুমান করতে পারি) জনকয়েকের সমর্থন মার্জারনীতিকেরা লাভ করেছেন বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। নিশ্চয়ই এত বিলম্বে যাঁরা মত প্রকাশ করেছেন তাঁরা উপরোক্ত কারণে নয়, বিবেচনা-সঙ্গত ও বিবেকসঙ্গত কারণেই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন। মানতেই হবে, আজকের ভারতরাষ্ট্রের ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের বহুবিধ আথিক সুযোগ, পুরস্কার

ও পারিতোষিক, রেডিও ও ফিল্মের চাকরি ছাড়াও আর্থিক যোগাযোগ, সঙ্গীত-নাটক আকাদমি প্রভৃতির বেহিসাবী অফুরন্ত সুযোগ—এক কথায়, রাষ্ট্রের শতবাহিনী প্রসাদধারার অজস্র সুবিধা ও প্রলোভন সত্ত্বেও বিবেকেরই সম্মানরক্ষা একটা সাহসিক কাজ। এ কথা আমরা আরও সুনিশ্চিতরূপে জানি—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাজী আবদুল ওদুদ, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শিশির-কুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরাও বিবেকের ও যুক্তির বশেই সংযুক্তি-বিরোধী। বিবেকের প্রেরণা হয়তো সকলেরই সমান, কিন্তু যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির প্রেরণা হয়তো সকলের সমান নয়। সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে স্বধর্ম হল—ভোটের জোরে জেতা নয়, যুক্তির বলে পরস্পরকে বোঝা ও বোঝানো। বিচারের উপযুক্ত সেই আসর ও অবকাশ আমরা আজ দাবি করি। অবশ্য সেজন্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর দ্বারস্থ হয়েও নিরাশ হয়েছি। তাই মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ-আলোচনার সীমিত আসরেই আহ্বান করছি—বাঙলার সংস্কৃতিবিদরা আলোচনায় অগ্রসর হোন, অন্তত সংস্কৃতির দিক থেকেই তাঁরা সংযুক্তি-করণের প্রস্তাবটি বিচার করুন। একথা আমরা বেশ জানি—সংস্কৃতি আকাশ-লতা নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শুধু প্রস্তাবের সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা—সুদূর 'প্রদেশগঠন নীতি'র সুদূরতর অর্থ ও ফলাফল, কিম্বা 'ব্যবস্থা'-সাপেক্ষ পশ্চিম বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের অর্থ ও ফলাফল—বিচার করা অসম্ভব। তথাপি সেই বৃহৎ ও মূলপ্রেক্ষাপট বিস্মৃত না হয়ে ভারতীয় ঐক্যের ঐতিহাসিক গতিপথে লক্ষ্য রেখে প্রধানত সংস্কৃতির সাক্ষ্যটাই কি একবার পূজনীয় রাজশেখর বসু ও তাঁর সহ-স্বাক্ষরিক সাহিত্যিকগণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন না?

ভবিষ্যৎ বাঙলার বাঙালীদের নামে আমরা সবিনয়ে তাঁদের আহ্বান করছি—আপনাদের বিচার-বিবেচনার স্পষ্ট নিদর্শন অন্তত তাদের উদ্দেশ্যে রেখে যান। কারণ নইলে কাল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ধাপ্পাবাজিকেই মনে করবে আপনাদের যুক্তি, এবং কাল কাউকে ক্ষমা করে না।

'পরিচয়'এর পক্ষ থেকে আমরা গত সংখ্যায়ও আমাদের সীমাবদ্ধ পরিসরে যতটুকু সম্ভব এই আলোচনার সারাংশ পরিবেশন করেছি। এ-সংখ্যায় আমরা মুখ্যত সংস্কৃতির দিক থেকেই বিচারে আরও একবার

অগ্রসর হলাম। স্থানাভাবে কোনো কোনো বিষয়ের আর পুনরুল্লেখ করলাম না, কোনো কোনো সংক্ষিপ্তভাবে নির্দেশিত বিষয়েরই আলোচনা করলাম। লেখক।

●

খণ্ডকে মিলিয়েই ভারতবর্ষ সমগ্র। এমন ভারতবাসী তাই কেউ নেই যে হয় বাঙালী, নয় হিন্দুস্থানী, নয় অন্ধ্র, মারাঠী, তামিল, গুজরাটী এমন কোনো জাতির; অথবা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ বা ঐ রকম কোনো উপজাতির মানুষ নয়; যে কোনো জাতীয় ভাষা বা উপজাতীয় ভাষা বলে না,—যে শুধু বিশুদ্ধ ভারতবাসী এবং 'ভারতী' নামে কোনো স্বতন্ত্র ভাষা বলে। এই জাতি-উপজাতি মিলিয়েই ভারতের মহাজাতি, যা একটা মামুলি 'নেশন' নয়। অথচ ছত্রিশ কোটির এই বহুভাষিক জাতিগুলিকে সেরকম একটি 'নেশন' এবং ব্রিটেন বা ফ্রান্স বা জার্মানি অথবা আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো এই ভারত-রাষ্ট্রকে একটা পরিচিত 'ন্যাশানাল স্টেট'-এ পরিণত করতে না পারলে আমাদের পুঁথি-পড়া রাষ্ট্রাদর্শের ধারণা তৃপ্ত হয় না। যা স্বাভাবিক এবং প্রত্যক্ষ সত্য তাকে অবশ্য অগ্রাহ্য করতে পারি না। ভারতবর্ষ আকারে ও লোকবলে, ভাষার বৈচিত্র্যে ও জাতির বৈচিত্র্যে রাশিয়া-বর্জিত ইউরোপ-খণ্ডের সঙ্গেই তুলনীয়। সে ইউরোপকে এক 'নেশন' বা এক 'ন্যাশানাল স্টেট' কোন বাতুলেও কল্পনা করতে পারে না। আমাদের ইতিহাসের আশীর্বাদে এবং আমাদের শুভবুদ্ধির বলে তথাপি এই ভারতবর্ষ 'এক' না হলেও ঐক্যবদ্ধ, যথার্থ 'অখণ্ড' না হলেও 'সমগ্র'। এই সমগ্র থেকেও যে বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় তার প্রমাণ পাকিস্তান; আর সে বিচ্ছেদে যে কত মর্মান্তিক ক্ষত ঘটে পাকিস্তান তারও প্রমাণ। অর্থাৎ ইতিহাসের এ বিধান অলঙ্ঘনীয় নয়; কিন্তু সে লঙ্ঘন অবাঞ্ছনীয়। এই কঠিন সত্যকে উপলব্ধি করেই আমরা এই ভারতরাষ্ট্রকে গঠন করেছি 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' নামে, ভারত-সংঘ রূপে। সংবিধানের প্রারম্ভেই এই মূল সত্যও ঘোষণা করেছি: ভারত—রাজ্যসমূহের সমবায় (ইউনিয়ন অব স্টেটস্)—'এক রাষ্ট্র' তো নয়ই, ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র এবং 'প্রদেশ' বা 'মণ্ডল' বা 'জোন' সমূহের সমবায়ও নয়,—রাজ্যসমূহেরই সংঘ।

খণ্ড হয়েও তারা সমগ্রের আশ্রয়, আবার সমগ্রের আশ্রয়েই তারা প্রত্যেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ; ভারত-সংঘের আছে পূর্ণ ক্ষমতা, রাজ্যসমূহেরও আছে স্বরাজ। এই কথাও আমরা নিঃসংশয়ে জানতাম—এই রাজ্যসমূহের গঠন পরিসমাপ্ত হয়নি। কিন্তু সে গঠনের বনিয়াদ হবে প্রধানত এক-একটি ভাষা; এবং এই ভারতসংঘ শত ভাঙাগড়ার মধ্যেও সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ভারতীয় ঐক্যেরই সত্যকার প্রকাশ ও পরিণতি।

ভারতের এই ক্রমবিকশিত সমগ্র সত্তার প্রাণমূল যাঁরা সন্ধান করেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন—সে প্রাণমূল তার রাজনৈতিক গঠন নয়, এমনকি তার সামাজিক গঠনও সর্বাংশে নয়, সে প্রাণমূল তার সাংস্কৃতিক সম্পদ। ভারতের ঐক্য প্রথমাবধি ছিল এই সাংস্কৃতিক ঐক্য। অবশ্য সামাজিক ব্যবস্থারই প্রয়োজনে ভারতীয় সংস্কৃতি এই বিশেষ সামাজিক শক্তিরূপে এবং বিশেষ ভাবাদর্শরূপে বিকাশলাভ করবে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের অন্যান্য শক্তি সে তুলনায় মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন রাষ্ট্রীয়গঠনে ভারতসমাজ বিশেষ ঐক্যলাভ করেনি। না করাতে ক্ষতি না হয়েছে তা নয়, কিন্তু সে ক্ষতি দেখা দিয়েছে আধুনিক কালে, কারণ আধুনিক সমাজ রাষ্ট্র নামক একটা শক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাসে সেই আধুনিক যুগ খুব বেশিদিন আরম্ভ হয়নি—রিনাইসেন্সের ঐহিক-মানসিক চেতনার পরে ব্রিটিশ বিপ্লবে (১৬৮৮) জাতীয় রাষ্ট্রের প্রথম সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠা। এক শত বৎসর পরে ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের ফলে তার অমোঘতা সমগ্র ইউরোপে প্রায় স্বীকৃত হতে থাকে। আমাদের দেশে অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠায় ক্রমশ এই রাষ্ট্রীয় চেতনা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। তার আগে আমাদের দেশে যদি কোনো অশোক-আকবর একটা সাম্রাজ্য-রোলারে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র হিসাবে এক করে দিতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই কী হত তা এখন কল্পনা করা একটা বিলাসিতা। আমরা জানি তা হয়নি, শুধু তাই নয়,—অসম্ভব বলেই তা হয়নি। এতবড় বিরাট ও বিচিত্র দেশে দীর্ঘস্থায়ী একরাষ্ট্র গঠন বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পূর্বে অসম্ভব ছিল। এ-ও জানি—এ রকমই জাতি, ভাষা, আচারবিচারে বিচিত্র ইউরোপে ঠিক ওরকম একরঙা রাষ্ট্র গঠন তখনও, এখনো যেমন, অসম্ভব, একটা ইউনিয়ন অব ইউরোপ গঠন তেমনি অসম্ভব, একটা স্টেট অব

ইউরোপ তো দূরের কথা। ভারতবর্ষেও তা সম্ভব হয়নি, তত প্রয়োজনও তখন ছিল না। কারণ, তখন সমাজ আত্মপ্রকাশ করত অন্যান্য পথে, রাষ্ট্র ছিল তার আত্মপ্রকাশনের যন্ত্রমাত্র। রাষ্ট্র বা 'নেশন'-এর উপর নির্ভর না করে ভারতীয় সমাজ কিভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করত "স্বদেশী সমাজ"-এ রবীন্দ্রনাথ তা অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ যা উপলব্ধি করতে পারেন নি তা এই যে—আধুনিক কালে রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে সেরকম 'স্বদেশী সমাজ' গঠন করা যায় না। এ কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

আরেকটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা বুঝব, এই ভারতীয় সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতি কী ছিল? প্রথমত, ভারতীয় সমাজ যে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ হতে পেরেছে তার কারণ গ্রীস বা রোমের মতো ভারতীয় জীবন-যাত্রা নগরকেন্দ্রিক ছিল না। প্রধানত এ-সমাজ ছিল স্বনির্ভর পল্লী-সমাজ; পল্লীর আর্থিক বিন্যাসের উপরেই নির্ভরশীল (selfsufficient village economyতে পালিত village community)। দ্বিতীয়ত, এ-সমাজের প্রাণ ছিল ধর্ম—ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' নয়, তার বিশেষ 'কালচার'। আর ভারতীয় সমাজের প্রধান ভিত্তি তার অদ্ভুত সহনশীল ও গ্রহণশীল সংস্কৃতি। এ সমাজে না হলেও অঞ্চলে অঞ্চলে পার্থক্য ছিল, জাতিতে জাতিতে বিভাগ ছিল, শ্রেণীবিভাগও ছিল, 'অসমান বিকাশ'ও ঘটেছে নানাভাবে। কিন্তু তবুও এই পল্লীসমাজ এবং এই অত্যন্ত গভীর অর্থে প্রাণবান সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে শত শত আঘাত ও আঘাতের মধ্য দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাহত হয়েও এই আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সমাজকে একই ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে, তার প্রাণকে ক্রমশ আপনার সত্য আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছে। এই সত্য—ভারতীয় সমাজের প্রাণসত্য—বহুবিচিত্র জাতিকে নিয়ে মহাজাতি গঠন; আর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণসত্য বৈচিত্র্যের মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা।

ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া ১৯৪৭ সালে হঠাৎ সংবিধান-রচয়িতাদের মাথায় এসে ভর করেনি। তিন হাজার বৎসরের মধ্য দিয়ে তা গড়ে উঠেছিল প্রথমে সাংস্কৃতিক ঐক্যকে আশ্রয় করে, তারপর সামাজিক ঐক্যকে রক্ষা করে এবং সর্বশেষে আধুনিক কালে মহাজাতিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রধান ভাষাভিত্তিক জাতিকে নিজের 'স্বরাজ' দান করে। কোনো রাজ-

নৈতিক দলের বা মহানায়কের মর্জিতে ভারতীয় ঐক্য গড়ে ওঠেনি। কোন রাজনৈতিক দলের বা মহানায়কের খেয়ালে ভারতবর্ষের ভাঙাগড়া করা চলবেও না। একালের ভারতরাষ্ট্রের যেমন চাই সামগ্রিক শক্তি, তেমনি একালের খণ্ডরাজ্যগুলি হারালে তার এই ঐতিহাসিক জাতিগুলির—হাজার বছর ধরে এক-একটি ভাষা অবলম্বন করে যারা ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে—রাজনৈতিক সত্তা থাকবে না। আর এ যুগে রাজনৈতিক সত্তা হারালে কোনো সমাজ তার আপন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। আর সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলে তার ভাষা ও সংস্কৃতিও বিকাশলাভ করা তো দূরের কথা ক্রমশ অধোগতিপ্রাপ্ত হতে বাধ্য।

কোনো ভারতীয় রাজ্যবিলোপ তাই শুধু একটা প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন নয়, একটা অর্থনৈতিক সু বা কু ব্যবস্থা মাত্র নয়; তা তিন হাজার বছরের ভারতীয় ইতিহাসের গঠনধারার বিরোধিতা, চিরবহমান ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণসত্যের বিরোধিতা এবং হাজার বছর ধরে যে জাতি ক্রমশ বিকাশলাভ করেছে স্বাধীনতার যুগে তাকে তার স্বরাজ থেকে বঞ্চিত করে তার সমস্ত সত্তাকে গুলিয়ে দেওয়া।

এখন হয়তো প্রশ্ন হবে, দফাদাত্রি রক্ষাকবচের ব্যবস্থায় যখন ভাবী সংযুক্ত রাজ্যকে 'দ্বিভাষিক' করা হচ্ছে, পশ্চিম বাঙলায় বাঙলা তো থাকবেই, এমন কি বিহারেও বাঙলা অবশ্য পাঠ্য হচ্ছে, ইত্যাদি, তখন বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির কোনো আশঙ্কা নেই বরং প্রসারেরও সম্ভাবনা আছে। এ-প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় এসব 'ব্যবস্থা'র অর্থ কী, মূল্য কী আর ব্যবস্থাগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ভার থাকবে কার উপর ইত্যাদি কঠিন ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ব্যাপার। না হলে এই যুক্তির ভিতরের অসারতা থেকেই যাবে। কিন্তু আমরা তা বাদ দিয়ে না হয় এখানে শুধু সাংস্কৃতিক সম্ভাব্যতাই আলোচনা করি—অবশ্য পশ্চিম বাঙলার শুধু নয়, বিহারের সাংস্কৃতিক সম্ভাব্যতাও আলোচনা করা উচিত। কারণ, আমাদের বাঙালী সংস্কৃতি গত একশো বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির যে প্রাণসত্যটিকে উপলব্ধি করেছে তাতে এই একশো বছরের বাঙালী সংস্কৃতি এই সত্যেরই ঘোষণা যে, ভারতের প্রত্যেকটি জাতি ও ভাষার বিকাশেই ভারতের বিকাশ, বাঙালীরও সফলতা; ভারতের একটি জাতিও দুর্বল থাকলে ভারত দুর্বল থাকে; আর আমাদের

বাঙালী সাধনা সেই পরিমাণে সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব বাঙালী সংস্কৃতির সে সামান্যই জানে যে মনে করে বিহার বা অন্য যে কোনো রাজ্যের সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করতে পারলেই বাঙলার লাভ। এই মনোভাব আজ হিন্দীবাদী হিন্দী সংস্কৃতিকে পাচ্ছে, কিন্তু তা তাঁদের ইংরেজের পরে ইংরেজির স্থান গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নয়, ইংরেজের পরে ইংরেজের সাম্রাজ্য-সুযোগ আয়ত্ত করার প্রলোভন। এ-প্রলোভন সংযত না করলে তাঁরা শুধুই অন্যান্য সমস্ত জাতি ও-ভাষার বৈরিতা অর্জন করবেন না, তাঁরা ভারতের যুগ-যুগ-বর্ধিত এই ঐক্যকে নিঃশেষিত করবেন-এবং বাঙালী হিসাবে, বাঙালীর সংস্কৃতির ঐতিহ্যধারক হিসাবে এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দীর অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করাও হবে আমাদের স্বধর্মপালন।

প্রশ্ন হবে, ভাবী সংযুক্ত রাজ্যে বাঙলার অবস্থা তবে কী? সংক্ষেপে বলি কার্যত যা হবে। প্রথমত শিক্ষাব্যাপার। যারা স্কুলে পড়ে তারাই বিহারে বাঙলা পড়বে এবং হিন্দী পড়বে পশ্চিম বাঙলায়—এ ধরে নিলাম পশ্চিম বঙ্গে শতকরা পঁচিশ জন মাত্র সাক্ষর, বিহারে শতকরা পনেরো জন—এরাই এ অবস্থায় দুটি ভাষা পড়বে। বাকি বাঙলার পঁচাত্তর জন বিহারের পঁচাশি জনের কিছুই পড়বার কথা নয়। অবশ্য শিক্ষা ব্যাপক হবে, তবে তা হতে হতে আরো কুড়ি-পঁচিশ বছর। তাহলেও কোন্ ক্লাস থেকে বাঙালী ছাত্র পড়বে হিন্দী আর বিহারী ছাত্র বাঙলা? একেবারে প্রাথমিক শিক্ষালয় থেকে। তাহলে সেই ছাত্ররা ভাষার হরফ চেনা ও বর্ণপরিচয় ছাড়া আর কিছু শিখবে না এবং প্রয়োজনীয় সাধারণ অন্য বিদ্যাও তারা স্কুলে লাভ করবে না। লক্ষ লক্ষ দেহাতী ছাত্রের উপর এই দুই ভাষা চাপাবার কল্পনাটা শুধু জবরদস্তি নয়, আসলে একটা ধাপ্পা। তবে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষা এবং সংযুক্ত রাজ্যেরও রাজ্যভাষা, তার পিছনে যখন থাকবে হিন্দী-ভাষী রাজ্যদের বিরাট ও পরাক্রান্ত সমর্থন তখন পশ্চিম বাঙলায় হিন্দীর প্রচার বাড়বে আর তারই আনুষঙ্গিক হিসাবে ইংরেজির প্রচলন সংকীর্ণ হবে। এবং ইংরেজির সাংস্কৃতিক দান ক্রমশ স্বল্প থেকে স্বল্পতর পরিমাণে পৌছবে বাঙলা সাহিত্য ও গবেষণাদির ক্ষেত্রে। ইংরেজির স্থান হিন্দী পূরণ করতে পারবে কিনা তা রাজশেখর বসু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই জানেন।

দ্বিতীয় কথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কী হবে? বাঙলা সেখানে সংখ্যাল্পের ভাষা, হিন্দী বিহারের মাতৃভাষা না হলেও অধিকাংশের ভাষা। অতএব রাজ্যমধ্যে প্রথম গুরুত্ব হিন্দীর। তারপর আমরা এখনি শুনছি বিহারের আপত্তি—দুভাষায় রাজকার্য চালানোতে অযথা অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হবে। সুতরাং কার্যত যা হবে অনুমান করা যায়। বাজেটই ধরা যাক। প্রথমত তা উত্থাপিত হবে হিন্দীতে। তারপর মুদ্রণের অসুবিধার জন্য বাঙলায় আপত্তি করবার কারণ নেই। কারণ সকলেরই হিন্দীও অবশ্য জ্ঞাতব্য, তার উপর তা আবার রাষ্ট্রভাষা। অতএব অনতিকাল পরেই অধিকাংশ প্রশাসনিক কর্মে বাঙলা হবে দুয়োরানী, হিন্দী সুয়োরানী, আর তারপর ঘুটেকুড়ানির জীবন।

বাঙলা অবশ্য লোপ পাবে না। পূর্ব বাঙলায় তা বেঁচে থাকবে। আর, অনেকটা বর্তমান কালের মৈথিলী ভাষা ও সংস্কৃতিও টিকে থাকবে। কেউ কেউ তাতে সাহিত্যও লিখবেন, কাব্যও লিখবেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞানগভীর আলোচনা আর ইংরেজির পরিবর্তে এই স্বাধীনতার যুগে বাঙলায় হবে না, হবে হিন্দীতে। অর্থাৎ স্বাধীনতা লোভ ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পশ্চিম বাঙলার পক্ষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ তার স্বরাজ্য হারাবে। পাঁচমিশালি রাজ্যে সংস্কৃতি সংকর ছাড়া আর কিছু হয় না।

বিহারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র আলোচ্য। তার সমস্যা আরও জটিল। মৈথিল, ভোজপুরিয়ার পরিবর্তে হিন্দী যারা গ্রহণ করছে তারা কিন্তু এখনো স্কুলে-পড়া বিহারী, অর্থাৎ শতকরা পনেরো জন মাত্র। হিন্দী ভাষায় বিহারী সংস্কৃতি গড়তে হলে তাঁরা মৈথিল-ভোজপুরিয়ার প্রেরণা অবলম্বন করে গড়তে পারেন। তা হবে আইরিশ-ইংরেজি সাহিত্যের মতো বিহারের জাতীয় সাহিত্য। বাঙলা সত্যই শিখলে মৈথিলরা কি এই সাহিত্য হিন্দীতে লিখবেন, না আবার মৈথিলীতে ফিরে যেতে চাইবেন? না দোটানায় হাবুডুবু খাবেন?

এ বিষয় বিহারীদেরই বিশেষ আলোচ্য। আমরা শুধু প্রশ্নই উত্থাপনের অধিকারী। তবে এটুকু বলতে পারি—পাঁচমিশালি রাজ্যে তাঁদের অনতিপুষ্ট সংস্কৃতির যে দশা হবে তা খুব বাঞ্ছিত নয়।
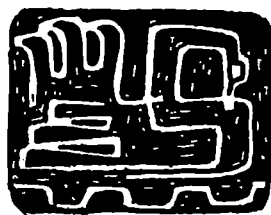
কবিতা

ইলিয়া গ্রিগরিয়েভিচ এরেনবুর্গ

তিনটি কবিতা

বিষ্ণু দে

তূর্য

আমি সেই তূর্য, যাকে ত্রিকাল বাজায় ;
আহ্বান আমার কাজ, ওদের শ্রবণ।
কিন্তু কে বা জানে বলো এই সত্য হায়
পিতলেরও ব্যথা জাগে, ভিজায় নয়ন ?

আমার নীরব মুখ ত্রিকালের জিদ
করেছে ভয়াল ভাবী কথনে মুখর ঃ
অলস হেলার থেকে গড়েছি শহীদ,
সরল সাঁঝের থেকে রাত্রি ভয়ঙ্কর।

সে এল—অপ্রতিহত তার জয়বেশ।
ওরা কি চিৎকার করে ? কাকে ওরা ডাকে ?
হাজারে হাজারে গর্জে ওঠে সারাদেশ,
সুরগুরু ত্রিকাল যে বাজায় সবাকে।

আমি তো যাইনি উল্টে ধীরস্থির হাতে
ভয়হীন ইতিহাসে পৃষ্ঠা পরপর,
আমি যুগযুগান্তের বিরাট সভাতে
বসাই নি সারে সারে অন্ধ কারিগর।

আমি তো বলি না কথা, শুধু দিই সাড়া
ত্রিকালের ক্ষতচিহ্নে আমার অধরে।
প্রচণ্ড জোয়ার নই আমি কূলছাড়া,
মানুষ কেবল, জন্ম নারীর জঠরে।

তূর্য মৃত্যুহীন। কিন্তু দেখে কয়জনা
রক্তে রক্তে উচ্চকিত পিতল ফুকারে
এই আমি তুলে ধরি বিজয়ী বন্দনা
তাদেরই আমাকে যারা রাখে অধিকারে॥

২

ওহো ডাঁশমাছি অতি দুর্ভাগা বটে,
যতোই তাড়াই সেই আসে ফিরে ফিরে,
চলে যায় বটে, ফেরে সে সন্ধ্যাঘোরে,
সর্বদা এক, গরমে কিংবা জলে।
যখন গুমোট শ্বাস হয় প্রায় রোধ
ও বোঝে না কিছু, মৃগীরোগী যেন, ঠিক
হাজিরা দেয় সে, সারারাত থাকে পড়ে।
কি যে করা যায়, অদ্ভুত ডাঁশমাছি!

৩

তাদের করুণ কথা কবি গেছে গেয়ে,
দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরে পরস্পর
দেখা যবে হল একে চেনে না অপর
স্বর্গে, কিবা আরো দুঃখ আছে এর চেয়ে।

স্বর্গে নয়, এই মর্ত্যে ঠাঁই আছে যেথা
অগ্নিবান হানবার আর আছে ব্যথা—
আমার প্রতীক্ষা দীর্ঘ, প্রেমেই যা থাকে,
আমার নিজেরই মতো চিনি যে তোমাকে,
তোমাকে ব্যথায় ডাকি, ডাকি সবখানে।

দিন কেটে যায়, যুদ্ধ শেষ হয়ে আসে,
নিজের বাড়িতে ফিরি, সে এল সন্তাষে,
দেখি পরস্পর আর চিনি না দুজনে।

নোভি মির্ ১৯৪৫, ৯ নং

স্বদেশ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সোনালি সবুজ এ দেশ আমার, আমার অহংকার
দিনরাত্রির মালা গেঁথে গেছি যুগযুগান্ত ধরে
ঘুমের শিয়রে স্বপ্ন বিছিয়ে জেগে আছি দুর্বার।

দিনরাত্রির মালা গেঁথে গেছি যুগযুগান্ত ধরে
ভাটিয়ালি সুরে ছড়িয়েছি কত ঢেউয়েদের উল্লাস
ফসলের দিন তুলেছি চাতালে জীবনের কলেবরে।

ভাটিয়ালি সুরে ছড়িয়েছি কত ঢেউয়েদের উল্লাস
যদিও আর্তনাদের সীমায় মৃত্যুর কানাকানি
তবুও প্রাণের শাখাপ্রশাখায় সবুজের ইতিহাস।

যদিও আর্তনাদের সীমায় মৃত্যুর কানাকানি
তবু উদ্ধত আষাঢ়ের দিন জোয়ারের বিস্ময়ে
মেঘে মেঘে আজ আকাশের নীলে কি কথার জানাজানি।

তবু উদ্ধত আষাঢ়ের দিন জোয়ারের বিস্ময়ে
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেয় মাথা চাড়া বার বার
রাতের আকাশ আড়ামোড়া ভাঙে জীবনের প্রত্যয়ে।

এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেয় মাথা চাড়া বারবার
সোনালি সবুজ এ দেশ আমার, আমার অহংকার॥

১৮

আরেক জন্মের আগে

তরুণ সান্যাল

দিনরাত্রির দোলায় দুলে দুলে আমার
সূর্যোদয় সূর্যাস্ত,
ভোরের আশ্চর্য পাপড়ি সন্ধ্যা এলে হিম
অন্ধকারের উদ্যত থাবার নিচে উদ্ধত কনকচাঁপা দিন,
হৃদয়ের অন্তরালে মোহানায় দাঁতচাপা নদী
বুকের কবাটে চাপ দেয়

ঈশ্বরী আমার, এ তো জীবনের চতুরালি
নিজের মৃতদেহের আসনে প্রাত্যহিক শবসাধনা,
নিজের জন্মের লগ্নে জীবনকে আবিষ্কার করে
সকরুণ আত্মহত্যা, প্রথম কান্নার স্বরে
আকাশের জন্মনক্ষত্রকে ছিঁড়ে আবার আঁধার ফিরে চাওয়া

এদেহে স্পন্দন গোনো হয়তো, সে স্পন্দনের ধ্বনি
চন্দনকাঠের প্রতি ঘর্ষণের ক্ষরণ, স্মরণ
মধ্যাহ্নের মূর্ছনায় অস্পষ্ট আবেগের মুখ চিনে চিনে
সন্ধ্যার বাঁকের মুখোমুখি হৃদয়কে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখা।
আমার প্রত্যয় দেখ, একটি শরীরের ধনুকে
একজোড়া বাহুর তীক্ষ্ণ শরের সমন্বয়

শমীবৃক্ষে আসন্ধ্যাসকাল তবু
দুলে দুলে দিনরাত্রির জলাবর্ত

তোমার নাভিমূলে একটি কনকপদ্ম
দিনরাত্রির হাওয়ার দোলায় টলমল-
আমি আবর্তনের অন্ধকারে
মুখ-লুকানো আরেকটা সকাল

ঈশ্বরী আমার
আমি জন্ম নেবো কবে ॥

[পূর্বানুবৃত্তি]

জে. বি. প্রিস্টলির
'ইন্সপেক্টর কল্‌স্‌'
অবলম্বনে

●

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

চন্দ্রমাধব সেন—বিখ্যাত ধনী, কয়েকটি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও ডিরেক্টর ॥ রমাসেন,—চন্দ্রমাধব সেনের স্ত্রী ॥ শীলা সেন,—ঐ কন্যা ॥ তাপস সেন,—ঐ পুত্র ॥ গোবিন্দ,—ঐ ভৃত্য ॥ অমিয় বোস,—চন্দ্রমাধব সেনের বন্ধুপুত্র ॥ তিনকড়ি হালদার,—পদ্মপুকুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর ॥ স্থান, পদ্মপুকুরে চন্দ্রমাধব সেনের বাড়ির ড্রয়িংরুম ॥ কাল, ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের এক সন্ধ্যা ॥

চন্দ্রমাধব। (তিনকড়িবাবু আসন গ্রহণ করিবার পর) কি আশ্চর্য! শীলার হল কি ?

তাপস। বোধহয় ছবিটা দেখে চিনতে পেরেছে ; তাই না তিনকড়িবাবু ?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দ্রমাধব। যত নষ্টের মূল তো আপনি! কেন আপনি মেয়েটাকে এভাবে আপসেট্‌ করে দিলেন ?

তিনকড়ি। ভুল করছেন। আমি আপসেট্‌ করিনি—উনি নিজেই আপসেট্‌ হয়ে গেলেন।

চন্দ্রমাধব। (ক্রুদ্ধ স্বরে) সেইটাই তো জিজ্ঞেস করছি—কেন ?

তিনকড়ি। আবার ভুল করছেন। কেন যে আপসেট্ হলেন, তা তো আমি এখনও জানতে পারিনি। ওটা জানতেই তো আমার এখানে আসা।

চন্দ্রমাধব। বেশ তাহলে আগে আমিই জেনে আসি—

অমিয়। চলুন, আমিও বরং আপনার সঙ্গে যাই কাকাবাবু, দেখি শীলাকে জিজ্ঞেস করে—

চন্দ্রমাধব। (উঠিয়া) না না, আগে আমিই দেখি ব্যাপারটা কি হল। তারপর তোমার কাকীমাকেও তো বলা দরকার। দেখি তিনি কি বলেন। (বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তিনকড়িবাবুকে ক্রুদ্ধস্বরে) আশ্চর্য! একটা এতবড় আনন্দের দিন। কেমন ছিলাম সন্ধেবেলা আর কোথা থেকে শনি এসে জুটলেন আপনি, সমস্ত আমোদটা পণ্ড হয়ে গেল একেবারে।

তিনকড়ি। (এতটুকু বিচলিত না হইয়া) আজ প্রাণে হস্‌পিটালে ডেড্-বডিটার দিকে দেখতে দেখতে আমারও ওই একটা কথা কেবলি মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—কত আমোদ আহ্লাদ, কি সুন্দর ফুটফুটে একটি জীবন—কোথা থেকে কারা এসে কি বিশ্রীভাবে পণ্ড করে দিয়ে গেল। (মিস্টার সেন যাইতে যাইতে উত্তর দিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে হয়তো মনে হইল কিছু না বলাই ভাল; তাই কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। তাপস ও অমিয়র অস্বস্তি-ভরা দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ। তিনকড়িবাবু কিন্তু এসব কিছু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না)।

অমিয়। এবার ছবিটা আমি একটু দেখতে চাই তিনকড়িবাবু।

তিনকড়ি। আজ্ঞে না। সময় হলেই আপনাকে আমি দেখাব।

অমিয়। আশ্চর্য! আমি তো বুঝতে পারছি না, কেন আপনি—

তিনকড়ি। (বাধা দিয়া গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে) দেখুন আমি তো আগেই একবার বলেছি—আমার এন্‌কোয়ারি করার রীতিই এই রকম। ও আমি দেখেছি, সবাইকে একসঙ্গে ধরলে বড় গণ্ডগোল হয়। আপনাকেও আমি একটু পরেই ধরব। তখন আপনার যা বলার আছে তা বলবেন।

অমিয়। (অস্বস্তির সহিত) না না, মানে, বলবার আমার কিছু নেই, মানে—

তাপস। (হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনকড়িবাবুকে) দেখুন মশাই, আমি আর পারছি না—

তিনকড়ি। (গম্ভীর ভাবে) না পারাটাই স্বাভাবিক।

তাপস। না—মানে—আজ আমাদের এখানে একটা ছোটখাট পার্টি গোছের ছিল। আর কি জানেন? মানে, ঐ পার্টি জিনিসটা একেবারেই আমার ধাতে সয় না। আমার এখানে থাকা মানেই আপনাদের কাজের অসুবিধে। তা ছাড়া মাথাটাই বড্ড ধরেছে। তাই বলছিলুম কি,—মানে আপনি যদি কিছু মনে না করেন,—তাহলে আমি এখন বরং ভেতরেই যাই—কি বলেন?

তিনকড়ি। আজ্ঞে না, আমি তা বলি না।

তাপস। বলেন না? মানে? কি বলেন না?

তিনকড়ি। ওই আপনাকে ভেতরে যেতে।

তাপস। (প্রায় চিৎকার করিয়া) কিন্তু কেন?

তিনকড়ি। তাতে আপনারই কষ্টটা কম হত। ধরুন, আপনি এখন ভেতরে গেলেন, কিন্তু হয়ত একটু পরেই আপনাকে আবার এ ঘরে আসতে হবে। এ ঘরে থাকলে এই যাওয়া-আসার কষ্টটা হত না।

অমিয়। আপনার কথাবার্তাটা কি একটু বেশী কড়া হয়ে যাচ্ছে না?

তিনকড়ি। হয়ত হচ্ছে। আপনারা সহজ ভাবে কইলে, আমিও সহজ ভাবে কইব।

অমিয়। না—মানে—আমরা তো আর ক্রিমিনাল নই, রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্ সিটিজন্‌স্—

তিনকড়ি। দেখুন—এই ক্রিমিনাল্ আর রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্ সিটিজন্‌স্—এ দুটোর মধ্যে তফাতটা কি খুব পরিষ্কার? আমার তা মনে হয় না। কতটা অবধি রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্, আর কোনখান থেকে ক্রিমিনাল্, এ যদি আমাকে কেউ বলতে বলে, আমি তো বলতে পারব না।

অমিয়। অবিশ্যি আপনাকে কেউ বলতে বলেও না—তাই না?

তিনকড়ি। না ঠিক তা নয়। সবটা না বলতে বললেও খানিকটা বলতে বলে। এই ধরুন আজকের এই এনকোয়ারির ব্যাপারটা—এটা তো আমার মতো লোকই করে। (শীলার প্রবেশ। মুখ দেখিয়া

মনে হয়, খুব খানিকটা কাঁদিয়াছে। ভিতরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল)।

শীলা। (তিনকড়িবাবুকে) আচ্ছা এর মধ্যে আমি যে আছি, এ বোধহয় আপনি গোড়া থেকেই জানতেন—না ?

তিনকড়ি। মেয়েটির লেখা ডায়েরিটা পড়ে মনে হয়েছিল, হয়ত আপনি আছেন।

শীলা। আমি বাবাকে সব বলেছি। তিনি তো বেশ বললেন—ও কিছু নয়, ও নিয়ে মন খারাপ করার কোন মানেই হয় না। কিন্তু আমার মন মানছে কই ? এত বিশ্রী লাগছে যে কি বলব আপনাকে ! আচ্ছা সত্যি বলুন তো, ওখান থেকে চাকরি যাওয়ার পর অবস্থাটা কি বড্ড খারাপ হয়ে পড়েছিল ?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ, দুর-অবস্থার একেবারে চরম। চাকরিটা গেল অকারণে। তারপর এধার ওধার চেষ্টা যে করে নি তা নয়—করেছিল। কিন্তু কিচ্ছু হয় নি। কাঁহাতক আর মানুষ না খেয়ে থাকে বলুন ? ভাবলে, ভাল রকমে যখন হল না, তখন দেখা যাক একটু রকমফের করে—যদি পেটটা অন্তত ভরে।

শীলা। (অসহায় কণ্ঠস্বরে) সত্যি, আমিই তাহলে দায়ী, তাই না ?

তিনকড়ি। না না, একেবারে আপনি দায়ী বললে ভুল বলা হবে। চেন্ স্টোরের চাকরি যাওয়ার পরেও তো কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে হ্যাঁ, আপনি আর আপনার বাবা—আপনারা দুজনে খানিকটা দায়ী তো বটেই।

তাপস। কিন্তু শীলা করেছিলটা কি ?

শীলা। করেছিলাম যা, তা খুবই অন্যায়। ম্যানেজারের কাছে মেয়েটির নামে কম্‌প্লেন্ করেছিলাম।

তাপস। কিন্তু ম্যানেজারই বা কি রকম লোক ? তুই গিয়ে বললি, আর মেয়েটাকে ওরা ছাড়িয়ে দিলে ?

শীলা। ওদের ম্যানেজার হীরেনবাবু যে ভয়ানক ভীতু লোক ! তার ওপর দোকানের মালিক তো একরকম অনন্ত জ্যাঠা। হীরেনবাবু তো জানে অনন্ত জ্যাঠা শেলী-মা বলতে অজ্ঞান।

তাপস। কিন্তু তা হলেও—

শীলা। না না, তা হলেও নয়। কম্‌প্লেনটা আমি খুব সাধারণ কম্‌প্লেন করিনি। সোজা গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটিকে পেলেন কোত্থেকে? হীরেনবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন কিছু করেছে-টরেছে নাকি? আমি বললাম—করেছে মানে? আমার দিকে তাকিয়ে অসভ্য ইঙ্গিত করেছে, অশ্লীল রসিকতা করেছে! কাল যদি এসে ওকে এখানে দেখতে পাই তো আপনার নামে জ্যাঠার কাছে রিপোর্ট করব—বলব, আপনি বিশেষ সুবিধে পাবার জন্যে যত সব খারাপ মেয়েছেলে এনে দোকানে ঢোকাচ্ছেন।

তিনকড়ি। কিন্তু কেন বললেন আপনি এ সব কথা?

শীলা। আপনি বিশ্বাস করুন তিনকড়িবাবু—রাগে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না!

তিনকড়ি। কিন্তু সে কি এমন করেছিল যাতে আপনার মাথাটা ঐরকম বেঠিক হয়ে গেল?

শীলা। আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি—মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। মনটা সেদিন এমনিতেই খারাপ ছিল। ঐ মুচকি হাসিটুকুতে—কি বলব—সর্বাঙ্গ রাগে যেন একেবারে জ্বলে উঠল।

তিনকড়ি। কিন্তু সেটা কি তার দোষ?

শীলা। না না, তার দোষ হবে কেন? দোষ আমার নিজেরই! (হঠাৎ অমিয়কে) কি অমিয়, চোখ যে আর নামাতে পারছ না! বড় মীন্ বলে মনে হচ্ছে আমাকে—না? আরে আমি তবু তো সত্যি কথা বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি? তুমি কি বলতে চাও লজ্জা পাবার মতো কোন কাজ কোনদিন তুমি করনি?

অমিয়। (বিস্মিত হইয়া) করিনি—আমি বলেছি কি একবারও? আমি তো বুঝতে পারছি না, কেন তুমি আমাকে শুধু শুধু—

তিনকড়ি। (অমিয়কে থামাইয়া দিয়া) থাক, আপনাদের ও ব্যাপারটা পরে সেট্‌ল্ করে নেবেন। (শীলাকে) হ্যাঁ কি হয়েছিল সব বলুন তো?

শীলা। আমি সেদিন ওখানে গিয়েছিলাম একটা লং কোট ট্রাই করতে। কোটটা নিয়ে এসে হেড-অ্যাসিস্ট্যান্ট বলল, এই কাটটা বোধহয়

আপনাকে ঠিক ফিট্ করবে না, এটা এই রকম গড়নে ভাল ফিট করে। ওই বলে ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে তার কাঁধের সঙ্গে লাগিয়ে আমাকে দেখালে। দেখলাম সুন্দর ফিট করেছে। কিন্তু আমারও কি জানি কেমন জেদ চেপে গেল। বললাম, না, ঐ কোটটাই আমি নেব। কিন্তু পরে দেখি, একেবারে মানায় নি, বিশ্রী দেখাচ্ছে। ঠিক সেই সময় আয়নার ওপর চোখ পড়ল। দেখি, মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। মনে হল, যেন বলতে চাইছে, মেয়েটাকে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে দেখ। রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। কোটটা হেড-অ্যাসিস্ট্যান্টের গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে চলে এলাম ম্যানেজারের কাছে। তারপর—তারপর যা হয়েছে সবই তো আপনাকে বলেছি। (অসহায় কণ্ঠস্বরে) না—জানেন, যদি মেয়েটিকে দেখতে একটা মন্দ-নয়-গোছেরও কিছু হত, তাহলে হয়ত আমি কম্প্লেন্ই করতাম না। কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে! এতটুকু অসহায় বলে মনে হয় নি, তাই কম্প্লেন্ করে দুঃখও এতটুকু হয় নি।

তিনকড়ি। তাহলে একরম বলতে পারেন, আপনার বেশ একটু হিংসে হয়েছিল—কেমন ?

শীলা। (অসহায়ভাবে) তাই হবে বোধহয়। তা নইলে, আমিই বা কেন কম্প্লেন করলাম—

তিনকড়ি। আর হিংসে হয়েছিল বলেই, অনন্ত জ্যাঠার ভাইঝি হিসেবে, আর আপনার বাবার মেয়ে হিসেবে আপনার যেটুকু ক্ষমতা আছে, তা প্রয়োগ করলেন একটা নিরীহ মেয়ের ওপর। ফলে তার চাকরিটা গেল! আর এত কাণ্ড করার কারণটা কি ? না তার একটু মুচকি হাসি আপনার মাথাটাকে বেঠিক করে দিয়েছিল—এই তো ?

শীলা। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বুঝে দেখুন—ব্যাপারটা যে এত সাংঘাতিক হতে পারে, তা আমার মাথাতেই আসেনি তখন! এখন আমি বুঝেছি! এখন যদি তার সাহায্যের দরকার হত, আমি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম!

তিনকড়ি। (রূঢ় স্বরে) হ্যাঁ, বুঝেছেন ঠিক, কিন্তু বড্ড দেরি করে বুঝেছেন! এখন কোথায় পাবেন তাকে, যে সাহায্য করবেন! সে তো আর বেঁচে নেই!

তাপস। মাই গড্ !—-ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে—

শীলা। (ঝড়ের বেগে) you shut up ছোড়দা! ব্যাপারটা যে বেশ জটিল তা কি তোঁকে বলে দিতে হবে না কি ? আমি বুঝি না, কতবড় অন্যায় আমি করেছি ? আপনি বিশ্বাস করুন তিনকড়িবাবু, ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি বুঝেছি! যা করেছি, তা এই একবারই করেছি, আর কখনও করব না। আজ বিকেলে আমি চেন স্টোরে গিয়েছিলাম। তখন গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওখানে কজন যেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বোধ হয় আমাকে দেখে ওই মেয়েটির কথা তাদের মনে পড়ে গিয়েছিল! (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) ওঃ কি লজ্জা! কোনদিন আমি আর ও পথ মাড়াতে পারব না! ওঃ—কেন কেন এমন অঘটন ঘটল বলতে পারেন ?

তিনকড়ি। (কঠোর স্বরে) আজ পাণ্ডে হসপিটালে, মেয়েটির মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে, আমিও নিজেকে ঠিক ঐ প্রশ্নটাই করেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, বুঝতে চেষ্টা কর তিনকড়ি, কেন ব্যাপারটা ঘটল, এ অঘটন না ঘটলে কি চলত না! তাই বুঝতেই আমার এখানে আসা—আর না বুঝে আমি এখান থেকে যাবও না। কি কি facts আমি পেয়েছি ? দয়াময়ী কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠান আপনার বাবার একটা কন্‌সার্ণ্। সন্ধ্যা চক্রবর্তী বলে একটি মেয়ে সেখানে কাজ করত। মাসে মাইনে পেত তিরিশ টাকা। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে চেয়ে তারা স্ট্রাইক্ করে। স্ট্রাইক ফেল করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাবা সন্ধ্যাকে ছাঁটাই করেন। ভয়, পাছে ও থাকলে আবার ঐ রকম স্ট্রাইক হয়। মাস-দুয়েক বেকার বসে থাকর পর ধর্মতলায় চেনস্টোরে আবার একটা চাকরি সে যোগাড় কারে। এই নতুন চাকরিতে যখন সবে সে স্থিতু হয়ে বসতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই সময় আবার তার চাকরি যায়। কারণ কি ? না, লংকোটটা মানাচ্ছে না বলে আপনি নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। সেই বিরক্তির জের গিয়ে পড়ল তার ওপর। ফলে এ চাকরিটাও তার গেল। এর পরেও এধার-ওধার চাকরির চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু পায়নি। কিন্তু বাঁচতে তো হবে ? কাজেই ঠিক করলে একটু রকম ফের করে দেখবে। কিন্তু রকমটার নেচারটা খুব ভাল নয়।

কাজেই নামটা বদলাতে হল। প্রথমে ছিল সন্ধ্যা চক্রবর্তী, মাঝে চেনস্টোরে কি ছিল তা আমার জানা নেই, এবার নাম বদলে হল ঝরনা রায়।

অমিয়। (ভীষণভাবে চমকিত হইয়া) কি; কি নাম বললেন?

শীলা। (কঠোর দৃষ্টিতে অমিয়কে দেখিতে দেখিতে) ঝরনা রায়।

(দেখা গেল শীলা একদৃষ্টিতে অমিয়র দিকে চাহিয়া রহিয়াছে)

অমিয়। (শীলার দিকে চোখ পড়িতে থতমত অবস্থায়) না-মানে-শীলা-মানে—

তিনকড়ি। (উঠিয়া) আপনার বাবা কোথায় গেলেন মিস্ সেন?

শীলা। বাবা? বাবা ভেতরের ড্রয়িংরুমে মার সঙ্গে কথা কইছেন। আপনি যাবেন তাঁর কাছে? (তাপসকে) ছোড়দা, এঁকে একটু ভেতরে নিয়ে যা তো। (তাপস উঠিয়া "আসুন তিনকড়ি বাবু" বলিলে, তিনকড়ি বাবু একবার শীলার মুখের দিকে, আর একবার অমিয়র মুখের দিকে তাকাইলেন। তারপর "চলুন" বলিয়া তাপসের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।)

শীলা। তারপর অমিয়?

অমিয়। কি বল?

শীলা। সন্ধ্যা চক্রবর্তীকে তাহলে তুমি জানতে?

অমিয়। না।

শীলা। মানে ঐ ঝরনা রায়কে? একই তো ব্যাপার—

অমিয়। ঝরনা রায়কেই বা আমি জানতে যাব কেন?

শীলা। বোকার মতো কথা বোলো না অমিয়! হাতে আমাদের খুব বেশী সময় নেই। তিনকড়িবাবুর মুখ থেকে ঝরনা রায় নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখের চেহারা পাল্টে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল!

অমিয়। আচ্ছা বেশ— জানতাম। কিন্তু এ কথার এখানেই শেষ হোক।

শীলা। কিন্তু কি করে এখানে শেষ হবে—সেটা বল?

অমিয়। কিন্তু শীলা, তুমি বুঝতে পারছ না—

শীলা। (বাধা দিয়া) আমি খুব বুঝতে পারছি! তুমি শুধু তাকে চিনতে না, খুব ভাল করে চিনতে! তাই নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মুখ

কালো হয়ে উঠেছিল! নিশ্চয় চেনস্টোর ছাড়ার পর তোমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। তখন সে, নাম বদলে ঝরনা রায়—একটু রকমফের করে দেখছে—বাঁচতে পারে কি না! আজ আমি বুঝতে পারছি, গেলো বছর মে-জুন-জুলাই কেন তুমি এদিক মাড়াওনি। এখানে ওখানে দেখা হলে বলতে, ভয়ানক কাজ। ওই তিনমাস তুমি ওর সঙ্গেই ছিলে!

অমিয়। কিন্তু শীলা, সে ঐ তিনমাসেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর এতদিন কেটে গেছে, একবারও আমার তার সঙ্গে দেখা হয়নি। সত্যি বলছি শীলা, তুমি বিশ্বাস কর, এ আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!

শীলা। আধঘণ্টা আগে আমারও ঐ ধারণা ছিল। আমারও মনে হয়েছিল, এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!

অমিয়। সম্পর্ক তো নেই! তোমারও নেই—আমারও নেই! কিন্তু দোহাই তোমার, এসব কথা যেন ঐ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরটাকে বোলো না!

শীলা। কি কথা বল তো? তুমি মেয়েটিকে জানতে, এই?

অমিয়। হ্যাঁ, ওটা তোমার-আমার মধ্যেই থাক—

শীলা। (অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া উঠিয়া) তুমি কি বোকা অমিয়! সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার এ সমস্ত কথা জানে! আর শুধু এটুকু কেন? হয়ত দেখ—এমন অনেক কথা জানে—যা আজও আমরাই জানি না! দেখে নিও তুমি-এ যদি ঠিক না হয় ত কি বলেছি! (এতক্ষণ অমিয়র কাছে নিজেকে বড় ছোট বলিয়া মনে হইতেছিল। এবার অমিয়র মুখ শুকাইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার মুখে বেশ একটু হাসিও ফুটিয়া উঠিল। ঠিক এমন সময় দরজা খুলিয়া সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরের আবির্ভাব)।

তিনকড়ি। (দুইজনের মুখের উপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমিয়কে প্রশ্ন করিলেন) তারপর মিস্টার বোস?

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও নামিয়া আসিল।

●

শিল্পী শরৎচন্দ্র

সুধীর রায়চৌধুরী

"পথের দাবী চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয়, ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারেকে কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ে চাষার কুটিরে।" [পথের দাবী, পৃ—৭১২]

পূর্বভাষণ

ঐতিহাসিক কালবিচারে শরৎচন্দ্র 'সবুজপত্র' যুগের সমসাময়িক, যদিও মানসনির্মিতিতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সবুজপত্রগোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান মেরুপ্রমাণ। ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 'বড়দিদি' প্রকাশের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। সবুজপত্রের প্রকাশকাল ১৯১৩ সাল। বাঙলা সাহিত্যে এই যুগসন্ধিপর্বের রূপটি আপাতভাবে জটিল। একদিকে সবুজপত্রগোষ্ঠীর ভঙ্গিপ্রধান সাহিত্য-আন্দোলন, অন্যদিকে বাঙলা উপন্যাসে বস্তুবাদী ধারা প্রবর্তনে শরৎচন্দ্রের বৈপ্লবিক কৃতিত্ব। সবুজপত্রে 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি গল্প প্রকাশিত হলেও মুখ্যত এ হল ভঙ্গিপ্রধান সাহিত্য আন্দোলন এবং শরৎ-সাহিত্যের সঙ্গে এর বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব অসামান্য হলেও তাঁর ক্ষেত্র সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপে সীমাবদ্ধ।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয়ই মানবেন, বাঙলা সাহিত্যে এই দুজনেরই ভূমিকা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। সবুজপত্র আন্দোলনকে অস্বীকার করবার স্পর্ধা কারো নেই এবং বীরবল যদি চলিত ভাষাকে তার যথোচিত মর্যাদাদানে অপারগ হতেন, তাহলে আধুনিক বাঙলা গদ্যের ধারা স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাধর্ম্যে অনেকাংশে ব্যাহত হত নিঃসন্দেহ। ভাষার এই রূপগত নিরীক্ষার মধ্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক হলেও অস্বাভাবিক নয়। কেননা বস্তুচেতনার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে তাঁর আবির্ভাব, সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে সামাজিক নীতিবোধের প্রতি শরৎচন্দ্রের অনাস্থা দেখা দিয়েছে অনেক পরে —তাঁর প্রথম দিকের রচনায় প্রচলিত সামাজিক অথবা নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি বিদ্রোহ দূরের কথা সামান্য নেতিবাদ পর্যন্ত অনুপস্থিত। এই পর্বে লেখকের লক্ষ্য 'মিষ্টি প্রেমের গল্প' অথবা 'ঘরোয়া জীবনের ছোটখাটো চিত্রণ।' গল্পের মধ্যে প্রসঙ্গত যেখানে সামাজিক প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে লেখক তা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে বড়দিদি, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসের নাম উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলির পটভূমিকা প্রায় সবক্ষেত্রেই পল্লীজীবন এবং একান্নবর্তী পরিবার। এই বিশেষ দিকে শরৎচন্দ্র আজো অপরাজেয় কথাশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের গল্পে আমরা পল্লীজীবনে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের রূপটি পাই, শরৎসাহিত্যে বিশেষভাবে এর সমৃদ্ধির রূপটি প্রতিফলিত। 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অনাস্থা প্রবল, তাই 'হালদারগোষ্ঠী' ইত্যাদি গল্পে ভাঙনের রূপটিই স্পষ্ট। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শরৎচন্দ্রের আজন্ম পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে। আপাতত আমার বক্তব্য, শিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব হল এই—এক দিকে ফেলে-আসা জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধের প্রতি মমত্ব; অন্যদিকে স্পর্শকাতর চিত্তে তিনি অনুভব করেছিলেন এর ভাঙনের রূপ। কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর সামন্তবাদী সংস্কারই প্রবল, ফলে তাঁর রচনার কয়েকজায়গায় শিশুসুলভ অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। বরং যেখানে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি উদাসীন, সেখানে অসঙ্গতি কম এবং শিল্পরচনা হিসেবেও অধিকতর সার্থকতা। 'বিন্দুর ছেলে' 'নিষ্কৃতি' 'রামের সুমতি' সুন্দর গল্প।

এর সঙ্গে 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসের তুলনা করলে দেখা যাবে শেষোক্ত উপন্যাসের পরিণতি কত দুর্বল এবং দ্রুত। জ্ঞানদার চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাক—জ্ঞানদার অপমানিত অরক্ষণীয়া যৌবনের কী নিপুণ বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। জ্ঞানদা এখানে 'typical character under typical circumstances'। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনোযোগ বিষয়ান্তরে ব্যস্ত। তাই শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য জ্ঞানদার দুঃখ-কষ্টের জন্যে দৈবই দায়ী। অতুলের ভুল বোঝাবুঝির জন্যে জ্ঞানদার এই নিগ্রহ, দরিদ্র জ্ঞানদার সঙ্গে ধনী অতুলের আর কোথাও দ্বন্দ্ব নেই এবং শেষ দৃশ্যে অনুতপ্ত অতুল জ্ঞানদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে সব দুঃখের শেষ হল।

এই প্রসঙ্গে টলস্টয়ের 'রিসারেকশন' উপন্যাস স্মরণ করুন। 'রিসারেকশন' এবং 'অরক্ষণীয়ায়' যত বৈপরীত্যই থাক, প্রধান বিষয়ে তাদের ঐক্য রয়েছে—একটি মেয়ে স্বদোষে নয়, পারিপার্শ্বিকের জন্যে নির্যাতিত হয়েছে। জ্ঞানদা এবং মাসলভা দুজনেই জীবনের এই প্রবঞ্চনাকে মেনে নিয়েছে, তাই বলে মাসলভা কিন্তু নেকলুডভকে ক্ষমা করে নি। নেকলুডভ যখন জেলখানায় তাকে উদ্ধার করতে এল, তখন বলল, "So you want to save your soul through me, eh ? In this world you used me for your pleasure and now you want to use me in the other world to save your soul !" অতুল অবশ্য নেকলুডভের মত হীন ভাবে নয়, তবুও জ্ঞানদার নারীত্বের অবমাননা করেছে। কিন্তু নানা অবস্থাবিপর্যয়েও জ্ঞানদা একই জ্ঞানদা থেকে যায়, অতুলের প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাও তার মধ্যে অনুপস্থিত। পারিপার্শ্বিকের কোনো প্রভাব তার মধ্যে নেই। জ্ঞানদা যেমন স্বভাবসিদ্ধ নৈঃশব্দ্যে সব লাঞ্ছনাকে মেনে নিয়েছে, তেমন ভাবেই যদি নীরবে অতুলকে প্রত্যাখ্যান করত তাহলে সত্যিকার মহৎ সৃষ্টি হতে পারত। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের কয়েকটি মহত্ত্ব বা ঔদার্য জন্মগত, এ জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না। দ্বিতীয়ত, নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনায়ও শরৎচন্দ্রের রীতি একেবারে ছককাটা—নায়িকা দরিদ্র হলে ধনী নায়ক হবে, নায়ক দরিদ্র হলে, ধনী নায়িকা হবে, যেমন নরেন্দ্র-বিজয়া, ললিতা-শেখর, জ্ঞানদা-অতুল, কমল-অজিত ইত্যাদি। (এবং বোধ হয় এ রীতি বাঙলা উপন্যাসে আজো প্রচলিত)। শরৎ-সাহিত্যে একটি সামন্ততান্ত্রিক রীতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

অনেক সময় বাল্যপ্রেমকে তিনি অযথা গুরুত্ব দিয়েছেন। শৈশবপ্রেমের প্রভাব শরৎচন্দ্রের ওপর এত বেশি যে গভীর প্রেমের চিত্রণে তিনি প্রায় সর্বত্রই একে অবলম্বন করেছেন। এদিক থেকে তিনি একেবারে বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের সমসাময়িক। গ্রামজীবনের পটভূমিকায় এ রীতি হয়তো সহনীয়, কিন্তু শিক্ষিতা-আধুনিকা বিজয়ার যখন নরেনের প্রতি ভালোবাসার অন্যতম কারণ হিসাবে শুনি তাদের জন্মপূর্বে তাদের পিতাদের পরস্পরের প্রতিশ্রুতি তখন আমাদের মন নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করে।

সৃষ্টি ও দৃষ্টি : অন্তর্দ্বন্দ্ব

আগেই বলা হয়েছে, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শরৎচন্দ্রের আজন্ম দুর্বলতা, কিন্তু কয়েক জায়গায় যুক্তি দিয়ে তিনি একে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, পারেন নি। ফলে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে কতকগুলি মৌলিক অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের অভিযোগ স্পষ্ট ছিল না। তাঁর এ স্ববিরোধের দরুন তাঁর তথাকথিত বিদ্রোহিনী নায়িকাদের পরিণতিও কিরকম অস্বাভাবিক। আপাতত আমরা শরৎ-সাহিত্যের কতকগুলি মৌল অসঙ্গতির রূপ বিচার করব।

সামাজিক প্রথার প্রতি শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের আনুগত্য অপরিসীম। বিবাহের স্মৃতি যতই তিক্ত অথবা ভয়াবহ হোক অলকা অস্বীকার করতে পারে না, 'স্বামী'র কুসুমও পারে নি এবং অনেকেই পারে নি। শরৎ-সাহিত্যে নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে মাতৃত্বের বিকাশে। এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন। বস্তুত একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে রাজলক্ষ্মী, অভয়া। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কোনো নায়িকার মুখে যখন শুনি, "চাটুবাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারীজাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে কোনো অবস্থাই অঙ্গীকার করুন দিদি, এই মিথ্যে নীতিটাকে কখনো মেনে নেবেন না" (কমল, 'শেষ প্রশ্ন' পৃঃ—৩২৫) তখন বিস্ময়ে অবাক হই। শরৎচন্দ্রের অন্যতম বিদ্রোহিনী নায়িকা এই কমললতার কোনো বিশেষ বিবাহ-প্রথা খারাপ বলে বিবাহেই অনাস্থা দেখা দিল, অথচ দীর্ঘকাল সহবাসে

(নিঃসন্দেহ অবৈধ) আর আপত্তি নেই, বরং পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। কমলের বিদ্রোহ জীবনের প্রতি নাস্তিক্যবাদেরই নামান্তর।

কমল সব কিছুতেই অবিশ্বাসী। কিন্তু আশ্চর্য এই যে কমলের জন্ম যদিও অবৈধ প্রেমে তবু লেখক আমাদের জানাতে ভোলেন না যে কমলের পিতা সচ্চরিত্র এবং বিদ্বান্; এবং স্বয়ং কমল একবেলা স্বপাকে আহার করে, কোনো অবস্থাতেই তার ব্যতিক্রম হয় না। এমন নিষ্ঠাবতীর বিবাহে অনাস্থা, কিন্তু দীর্ঘকাল অবৈধ সহবাসে নয়। এ সম্পর্কে তার যুক্তিও অদ্ভুত।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় নারীনির্যাতনের কথা মার্কসবাদী পণ্ডিতেরা বলে গেছেন। কিন্তু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এও দেখিয়েছেন সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কি করে নারীমুক্তি সম্ভব। শরৎচন্দ্রের এই শ্রেণীরূপ সম্পর্কে ধারণাও বিচিত্র—তাঁর মতে নারীজাতির এই অবস্থা কোনো বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি নয়। যুগে যুগে পুরুষেরা নারীদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার করে চলেছে, "পুরুষের তৈরী সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরেচি—কত যে জ্বলেচি সে জানাবার নয়। শুধু জ্বলুনিই সার হয়েছে —কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নর-নারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশি আর এক পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি স্বাধীনতা তত্ত্ববিচারে মেলে না, ন্যায়-ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল করে মেলে না—**এ কেউ কাউকে দিতে পারে না—দেনাপাওনার বস্তুই এ নয়।** কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতা, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবনকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না—মরে" (শেষ প্রশ্ন, পৃ—৪০৭)। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষ প্রশ্ন'কে অন্যতম মূল্যবান সৃষ্টি বলে মনে করতেন।

প্রসঙ্গত 'নারীর মূল্য' বইটি স্মরণীয়। এখানে তিনি আদি কৌমদের থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যদেশ পর্যন্ত প্রচলিত বিভিন্ন আচার-প্রথার মধ্য দিয়ে নারী-নির্যাতনের বহুবিধ উদাহরণ সংগ্রহ করছেন। কিন্তু নারীর দুঃখ-কষ্টের প্রতি তাঁর অনুভূতি যত তীব্র, অভিজ্ঞতা তত গভীর নয়। তাই সমাজে শ্রেণী বলতে তিনি দুটি শ্রেণীই বুঝতেন—পুরুষ এবং নারী। তাঁর

সামাজিক প্রশ্ন এবং সমস্যাবলী সেজন্য ভাসা-ভাসা, কোনো সঙ্গতি নেই। তিনি একদা মন্তব্য করেছিলেন, ঔপন্যাসিক সমস্যার কথা বলেন, সমাধান দেওয়া তাঁর দায়িত্ব নয়। কথাটির যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু সমস্যার যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ চিত্রণ ঔপন্যাসিকের অবশ্যদায়িত্ব—শরৎচন্দ্র তাঁর ভাবপ্রবণতার মোহে মাঝে মাঝে এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হয়েছেন। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া চরিত্রায়ণে অসঙ্গতি। উদাহরণ দেওয়া যাক। এ তো নিশ্চয়ই সর্বসম্মত সত্য যে শরৎচন্দ্র নারীর সামাজিক মুক্তিতে বিশ্বাসী—এজন্য তিনি আজন্ম সংগ্রাম করে গেছেন। কিন্তু এই শরৎচন্দ্রই আবার বিশ্বাস করতেন দুঃখকে সহ্য করা, প্রতিকূল অবস্থাকে মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেবার মধ্যেই নারীত্ব [দ্রষ্টব্য শ্রীকান্ত-অভয়ার কথোপকথন]। বস্তুত এই মৌল অসঙ্গতির জন্যে তিনি বিদ্রোহিনী নারীচরিত্র সৃষ্টিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ (যথা কমল, অভয়া, কিরণময়ী)। স্রষ্টার অসঙ্গতি সৃষ্টিকেও প্রভাবিত করেছে। রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদি, বিন্দু, কুসুম ইত্যাদি চরিত্র-চিত্রণে তিনি যত সার্থক কমল-কিরণময়ী চরিত্রায়ণে ততখানিই ব্যর্থ। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন, "কার্যক্ষেত্রে দেখেছি, যখনই আমার মনের কোণে সেই 'কনজারভেটিভটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখুনি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। এই যেমন ধর না বিধবা-বিবাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহে অনুমতি না দেওয়া স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির অন্যায়ের একটা জঘন্য দৃষ্টান্ত। সংসারে পাপ-তাপের এই মূল কারণ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বিধবা বিবাহ দেবার অনুমতির দায়িত্ব যখন আমার উপরে আসে, **তখন অন্তর থেকে সে অনুমতি কিছুতেই দিতে পারিনে"** (শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প, পৃ-৩৮)।

এই কারণেই দেখতে পাই অভয়া প্রগতিবাদিনী হলেও শরৎ-সাহিত্যের অন্যান্য নায়িকার চেয়ে অনেক আড়ষ্ট। রোহিনীর সঙ্গে তার প্রেমে মহত্ত্ব নেই, অনেকটা বৈষয়িক প্রেরণাই সক্রিয়। তার ওপর শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের প্রতি স্রষ্টার বিশেষ পক্ষপাত অভয়াকে আরো নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। অবশ্য শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমেও অসঙ্গতি প্রচুর। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে বলেছে, তার জন্যে সে প্রাণ বিসর্জন করতে প্রস্তুত, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করতে পারে না। এসব উক্তিতে শরৎচন্দ্রের স্ববিরোধ স্পষ্ট।

চরিত্রচিত্রণ : ব্যক্তি ও শ্রেণী

অনিবার্যভাবে চরিত্রায়ণের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস মনস্তত্ত্বপ্রধান বলে বাইরের ঘটনার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং চরিত্রচিত্রণের ওপর উপন্যাসের উৎকর্ষ একান্তনির্ভর। বাইরের ঘটনা-প্রবাহ এখানে যথাসম্ভব নিয়মিত বলেই হয়তো ঘটনাসংস্থানে কতকগুলি মুদ্রাদোষ অনিবার্য। যেমন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেমের দৃশ্যের সঙ্গে আহারের দৃশ্য অপরিহার্যরূপে জড়িত। অমন যে বাগ্‌বিপ্লবিনী কমল সে-ও এর ব্যতিক্রম নয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বহুস্থানে করা হয়েছে, সুতরাং আপাতত এ আলোচনা নিরর্থক।

শরৎচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণে প্রধান ক্রটি তিনি চরিত্রের শ্রেণীরূপে বিশ্বাস করতেন না—উপন্যাসে একটি চরিত্র তার আচার-আচরণে, স্বাতন্ত্র্যে-বৈশিষ্ট্য একটি পৃথক ব্যক্তিত্ব, তার সঙ্গে আর কারো মিল নেই। আবার একই সঙ্গে সে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ—সেই শ্রেণীর চিন্তাধারা তার মধ্যে প্রতিফলিত। এটি হল সেই ব্যক্তির টাইপ ভূমিকা। ধরা যাক কোনো ঔপন্যাসিক একজন স্কুল-শিক্ষকের জীবন চিত্রিত করলেন। এখানে তার সুখ-দুঃখ, সমস্যা-সমাধান একান্তভাবেই তার নিজস্ব। সে নিজের মতো চিন্তা করে, নিজের পদ্ধতিতে জীবন নির্বাহ করে। কিন্তু এর মধ্যে তার সামাজিক সত্তাও বিধৃত এবং এখানে অনেক স্কুল-শিক্ষকের সঙ্গেই তার মিল। সমগ্র শিক্ষক-জীবনের সে প্রতিনিধি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে কোনো ঔপন্যাসিক যদি কোনো স্কুল-শিক্ষককে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের মনোবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন তবে কেউ তাকে সার্থক সৃষ্টি বলবে না। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিতে এই ক্রটি বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে, তাঁর টাইপ চরিত্রগুলিও ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত। এজন্য তাঁর চরিত্রগুলিকে সবসময় প্রতিনিধিস্থানীয় বলা চলে না। সাবিত্রী আর যাই হোক মেসের ঝি নয়, রাজলক্ষ্মী বাইজী নয়, রমা অসতী নয়। সুমিত্রা কি যথার্থই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেত্রী? এর ফলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাব একেবারে নেই বললে চলে, চরিত্রগুলি প্রায়ই 'anarchic'—নিজেদের খেয়ালখুশিমত চলে। শরৎচন্দ্রে এ ক্রটি সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'সাবিত্রী সত্যিই ঝি-শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মীদেবীও দায়ে পড়ে একবার এক ব্রাহ্মণগৃহে দাসীবৃত্তি

করেছিলেন" (শরৎ-পরিচয়, পৃ-৪৯)। কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের একটি মহৎ সৃষ্টি হতে পারত যদি উৎকেন্দ্রিকতা তাকে প্রভাবিত না করত। উপেন্দ্রের কাছে প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য সে দিবাকরকে নিয়ে রেঙ্গুনে পলায়ন করল—এ আত্মনিগ্রহের পরিণতি উন্মাদনায়। এখানে তার আচরণ শুধু উৎকেন্দ্রিক নয়, এখানে তার প্রেমও মহত্ব হারিয়েছে। আর সামাজিক প্রশ্নগুলিও বহু আগেই গৌণ হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনো উপন্যাসের কোনো নায়িকা কিরণময়ীর মত হীনভাবে প্রমাণ করে নি, 'Vengeancc is mine ; I shall repay. I never forgive, nor do I forget.'

উপসংহার

উপসংহারে আমরা শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক মতাদর্শের আলোচনা করব। ধনতন্ত্রজাত শহুরে সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় শরৎচন্দ্রের স্বল্প। তিনি বাঙলার পল্লীজীবনধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যেখানেই সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করেছেন, সেখানেই তিনি ব্যর্থ। যেমন স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না—তাই সব্যসাচী-পরিকল্পিত মুক্তি আন্দোলনে কুলি-মজুর আছে, কিন্তু চাষীর স্থান নেই (প্রবন্ধের গোড়াতে 'পথের দাবী'র উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। এর কারণ তিনি জোর করে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জীবনধারাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, ফলে তাঁকে সবকিছুকেই অস্বীকার করতে হয়েছে। আমাদের আধাসামন্ততান্ত্রিক জটিল সমাজরূপ সম্পর্কে এ অনভিজ্ঞতারই পরিচয়। আমাদের মুক্তিআন্দোলনের চিত্রণও তাঁর উপন্যাসে খুব অস্পষ্ট। অপূর্ব চরিত্রটি না থাকলে 'পথের দাবী' উপন্যাসকে সুদূর প্রাচ্যের কোনো দেশের মুক্তি আন্দোলন বলে ভুল হয়। সব্যসাচীর অধিকাংশ ঘাঁটিই সুদূর প্রাচ্য অথবা ইয়োরোপে এবং বহু দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সে জড়িত। আমাদের মুক্তি আন্দোলনের এতখানি ব্যাপ্তি ছিল কিনা ভাববার বিষয়। 'পথের দাবী' সমিতিতে মুক্তি আন্দোলনের কথা একেবারে নেই, আর, সব্যসাচীর আচরণেও নেই। কোনো দেশের মুক্তি আন্দোলন ওরকম

আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় হওয়া অসম্ভব। শরৎচন্দ্র আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েও কেন এই রূপকথার সৃষ্টি করতে গেলেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। একি অসাধারণের প্রতি মোহ?

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আরেক সমস্যা অপরিহার্যভাবে জড়িত—প্রেম এবং গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি। এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট মীমাংসা অবশ্য সম্ভব নয়। তাই বলে একে নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রশ্রয় দেয়াও নিরর্থক। আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এ সংস্কার সুপ্রসিদ্ধ—বিপ্লবী মানেই চিরকুমার। লেনিন-ক্রুপস্কায়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল। সব্যসাচীও এই সংস্কারকে স্বীকার করে নিয়েছে। সুমিত্রা কি কারণে সব্যসাচীর জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না, তার কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই, অনেকটা আত্মনিগ্রহের ফলে অসুস্থ আত্মপ্রসাদের মতো। এ ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র প্রথানুগ।

'পথের দাবী'তে প্রগতি-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা রয়েছে শশীকবির প্রতি সব্যসাচীর নির্দেশে। সব্যসাচীর মতে, "**অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ তাদের ক্ষুধাবোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না।** তাদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা করা মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই করে নেবে,—নইলে তোমার গলায় লাঙলের গান লাঙল-ধারীর গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি কোরো না কবি।" (পৃ-৩৬১)। সাহিত্য সম্পর্কে এ উক্তি ট্রটস্কির মতামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ট্রটস্কি বুর্জোয়া যুগে প্রলেটারীয় সাহিত্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি তাঁর মতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার পরেও সার্থক গণসাহিত্যের সৃষ্টি নাও হতে পারে, কেননা, "Our proletariet has its political culture……but it has no artistic culture "(Literature and Revolution.)"

বাঙলা সাহিত্যে বস্তুবাদী ধারা প্রবর্তনের কৃতিত্ব সত্ত্বেও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং স্ববিরোধের মধ্য দিয়ে শরৎ-সাহিত্যের পূর্ণ তথা পুনর্বিচারের সময় এসেছে। অবশ্য চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তা এবং সাহিত্যে তাঁর অনুকারীদের ভিড় দেখে সন্দেহ হয় হয়তো মোহমুক্তির অনেক দেরি।

কেরানীর মৃত্যু

আন্তন শেখভ

কী সুন্দর সেই রাতটা! আমাদের আদর্শ কেরানী শ্রীইভান ডিমিট্রিচ্ চারভিয়াকভ স্টলের দ্বিতীয় সারিতে বসে অপেরা-গ্লাস চোখে দিয়ে বিভোর হয়ে নাটক দেখছেন। স্টেজের উপরে চোখ রেখে সেই মুহূর্তে বুঝি ভাবছিলেন—'আ আমার মতো সুখী আর কেউ আছে কি এখন?' আর ঠিক তখনই, হঠাৎ…

'হঠাৎ' শব্দটা এত একঘেয়ে হয়ে গেছে! কিন্তু কি করবে বলুন, লেখকরা ওটি না ব্যবহার করেও পারে না—আর মানুষের জীবনভোর যখন বিস্ময়-চমকেরও শেষ নেই…!

হঠাৎ,—হঠাৎ তাঁর মুখটা কুঁচকে উঠল, চোখদুটো গোলগোল হয়ে আকাশের দিকে চাইল, নিশ্বাস আটকে রইল, আর অপেরা-গ্লাস থেকে চোখ সরাতেই সিটের উপর ঝুঁকে পড়ল শরীরটা—হ্যাঁচ্চো। অর্থাৎ হাঁচলেন উনি।

অবশ্য হাঁচি জিনিসটায় সবারই অধিকার, যেমন খুশি হাঁচতে পারেন আপনি, যেমন ইচ্ছে। হাঁচেন তো সবাই: চাষা থেকে পুলিস ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর থেকে প্রিভি কাউন্সিলার অবধি। প্রত্যেকে, প্রত্যেকে। কাজেই চারভিয়াকভ লজ্জিত হলেন না, শুধু রুমাল বের করে নাকটা মুছলেন, তারপর শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যা করে থাকেন, অর্থাৎ চারদিকে চেয়ে নিলেন একবার—কারুর কোন অসুবিধে হল কিনা। আর তখনই লজ্জা পেলেন ইভান। কারণ, স্পষ্ট দেখলেন তাঁর ঠিক মুখোমুখি প্রথম

সারিতে বসা বুড়োমত ভদ্রলোক হাতের দস্তানা দিয়ে টাক-মাথার পেছনটা সযত্নে মুছে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে কী জানি বললেন।

চারভিয়াকভ তখন চিনতে পেরেছেন—যোগাযোগ দপ্তরের হোমরা-চোমরা সিভিল জেনারেল ব্রিজালভ।

'কী সব্বনাশ, ভদ্রলোকের ঘাড়ে হেঁচে দিয়েছি!' চারভিয়াকভ ভাবলেন। 'নাই বা হলেন আমার উপরিওলা, তবু কাজটা খারাপ হয়েছে—ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

সামনে ঝুঁকে পড়লেন চারভিয়াকভ, একটু কাশলেন, তারপর সিভিল-জেনারেলের কানের উপর ফিসফিস করে উঠলেন—

'কিছু মনে করবেন না স্যার। দেখতে পাইনি—হঠাৎ হেঁচে দিয়েছি।'

"থাক্ থাক্।"

"না, মাফ করবেন স্যার। আমি ঠিক ওই ভেবে—মানে—হঠাৎ।"

"আঃ থামুন দিকি! শুনতে দিন।"

চারভিয়াকভ আহত হলেন, বোকার মতো হাসলেন একটু, তারপর স্টেজের দিকে মন দেবার চেষ্টা করলেন। নাটকের পাত্রপাত্রীদের লক্ষ্য করতে লাগলেন চারভিয়াকভ কিন্তু নিজেকে আর সবচেয়ে সুখী মনে হচ্ছিল না তখন। বিষাদের ছায়া এসে ওঁকে ঘিরে ধরেছে।

ইণ্টারভ্যালের ঘণ্টা বাজতেই সোজা চলে এলেন ব্রিজালভের কাছে। একটু ইতস্তত করলেন, শেষটায় লজ্জা ভেঙে জড়িয়ে জড়িয়ে শুরু করলেন—

"এই যে স্যার। আপনার উপর তখন হেঁচে দিয়েছিলুম, মাফ করবেন। ঠিক বুঝতে পারিনি—মানে—"

"আঃ আবার শুরু করলেন দেখছি; আমি তো ভুলেই গিছলাম।"—নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে অধৈর্য হয়ে জেনারেল বলে উঠলেন।

চারভিয়াকভ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে জেনারেলকে চেয়ে দেখলেন আর চেয়ে চেয়ে ভাবলেন—"হ্যাঁ! উনি তো বলে দিলেন ভুলেই গেছেন, কই, ওঁর চোখমুখ দেখে তো তা মনে হয় না। বোধহয়, আমার সঙ্গে কথা কইতে চান না। তা না চান, আমার গিয়ে বুঝিয়ে বলা উচিত যে ওকাজটা আমার মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়—হঠাৎ—মানে প্রকৃতির নিয়ম তো—তাই। আর না বললে ভাবতে পারেন আমি বুঝি থুতু ফেলতে গিছলাম ওঁর উপর।

আর যদিই বা এখন না ভেবে থাকেন পরে যে এমনি ভাববেন না তার ঠিক কি ?

বাড়ি ফিরেই চারভিয়াকভ নিজের অভদ্রোচিত আচরণের খবর স্ত্রীর কাছে শুনিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হল স্ত্রী যেন ব্যাপারটা নেহাতই হাল্কা ভাবে নিল। প্রথমটা ও অবশ্য একটু ঘাবড়ে গিছল, কিন্তু পরে যেই শুনল ব্রিজালভ ওদের আফিসের কর্তা নয় তখনই আশ্বস্ত হয়ে গেল।

"তা হোক, আমার মনে হয় তোমার ওঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"—স্ত্রী তবু বলল—'না হলে উনি হয়তো ভাববেন যে তুমি ভদ্রতাই জান না।"

"ঠিক বলেছ। আমি তো মাফ চাইতেই গিছলাম, কিন্তু লোকটা এমনি অদ্ভুত জানো, একটা কথাও বলল না যার অর্থ হয়। তাছাড়া তখন কথা বলার সময় ছিল না।"

পরদিন চারভিয়াকভ চুলটুল ছেঁটে অফিসের ফ্রককোট পরে ব্রিজালভের কাছে তাঁর আচরণের কৈফিয়ত দিতে চললেন। যে ঘরে জেনারেল বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে থাকেন সেখানে অসংখ্য প্রার্থীর ভিড়। জেনারেল এক-একজনের দরখাস্ত নিচ্ছেন, পড়ছেন। কয়েকজনের সঙ্গে কথা কয়ে এবার চোখ তুলে চারভিয়াকভের দিকে চাইলেন।

"এই যে স্যার, গতরাত্রে আর্কিডিয়া থিয়েটারে—মনে আছে আপনার?" —চারভিয়াকভ বলতে থাকেন—"সেই যে হেঁচে দিয়েছিলুম—মানে হাঁচি এসে গিছল—কিছু মনে করেন···"

"চুপ করুন, কী যা-তা বকছেন।" —জেনারেল চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে চেয়ে শুরু করলেন—"হাঁ কী করতে পারি আপনার জন্য বলুন?"

"আমার কথা শুনতেই চান না উনি" —চারভিয়াকভ ভাবলেন, আর ভেবে-ভেবে বিবর্ণ হয়ে গেলেন—"তার মানে উনি রেগে আছেন। না, ওঁকে এমনি রেগে থাকতে দিলে তো চলবে না—সমস্ত আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।···" চারভিয়াকভ ভাবতে থাকেন।

সবশেষ প্রার্থীর দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে জেনারেল যখন নিজের খাস

কামরায় ফিরে যেতে উঠেছেন, চারভিয়াকভ আবার পিছন নিলেন, আর পিছন পিছন বিড়বিড় করে চললেন—

"আমায় ক্ষমা করবেন স্যার, আপনাকে বিরক্ত করছি—কী করব, আমার আন্তরিক অনুশোচনা থেকে এমন করতে সাহস পাচ্ছি···"

জেনারেল ঘাড় ঘুরিয়ে এমন চোখে চাইলেন এবার যেন চীৎকারে ফেটে পড়বেন এক্ষুনি, তারপর হাত নেড়ে সরিয়ে দিলেন ওকে। "কী মশায়, ঠাট্টা পেয়েছেন আমাকে নিয়ে"···বলতে বলতে ওঁর মুখের উপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন জেনারেল।

"ঠাট্টা!" চারভিয়াকভ ভাবলেন "এতে হাসিঠাট্টার কী হল আমি তো দেখছি না। উনি একজন জেনারেল হয়েও এ জিনিসটা বুঝছেন না? বেশ তো, নাই বা বুঝলেন! আমিও ওরকম ভদ্রলোককে ক্ষমা চেয়ে বিরক্ত করতে আসছি না। মরুকগে যাক্। একটা চিঠি লিখে ফেলে দেব—ব্যস্। বলব আর কোনদিন আসছি না আমি।"

বাড়ি যেতে যেতে চারভিয়াকভ ভাবছিলেন ওরকম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠি আর তাঁর লেখা হল না। অনেক করে ভেবে দেখলেন, কিন্তু কথাগুলো যে কি করে সাজাবেন ঠিক করতে পারলেন না। সুতরাং পরের দিন তাঁকে জেনারেলের কাছেই যেতে হল আবার ব্যাপারটা সোজাসুজি মিটিয়ে ফেলতে।

জেনারেল তাঁর দিকে প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে চাওয়া মাত্র শুরু করলেন চারভিয়াকভ—"কাল আপনাকে স্যার বিরক্ত করেছিলাম। আপনি ভাবলেন ঠাট্টা করতে এসেছি—তা নয় স্যার। সেদিন হেঁচে দিয়ে আপনার যা অসুবিধা করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম। আর ঠাট্টার কথা বলছেন,—আমি কি কোনকালে এমন কথা ভাবতেও পারি স্যার? এতখানি ধৃষ্টতা হবে আমার? লোকের সঙ্গে পরিহাস করবার চিন্তা আমাদের মাথায় একবার ঢুকলেই হয়েছে! শ্রদ্ধা, সম্মান বলে কি কিছু থাকবে তখন, না বড়জনদের মর্যাদাটাই থাকবে?···"

"বেরিয়ে যান এখান থেকে"—রাগে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে উঠলেন জেনারেল।

"কী বলছেন স্যার !" ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছেন চারভিয়াকভ। গলার আওয়াজ মিন্‌মিনে।

"বেরিয়ে যান বলছি।" মেঝের উপর সজোরে পা ঠুকে জেনারেল আরেকবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

চারভিয়াকভের মনে হল কে যেন ওঁর শরীরের মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঘা মেরেছে। তাঁর কানে আর কিছু যাচ্ছিল না, চোখে দেখছিলেন না কিছুই। কোনমতে পেছন হেঁটে দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন তারপর টলতে টলতে চললেন রাস্তা দিয়ে। যন্ত্রের মতো গিয়ে ঘরে ঢুকলেন চারভিয়াকভ। তারপর সেই অবস্থায় সেই অফিসের সাজে ফ্রককোট পরেই গিয়ে শুয়ে পড়লেন সোফার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটুকু বেরিয়ে গেল।

অনুবাদ : **সত্যগোপাল ভট্টাচার্য**

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত

(পূর্বানুবৃত্তি)

রণজিৎ গুহ

ফিলিপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারার উৎসমূল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ফ্রান্সের প্রাক্-বিপ্লবী যুগের দার্শনিক আলোড়ন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। শুধু ফ্রান্সিসই নন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরেকজন মুখ্য প্রবক্তা বিহারের টমাস্ ল'ও পরবর্তী কালে ঠিক একই ভাবাদর্শে দীক্ষা নিয়েছিলেন [টমাস্ ল প্রণীত "লেটার্স টু দি বোর্ড" (১৭৮৯) ও "রিসোর্সেজ্ ইন্ বেঙ্গল" (১৭৯২) দ্রষ্টব্য]। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, আঠারো শতকের শেষে ভারতে ইংরাজ-শাসনের যুগসন্ধিতে ফ্রান্সের বুর্জোয়া ভাববিপ্লব এদেশে কোম্পানির শ্রেষ্ঠ কর্মচারীদের অনেককেই ও তাঁদের মাধ্যমে সমগ্র ব্রিটিশ শাসননীতিকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল তার তাৎপর্য আজও যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। কারণ হয়তো এই যে, ব্রিটিশ ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা আজও ওদেশের শিল্পবিপ্লব ও অবাধবাণিজ্যস্বার্থের সঙ্গে এদেশের ভূমিব্যবস্থার বিবর্তনের ঐতিহাসিক যোগসূত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেননি।

প্রাকৃতধনবাদের মূল্যায়ন তত্ত্ব ও তার অসঙ্গতি

ফ্রান্সিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তাত্ত্বিক বনিয়াদ ছিল ফিজিওক্র্যাটদের প্রাকৃতধনবাদ। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্‌কালীন দার্শনিক সংক্রান্তির মধ্যে এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়, এবং আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের শুরু এখান থেকেই। মার্ক্স বলেছেন, শ্রম-প্রক্রিয়ার কালে মূলধন যে বাস্তব উপাদানসমূহ অবলম্বন করে থাকে এবং বিকিরণের সময়ে মূলধন যে নানা রূপ ধারণ করে, এই উভয়েরই বিশ্লেষণ করার কৃতিত্ব প্রাকৃতধনবাদীদের পাওনা : উভয়তই

আডাম স্মিথ তাঁদের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। বাড়তি-মূল্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে তাঁরাই প্রথম বিকিরণের ক্ষেত্র অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং এই প্রচেষ্টার ফলেই পরের যুগে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছিল। তাই, মার্ক্সের মতে, "বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে মূলধনের বিশ্লেষণ প্রধানত প্রাকৃতধনবাদীদেরই কীর্তি। এই অবদানের জন্যই তাঁরা আধুনিক অর্থনীতিবিদ্যার জনক।"[১]

এই তত্ত্ব অনুযায়ী জমি অর্থাৎ প্রকৃতিই হচ্ছে সম্পদের আকর। শ্রম-শক্তির মূল্য ও সেই শ্রমশক্তি খাটিয়ে যে নতুন মূল্য জন্মায়, এই দুইয়ের বিয়োগফলটুকু শিল্পের চেয়ে কৃষিতেই সবচেয়ে সহজ ও প্রকট হয়ে দেখা দেয়; তাই কৃষিজ উৎপাদনের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই প্রাকৃতধনবাদীরা তাঁদের মূল্যায়ন তত্ত্ব নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বলেন, ক্ষেতমজুর তার জীবিকার জন্য মজুরি হিসাবে যেটুকু পায় (strict necessaire), শ্রমের দ্বারা সে তার চেয়ে কিছু বেশি উৎপাদন করে; এই উদ্বৃত্তটুকুই (produit net) হচ্ছে বাড়তি-মূল্য যা জমির মালিক খাজনা হিসাবে আত্মসাৎ করে। এক কথায়, এই হল প্রাকৃতধনবাদী মূল্যায়ন-নীতির সারমর্ম।

এই থিওরির মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য-দোষ আছে নিশ্চয়ই। যেমন, একদিকে নির্ভুলভাবেই বলা হয়েছে যে পরশ্রম ফলভোগেই বাড়তি-মূল্যের উৎপত্তি ঘটে; কিন্তু এই বিশ্লেষণ থেকেই আবার মনে হয় যেন বাড়তি-মূল্য "প্রকৃতির প্রসাদ" মাত্র; ফলে, শ্রমের সামাজিক রূপটি সঠিক ফুটে ওঠে না। দ্বিতীয়ত, জমির খাজনাকে যেভাবে মজুরির অতিরিক্ত নিছক বাড়তি-মূল্য হিসাবে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে সামন্তবাদী ধারণার নামগন্ধও নাই; তবু, এই বক্তব্য থেকেই বোধ হয় যে খাজনার সৃষ্টি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে নয়। তৃতীয়ত, জমির মালিকের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তার থেকে জমিদারকেই খাঁটি পুঁজিপতি অর্থাৎ বাড়তি-মূল্যের ভোক্তা বলে মনে হতে পারে। মোট কথা, প্রাকৃতধনবাদী তত্ত্বে সামান্তবাদের জমিদার-প্রজা সম্পর্কের 'ফর্মের' মধ্যে পুঁজিবাদের মালিক-শ্রমিক 'কন্টেন্ট' আরোপিত

॥ পারিভাষিক ॥ Physiocrat—প্রাকৃতধনবাদী। Labour Process—শ্রম প্রক্রিয়া। Circulation—বিকিরণ। Value—মূল্য। Surplus Value বাড়তি মূল্য।

হয়েছে। দুটি পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক আদর্শের মিশ্রণের ফলে এই তত্ত্বের মধ্যে যে অপরিচ্ছন্নতা দেখা যায়, মার্ক্স তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন:

"এই ভাবেই পুনর্বার সামন্তবাদের অবতারণা করে তাকে বুর্জোয়া উৎপাদনের ছদ্মরূপে ব্যাখ্যা করা হয়; কৃষিকে তাই মনে হয় যেন উৎপাদনের সেই শাখা যাতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন—অর্থাৎ বাড়তি-মূল্যের উৎপাদন—নিরঙ্কুশভাবেই ঘটে। এমনি করে সামন্তবাদ যেমন বুর্জোয়া বনে যায়, বুর্জোয়া সমাজকেও তেমনি পরানো হয় সামন্তবাদের ঢং।"[২]

যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে প্রাকৃতধনবাদের উদ্ভব হয়েছিল, এই অসঙ্গতি তারই লক্ষণ। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুর পুরানো সমাজকে দীর্ণ করে বেরিয়ে আসতে আসতেও সামন্তবাদের খোলসটা তখনও পুরোপুরি ছাড়াতে পারেনি। একটি পুরাতন ব্যবস্থার অন্তিম দশায় আরেকটি নতুন সমাজের অর্থনৈতিক আদর্শের জন্মের অস্বচ্ছ উষায় তত্ত্বের জগতেও যে অবাস্তব কুহকের সৃষ্টি হয়, প্রাকৃতধনবাদের স্ববিরোধিতা তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই দ্বিধা মূলত সমকালীন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য; কারণ, সামন্তসমাজ থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের শক্তি তার আত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট রূপটি তখনও আয়ত্ত করতে পারেনি, ফলে সামন্তসমাজকেই সে শুধু আরও বুর্জোয়া ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।[৩]

এই অসঙ্গতি সত্ত্বেও প্রাকৃতধনবাদীরা বুর্জোয়া অর্থনীতির অগ্রদূত, কারণ "জমির স্বত্বাধিকার থেকে শ্রমের বিচ্ছেদই ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত'—এই সত্যটি তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাই স্বভাবতই ফরাসী বিপ্লবের পূর্বাহ্নে তাঁরা এন্সাইক্লোপিডিস্টদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলেন, এবং বিপ্লবী ফরাসী সরকারের অর্থনৈতিক পলিসি তুর্গো ও কেজ্‌নের মতামতের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল।

আঠারো শতকের বিপ্লবী বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছেই যে ফ্রান্সিস রাজনৈতিক দীক্ষা নিয়েছিলেন সে-কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাও ঐ একই আদর্শের ছাঁচে গড়া। তাই দেখা যায় যে তাঁর চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের সামগ্রিক পরিকল্পনা, অর্থাৎ বাঙলার কৃষিব্যবস্থা এবং তার আনুষঙ্গিক অর্থনীতি ও শাসননীতি সম্পর্কে ফ্রান্সিসের প্রস্তাবগুলির সঙ্গে প্রাকৃতধনবাদী তত্ত্বের একান্ত মিল আছে। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এই পরিকল্পনাটিকে পাঁচ ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে: ১। জমির মালিকানা, ২। জমিদারের ভূমিকা, ৩। রায়তের অধিকার, ৪। রাজস্ব ও ব্যবসায়-বাণিজ্য, ও ৫। সাম্রাজ্যরূপ।

১। জমির মালিকানা

প্রাকৃতধনবাদীদের মতে জমিই হচ্ছে সম্পদের উৎস এবং জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাই কৃষিজ উৎপাদনের প্রধান শর্ত। জনৈক বিশেষজ্ঞের ভাষায়: "ব্যক্তিস্বত্ব, বিশেষ করে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা—এই হল তাঁদের (প্রাকৃতধনবাদীদের) সমাজদর্শনের মৌলিক অবদান, তাঁদের অর্থনৈতিক আদর্শও এই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।"[৪]

ফ্রান্সিসও জমিতে ব্যক্তিস্বত্বের প্রতিষ্ঠাকেই তাঁর সমগ্র কৃষিসংস্কারের মূল বনিয়াদ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেই বলতেন যে অন্যান্য প্রসঙ্গে তাঁর সমস্ত বক্তব্যই এই মূলসূত্রটির যুক্তিসঙ্গত পরিণতি মাত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দলিলটি রচনা করার বছরখানেক আগেই লর্ড নর্থের কাছে এক চিঠিতে তিনি জমিদারদের 'স্বাভাবিক অধিকারের' কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৫] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে এই স্বাভাবিক অধিকারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে সেই অভিযোগ দিয়েই তাঁর ২২শে জানুয়ারি ১৭৭৬ তারিখের বিখ্যাত বিবৃতিটির মুখবন্ধ করা হয়েছে:

> 'আমার মনে হয় যে কোম্পানি আগে থেকেই একটি ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন যে দেশের শাসনকর্তৃত্ব যার হাতে সে-ই জমির মালিক; অতএব রাজ্যশাসন করতে গিয়ে গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে চান না, কারণ তাঁরা মনে করেন ভূস্বামী হিসাবে উৎপাদনের সবটাই তাঁদের পাওনা।'

জমিতে ব্যক্তিস্বত্বের অধিকার লঙ্ঘনই যে কোম্পানি শাসনের আদিম পাপ, এই কথার পুনরুক্তি তাঁর চিঠিপত্র, প্রচার-পুস্তিকা ও বহু সরকারী রচনায় পাওয়া যায়।

তিনটি বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিস্বত্বের স্বপক্ষে ফ্রান্সিসের যুক্তিগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। প্রথমত, ফরাসী বুর্জোয়া মনীষীদের নিকট এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের ঋণ তিনি সরাসরি স্বীকার করতেন। লর্ড নর্থের কাছে এক চিঠিতে (১৭ই সেপ্‌টেম্বর ১৭৭৭) তিনি মঁতাস্ক্যুর 'এস্‌প্রি দ্‌ লোআ' থেকে একটি সূত্র নিজের সমর্থনে উদ্ধৃত করেন। সূত্রটি এই: 'রাজা যেখানে নিজেকেই সমস্ত জমির মালিক ও প্রজাবর্গের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন, সেই গভর্নমেণ্টকেই স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে অত্যাচারী বলে অভিহিত করা যায়। এরই ফলে কৃষিকার্যে অবহেলা ঘটে; তার উপর আবার রাজা নিজেই যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে শিল্পেরও সর্বাঙ্গীণ ক্ষতি হয়।' বাঙলাদেশে কোম্পানির ভূস্বামিত্বের দাবি এবং শাসন ও ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁদের দ্বৈত ভূমিকা—দুই পাখিই এক ঢিলে মারার জন্য মঁতাস্ক্যুর কথা ফ্রান্সিস খুব নিপুণভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, মঁতাস্ক্যু ও সেই যুগের আরও অনেক বুর্জোয়া চিন্তানায়কের মতোই ফ্রান্সিস পুরানো ইতিহাসের নজির টেনে নিজের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। অনেক দেশেই সমাজসংস্কারকেরা তাঁদের নতুন ও বৈপ্লবিক প্রস্তাবকে সনাতন ঐতিহ্যের সাজ পরিয়ে পেশ করেছেন, ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। ফ্রান্সিসও বারবার বলেছেন যে তিনি শুধু পুরানো মোগল ব্যবস্থাকেই পুনঃপ্রবর্তন করার প্রস্তাব করছেন, তার বেশি কিছু নয়। ফলে অবশ্য মোগল আমলের শাসনপ্রথা ও রাজস্বনীতি সম্পর্কে ইতিহাসের একটা ব্যাখ্যা তাঁকে দিতে হয়েছিল। কয়েকটি চিঠিতে এবং বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল পরিকল্পনাটির পরিশিষ্টে তিনি এই প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মতে এমন কোনও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নেই যে মোগলরা বাঙলাদেশে এসে এখানকার জমিদারদের উৎখাত করেছিল। জমির স্বত্ব পুরানো মালিকদেরই হাতে থাকে, এবং মোগল বিজেতারা যে তাদের ভূসম্পত্তি হরণ করে নিজেদের অনুচরবর্গের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল এমন কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি বলেন জায়গীর বা ওয়াকৃফ দেওয়া হত ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ জমির স্বত্ব হস্তান্তর করা নয়: কারণ, 'জমি তখনও জমিদারেরই সম্পত্তি থাকে, রাজা কেবল

তার রাজস্বটা আরেক পাত্রে দান করেন।' [২২শে জানুয়ারি ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি—পরিশিষ্ট] এর পরেও অবশ্য প্রশ্ন থাকে যে উল্লিখিত বক্তব্য যদি ঠিকই হয় তাহলে নবাবী আমলের রাজকীয় সনদগুলির তাৎপর্য কি? কেননা, ঐ সব সনদেই লেখা আছে যে মোগল বাদশা বা নবাবেরা জমিদারদের ভূস্বামিত্বে প্রতিষ্ঠা করছেন। এই তথ্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসের থিওরি মেলে না, তাই তিনি এই তথ্যটাকেই এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আমার মতে ওটা শুধু সামন্তবাদের সাজানো কথা (feudal fiction)।'

তৃতীয়ত, একথা তিনি বেশ জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে সামন্তবাদের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবের কোনও মিল নাই; এবং যেহেতু তাঁর মতে এই প্রস্তাব মোগল যুগের আদর্শে গড়া, তাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মোগল আমলের ভূমিব্যবস্থাও সামন্তবাদ থেকে পৃথক। ২২শে জুন ১৭৭৬ তারিখে তিনি মিঃ রউসের কাছে এক চিঠিতে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[৬] সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এই যে, সামন্ত-ব্যবস্থায় বিজেতা শাসক-শক্তি বিজিত দেশের জমি অনুচরদের মধ্যে বণ্টন করে তার বিনিময়ে সামরিক "সার্ভিস" আদায় করে; কিন্তু মুসলমান বিজেতারা কোন রকম সামরিক "সার্ভিসের" বিনিময়ে অনুচরদের মধ্যে কিংবা এদেশেরই পুরানো ভূস্বামীদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করার চেষ্টা করেনি। সরকারকে একটা নির্দিষ্ট ও নিয়মিত পরিমাণ রাজস্ব সরবরাহ করার শর্তে পুরানো মালিকেরাই নিজস্বত্বে বহাল ছিল, এবং রাজস্বের আয় থেকে একটা স্থায়ী ভাড়াটে ফৌজ নিয়োগ করে এদেশের শাসনকার্য চালানো হত।

ফিলিপ ফ্রান্সিস সামন্তবাদের যে সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা এখানে নির্দেশ করেছেন তার সঙ্গে অবশ্যই একমত হওয়া যায় না; এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে মোগল যুগের সামন্তব্যবস্থার আঙ্গিকে যে তফাত ছিল সেই প্রসঙ্গে জোর দিতে গিয়ে তিনি যেভাবে এদেশে সামন্তবাদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন, তার ঐতিহাসিক যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নিশ্চয়ই আছে। তবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত মোগলব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব যে মোটেই সামন্তবাদকে জীইয়ে তোলা নয়, এ-কথা বলতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের ভুল করলেও সেই সঙ্গে তাঁর সামন্তবাদ-বিরোধী বুর্জোয়া ঝোঁকেরও নির্ভুল পরিচয় রেখে গেছেন।

আসলে বুর্জোয়া আদর্শনিষ্ঠা ও প্রাকৃতধনবাদী তত্ত্বে গভীর প্রত্যয়ের বশেই ফিলিপ ফ্রান্সিস ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচারে ভুল করেছিলেন। ঐ যুগের ফরাসী দার্শনিকদের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজ দেশকাল-নিরপেক্ষ কতকগুলি শাশ্বত ও অমোঘ নিয়মে বাঁধা। সুতরাং ইউরোপীয় সমাজে যে নিয়ম হিতকর বলে প্রমাণিত হয়েছে, বাঙলাদেশেও তা প্রযোজ্য নয় কেন? তিনি বলতেন: "অন্যান্য দেশে যেসব নীতিকে নিঃসংশয়ে প্রয়োগ করা চলে, বাঙলাদেশে তা চলবে না, এমন কথা মেনে নেবার পক্ষে কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না।"

নির্গুণ সত্যে বিশ্বাস ও সাধারণ ধারণা থেকে বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি, ফ্রান্সিসের যুক্তিবিন্যাসের এই অবরোহী পদ্ধতি স্বভাবতই আঠারো শতকের ফরাসী দার্শনিকদের তর্কনীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। লর্ড নর্থকে লেখা এক চিঠিতে (২২শে জানুয়ারি ১৭৭৬) তাঁর যুক্তিপ্রকরণের একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়:

> "এ দেশের শোচনীয় অবস্থা দেখেই প্রথমে যেসব সাধারণ নীতির কথা আমার মনে হয়েছিল, এবং সত্য ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই ইউরোপীয় সমাজনীতি থেকে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও যা সর্বকালে ও সর্ব দেশেই প্রযোজ্য—সেইসব সাধারণ প্রস্তাবের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনও কারণ আমি দেখি না।"

সুতরাং ইউরোপীয় সমাজের এই সাধারণ সত্যকে বাঙলাদেশের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার তাগিদেই ফ্রান্সিস এদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসকে একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। ফলে, ফ্রান্সিসের ইতিহাসবোধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যাই হোক না কেন, তাঁর সমাজবোধের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না।

২। জমিদারের ভূমিকা

প্রাকৃতধনবাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল বনিয়াদ জমিতে ব্যক্তি-সত্ত্বের অধিকার। অতএব, এই ব্যক্তিসত্ত্ব ভোগ করে জমিতে যথেষ্ট টাকা খাটাতে পারে এমন একটি শ্রেণীর অস্তিত্বও তাঁদের মতে কৃষিজ উৎপাদনের প্রধান শর্ত।[৭] অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য অর্থ-

নীতিতে একটি ধনিক-চাষী শ্রেণীর আবির্ভাব হতেই হবে, এই ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা প্রাকৃতধনবাদীদের ছিল। বলা বাহুল্য, অনেক অসঙ্গতি ছিল বলেই তাঁদের তত্ত্বে জমির মালিককে চট করে বুর্জোয়া বলে চেনা যায় না বরং সামন্তবাদের যে সাজটা তার গায়ে পরানো থাকে তাতে তার স্বরূপ নির্ণয়ে ভুলও হতে পারে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে জমিদারই স্বাধীন কৃষিজীবী মজুরের শ্রমশক্তিকে পণ্যের মতো ক্রয় করছে, তখন আর সন্দেহ থাকে না যে সেই হচ্ছে বাড়তি-মূল্যের ভোক্তা প্রকৃত পুঁজিপতি : সামন্ত-জমিদার নয়, কৃষিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল সংগঠক—ধনিক-চাষী। মার্ক্সের ভাষায় —"এই জমিদারটি আসলে ধনিক।"[৮]

উত্তরকালে ফ্রান্সিসের মন্ত্রশিষ্য টমাস্ ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারকে সরাসরি ধনিক-চাষীর রূপেই চিত্রিত করে বলেছিলেন যে তার কর্তব্য পুঁজি খাটিয়ে কৃষিজ উৎপাদনকে বৃহৎভাবে সংগঠিত করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে মূলধন নিয়োগের সম্ভাবনা যে অনেক বেড়ে যাবে, কর্নওয়ালিস সেকথা ভেবেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের নিজের রচনায় জমিদারের ধনিক-রূপ তেমন সবিশেষ বর্ণনা করা হয়নি। জমিদারকে ব্যক্তিস্বত্বে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ; উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে তিনি শুধু প্রকারান্তরে মতামত দিয়ে গেছেন।

মধ্যম শ্রেণীর গুরুত্ব

কিন্তু প্রখর সমাজবোধ ছিল বলেই ফ্রান্সিস তাঁর আদর্শ সমাজের কাঠামোর মধ্যে জমিদারদের স্থান নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই সামাজিক 'মডেলটির' সঙ্গে তৎকালীন ফরাসীদেশের সমাজ-বিন্যাসের ছকের মোটামুটি মিল আছে। প্রথমত, এই আদর্শ সমাজ মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত : একদিকে সামাজিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী মুখ্য ভাগ, কিন্তু সংখ্যায় তারা অল্প ; অপরদিকে ক্ষমতাবিহীন সংখ্যাবহুল অংশ যাদের কর্তব্য মুষ্টিমেয় অগ্রণী ভাগের সেবা করা। "জনতার অধিকাংশকেই পরিশ্রম করতে হবে এবং বহুর শ্রমফল সংখ্যাল্পকে পোষণ করবে—এই হচ্ছে প্রত্যেকটি সুনিয়ন্ত্রিত গভর্নমেণ্টের নিয়ম" (৫ই নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি)। বলা বাহুল্য, বহুর সেবায় মুষ্টিমেয়ের সমাজকৌলীন্য বজায় রাখার এই পরিকল্পনা "আঁসিয়ে

রেজিমের” কথাই মনে আনে। দ্বিতীয়ত, এই সমাজ-বিন্যাসে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকার অনুযায়ী উপরতলা থেকে নিচের তলা পর্যন্ত ক্রমিক স্তর-পরম্পরায় প্রত্যেকটি শ্রেণীর স্থান সুনির্দিষ্ট থাকে (২২শে জানুয়ারি ও ৫ই নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি)। ফ্রান্সিসের মতে এই কাঠামোয় জমিদারেরা গভর্নমেণ্ট ও রায়তের মাঝামাঝি একটা মধ্যম স্থানের অধিকারী। তাদেরই মারফত সমাজের উপরিতলের কর্তৃত্ব অধস্তল পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়। এই মধ্যম শ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ডবিশেষ এবং তা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সমগ্রভাবে সমাজেরই বিনাশ ঘটতে পারে (বিবৃতি—২২শে জানুয়ারি ১৭৭৬)।

বহুর সেবায় মুষ্টিমেয়ের সমাজকৌলীন্য বজায় রাখার এই পরিকল্পনা স্বভাবতই “আঁসিয়ে রেজিমের” কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় আভিজাত্যের অনুকূল এই শ্রেণীবিন্যাস মেনে নিয়েও আঠারো শতকের বুর্জোয়া লেখকেরা যেমন এই কাঠামোর মধ্যেই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ তৃতীয় বা মধ্যম শ্রেণীকে (“তিয়েজের্তা”) সনাতন সমাজের পতন ও নতুন সমাজ বিবর্তনের অক্ষবৎ ধারণা করেছিলেন, জমিদাররূপী মধ্যম শ্রেণীর গুরুত্ব বর্ণনায় ফিলিপ ফ্রান্সিসও যেন বাঙলার সমাজবিকাশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তারই তুলনা খুঁজেছেন।

বৃহৎ জমিদারির বিরুদ্ধে

সামন্তশক্তিকে দুর্বল করার জন্য জমিদারির আয়তন ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে ফ্রান্সিস যে প্রস্তাব করেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, “বৃহৎ জমিদারিগুলি ভাগ করে দিয়ে ছোট জমিদারিগুলির আয়তন অক্ষুণ্ণ রাখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনিও হেস্টিংস ও বারওয়েলের সঙ্গে একমত ছিলেন। কিন্তু হেস্টিংসরা এই প্রস্তাব করেছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক ও শাসনগত সুবিধার কথা ভেবে ; অর্থাৎ তাঁরা ভেবেছিলেন যে বৃহৎ ভূসম্পত্তিকে খণ্ডখণ্ড করে ফেলতে পারলে প্রাচীন জমিদারবংশগুলিকে সহজেই কোম্পানির বশে আনা যাবে এবং রাজস্ব আদায় ইত্যাদিরও অনেক সুবিধা হবে। ফ্রান্সিস কিন্তু সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মৌলিক ও সামগ্রিক আপত্তি থেকেই এই প্রস্তাব সমর্থন করেন : শাসনকার্যের সাময়িক সুবিধার কথা তাঁর কাছে

গৌণ বিষয়। তাই ছোট জমিদারির আয়তন বজায় রাখার চেয়েও বৃহত্তর জমিদারিগুলিকে খর্ব করাই তিনি বেশি জরুরী বলে মনে করতেন;[১০] কারণ বৃহৎ জমিদারগোষ্ঠীরাই তখনও বাঙলাদেশে সামন্তব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ।

দ্বিতীয়ত, হেষ্টিংসের মতো তিনিও বলেন যে উত্তরাধিকারে অগ্রজস্বত্বের নিয়ম বৃহৎ জমিদারিগুলির বেলায় অবৈধ বলে ঘোষণা করা উচিত। তাছাড়া উত্তরাধিকারের সূত্র অটুট রাখার জন্য সন্তানাভাবে পোষ্যপুত্র গ্রহণের সুযোগ থেকে বৃহৎ জমিদারবংশগুলিকে বঞ্চিত করার প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন।

তৃতীয়ত, তাঁর মত ছিল এই ছিল যে "ভূসম্পত্তিকে আরও অনেক মালিকের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া" উচিত। হিউমের একটি উদ্ধৃতি তুলে তিনি বলেন যে সম্পত্তি আয়তনে ছোট হলেই টেঁকে বেশি (২২শে জানুয়ারি ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি)।

এক কথায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সামন্তশক্তির হাতে সম্পত্তি-সঞ্চয় রোধ করা। তাছাড়া, বৃহৎ জমিদারির আয়তন হ্রাস করে জমির মালিকানা একটি সংখ্যা-বহুল মধ্যম শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করার এই নীতি যে কার্যত গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে পরম সহায়ক তাও লক্ষ্য করার বিষয়।

ইজারাদারি বনাম জমিদারি বন্দোবস্ত

জমিতে ব্যক্তিস্বত্বের অধিকার ও স্বত্বভোগী জমিদারশ্রেণীর অস্তিত্ব—এই দুটি প্রত্যয়েরই যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানাকে আইন বেঁধে পাকাপাকি করার অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব।

১৭৭৬ সালের ২২শে জানুয়ারি ফিলিপ ফ্রান্সিস বাঙলার লাটপরিষদে এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন। জমির স্বত্ব ও রাজস্বনীতির প্রতিটি বিষয়ে এই পরিকল্পনা হেস্টিংসের ইজারাদারি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইজারাদারি ব্যবস্থায় জমিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি ও জমিদারকে রাষ্ট্রের কর্মচারী বলে গণ্য করা হয়; ফ্রান্সিসের পরিকল্পনায় জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং জমিদার উত্তরাধিকারসূত্রে এই সম্পত্তির মালিক। দ্বিতীয়ত, নীলাম ডেকে সর্বোচ্চ খরিদ্দারের কাছে অল্প ও অনিশ্চিত মেয়াদে ইজারা দেবার যে-রীতি তাতে চুক্তির কথাটাই বড়ো, মালিকানার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর;

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাবটির মূলেই আছে মালিকানার শাশ্বত অধিকারের স্বীকৃতি। তৃতীয়ত, হেস্টিংসের বিধানে রাজস্বের দাবি অত্যন্ত উঁচু হারে বাঁধা এবং পরিবর্তনীয়; ফ্রান্সিসের পরিকল্পনায় আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ শাসনকার্যের প্রয়োজনের চেয়ে এক পয়সা বেশি নয়, এবং জমাবন্দীর হার একেবারেই অপরিবর্তনীয়।

এই দুটি ব্যবস্থা এতই পরস্পরবিরোধী যে একটির প্রতিবাদেই আরেকটির প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ইজারাদারিকে খণ্ডন করার জন্য ফ্রান্সিস যে-যুক্তিগুলি ব্যবহার করেছেন তাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য সঠিক বিবৃত হয়েছে।

ফ্রান্সিস বলেছেন যে ইজারাদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কোম্পানি "মালিকের কাজ" করেছে, কারণ রাজশক্তিই জমির মালিক এই ভুল ধারণা থেকেই উক্ত ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে।[১১] এই নীতি অনুসারে "উত্তরাধিকারসূত্রে যারা সম্পত্তির আইনসঙ্গত মালিক তাদের অধিকার হরণ করে সব ক্ষেত্রেই বিদেশীদের কাছে জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে"; বিদেশী বলতে তিনি কলকাতার বেনেদের নাম করেছেন, কারণ তারা গ্রামবাঙলার লোক নয়, অথচ স্বনামে বা শ্বেতাঙ্গদের হয়ে বেনামীতে তারাই জমি বেশি ইজারা নিত।[১২]

এইভাবে, ইজারাদারি ব্যবস্থা "ব্যক্তিস্বত্বের ধারণাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে," এবং সম্পত্তির অনিশ্চয়তা কৃষিকার্যে বিঘ্ন ঘটায়। লর্ড নর্থের কাছে তিনি তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন (১৭ই সেপটেম্বর ১৭৭৭):

> "এমত অবস্থায় কৃষির উন্নতি আশা করা চলে না; কারণ জমি যখন নিজের নয়, তখন তার উপর টাকা বা গতর খাটাতে যাবে কে? তাছাড়া, বাড়তি ফসল পয়দা হলে তার সবটাই যে নতুন বন্দোবস্ত করে কেড়ে নেওয়া হবে না তাই বা কে বলতে পারে?"

তাঁর অভিযোগ এই যে, হেস্টিংসের রাজস্বনীতির সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর বিবেকহীন লোক দেশের সব জমিজমা হাত করে নিয়েছে; জমি বা কৃষির প্রতি তাদের কোনও মমতা নাই। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজারার সংক্ষিপ্ত মেয়াদটুকুর মধ্যেই যথাসম্ভব লভ্য তুলে নেওয়া। তাছাড়া, জমির উৎপাদন বাড়লেই কোম্পানির খাজনার খাই

বাড়ে, এই জন্যেই জমিদারেরাও কৃষির উন্নতি করতে চায় না; বরং ফসল কম হলে খাজনার হারও কমবে বলে জমির উৎপাদিকা শক্তিকে হ্রাস করাই তাদের স্বার্থে। মোট কথা, ইজারাদার বা জমিদার যারই হাতে জমি থাকুক, এই ব্যবস্থায় কৃষির ক্ষতি হবেই। কৃষির ক্ষতিতে রায়তের সর্বনাশ: খাজনার ভয়ে রায়ত পালায়; গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। অন্যদিকে, কোম্পানির শাসনব্যবস্থার জটিলতাও বাড়ে। বারবার জমির বন্দোবস্ত করতে হয় বলে ব্যয়ভার ও কাজের চাপ দুই-ই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, এবং রাজস্ব আদায়ের কাজও কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, জমিদার ইজারাদার দর-ইজারাদার কটকিনাদার জামিনদার ইত্যাদি নানা লোকের নানান্ রকম দাবিদাওয়া এই ব্যবস্থার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে আছে যে মামলা-মোকদ্দমার চাপে দেওয়ানি আদালতের আর নিঃশ্বাস ফেলার উপায় থাকে না; ফলে "জনসাধারণ বিচারলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।"

ফ্রান্সিসের মতে, প্রথম পাঁচসালা বন্দোবস্তের ব্যর্থতাই ইজারাদারি ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করে। রাজস্বের ঘাটতি এই ব্যর্থতার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য। ঘাটতির কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কৃষি ও কৃষকের দুর্দশার কথা বিবেচনা না করে কোম্পানির লাভের অঙ্কটাকেই ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাবার তাগিদে বন্দোবস্তের সময় আদায়ী রাজস্বের পরিমাণকে একটা অবাস্তব হিসাবের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়, তার ফলে স্বভাবতই আদায়ে অনেক বাকি পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত লোকসানের ঝুঁকি নিয়েও সরকারকে অনেকটা খাজনা মকুব করতে হয়। "সাদা সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে খাজনার আত্যন্তিক হার ও অনাদায়ী খাজনা মকুব করার প্রয়োজনীয়তা হাতে হাত মিলিয়ে চলে" (লর্ড নর্থের নিকট পত্র, ১৭ই সেপটেম্বর ১৭৭৭)। অর্থাৎ মাত্রাহীন জমা, প্রচুর বাকি ও বেপরোয়া মকুবের এই পাপচক্র জমিতে ব্যক্তিস্বত্ব অস্বীকারের ধ্রুব পরিণাম। সুতরাং জমিদারের হাতে মালিকানা তুলে দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন না করলে সমূহ সর্বনাশ হবে। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অচিরাৎ যদি ব্যক্তিস্বত্বকে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে কায়েম করা না হয় তাহলে এদেশের কৃষি ও তৎসহ সরকারী রাজস্বেরও চূড়ান্ত ক্ষতি হবে।"(ঐ)

৩। রায়তের অধিকার

জমিতে ব্যক্তিস্বত্বের অধিকার থাকা উচিত এই বিশ্বাস নিয়েই ফিলিপ ফ্রান্সিস এদেশে এসেছিলেন। কিন্তু এই অধিকার কার প্রাপ্য—জমিদারের না রায়তের, না উভয়েরই—সে বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে তাঁর খানিকটা সময় লেগেছিল। লাট কাউন্সিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনাটি পেশ করার মাত্র এগারো মাস আগে তিনি লর্ড নর্থকে লিখেছিলেন (২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৭৭৫): "জমিদার, তালুকদার, এমনকি রায়তের ও সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করা উচিত।"[১৩] ইজারাদারি ব্যবস্থার ফলে বিত্তহীন প্রতিপত্তিহীন পুরাতন জমিদারশ্রেণীকে আইনের জোরে মালিকানায় প্রতিষ্ঠা করা হলেও তারা সেই অধিকার ব্যবহার করে কৃষির পুনঃসংস্কার করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে ফ্রান্সিসের সন্দেহ ছিল। জমিদারি স্বত্বের স্বপক্ষে চূড়ান্ত মত প্রকাশ করার দুমাস আগেও তিনি একটি চিঠিতে লেখেন (২১শে নভেম্বর ১৭৭৫):

> "যখন থেকে জমিদারদের পেন্সনজীবী সম্প্রদায়ে পরিণত করা হয়েছে, তখন থেকেই তারা অকর্মণ্যতা, মূর্খতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও ঘৃণ্যতায় ডুবে আছে। প্রায় সর্বত্রই তারা দেনার দায়ে বাঁধা, এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তাদের কারোই কোন বিষয়বুদ্ধি নাই; ফলে সাধারণ লোকের চোখে তাদের প্রাক্তন গৌরব ও মর্যাদার আর কিছু অবশিষ্ট নাই। আমি শুনেছি এবং বিশ্বাসও করি যে তরুণ জমিদারসন্তানদের অধিকাংশই জড়বুদ্ধি মূর্খ।......এই হচ্ছে জমিদারি বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো আপত্তি। কিন্তু উপায় কি, জমিদারি বা ইজারাদারি একটা বেছে নিতেই হবে।"[১৪]

দুদিন পরে স্ট্র্যাচির কাছে তিনি প্রায় ঐ একই কথা আবার লেখেন (২৩শে নভেম্বর ১৭৭৫): "আমার নীতিগত ও ব্যক্তিগত ঝোঁক হচ্ছে জমিদারদের হাতে মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এতদিনে ঋণের দায়ে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে নিয়েছে। ...ভোজ হয়ে যাবার পর আমরা পৌঁছেছি, তাই এখন উচ্ছিষ্ট দিয়ে ফলার করা ছাড়া গতি নাই।"[১৫]

শেষ পর্যন্ত তাঁর মূল প্রস্তাবে এই "নীতিগত ও ব্যক্তিগত ঝোঁকেরই"

জয় হল। জমিদারি স্বত্বকে স্বীকার করার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হিসাবে রায়তী স্বত্বকে অস্বীকার করতেই হল।

রায়তের স্বত্ব অগ্রাহ্য

রায়তের স্বত্ব অগ্রাহ্য করেছেন বলেই যে ফিলিপ ফ্রান্সিস রায়তের ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, এরকম মনে করা অবশ্য ভুল হবে। লাঙল যার, কৃষির উন্নতি যে তার উপরই নির্ভর করে, প্রাকৃতধনবাদের শিষ্য হিসাবে তিনি একথা ঠিকই বুঝতেন। নিজেই বলেছেন: "রায়তের সাহায্য না পেলে জমিদারের জমির কোন মূল্য থাকে না" (৫ই নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি)। রায়তের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা, ইজারাদারি অত্যাচারে রায়তের পলায়ন ও তার ফলে কৃষির সর্বনাশের বর্ণনা তাঁর বহু রচনায় পাওয়া যায়। ২২শে জানুয়ারি ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে রায়ত শুধু দুবেলা পেট চালানোর তাগিদে নেহাত অভ্যাসবশে কৃষিকাজ করে যাচ্ছে, আশা বা উদ্যম কোনটাই তার নেই।

কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কি? হেস্টিংস ও বারোয়েল বলেছিলেন যে সমাধানের উপায় হচ্ছে এমন ব্যবস্থা করা যে "রায়ত যেন চিরদিনের মতো নির্ঝঞ্ঝাটে জমির অধিকার ভোগ করতে পারে"—অর্থাৎ, রায়তের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ফ্রান্সিস স্বভাবতই সেকথায় কান দিতে নারাজ, কারণ ততদিনে তিনি স্থির করে ফেলেছেন যে জমিদারই জমির প্রকৃত মালিক, রায়ত নয়। তাঁর ৫ই নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতিতে কোনরকম দ্বিধা-সংশয় না রেখে স্পষ্টই বলা হয়েছে:

> "একথা আদৌ সত্য নয় যে রায়তই জমির স্বত্বাধিকারী। এমনকি সেরকম হবারও কোনও প্রয়োজন নাই, না রায়তের নিজস্বার্থে না সরকারের স্বার্থে।"

এই সাংঘাতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য ফ্রান্সিসকে কোনও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্য নিতে হয়নি। জমিদারই জমির মালিক এবং যেহেতু একই সঙ্গে জমিদার ও রায়তের দ্বৈতস্বত্ব থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং রায়তের মালিকানার দাবি অগ্রাহ্য:—এই অতিসরল যুক্তির বাহনে তিনি বাঙলাদেশের সনাতন ভূমিব্যবস্থার জটিলতা একলাফেই ডিঙিয়ে গেছেন।

মালিকানার বদলে "স্বেচ্ছাচুক্তি"

স্বত্বসমস্যার এই সমাধানের পরেই জমিদার-রায়ত সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে। সেখানে তাঁর মূল যুক্তির জের টেনেই ফ্রান্সিস বলেছেন ঃ

> "জমি জমিদারেরই উত্তরাধিকারগত সম্পত্তি। দেশের সংবিধান অনুযায়ী গভর্নমেণ্টকে একটা রাজস্বভাগ দিয়ে জমিদার এই সম্পত্তি ভোগ করে। যতদিন সে এই শর্ত মেনে চলবে, ততদিন মালিকানা তারই এবং যাকে ইচ্ছা সে জমি ভাড়া দিতে পারে।" (২২শে জানুয়ারি ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি)

যাকে ইচ্ছা শুধু নয়, যেমন ইচ্ছা। কারণ, রায়তের সঙ্গে কিভাবে কি শর্তে জমির বন্দোবস্ত হবে, তা স্থির করার দায়িত্ব জমিদারের—গভর্নমেণ্টের নয়। "প্রজার সঙ্গে জমিদারের চুক্তির উপর কোনরকম বিধিনিষেধ আরোপ করা" সরকারের পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না।[১৬] করতে গেলেই তার অর্থ হবে "সম্পত্তির অধিকারের উপর আক্রমণ" (৫ই নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি)। ব্যক্তিগত পবিত্র ভূমিস্বত্বের অধিকার একেবারেই অলঙ্ঘনীয়; তার চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করার এক্তেয়ার কারও নাই, সরকারেরও নয়; জমিদার-রায়ত সম্পর্ক ঐ অধিকারের অন্তর্গত; অতএব গভর্নমেণ্টের সেখানে কিছু করার নাই। রায়তের স্বার্থ বলি দিয়ে ব্যক্তিস্বত্বের এই জয়জয়কার ফ্রান্সিসের শ্রেণীচেতনার মাহাত্ম্যই প্রমাণ করে।

ফ্রান্সিস মনে করতেন যে সরকারী হস্তক্ষেপ না ঘটলে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্পর্ক একটা স্বেচ্ছাচুক্তির আকার ধারণ করবে। "দুপক্ষকেই যদি এভাবে নিজেদের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা সহজেই এমন একটা চুক্তিতে আসবে যাতে উভয়েরই সুবিধা" (বিবৃতি, ঐ)। আর, যেহেতু তখনও বাঙলাদেশে কৃষকের তুলনায় কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক বেশি, তাই তাঁর মতে চুক্তির শর্ত রায়তেরই অনুকূল হবার সম্ভাবনা। "এদেশের বর্তমান অবস্থায় জমিদারের চেয়ে রায়তেরই সুবিধা হবে বেশি। এতখানি জমি যেখানে পতিত পড়ে আছে এবং আবাদ করার লোক যখন এত কম, তখন চাষীকে সাধাসাধি করতে হবে।"(ঐ) বলা বাহুল্য, অদূর ভবিষ্যতে জমির উপর কৃষিজীবী লোকসংখ্যার চাপে সুবিধা-অসুবিধার এই হিসাব যে

একেবারেই উল্টে গিয়ে জমিদারের পক্ষে ও চাষীর বিপক্ষে দাঁড়াবে, সেকথা অনুমান্ করার মতো দূরদৃষ্টি ফ্রান্সিসের ছিল না।

রায়তের ভাগ্য জমিদারের হাতে সঁপে দেবার এই প্রস্তাবকে ফার্মিংগার "লেসে-ফেয়ার" নীতি বলেছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে এই নীতিও আসলে প্রাক্তধনবাদী আদর্শে গড়া। ধনিক-চাষী যেমন ক্ষেত-মজুরের শ্রমশক্তিকে পণ্য হিসাবে খরিদ করে, স্বত্বাধিকারী জমিদারকেও তেমনি স্বত্বহীন রায়তের শ্রমশক্তি ক্রয় করতে হয়, কিন্তু আবাদযোগ্য জমির তুলনায় যেহেতু আবাদ করার লোক কম অর্থাৎ শ্রমশক্তির জোগানের চেয়ে তার চাহিদা বেশি, তাই আপাতত ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতারই সুবিধা। এক কথায়, জমিদার-রায়তের তথাকথিত স্বেচ্ছাচুক্তিটি আসলে ধনতান্ত্রিক লেবার-মার্কেটের চাহিদা-জোগানের অমোঘ নিয়মে বাঁধা।

দুপক্ষের মধ্যে এভাবে যখন একটা "স্বাধীন চুক্তি" হয়ে গেল, তারপরই আসে সরকারী হস্তক্ষেপের কথা। ফ্রান্সিস বলেছেন, "জমিতে রায়তের কোন সরাসরি চিরস্থায়ী স্বত্ব নেই বলেই একথা ভাবা উচিত নয় যে তার কোনরকম অধিকারই থাকবে না বা তার স্বার্থরক্ষার কোন চেষ্টা করার আর দরকার নাই" (বিবৃতি, ঐ)। অতএব, গোরু মেরে জুতো দান: রায়তের মালিকানার অধিকার কেড়ে নিয়ে ফ্রান্সিস প্রজাস্বার্থের অধিকার দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, রায়তের সঙ্গে একবার বন্দোবস্ত করে ফেলার পর জমিদারকে সেই বন্দোবস্তের শর্ত মেনে চলতেই হবে, এবং শর্তসম্বলিত পাট্টাকে আইনসঙ্গত চুক্তিপত্র বলে গণ্য করা হবে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গেই লক্ষ্য করা উচিত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বিবৃতিটিতে (২২শে জানুয়ারী ১৭৭৬) ফ্রান্সিস পাট্টার কথা যেভাবে উত্থাপন করেছিলেন. তাতে মনে হয় যেন আসলে তিনি রায়তের রক্ষাকবচ হিসাবে পাট্টার গুরুত্ব সম্যক স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন তিনি বলেছিলেন যে পুরানো আমলে এদেশে রায়তের পাট্টার ঐ "লোক-দেখানো চুক্তির" (ফর্ম্যাল এন্‌গেজমেণ্ট) উপর আদৌ নির্ভর করতো না, কারণ সেকালে "জমিদারের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক স্বার্থ ও সম্পর্কের যে পারস্পরিক বন্ধন ছিল" তারই জোরে রায়তের স্বার্থ সংরক্ষিত হতো। ফ্রান্সিসের

পরিপাটি যুক্তিবিন্যাসের মধ্যে রায়ত সম্পর্কে তাঁর এই অতি দুর্বল বক্তব্যটি যে এক প্রকাণ্ড ছিদ্রবিশেষ, হেস্টিংস ও বারোয়েল তা সহজেই ধরে ফেলেছিলেন, এবং এই কথা নিয়ে অনেক খোঁচাখুঁচি করার পরেই তবে শেষ পর্যন্ত ৫ই নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতিতে ফ্রান্সিস স্পষ্ট করে বললেন যে, পাট্টাই হচ্ছে জমিদারের সঙ্গে রায়তের "স্বেচ্ছাচুক্তির সাক্ষ্য ও গ্যারান্টি" এবং গভর্নমেণ্টের উচিত "তাদের এই পারস্পরিক চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা।"

১৭৯৩ সালের আইনে যে রায়তের অধিকার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ কর্নওয়ালিসী বন্দোবস্তের এই দুর্বলতা আসলে ১৭৭৬ সালের মূল পরিকল্পনাটির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার মাত্র।

[ক্রমশ

(১) মার্ক্স: থিওরিজ্ অব্ সারপ্লাস্ ভ্যালু," ৪৫ ॥ (২) ঐ, ৫০ ॥ (৩) ঐ ৫৩॥ (৪) ভ্যুলেসে: "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্ সোশ্যাল সায়েন্স্" গ্রন্থের "দি ফিজিওক্র্যাট্‌স" শীর্ষক প্রবন্ধ ॥ (৫) ফ্রা-পা, ৩৬ নং (এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফ্রান্সিস-পাণ্ডুলিপিমালার উদ্ধৃতিগুলি সোফিয়া ওয়াইট্‌জম্যানের গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে সঙ্কলিত হয়েছে) ॥ (৬) ফ্রা-পা, ৪৯ নং ॥ (৭) ওয়াইট্‌জম্যান: ২৬৭ ॥ (৮) ভ্যুলেস: ঐ ॥ (৯) মার্ক্স: ঐ, ৫২ ॥ (১০) ফ্রা-পা ৪৯ নং ॥ (১১) লর্ড নর্থের নিকট পত্র (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৭৭) ॥ (১২) ফ্রা-পা, ৩৬নং ॥ (১৩) ঐ ॥ (১৪) ঐ (১৫) ॥ ফ্রা-পা, ৪৯ নং ॥ (১৬) ঐ ॥

ছোটো-বড়ো

প্রদ্যোৎ গুহ

ঠিক ফরশা নয়, কিন্তু কালোও নয় তাই বলে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বললেও বরং কমই বলা হয়। আঁটো-সাটো শরীর। ঠিক সুন্দরী না বলা যাক, এমন একটা আলগা শ্রী আছে যে না তাকিয়ে পারা যায় না মেয়েটার দিকে।

সারাদিন হরিপদর দোকানটিতে বসে থাকে আর হাসে। আর হাসলে গালে চমৎকার টোল পড়ে মেয়েটার। ওরই জন্য এত বিক্রি হরিপদর দোকানে, হরিপদ ক্ষ্যান্ত দুজনে দিলে ভেজেও চাহিদা মেটাতে পারে না খদ্দেরের—নইলে বৃন্দাবন কি হরিপদর চেয়ে খারাপ ফুলুরি ভাজে নাকি!

রাগে গা জ্বালা করে বৃন্দাবনের। কেউ যেন ভুলেও দেখতে পায় না তার দোকান। বাপ হয়ে মেয়ের রূপ দেখিয়ে খদ্দের পাকড়ায়! আরে ছোঃ! হরিপদটা কি মানুষ!

প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো খাস ভদ্রপাড়ার মধ্যেই এদের বস্তিটা। ভদ্রলোকের ছেলেরা পর্যন্ত ভিড় জমায় হরিপদর দোকানে। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে বৃন্দাবনের। অথচ থাকতে হয় ওকে হরিপদর পাশের ঘরটাতেই।

আবার দেমাক! বামুনের ছেলে! লোকের কাছে বড়াই করা হয়: সবই কপালের লেখা বাবু! নইলে কত বড়ো বংশের ছেলে আমি—এখানে এই ছোটোলোকদের মধ্যে পড়ে থাকতে হয়!

কপাল! কপাল তো পরের ইস্তিরির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়েছিলি কেন? ফষ্টিনষ্টি করার সময় মনে থাকে না, তারপর ফ্যাসাদ বাধলে বুঝি কপালের দোষ! ওসব ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই—বিন্দাবনের বাবু সাফ্-সাফ কথা!

কবে এখান থেকে চলে যেত বৃন্দাবন, যায়নি শুধু ঐ মেয়েটার টানে। কেমন জানি একটা নেশা ধরে গেছে বৃন্দাবনের। মেয়েটাকে দুবেলা দেখতে না পেলে মনটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। কাজেকর্মে মন লাগে না।

মাঝে মাঝে পাউডারটা আলতাটা কিনে দেয় বৃন্দাবন। পদ্মকে কিছু দিয়েই যেন আনন্দ পাওয়া যায়। সেই পাউডার মেখে আলতা পরে যখন ঘুরে বেড়ায় মেয়েটা তখন শিরায় শিরায় যেন মাতন লাগে বৃন্দাবনের। একদিন হাত চেপে ধরেছিল পদ্মর। তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে আনাড়ির মতো খাদে-নামানো আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল—পদ্ম! হাত ছাড়িয়ে নেয়নি পদ্ম। বরং ওর মুখে ফুটে উঠেছিল কেমন একটু প্রশ্রয়ের বিহ্বল হাসি। সে হাসির জন্যে সাম্রাজ্য বিকিয়ে দেওয়া যায়।

হরিপদর ওপর তাই রাগ পুষে রাখতে পারে না বৃন্দাবন।

তবু একদিন ঝগড়া হয়ে গেল হরিপদর সঙ্গে। আর ঝগড়াটা হল নেত্যকে নিয়েই।

নেত্যকে এ বস্তিতে নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবনই। বামুনের ছেলে নেত্য। লেখাপড়াও শিখেছে একটু-আধটু। এখন হারিয়ে-তারিয়ে কাশ্যপ গোত্র হয়ে মুরগীহাটার পাইকারদের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ফিরি করে বেড়ায়।

মুরগীহাটায় জিনিস কিনতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল নেত্যর সঙ্গে। আহা, বাউনের ছেলে অবস্থার ফেরে পড়ে ফিরি করে খায়!—এক দেখে কেমন যেন মায়া ধরে গিয়েছিল বৃন্দাবনের মনে। তাই কথায় কথায় ও যখন একদিন থাকবার জায়গার অভাবের কথা বলেছিল—তখন বৃন্দাবন এক কথায় ওকে নিয়ে এসেছিল এই বস্তিতে। কিন্তু এ কিরকম ব্যাভার নেত্যর। যখন তখন খুনসুটি করবে পদ্মর সঙ্গে।

'ভদ্রলোকের জাতটাই অমনি।

পদ্মটাও যেন আজকাল দেখেও দেখতে পায় না বৃন্দাবনকে। কিন্তু তবু কিছু বলেনি বৃন্দাবন। দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

নেত্যও যেন আজকাল এড়িয়ে চলে বৃন্দাবনকে। গতমাসে পদ্মকে শাড়ি কিনে দিয়েছে নেত্য। দিক না। ক্ষ্যান্ত রেঁধে খাওয়াচ্ছে, তার জন্য খুশি

হয়ে নেত্য যদি পদ্মকে একটা শাড়ি কিনেই দেয়.—তাতে দোষ কি ! কিন্তু সেকথাটা বৃন্দাবনকে জানালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত, না কি বারণ করতে যেত বৃন্দাবন। মনে যদি পাপ না থাকবে তবে এত ঢাকঢাক-গুড়-গুড় কিসের ?

পদ্মটাও তেমনি। দেমাকে যেন পা পড়ে না আজকাল।

সেদিন একগ্লাস জল চেয়েছিল। বলে, গড়িয়ে খাও না ! হাতখানা তো খসে পড়েনি ! জল না দিবি তো না দিবি। মরে গিয়ে মাছরাঙা হবি। অত কথা কিসের।

কিন্তু তবু পদ্মর ওপর রাগ করে থাকতে পারেনি বৃন্দাবন। ওইটুকুন তো মেয়ে। পৃথিবীর ও কি দেখেছে। কিই বা জানে। ওর কথায় দোষ ধরলে চলে।

এমনকি সেদিন যখন একলা পেয়ে পদ্মর হাত চেপে ধরেছিল বৃন্দাবন আর ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছোটোলোক বলে গালি দিয়েছিল পদ্ম—তখনও দাঁতে ঠোঁট চেপে সে অপমান নীরবে সহ্য করেছে বৃন্দাবন।

হুঁ ছোটোলোক ! দেখা যাবে ভদ্দরলোকের নেশা কতদিন থাকে। কারুর অত দেমাকের মাথা তামুক খায় না বৃন্দাবন। টাকা ফেললে যেন মেয়ে-মানুষের অভাব। সদিটা তো ঠ্যাঙ বাড়িয়েই আছে। তু করে ডাক দিলেই চলে আসে। রঙটা একটু কালো। তা রঙ ধুয়ে কি জল খাবে ! গতরে মাংস থাকলেই হল।

বৃন্দাবন যদি ওদের ব্যাপারে আর কোনো কথা বলে তো, লোকে যেন কুকুর পোষে ওর নামে।

তবু বৃন্দাবন কথা না বলে থাকতে পারল কই ! কিন্তু কি এমন বলেছে যে হরিপদ অমন চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একশা করল !

নিজের চোখে দেখেছে—তাই না বলা। আর সে তো ওদের ভালোর জন্যেই। নইলে ও-তো দিব্যিই করেছিল- ওদের ব্যাপারে আর কথাটি বলবে না।

আর এমন কিছু তক্কে তক্কেও থাকেনি বৃন্দাবন। পদ্মর হাসির শব্দ শুনেই এসেছিল। আর এসে দেখে, নেত্যর সাপটে-ধরা দুহাতের মধ্যে আটকে পড়ে হাসছে পদ্ম। আঃ ছাড়ো···ছাড়ো। কেউ এসে পড়বে।

ইস্, ছাড়ব বই কি!

নেত্য একটা দৈত্য যেন।

নেত্যর ঠোঁট এসে লাগল পদ্মর মুখে। পদ্মর এলো খোঁপাটি ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সারা পিঠে।

আর দাঁড়ায় নি বৃন্দাবন। পা দুটো ওর থরথর করে কাঁপছিল। ধড়াস ধড়াস করে শব্দ হচ্ছিল বুকের মধ্যে। নিজের ঘরে এসে বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল অনেকক্ষণ।

কিন্তু এত সব কথা কি হরিপদকে বলতে গেছে বৃন্দাবন। ও শুধু বলেছিল :

দেখ হরিপদদা, মেয়েটাকে একটু সাবধানে রেখ। জানা নেই, শোনা নেই, নেত্যর সঙ্গে অত মেশামেশি কি ভালো?

তার উত্তরে হরিপদ কিনা বললে :

আমার মেয়ে যা খুশি করবে, তাতে তোর বাবার কি! ফের যদি আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসিস, জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব, পাজী কোথাকার।

ক্ষ্যান্ত আবার ফোড়ন কাটে :

ছোটোলোকের আস্পদ্দা! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো মরাখেগো মিন্‌ষের।

হুঁ ছোটোলোক! জুতো মারলেই হল! ক জোড়া জুতো পরে হরিপদ, জানা আছে! জুতো মারবে! বৃন্দাবন যেন হাত দুখানা জগন্নাথকে দিয়ে এসেছে।

ওদের ভালোর জন্যই বলেছিল—নইলে ভারী বয়ে গেছে বৃন্দাবনের।

সেই থেকে ওদের সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে বৃন্দাবন। নেত্য অবশ্য দু-একবার ভাব জমাতে এসেছে। কিন্তু তাকে আমল দেয়নি বৃন্দাবন। যথেষ্ট হয়েছে! ভদ্দরলোকের ছেলের ছোটোলোকের সঙ্গে মেশামেশি করতে আসা কি সাজে! বাউনের ছেলে বাউনের সঙ্গেই মিশুক গে। আমে-দুধে মিশে যায় আঁটি যায় আস্তাকুড়ে—এই তো দুনিয়ার নিয়ম!

পদ্ম যতদিন আছে ফুলুরির দোকানে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। ফুলুরির দোকান তুলে দিয়ে বৃন্দাবন তাই পানবিড়ির দোকান দিয়েছে

আজকাল। বৃন্দাবনের পান না খেলে পাড়ার গিন্নীদের ভাত হজম হয় না। বৃন্দাবনের লাল সুতোর বিড়ির মতো মিঠে বিড়ি এ তল্লাটে পাওয়া যায় না কোথাও। আটটা দিনের মধ্যেই জমে উঠেছে দোকান। পয়সাকড়ি আসছে বেশ।

আর্ট সিল্কের একটা জামা কিনেছে বৃন্দাবন, আর একটা গন্ধ তেল। পদ্ম যখন ঘরে থাকে তখন ঘটা করে তেল মাখে সে। গন্ধটা নিশ্চয়ই নাকে যায় পদ্মর। সময় অসময়ে সিগারেট ধরিয়ে বাড়ি ঢোকে সে। থাক না দেখি, কটা সিগারেট খাবে নেত্য। একদিন যেন ধারে কিনতে যায় দেবে দুকথা শুনিয়ে।

সদিকে নিয়ে দুদিন সিনেমা দেখে এসেছে বৃন্দাবন। পদ্মকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে :

তোকে নিয়েই ঘর বাঁধব রে সদি। ভগমানের ইচ্ছেয়, এখন পয়সা-কড়ি তো দুটো পাচ্ছি। কিন্তু একটা মেয়েমানুষ ঘরে না থাকলে—ঘর শালা যেন শ্মশান মনে হয়।

সদি অবশ্য সে কথায় কান দেয় নি। বলেছে :

ও-সব কথা আমাকে বলতে এসো নি গো। তোমাদের পুরুষ জাতকে আমার বিলকুল চেনা আছে। যেখানে লাথি-ঝাঁটা সেখানে নাক-ঘষতে যাওয়া তোমাদের স্বভাব। ও যদ্দিন পদ্ম ঠাকুরনের মন না উঠছে তদ্দিনই সদির আদর—সে আমার ঢের জানা আছে। সে জন্যি আমার আক্ষেপ নেই। যার যেমন কপাল···

নারে সত্যি বলছি! তোকে নিয়েই ঘর বাঁধব। ওরা ভদ্দরলোক, ওদের দিকে দৃষ্টি করা কি আমাদের সাজে! পদ্মর দরকার নেই, আমার সদিই ভালো

বোলো নি, বোলো নি—ঠাকরুন শুনতে পেলে আর এ জন্মে ওদিকে পা বাড়াতে হবে নি। আমার কি, আমি নষ্ট মেয়েমানুষ—যতদিন রাখবে ততদিন থাকব। না রাখবে চলে যাব। গতরে যতদিন মাংস আছে ততদিন ভাতকাপড়ের তো অভাব হবে নি।

কোন শালা আবার ওদিকে পা বাড়ায়। তুই দেখিস, সামনের মাসেই তোকে ঘরে নে আসব। এ কথার যদি খেলাপ হয়, আমার নামে কুকুর পুষিস···

সদি তবু হালকা করে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা।

অত কুকুর কোথায়? কথার খেলাপ কি তোমার একবার হয়েছে গো!

ঠাট্টা নয়। দেখিস এবার।

সত্যি, মনস্থির করে ফেলেছে বৃন্দাবন। পদ্মর জন্যে কি সে সন্ন্যেসী হবে না কি!

সদি আজকাল হামেশাই বৃন্দাবনের ঘরে আসে। সদি ফর্দ করে দেয়, বৃন্দাবন জিনিস কিনে আনে। তারপর দুজনে মিলে ঘর সাজায় মনের মতো করে। সদিকে একজোড়া শাড়ি, পাউডার, গন্ধতেল, তরল আলতা—টুকিটাকি আরো অনেক জিনিস কিনে এনে দিয়েছে বৃন্দাবন। সদি বলে:

আর মাসপয়লা অব্দি অপেক্ষা করে থাকা কেন—আজই চলে আসি—কি বল?

বৃন্দাবন বলে: না। এসব কাজে তাড়াহুড়ো করতে নেই। একটা ভালো দিন দেখে—তারপর।

দিন দিয়ে কি হবে গো? সাতপাক ঘোরাবে নাকি?

সাতপাক না ঘুরলেই বুঝি পাজি-পুঁথি মিথ্যে হয়ে যায়? শুভকাজ দিনক্ষণ দেখে করাই ভালো।

ঠোঁট উলটে সদি বলে:

যেমন তোমার ইচ্ছে—

একদিন সকাল বেলা সবে ঘুম থেকে উঠে আয়েস করে একটা বিড়ি ধরিয়েছে বৃন্দাবন—সদি হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

সদির তো কপাল পুড়ল!

কেন কি হয়েছে?

যা হবার তাই। পাখি উড়েছে।

কি যে হেঁয়ালি করিস। পষ্ট করে বল না বাপু।

তোমার নেত্যবাবু কেটে পড়েছেন।

কেটে পড়েছে?

হ্যাঁ গো। এবার যাও পদ্ম ঠাকরুনের কাছে।

বৃন্দাবনের বুকটা ধ্বক করে ওঠে। কিন্তু তবু মন শক্ত করে সে বলে:

দায়ে পড়েছে আমার ভদ্দরলোকের এঁটো কুড়োতে!

ওঃ এঁটো! বলি, সদিই বা কোন সতী ঠাকরুন এলেন।

সে আমি বুঝব—তোর ভাবনা করতে হবে না।

দেখব গো, দেখব—পাত চাটতে যাও কি না দেখব। একদিনে আর মরে যাচ্ছি না।

দেখিস্।

যে থুথু ফেলে দিয়েছে তা আর কখনও চাটবে না বৃন্দাবন। কখনও না। আসে যেন বৃন্দাবনের কাছে। দেবে দুকথা শুনিয়ে। খুব তো ভদ্দরলোকের সঙ্গে পীরিত করেছিলে—কি হল এখন! আবার ছোটো লোকের কাছে গা ঘষতে আসা কেন।

যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে চা-টা খেয়ে দোকানে গিয়ে বসে বৃন্দাবন।

কিন্তু যতই ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুক, কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরতেই থাকে। কিন্তু তবু ভাঙে না বৃন্দাবন। হরিপদ দোকানের সামনে দিয়ে দু-একবার যাওয়া-আসা করলেও—বৃন্দাবন তাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নি। যে থুথু ফেলে দিয়েছে—তা আর কখনও চাটতে যাবে না বৃন্দাবন। কখনও না।

যে খবর জানবার জন্য মন তার উতলা হয়েছিল, তা সে দুপুর বেলা সদির কাছ থেকেই পেল। নেত্য একমাসের ভাড়া বাকি ফেলে রাতারাতি উধাও হয়েছে এবং পদ্ম অন্তঃসত্ত্বা।

বাউনের অপকর্মটি তবে এই কারণেই সটকেছেন। আর এই জন্যেই কদিন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছিল পদ্মকে। পড়ে মরুক গে যাক্। ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না বৃন্দাবন। ছোটোলোক! কেমন এখন ছোটোলোকের কথাই ফলল তো। তখন পই-পই করে বলেছিল বৃন্দাবন—হরিপদদা, মেয়েটাকে একটু সামলে সুমলে রেখ। চেনা নেই জানা নেই—পরপুরুষের সঙ্গে অত মেশা-মেশি কি ভালো? বড় তেতো লেগেছিল তখন কথাগুলো। যাও এখন বেজন্মা নাতির অন্নপ্রাশনের জোগাড় করগে যাও! বৃন্দাবন আর ও-পথ মাড়াচ্ছে না।

একদিন গেল। দুদিন গেল। শেষে সদি নিজে থেকেই বললে:

ধন্যি লোক তুমি বটে। একবার তো হরিপদ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা

করতেও পারতে কি ঘটেছে। বেচারা এই হুদিনে কতবার তোমার ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল—তবু মুখ ফিরিয়ে থাকলে গা।

বৃন্দাবন গম্ভীরভাবে বললে: যে থুতু ফেলে দিয়েছি তা তার চাটতে যাবো না কখনও। পাঁজি দেখে এসেছি—আগামী মাসের পাঁচ তারিখ ভালো দিন আছে। পাঁচ তারিখ থেকে তুই আমার ঘরে আসবি।

হয়েছে গো, হয়েছে—আর গোঁ ধরে থাকতে হবে নি। আমি একটা নষ্ট মেয়েমানুষ, আমার জন্যে তোমার ভাবনা করতে হবে নি। গতরে যতদিন মাংস আছে—আমার ভাত-কাপড়ের অভাব হবে নি। পদ্ম ঠাকরুনের শুকনো মুখ যে আর দেখা যায় না।

আমি তার কি করব? ভদ্দরলোকের এঁটো আমি কিছুতেই কুড়োতে যাব না—এ তুই দেখে নিস সদি।

আর এই কথাটা দেখিয়ে দেবার জন্যেই যেন দ্বিগুণ উৎসাহে ঘর সাজাতে লেগে যায় বৃন্দাবন। সদিকে নিয়ে সিনেমায় যেতে আরম্ভ করে ঘনঘন। ঘর বাঁধার আনন্দে যেন সর্বদা বিভোর হয়ে থাকে বৃন্দাবন। সারাদিন গুনগুন করে সিনেমার গানের সুর ভাঁজে। আর সদি কিছু বললেই বলে: ভদ্দরলোকের এঁটো আমি কিছুতেই কুড়োতে যাব না। এ তুই দেখে নিস।

লোকটার রকম-সকম দেখে কেমন ভয় করে সদির। কিন্তু জোর করে কিছু বলতে সাহস পায় না। ক্ষীণ কণ্ঠে দু-একবার শুধু বলে—আমি একটা শুধু নষ্ট মেয়েমানুষ। আমার আবার ভাবনা কি। ঠাকরুনের শুকনো মুখ যে আর দেখতে পারি-নে।

কিন্তু বৃন্দাবন সেই যে গোঁ ধরে বসে আছে—তার থেকে এতটুকুও টলে না। যে থুতু ফেলে দিয়েছি তা আর কক্ষনো চাটতে যাব না। কক্ষনো না।

০

সন্ধ্যে থেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছিল। ঘুমটা বেশ জাঁকিয়েই এসেছিল বৃন্দাবনের। শেষরাতের দিকে দরজা ধাকানোর শব্দে ঘুম ভাঙতে তাই বেশ একটু বিরক্তই হয় সে। শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করে,

কে?

আমি সদি। দরজা খোল।

এত রাত্তিরে আবার কি? উঠে দরজা খুলতে খুলতেই বলে বৃন্দাবন। দুটো দিনও কি আর তর সইছে না তোর?

সদিও প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,

আচ্ছা, ঘুম বটে গা তোমার! আধঘণ্টা ধরে ধাক্কিয়ে দরজা ভেঙে ফেলছি তবু যদি বাবুর ঘুম ভাঙে।

তা মাঝরাতে তোরই বা এত পীরিত জাগল কেন?

তা বটে, পীরিতই বটে। হরিপদ ঠাকুর আর ক্ষ্যান্তদির যে ওলাওঠা হয়েছে গো।

ওলাওঠা?

আর কিছু বলতে হয় না বৃন্দাবনকে।

একাই একশ হয়ে শুশ্রূষায় লেগে যায় সে। বিপদ-আপদের সময় কি আর রাগ পুষে রাখলে চলে।

পদ্মকে এক রকম রোগীর ঘর থেকে খেদিয়ে দিল সদি। ছোঁয়াচে রোগ, বলা তো যায় না কিছু, কার থেকে কি হয়।

সকালবেলা হৈ-চৈ পড়ে গেল বস্তিতে। ছোঁয়াচে ব্যায়রাম। সবাই মিলে ফোন করে দিলে অ্যামবুলান্সে।

কিন্তু অ্যামবুলান্স এসে পৌঁছবার আগেই চোখ বুজল হরিপদ-ক্ষ্যান্ত। পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল পদ্ম। কাঁদল না একটুও।

ওর রকম-সকম দেখে ভয়ই পেয়ে গেল বৃন্দাবন। তার মুখেও কথা যোগাল না—মামুলী সান্ত্বনার কথাও না।

কিন্তু মরা আগলে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। উঠে লোকজন ডেকে আনে বৃন্দাবন। শত হলেও বামুনের মরা, যে-সে তো ছুঁতে পারবে না।

নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করেই সব ব্যবস্থা করতে হয় বৃন্দাবনকে। কিন্তু নিজে সে দূরে দূরেই থাকে।

তবু কিছু বলে না পদ্ম। একবার উঠে গিয়ে খানিকটা সিঁদুর মাখিয়ে দেয় ক্ষ্যান্তর কপালে। তারপর আবার কাঁচের চোখের মতো অন্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কেমন অস্বস্তি লাগে বৃন্দাবনের। গলার কাছে কিসের একটা পিণ্ড উঠে আসতে চায়। ঢোঁক গিলে সেটা নাবিয়ে দিতে চেষ্টা করে বৃন্দাবন।

শ্মশান থেকে গঙ্গা স্নান করে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। বস্তির উঠোনে তখন ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকার এসে জমতে শুরু করছে।

পদ্মকে তখনও তেমনি বসে থাকতে দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে যায় বৃন্দাবন। ওর দৃষ্টি এড়িয়ে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে চলে যায় সে। এক রকম পালিয়েই আসে। কোন রকম শব্দ না করে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলে। তারপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে ভূতের মতো। বাতি জ্বালে না। একটা বিড়ি ধরাতে গিয়েও কি মনে করে রেখে দেয়।

সদিটা থাকলেও হত। তকে উঠিয়ে চান-টান করিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সদি গেছে মনিববাড়ি। বাসন কটা মেজে দিয়েই চলে আসবে।

এখন কি করবে বৃন্দাবন!

সময়ের কাঁটাটা যেন ভারি হয়ে ঝুলতে থাকে। নড়ে না। সামনের দোতলা বাড়িটা থেকে সা-রে-গা-মা আওয়াজ আসে। হর্ণ বাজিয়ে হুস্ করে চলে যায় একটা মোটরগাড়ি। চোখের কোণটা জ্বালা করতে থাকে বৃন্দাবনের। একপা-দুপা করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। গুটি গুটি এসে দাঁড়ায় পদ্মর পেছনে। তারপর আস্তে আস্তে পদ্মর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে বৃন্দাবন। কিন্তু তবু মুখ তুলে তাকায় না পদ্ম। টেরই পায় নি যেন। যেন পাথর হয়ে গেছে সে।

আলতো ভাবে পদ্মর পিঠে একটা হাত রাখে বৃন্দাবন। আর হঠাৎ যেন পাথরের নিদ্রা ভেঙে জেগে ওঠে অহল্যা। ফুঁপিয়ে ওঠে সে। তারপর বৃন্দাবনের কোলে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে পদ্ম। কি করবে বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে বৃন্দাবন।

মনিববাড়ি থেকে ফিরে পদ্মর খোঁজ নিতে আসছিল সদি। দৃশ্যটা দেখে এক লহমা থমকে দাঁড়ায় সে। ফিরে যাবে কি না বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই থাকে। বিড়বিড় করে আপন মনে বলে,

আমি একটা নষ্ট মেয়েমানুষ, আমার আবার ভাবনা…

কিন্তু তবু চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে আসে।

বৃন্দাবন তখন ভাবছে, পান-বিড়ি আর ফুলুরির দোকান এক করে দিলে কেমন হয়? পদ্মকে যা মানায় ফুলুরির দোকানে!

অঙ্গ-বঙ্গ প্রদেশ ও বঙ্গ সংস্কৃতি

শিব দত্ত

সম্প্রতি বঙ্গভূমিতে যে মার্জার প্রবেশ করেছে সেটির অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত করবার জন্য একদল সাহিত্যিক উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন এবং সরবে সোৎসাহে তার জন্য কলম থেকে কালি ছিটোতে শুরু করেছেন, তা সে কালি খাতার পাতাতেই পড়ুক অথবা অভাগা বঙ্গ-সরস্বতীর মুখেই পড়ুক। উৎসাহের চোটে বেসামাল হয়ে তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের পাগল আখ্যা দিতে শুরু করেছেন, বলেছেন তাঁদের উক্তি পাগলের উক্তি! সম্প্রতি একটি "সাহিত্যিক" কাগজ আরও বলেছেন, যাঁরা এই মার্জারটির অবাধ বিচরণে বাধা দিতে চেষ্টা করছেন তাঁরা 'শকুনি, মড়িপোড়া এবং অগ্রদানী।" এই সব কথার সাহিত্যিক বিচার হয় না, চেষ্টা করেও লাভ নেই। বস্তুত একদল সাহিত্যিক সরস্বতীর উপাসনা ছেড়ে হঠাৎ মার্জারকেই উপাস্য দেবতা হিসেবে পুজো করতে উঠেপড়ে লাগেন কেন একথায় অনেকেই বিস্ময় বোধ করছেন। কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কেন না, প্রবাদবাক্যে আছে শিকে ছিঁড়লে মার্জারের ভাগ্যেই ছেঁড়ে, মানুষের ভাগ্যে নয়।

কিন্তু এসব কথা ছেড়ে দিয়েও এই প্রসঙ্গে বিচার করা যেতে পারে বাঙলার সংস্কৃতির কি বিপদের সম্ভাবনা এই মার্জারের দেখা দিয়েছে। তর্কের নিয়ম হল, প্রথমে পুর্বপক্ষ, তৎপরে উত্তরপক্ষ। সুতরাং পুর্বপক্ষটা ঐ উপরি-উল্লিখিত সাহিত্যিক কাগজটি হতেই তুলে দিচ্ছি :

"বাংলার সংস্কৃতি গেল বলিয়া যাঁহারা আকাশ পাতাল ফাটাইতেছেন তাঁহাদের কাছে আমার প্রশ্ন—বাংলার সংস্কৃতি কি এতই ঠুনকো জিনিষ? তা যদি হয় তা যাওয়াই ভাল। বিহার ও বাংলা দীর্ঘকাল একশাসন-

ভুক্ত ছিল, তখন কি বাংলা ভাষা বাংলা সংস্কৃতি বলিতে কিছু ছিল না ?... বহু বাঙালী পুরুষানুক্রমে বিহারে বাস করিতেছেন—তাঁহারা কি বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতি ভুলিয়া গিয়াছেন ? এই ধরণের বহু বাঙালীকে অন্তরঙ্গভাবে জানি—বরং তাঁহারা সযত্নে ও সগর্বে সেই সংস্কৃতিকে বহন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দী ভাষার একাধিপত্য ? হিন্দী ত আমাদের শিখিতেই হইতেছে—তাহাতে কি ? বরং দ্বিভাষিকরাজ্য হইলে ওখানে বাংলা শিক্ষার সুবিধা বাড়িবে। এককালে ফার্সী-ভাষা-ভাষীদের রাজত্ব ছিল, পরে ইংরেজী-ভাষাভাষীর রাজত্ব হয়—তাহাতে কি বাংলা ভাষা মরিয়াছে ? ফার্সী ও ইংরেজী জানা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা সাহিত্য তাহার সমৃদ্ধরূপ পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবে কে ? অত সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের বন্যাতেও বাংলা সাহিত্য মরে নাই—আজ হিন্দীর চাপে মরিবে ?"

এর মধ্যে দুটি একটি কথা ধরা যাক্।

"হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে"

ভারতবর্ষের সংবিধানে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয়েছে, অতএব সে অনুসারে হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে, এই হল যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তির পিছনে যে কতবড় একটি ভাঁওতা লুকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে অনেকেই চিন্তা করেন না। রাষ্ট্রভাষা কী জিনিস ? সংবিধানেও আছে, অফিসিয়াল ল্যাংগোয়েজ কমিশন সংবিধানের নির্দেশটি স্পষ্ট করতে গিয়েও বলেছেন, রাষ্ট্রভাষার অর্থ হল ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের কাজ এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে চিঠিপত্র আদানপ্রদানের কাজ যে ভাষায় চলবে। অর্থাৎ আগে যেখানে ইংরেজীতে চলত সেখানে হিন্দীতে চলবে। কিন্তু এই কি আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ পরিধি ? আমরা সকলে জন্মেছি কি উদয়াস্ত কেবল Sir, I have the honour লিখবার জন্য ? কতজন এই কার্যে ব্যাপৃত থাকবে ? ১৯৩১ সালের সেনসাসে দেখা যায় অবিভক্ত ভারতে ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১১, ৫৩, ০০০ লোক ছিল Public Administration-এ। সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সব জড় করলে আরও কিছু বেশি হবে। তা-ও মোট ৬০ লক্ষের বেশি নয়। বাকি যে এই বিপুল জনসংখ্যা—এরা কি করবে ?

সবাই চেয়ার দখল করে চিঠি মুসাবিদা করতে লেগে যাবে, অথবা শামলা চড়িয়ে কোর্টে বক্তৃতা করতে লেগে যাবে? এদের জীবনে ইংরেজী বা হিন্দী কোনও রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনই কোনও দিন হবে না। সেজন্য তাদের জ্ঞানবিকাশের জন্য প্রয়োজন তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা। সেই জন্য সংবিধানেও স্থানীয় ভাষা বা regional languageএর প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। শুধু কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, রাজ্যের আভ্যন্তরিক সকল ব্যাপারেই। বাঙলা সরকারের তেমন মতিগতি থাকলে তাঁরা স্বচ্ছন্দেই বাঙলা ভাষায় চিঠিপত্র নোট লিখতে পারতেন। আর তা হলে অনেক ইঙ্গবঙ্গ সেক্রেটারির হয়তো কিছুটা অসুবিধা হলেও অনেক মাননীয় মন্ত্রী গলদ্‌ঘর্ম হবার দায় হতে অব্যাহতি পেতেন। এবিষয়ে সংবিধানের কথা ছাড়াও এ তো সর্বস্বীকৃত নীতি যে মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রাথমিক বাহন। এই নিয়ে বহু আন্দোলনও এদেশে চলে এসেছে। যে চাষী সুন্দরবনের জঙ্গলের বাইরে কোনও দিনই আসবে না, দিল্লীর দপ্তর জাঁকিয়ে বসবে না, এমনকি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্নও দেখবে না তার রাষ্ট্রভাষার কোন প্রয়োজনই নেই। জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান তার মাতৃভাষাতেই তার কাছে পৌছে দিতে হবে। সুতরাং একথা ভুললে চলবে না যে রাষ্ট্রভাষা আর স্থানীয়ভাষা দুটি জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা এবং দুয়ের প্রয়োজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীই হোক, ইংরেজীই হোক্ বা ফরাসীই হোক্, তাতে বিপুল জনসাধারণের ততখানি এসে যায় না যতখানি আসে যায় স্থানীয় ভাষায় হস্তক্ষেপ হলে। কারণ একটি পোশাকী ভাষা, অপরটি প্রাণের ভাষা। কিন্তু যদি বলা হয়, তোমার প্রাণটিকে বিকশিত হতে দেব না, লোহার পোশাক দিয়ে সেটিকে বেঁধে রাখব, তাহলে প্রাণান্ত হবার সম্ভাবনা ঘটে। যাঁরা বলেন, হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে অতএব এখানে শুধু রাষ্ট্রের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয় দৈনন্দিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও হিন্দীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাধতামূলক কর, তাঁরা প্রাণের উপর আঘাত হানছেন। এ হচ্ছে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একচক্ষু হরিণের দৃষ্টি, যাতে করে নিজের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। উপরোক্ত যুক্তি যিনি দিয়েছেন, তিনি হয়তো মুনসেব নয় তো উকিল, কাজেই তাঁদের হিন্দী হয়তো শিখতেই হবে। কিন্তু তাঁদের শিখতে হবে বলেই সকলকেই শিখতে হবে? তাঁরাই

কি সারা সমাজ—তার বাইরে কি আর কেউ নেই? পূর্বেই বলেছি, সুন্দরবনের চাষীর কথা। তার পক্ষে তো মাতৃভাষাই যথেষ্ট—তবে কেন সে বাধ্য হবে হিন্দী পড়ে অকারণ শক্তিক্ষয় করতে? তেমনি কি অধিকার আমার আছে বিহারের সুদূর গ্রামের চাষীকে বাঙলা জোর করে পড়াবার? ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিহার থেকে ফার্সী তাড়িয়ে হিন্দীর প্রচলন করেছিলেন—সেই সময় হতেই হিন্দীর উন্নতি শুরু। যে কোনও দিন বাঙলার সংস্পর্শে আসবে না সেইরকম একজন চাষীকে আমরা কোন নীতিতে জোর করে বাঙলা পড়াতে যাব? সে কি কেবল বাঙলা সাহিত্যিক-দের কিছু বই বিক্রির সুবিধা করে দেবার জন্য?

"বাঙলা ভাষার সীমানা বিস্তার"

বস্তুত আরও একটা তথাকথিত যুক্তির কথা শোনা যায়। সেটা হচ্ছে, বাঙলা ভাষার সীমানা, মার্জারের ফলে, আসানসোলের বদলে কর্মনাশা নদী অবধি প্রসারিত হবে। প্রথমত, হবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাস্তব বুদ্ধি তার সমর্থন করে না। সংবিধানের Act 345-তে আছে কোন্ রাজ্যে কোন্ ভাষা বা ভাষাসমূহ স্থানীয় ভাষা হিসেবে গৃহীত হবে তা সেই রাজ্যই আইনসভায় ঠিক করবেন। অর্থাৎ ভোটের জোরে যদি অঙ্গবঙ্গ রাজত্বে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে হিন্দীই এই রাজত্বের একমাত্র স্থানীয় ভাষা, তাহলে তার কোনও প্রতিকার নেই। উলটো দিকেও প্যাঁচ আছে। আসাম দ্বিভাষিক রাজ্য হবে এই রকম স্থির হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই খবর বেরিয়েছে যে তাই শুনে শ্রীযুক্ত মেধী নাকি বলছেন, তাঁরা কোনও ভাষাকেই স্থানীয় ভাষা বলে ঘোষণা করবেন না। ভোটের জোরে তাঁরা তা পারেন। এবং সেটি করার অর্থই হবে, কার্যকালে আসামী যেমন চলছিল তেমনিই চলতে থাকবে—কিন্তু মাঝের থেকে বাঙলা মারা গেল। তেমনি যদি ভোটের জোরে এখানে সিদ্ধান্ত হয় যে কোনও ভাষাকেই স্থানীয় ভাষা বলে ঘোষণা করা হবে না তাহলে আসলে হিন্দীই চলতে থাকবে আর বঙ্গ-সরস্বতীর অকালমৃত্যু ঘটবে। এখনই তো দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় হয়ে গিয়েছেন, কেননা সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্য সভায় ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ

সিংহ যে সব লেখকদের রচনা পড়তে ও অনুবাদ করতে সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম হলেন প্রেমচাঁদ, দ্বিতীয় জয়শংকর প্রসাদ, তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ [হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ফেব্রুয়ারি ২৬,১৯৫৬ দ্রষ্টব্য]। এসব আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা পূর্বাপর অবস্থার আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে। শ্রীকৃষ্ণবাবু তো কোনও শর্ত মানতেই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও নীতিগত প্রশ্নের কথা থেকে যায়। যাঁরা জোর করে বিহারী চাষীকে বাঙলা পড়াবার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরাও সেই linguistic imperialismএর অপরাধী, যে ভাষাভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের অপবাদ আমরা বিহারীদের দিয়ে থাকি। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমরা এখানে হিন্দীর সাম্রাজ্যবাদ চালাতে দেব যদি ওখানে আমাদের বাঙলা সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা চালাতে দেওয়া হয় অর্থাৎ আমাদের লেখকদের কিছু বই বিক্রি হয়। এই কি সরস্বতীর সেবকদের সাম্প্রতিক পরিচয়? ভূদেববাবু তো তখন সহজেই বিহারে বাঙলা চালিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি নীতি আশ্রয় করে হিন্দীকেই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। আর আজকের বাঙালী কি নীতির আশ্রয় ত্যাগ করে সুবিধার প্রশ্রয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে?

"ইংরেজীর হাতে বাঙলা মরে নি—এখনও মরবে না"

আর একটা যুক্তি উঠেছে, ইংরেজীর হাতে বাঙলা মারা যায় নি, বরং বিকশিত হয়েছিল। তবে সে হিন্দীর হাতে মরবে কেন? এ যুক্তি যাঁরা দেন তাঁরা আসলে কোন যুক্তিরই বালাই রাখেন না। বড় বড় তিনটি কথা এ প্রসঙ্গে সহজেই স্মরণ রাখতে হবে। প্রথম কথা হল, আগে রাষ্ট্রের পরিধি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত, তা কেবল আইন এবং শৃঙ্খলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রত্যেক দিকে সে বাহুবিস্তার করে নি। আজকের রাষ্ট্রের সীমানা বহুবিস্তৃত, সে আমাদের হাঁড়ির খবর রাখতে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিকে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। কাজেই আগে যখন এক রাজা যেত, অন্য রাজা আসত, এক রাজত্বের পতন হত, অন্য রাজত্বের অভ্যুত্থান হত, তখন জনসাধারণের বিশেষ কিছু যেত আসত না। এর ব্যতিক্রম ঘটতে আরম্ভ হয় ইংরেজ রাজত্বের সময়। মার্কস নিজেই বলেছেন, রেলপথ স্থাপনা করে এবং ভারতের

বিভিন্ন অংশগুলির সংযোগ স্থাপনা করে ইংরেজ ভারতবর্ষে এক বিপ্লব ঘটাচ্ছে বস্তুত তা হয়েছিলও। ইংরেজের শাসন সারা ভারতের অভ্যন্তরে যতখানি প্রবেশ করতে পেরেছিল ইতিপূর্বে তা দেখা যায় নি। কিন্তু আজ তার চেয়েও বহুগুণে বেশি প্রবেশ ঘটছে। ইংরেজ আমলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁর বাংলায় বসে হাওয়া খেতেন আর মধ্যে মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে জেলাটায় চক্কর দিয়ে আসতেন, এই মাত্র। কিন্তু আজ গ্রামে গ্রামে গ্রামসেবকেরা প্রবেশ করেছে। এ জিনিস আরও হবে। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় রাষ্ট্রযন্ত্র আরও অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে এবং তার ভালো বা মন্দ করবার ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য আজ যদি কোনও রাষ্ট্র মনে করে কোনো জায়গায় মাতৃভাষার বদলে হিন্দী চালাব তাহলে সে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা এবং সফলতার সঙ্গে সেই মাতৃভাষার দলন করবে, তা পূর্বে করা সম্ভব ছিল না। সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা দলন করবে, বাইরে থেকে হিন্দীভাষী শিক্ষক আমদানি করবে, গ্রামের মধ্যেও লোকে বুঝুক না বুঝুক সরকারী কাজে জোর করে প্রচলিত হবে হিন্দী, জনসাধারণকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজেও সরকারের কোন সম্পর্কে গেলেই শিখতে হবে হিন্দী। এইভাবে প্রতিপদে তার মাতৃভাষা দলিত হবে। আমি সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত দৃষ্টিতে এই প্রশ্নটি দেখছি নে। সে দিকেও সমস্যা আছে—সে কথা সকলেই উপলব্ধি করেন। সে সমস্যাও যে খুব উপেক্ষণীয় তা বলি না। কেন না, যতদিন জনসাধারণ জাগ্রত না হয় ততদিন সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব আচ্ছন্ন করে থাকবেই এবং, সে সময় মধ্যবিত্ত সমাজ যদি তার সংস্কৃতি হারায় তাহলে এই অবস্থায় সামগ্রিকভাবেই সংস্কৃতির অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কিন্তু সে কথা যাক। জনসাধারণের দিক দিয়ে দেখলেও দেখা যাবে, মাতৃভাষার যে বিকাশেই তাদের সংস্কৃতির জয়যাত্রার ভিত্তি রচিত হতে পারে বর্তমান কালের রাষ্ট্র সেই ভিত্তিকে সমূলে নাড়া দেবার শক্তি অর্জন করেছে। সে শক্তি প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ আমলেও ছিল না। সুতরাং ইংরেজ আমলে বাঙলা মার খায় নি, অতএব এখনও খাবে না—এ যুক্তি নিতান্ত অবাস্তব। ইংরেজ আমলে মানভূমের বাঙলাভাষীরা যে মার খেয়েছে, আজ তাদের উপর প্রচণ্ডতর মার এসে পড়ছে, এ কথা হতে কি প্রমাণিত হয়?

এই কথা হতেই আর একটি কথা এসে পড়ে। সেকালের ইংরেজ

আমলে সরকারের কোনও ইচ্ছা ছিল না স্থানীয় ভাষাকে বিকশিত করবার যেমন কোন ইচ্ছা ছিল না স্থানীয় ভাষাকে ধ্বংস করবার। কারণ স্থানীয় ভাষা ছিল তার প্রশাসনিক প্রয়োজনের বাইরে। এভাষার বিকাশ ঘটেছে ইংরেজী-শিক্ষিতদের হাতে,কিন্তু সরকারের হাতে নয়। সরকারের প্রয়োজন কিছু ইংরেজী-জানা কেরানী-উকিল-মোক্তারের, তারা সেইটুকু প্রয়োজন মিটিয়ে নেবার পর, এবিষয়ে আর মাথা ঘামায় নি। সেই জন্য তারা যেমন এই সব ভাষার বিকাশের কোনও চেষ্টা করে নি, মাতৃভাষায় কোন শিক্ষার ব্যবস্থা করে নি, তেমনি পক্ষান্তরে যারা এইসব চেষ্টা করেছেন তাঁদের বাধাও দেয় নি। বাধা দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে হিন্দীর সে প্রয়োজন আছে কারণ সে শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে স্বকীয় উৎকর্ষে নয়, সংখ্যার জোরে এবং সে আসনে তাকে বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারের। ভাষা ও সাহিত্যগত উৎকর্ষের জোরে সে বাঙলার উপরে স্থান গ্রহণ করতে পারবে না, অথচ সেই শ্রেষ্ঠ আসন তার চাই-ই। তা না হলে অন্য প্রয়োজন দূরের কথা, প্রশাসনিক প্রয়োজনও তার মিটবে না। এই জন্যই হিন্দী প্রচারের মধ্যে একটা আক্রমণাত্মক ভাব আছে, থাকতেও বাধ্য। রাষ্ট্রশক্তি এবং সংখ্যাশক্তির জোরে সব বাধা ভাঙতেই হবে তাকে। তাই অপরকে খর্ব করবার উৎকট আগ্রহ তার মধ্যে পরিস্ফুট। একথার প্রমাণ আমরা বহুক্ষেত্রে পেয়েছি। সেই কারণে আমরা ইংরেজীর হাতে মার খাই নি বলে হিন্দীর হাতে মার খাব না, এটা কোনও যুক্তিই নয়। বরং হিন্দীর হাতে মার খেতেই হবে এই কথা ধরে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

তা ছাড়া ইংরেজীর হাতে আমরা মার খেতে যাব কেন? ইংরেজ এদেশে এসেছিল দৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক স্বরূপে কিন্তু ইংরেজী ভাষা তা আসে নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে,

বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে। ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সে চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।'

বস্তুত, আমরা যখন পাঁজি-মনসা-ওলাবিবি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, জীর্ণ আচারের ঠুনকো বেড়াজালের মধ্যে চোখ বুজে বসে ছিলাম তখন য়ুরোপে মোহমুক্ত বুদ্ধির যে উদার অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল, শুরু হয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দুরূহ সাধনা, সেই বাণীরই বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল ইংরেজী ভাষা। হয়তো ফরাসী ভাষা বা জার্মানভাষার মাধ্যমেও এই পরিচয় ঘটতে পারতো। তা যে ঘটে নি সে হল ইতিহাসের চক্রান্ত। কিন্তু মূল কথাটা হল, যে ভাষা নতুন যুগের নতুন চিত্তের উদ্বোধনের বাণী বহন করে নিয়ে আসে, সে ভাষা মারে না, নতুন উজ্জীবন ঘটায়। সে প্রাণশক্তিকে নাড়া দেয়, মননশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে, নতুন করে ভাবতে শেখায়, নব নব খাতে চিন্তাধারা প্রবাহিত করায়। ইংরেজী সে কাজ করেছিল—তাই তার স্পর্শে আমরা মরিনি, বরং বেঁচেছিলাম। খুব বেশি বেঁচেছিলাম। এই কাজ যে ইংরেজী ভাষার একচেটিয়া অধিকার তা নয়। পূর্বেই বলেছি, হয়তো ফরাসীর মাধ্যমেও একাজ সুসম্পন্ন হতে পারত। মোট কথা, দীপ্ত চিত্তের বাণী বহন করে এমন ভাষা চাই। ঘটনাচক্রে আমাদের যোগ ঘটল ইংরেজের সঙ্গেই—তাই ইংরেজীর মাধ্যমেই এই কাজ ঘটেছিল। উনবিংশ শতকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্তুঙ্গ মহিমা নিশ্চয়ই এই নতুন চিন্তা-আলোড়নের ফল।

কিন্তু এই নব উজ্জীবন ঘটাতে পারে কেবলমাত্র সেই ভাষাই যেভাষা সেই মনের উজ্জ্বল সম্পদ বহন করতে থাকে। প্রশ্ন ওঠে, সেই সম্পদ কি হিন্দীর আছে? বরং সে সম্পদ যেটুকু বাঙলার আছে সেটুকু হিন্দীর নেই। সুতরাং আজ হিন্দীর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে এসে বাঙলাভাষার কি নতুন চিত্তসম্পদ বাড়বে? বরং হিন্দীভাষাকে চালাবার প্রবল চেষ্টা যখন আজকের সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের তরফ থেকে হবে তখন অহরহ অনুভূত হতে বাধ্য যে তাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার পথে প্রচণ্ড অন্তরায় স্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে সম্পদ-উজ্জ্বল বাঙলাভাষা। তাকে খর্ব করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন:

"আমার বেশ মনে আছে যে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, বাঙলা সাহিত্য যতই উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে।- এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাঙলা ভাষা। অতএব বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে তত মঙ্গলকর নহে। সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।"

ঐ রকম একটা পিণ্ডাকার পদার্থই যে জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, একথা শুধু সেদিনই লোকের মনে জাগে নি। আজ যাঁরা ভারতবর্ষের ঐক্যের দোহাই দিয়ে সকল রকম স্থানীয় বিশিষ্টতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন তাঁরা বিশেষত্বকে মহত্ত্বে নিয়ে গিয়ে শ্বাশত সত্য মিলন ঘটাবার চেষ্টা করছেন না, তাঁরা সকল প্রকার ভেদকে রাষ্ট্রযন্ত্রের ঢেঁকিতে কুটে একটা কৃত্রিম কিমভুত পিণ্ডাকার পদার্থই গড়তে চাইছেন। এই অসত্য চেষ্টায়, এই সুবিধাবাদী সমন্বয়ে সকল বিশিষ্টতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে না দিতে পারলে তাঁদের সেই অপরূপ পিণ্ডাকার মিলনের সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই যে প্রয়োজন ইংরেজেরও হয় নি, আজ এঁদের সে প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রচেষ্টা যখন চলতে থাকবে বর্তমান রাষ্ট্রের বিপুল যন্ত্রের মাধ্যমে, নতুন কোনও চিত্তসম্পদই পাব না আমরা রাষ্ট্রভাষা হতে, বরং আমাদের সাহিত্য চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াবে অপরের, তখনও আমাদের আশা করতে হবে আমরা যেহেতু ইংরেজীর হাতে মরি নি, সেহেতু হিন্দীর হাতেও মরব না বরং উন্নতি করতে থাকব? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পড়বার পর জয়শংকর প্রসাদ পড়লে আমাদের চিত্তসম্পদ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে? আর আজ বাঙলার সাহিত্যিকেরা সেই কথা বিশ্বাস করে পটুলিতৃপ্ত অশ্বত্থামার মতো উদ্বাহু হয়ে আনন্দ করতে থাকবেন?

এই অসত্যের জয়গানে তাঁরা মুখর হয়ে উঠলেন কি করে? একি শুধু বুদ্ধি বিকৃতি না আরও কিছু?

সংস্কৃতির উত্থান পতন

জগতের ইতিহাসে সংস্কৃতির উত্থান-পতন কিছু নতুন নয়। অত্যুজ্জ্বল গ্রীক সাহিত্য কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, মিলিয়ে গিয়েছে লাতিন সাহিত্য, ইতালিতে কবে ফুরিয়ে গিয়েছে রেনেশাঁসের প্রেরণা, মরে গিয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য। কাজেই যাঁরা বিশ্বাস করে বসে থাকেন যে সংস্কৃতি ঠুন্‌কো জিনিস নয়, তা চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে, তাঁরা হয় দুর্মর আশাবাদী নয় অবিশ্বাস্য রকমের নির্বোধ। জগতে যে নিয়মে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উত্থান-পতন চলছে আমরা বাঙালী বলেই সে নিয়মকে এড়িয়ে যাব, এমনতর কথা বলার দুঃসাহস আর যারই থাক, যাঁদের ইতিহাসের দুএকটা পাতাও নাড়াচাড়া করা আছে তাঁদের সে দুঃসাহস কখনই হবে না। সংস্কৃতির একটা অন্তর্নিহিত ফল্গুধারা যুগ হতে যুগান্তরে প্রবাহিত হলেও তার চেহারা বদল হয় যুগে যুগে—আর তার উত্থান-পতন নির্ভর করে বহু জিনিসের উপর। তার মধ্যে সমাজবন্ধন একটা। টয়েনবী দেখিয়েছেন, গ্রীক সভ্যতা ততদিনই বিকশিত হতে পেরেছিল যতদিন নগর-রাষ্ট্রগুলি সমাজ এবং অর্থনীতির তাগিদ্ মেটাতে পেরেছিল। কিন্তু যখনই নগর-রাষ্ট্রগুলি সে তাগিদ মেটাতে সক্ষম হল না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে বৃহত্তর রাষ্ট্র সংস্থা গড়বার দরকার হল, প্রয়োজন হল সমাজের কাঠামো বদলাবার অথচ confederacy of Delos ইত্যাদি দুএকটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা ছাড়া সে বদল ঘটাতে পারলই না গ্রীক সমাজ তখনই তার গৌরব-সূর্য অস্তমিত হল, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি গেল মরে। বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির বেলাতেও কি একথা সত্য নয়? ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে, ইংরেজের আগমনের পূর্বে এদেশে সংস্কৃতির দুটি ধারা ছিল। সমাজের উচ্চস্তরে সামান্য কয়েকটি লোক বেদবেদান্ত-ন্যায়দর্শন-স্মৃতি-পুরাণ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বটে, কিন্তু তার পাশাপাশিই চলত একটি বিপুল বিরাট লোকসংস্কৃতির ধারা। এই ধারা প্রবাহিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়ে, এই সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে ঋতু-উৎসবে, পল্লীসঙ্গীতে, সহজিয়া সাধনায়, এই সংস্কৃতি বিধৃত হয়েছে

সেকালের প্রীতিস্নিগ্ধ পল্লী পরিবেশে। বাঙলার জীবনে যখনই কোনও সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে তখনই বাঙলার চিত্তশক্তি নতুনভাবে প্রাণরস সংগ্রহ করেছে তথাকথিত উপরস্তরচারীদের ন্যায়শাস্ত্রের বিধান হতে নয়, সে প্রাণরস সংগৃহীত হয়েছে জনসাধারণের মধ্য হতে, লোকসংস্কৃতির আত্মসাৎ-করণে। সেই কারণেই, এই প্রাচ্য প্রান্তে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিকড় গভীরে প্রবেশ করে নি, বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল যথেষ্ট এমনকি শঙ্করাচার্য যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তিনিও উড়িষ্যার এপারে তাঁর সীমানা গড়তে পারেন নি। যখন ন্যায়শাস্ত্রের বিধিনিষেধে এদেশ জর্জরিত তখনই শ্রীচৈতন্যদেব নতুনভাবে দরজা খুলে দিলেন সকলের জন্য ; টেনে আনলেন সকল অন্ত্যজকে। এই ধারাই বরাবর চলে আসছিল। এমনকি অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায়, সেই ক্ষয়িষ্ণু আমলেও বহু লোকসাধারণের পাঠশালা ও মক্তব রয়েছে, যা সমাজের তথাকথিত উপরস্তরচারীদের জন্য নয়, যা জনসাধারণের জন্য। হোক্ তা প্রাচীন এবং অনুপযুক্ত, হোক তা কালের দাবি মেটাতে অসমর্থ, তবু সে চেষ্টার পরিচয় ছিল। ইংরেজের আগমনের পর কি ঘটল ? নতুন চিত্তের জোয়ার এল বটে, কিন্তু সে জোয়ার দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হল না, সীমাবদ্ধ হয়ে রইল কেবল মধ্যবিত্ত সমাজে। যা ইংরেজেরই সৃষ্টি। সেইজন্য তখন হতে বাংলার সংস্কৃতির মোড় ঘুরে গেল। পূর্বে উপর এবং নীচের তলায় যে ভেদ ছিল সে ভেদ উঠলো বৃহত্তর হয়ে। একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল তেমনি অন্যদিকে লোকসংস্কৃতি গেল অতল অন্ধকারে তলিয়ে। একদিকে মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু অন্যদিকে একজন কৃত্তিবাসও জন্মালেন না। এই পার্থক্য বাঙলা দেশের সংস্কৃতির একটা মৌলিক দুর্বলতা। যার জন্য রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সখেদে বলেছেন—

> আমার কবিতা জানি আমি
> গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

যতদিন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রসার এবং বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল এবং যতদিন জনসাধারণের মধ্যে কোনও জাগরণ দেখা দেয়নি, ততদিন এই সংকটের তীব্রতা অনুভূত হয় নি। কিন্তু যখন বাঙালী মধ্যবিত্ত ম্রিয়মাণ,

অথচ অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ দেখা দিয়েছে তখন সংস্কৃতির সামাজিক ভিত্তিকে বিস্তৃততর করতে না পারলে সংকট অনিবার্য। সুতরাং আজ যখন সেই নিদারুণ প্রয়োজন আমরা অনুভব করতে শুরু করেছি তখনই আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল অবিঘ্নিত নিরুপদ্রব শান্তিতে বাঙলার সমাজের ও সংস্কৃতির নূতনতর রূপ দান। আর সে রূপ বাঙলার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতেই পারে না…অতএব বাঙালি বাঙলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দীভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দীর ছাঁচে বাঙলা লিখিতে থাকে তবে বাঙলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না।"

আজ সেই জন্য যদি বাঙলার এই সংকট মুহূর্তে আমাদের সমস্যার সঙ্গে নতুন করে যোগ করি বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বিহারী মধ্যবিত্তের কলহ, যদি আমদানি করি নানা স্বার্থের সংঘাত ও তার ফলে গোপন দলাদলি, যদি চলতে থাকে রাষ্ট্রের সম্পদ ভাগবাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে অহরহ অদৃশ্য দ্বন্দ্ব, যদি সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় কে কাকে ভাঙিয়ে নিয়ে নিজের দল পুষ্ট করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রাজত্ব করবে, এই পরিবেশে নতুন সমাজগঠন না হলে বাঙলার সংস্কৃতিতে দারুণতম সংকট অনিবার্য, সে সংকট তরণের ক্ষীণতম আশারও কি কোনও আশ্বাস আছে?

সমাজবন্ধন ছাড়াও তেমনি সংস্কৃতির আরও কিছু উপকরণ আছে। এর তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সংস্কৃতি এমন একটি পদার্থ যা প্রাণের মতোই সর্বত্র বিরাজমান অথচ যাকে ব্যাকরণের সূত্রে ধরা যায় না। তবু দু-একটা বাহ্য লক্ষণ দেখে কিছুটা বলা যায়। বলা বাহুল্য এর অন্যতম প্রধান উপকরণ ভাষা। আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস হোক্, বাঙলা হরফ তুলে দিয়ে দেবনাগরী হরফে বাঙলা লেখা হোক্, প্রাথমিক শিক্ষালয়ে মাতৃভাষার সম্যক্‌জ্ঞান আয়ত্ত হবার আগেই সঙ্গে

সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী পড়ানো হোক্—এই ধরনের প্রচেষ্টা কিছুকাল চললেই দেখা যাবে, যে সকল বিশেষ লক্ষণ দ্বারা বাঙলার সংস্কৃতি ও জীবনধারা চিহ্নিত, তারই আর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতি তো দূরের কথা।

নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে চিন্তাভাবনা না থাকলে সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে না। আজও কি বলতে হবে বাঙলার উপর হিন্দী এবং বিহারের উপর বাঙলা জোর করে চাপিয়ে দিলেই নদীর বাঁধ বাধা যদি-বা সম্ভব হয় সেই সঙ্গে উভয় দেশে সাংস্কৃতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা হবে?

উপসংহার

এত বাধা থাকা সত্ত্বেও হয়তো তবু দুঃসাহসে বুক বেঁধে অগ্রসর হওয়া চলত যদি আজ বাঙালী চরিত্র-তেজে দীপ্ত থাকত। কিন্তু আজকে যাঁরা আত্মপ্রতিনিধিত্বের আড়ালে বাঙালি পরিচয় গ্রাস করতে চাইছেন সেই মধ্যবিত্ত স্বার্থের একাংশের মধ্যে মেধা থাকতে পারে, বুদ্ধি থাকতে পারে, বিদ্যাও হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ চরিত্র -হারিয়েছে তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ ঐ সব সাহিত্যিকেরাই। যখন রাষ্ট্র হিন্দী-লেখকদের সামনে নানা পুরস্কারের লোভ তুলে ধরবেন, যখন বাঙালী জানবে হিন্দী জানলে শ্রেষ্ঠতর চাকরি পাওয়া যায়, যখন উপলব্ধি হবে হিন্দীতে ভাল লিখতে পারলে বিক্রীত বই-এর সংখ্যা অনেক বেশি হয়, তখন বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই যে, সেই লাভের লোভ পরিত্যাগ করে এই সব বাঙালী সাহিত্যিক একদিনও বাঙলা ভাষার চর্চাতেই নিমগ্ন থাকবেন না, বাঙলা পরিত্যাগ করে হিন্দী পড়তে ও শিখতেই সমস্ত প্রতিভা ও শক্তি ব্যয় করবেন। তাতে আমাদের প্রতিভায় হিন্দীর বিকাশ ঘটবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্গসরস্বতীর বিসর্জন হতে কাল বিলম্ব হবে না। তাই যদি না হবে তাহলে বাঙালী লেখকেরা এখনই তাঁদের বই-এর কুশ্রী অ-সাহিত্যিক হিন্দী ছবিতে রাজী হন কেন?

সমালোচনা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় ॥ শচীন সেন ॥ ৩য় সং ॥ রীডার্স কর্নার ॥ সাত টাকা ॥

ডাঃ শচীন সেনের বইটি প্রথম বেরোনোর পর পরিচয়-এ সমালোচিত হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে কলেবর বৃদ্ধি ঘটেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রবাহ' নামে একটি নতুন পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছিল। নবতম সংস্করণে এইটেই প্রথম পরিচ্ছেদ। প্রথম সংস্করণে লেখক শুধু 'ডাকঘর' ও 'ফাল্গুনী'—এই দুটি নাটকের আলোচনা করেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নাটকের অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা' পরিচ্ছেদটি। এই পরিচ্ছেদে লেখক সাহিত্যবিচার সম্পর্কে মার্কসীয় মত সম্বন্ধে অনেকটা আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লেখক তাঁর মতামত খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করে শেষ পর্যন্ত এই বলে ক্ষান্ত হয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'জিহাদ' সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে 'যে-সভ্যতায় ব্যক্তি নিষ্পেষিত এবং যন্ত্রের বাহন মাত্র'।

সাহিত্যবিচারে মার্কসীয় ইতিহাস-দর্শন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কতখানি প্রযোজ্য, শচীনবাবু তা এড়িয়ে গেলেও এই জাতীয় সাহিত্যবিচারপদ্ধতিতে

যে তাঁর আস্থা কম তা বোঝা যায় তাঁর নিজের আলোচনাপদ্ধতি থেকে। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনায় তিনি মার্কসীয় সাহিত্য-দর্শনের নিরপেক্ষ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন।

শচীনবাবু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও নাটকগুলির পরিচয় দিয়েছেন একটির পর একটি বই ধরে। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও উপন্যাসগুলির প্রসঙ্গ ও আখ্যান সম্বন্ধে অপরিচিত পাঠকদের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার পরিচয় তিনি দিয়েছেন 'জীবনদেবতা', 'প্রেমসাধনা', 'স্বাদেশিকতা', ইত্যাদি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে। যদিও এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার ক্রমিক ইতিহাস খানিকটা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অপরিচিত পাঠকদের পক্ষে কবির কাব্যরচনার ক্রমপরিণতি বুঝবার পক্ষে তা যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

শচীনবাবু, বোধ হয় বইটির নামের মোহে, যতটা জোর দিয়েছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় দিতে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যবিচারে বা সমালোচনায় তা মোটেই দেন নাই, যদিও অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এডোয়ার্ড টম্‌সন প্রভৃতি সমালোচকের কোনো কোনো বিরুদ্ধ মন্তব্য খণ্ডনে যথেষ্ট উৎসাহ তিনি দেখিয়েছেন। এর ফলে বইটি যেন একটু একপেশে হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য মহৎ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের স্থান-নির্ধারণ দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনাগুলিরও আপেক্ষিক মূল্যবিচারের বিশেষ কোনো চেষ্টা তিনি করেন নাই। হয়তো শচীনবাবুর উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অপরিচিত পাঠকপাঠিকাদের, সম্ভবত ছাত্রছাত্রীদের কাছে শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া। কিন্তু বইটিতে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের রচনা ও একাধিক রবীন্দ্র-সমালোচকের রচনা থেকে বহু উদ্ধৃতি আছে যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত তাঁরাও মূল্যবান বলে মানবেন।

হিরণকুমার সান্যাল

'জীবনী-বিচিত্রা' গ্রন্থমালা—ডারউইন, ভলটেয়ার, মাদাম কুরি, রামমোহন, ম্যাকসিম গর্কি, বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র॥ যথাক্রমে লিখেছেন অশোক ঘোষ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমল

দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনা—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক—স্বাক্ষর, কলকাতা ২০ ॥ প্রতি বই এক টাকা

যতদূর মনে পড়ে, আমাদের বাল্যে শিশুপাঠ্য জীবনী-সাহিত্য বিশেষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' কিংবা 'জীবনস্মৃতি' বাদ দিলে এমন জীবনী অল্পই ছিলো সরসতায় যা গল্পের বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে ইস্কুলের ছুটির দিনে, দুপুরে অ্যাডভেন্‌চারের বইয়ের অভাবে হয়তো কৃষ্ণদাসের স্থূলকায় গান্ধীচরিত নিয়ে বসেছি কিন্তু শেষে দেখা গেছে যা পড়েছি, ঘুমিয়েছি তার ঢের বেশী।

কিন্তু দেবীপ্রসাদ-চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত জীবনী বিচিত্রা-র সাতখানা বই সরস লিপিদক্ষতায় ও বৃত্তান্ত বলার কৌশলে আমাকে মাঝে-মাঝে এমন মুগ্ধ করেছে যে হৃত বাল্যের কথা ভেবে মনে মনে এক-একবার যে ঈর্ষা না অনুভব করিনি এমন নয়।

সাধারণ জ্ঞানের ঝুলি কৈশোরে যত ভরে ওঠে ততই ভালো। জ্ঞান-সমুদ্রতীরে মণিমুক্তো কদাচিৎ মেলে, তাই আপাতত নুড়ি কুড়িয়েও ঝুলি ভরে নিতে আপত্তি নেই কেননা জীবনের ও মনের পূর্ণ বিকাশের জন্যে বর্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরও বাড়ন্ত গাছের মতনই যখন রস-সংগ্রহে অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠে তখন হাতের কাছে এই বইগুলি পেলে তাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হবে আশা করি।

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে কর্মে ও চিন্তায় যাঁরা এক-একটা যুগ প্রবর্তন করেছেন—সেই যুগনায়কদের চরিত্র-চিত্রের আর-একটা সার্থকতা আছে। তাঁদের কর্মকাণ্ড ও আবিষ্কার-সংক্রান্ত নানা তথ্য বইগুলিতে সরস ভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে শিক্ষণীয় বিষয়েরও যেমন অভাব নেই তেমনি বিরাট ব্যক্তিপুরুষদের কর্মজীবনে বাধা-বিপত্তি, উদ্যম ও সাফল্যের যে বর্ণোজ্জ্বল চিত্র আঁকা হয়েছে তা এ যুগের কৈশোরকেও উদ্দীপনা জোগাবে। সেই সঙ্গে তাদের মনের দিক থেকেও বয়স্ক করে তুলবে, বর্তমান বাংলা দেশে যা নিতান্ত আবশ্যক।

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো? ॥ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥ এক টাকা
বাঘ ও অজন্তা ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ॥ দেড় টাকা
রবীন্দ্র-কথা ॥ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ এক টাকা
রঙ ও রূপ ॥ ডক্টর সচ্চিদানন্দ কুমার ॥ দুই টাকা
ব্যঞ্জনা ও কাব্য ॥ হরিহর মিশ্র ॥ দুই টাকা
ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি ॥ গুরুদাস সরকার ॥ তিন টাকা

এই সমস্ত বইগুলো "রত্নসাগর" গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ করেছেন ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড থেকে দেবকুমার বসু।

গ্রন্থের মুখবন্ধে সম্পাদকেরা বলেছেন, "সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে।" আশা করি এ উক্তিকে স্বীকার করবেন সবাই। প্রশ্ন হয়তো ওঠে আদপে আলোচ্য গ্রন্থমালায় এমন কোন রত্ন আছে কি না—এই নিয়ে। যদি তাই হয় তবে মীমাংসার ভার অক্ষম সমালোচকের উপর নেই। সেখানে পাঠকের রায়ই সবচেয়ে বড়।

কিন্তু একটা কথা বলতে পারি: রত্নের সন্ধানে এসে পাঠককে বারবার ডুব দিয়ে নাকাল হতে হবে না। হাতের গোড়ায়ই সে রত্ন আছে। আর তা হল গুরুদাস সরকার মহাশয়ের প্রাক-মুসলিম যুগের ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি। বর্তমান সমালোচকের যতদূর জানা আছে তাতে মনে হয় বাঙলা ভাষায় প্রাক মুসলিম যুগের শিল্প ও সংস্কৃতির আলোচনা-র সূত্রপাত প্রথম করলেন সরকার মশাই। এই গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য আমার মতো বহু পাঠকই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত। ইতিহাস এবং ভূগোলের যৌথ সম্বন্ধে স্পষ্ট এই গ্রন্থের পটভূমি—এবং লেখক কোথাও তাঁর পটভূমি থেকে দূরে সরে যান নি। বোধ হয় প্রত্যেক সৎগ্রন্থই তাই যা মানুষকে ভাবায়, তার অতীত ও বর্তমান, তার কর্মকাণ্ড আর অস্তিত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়ে সাহায্য করে। লেখকের মূল উক্তি বা প্রতিপাদ্যের সঙ্গে পাঠকের মিল কতখানি হল সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হল এই যে মনের স্তব্ধ দীঘিতে ঢেউ লাগল কিনা! যদি জাগে তবে বুঝতে হবে নিঃসন্দেহে গ্রন্থকার সার্থক। সরকার মশাই আমাদের ভাবনার ঢেউ দিয়েছেন।

ব্যঞ্জনা ও কাব্যে হরিহর মিশ্র ধ্বনিবাদকেই গ্রহণ করেছেন। আনন্দবর্ধন প্রবর্তিত ধ্বনিবাদ সাহিত্যবিচারের চূড়ান্ত এবং শেষ কথা কিনা এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই সন্দেহের কথা গোপন না করেও বলা যায় যে 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' রত্নসাগর গ্রন্থমালায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মিশ্র মশাই-এর বাচনভঙ্গী ধীর-স্থির। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাবার সময় কিংবা ভিন্ন মতকে খণ্ডন করার সময় যথোচিত মর্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ধ্বনিবাদ প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক তর্কের ভিতর না গিয়ে মিশ্র মশাইএর কাছে নিবেদন করবো, তাঁর আগামী খণ্ডতে যদি বাঙলা কবিতা থেকে উপমা বা উপকরণ সংগ্রহ করেন তবে আমার মতো বহু সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ পাঠক তাঁর মতামত আরো ওয়াকিবহাল হয়ে বিচার করতে সমর্থ হবেন। প্রসঙ্গত কাব্যের নিরলঙ্কার গুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিশ্র মশাই "যেতে নাহি দিব" থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস এই উদাহরণ যথেষ্ট যথাযোগ্য হতে বাধা পেয়েছে। যেমন, "এতক্ষণ ছায়াপ্রায় ফিরিতেছিল সে"...ইত্যাদি। ছায়াপ্রায় অলঙ্কার নয় কি ? ধর্মাচরণে যেমন নির্লোভ নিরলঙ্কার হওয়া সাধনার জয়যাত্রা সূচিত করে ; কাব্যেও তেমনি। যে কাব্য যত elemental সে কাব্য ততই মহৎ। প্রবীণ অধ্যাপকের প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন এই যে রবীন্দ্রনাথ কি শেষ জীবনের কবিতায় এই প্রসাদগুণ আরো গ্রাহ্যভাবে পান নি ? অবশ্যই এ প্রশ্ন গ্রন্থের মূল আলোচনার নিতান্ত শাখাকে আশ্রয় করেই।

বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। খ্যাতিমান প্রাবন্ধিকের 'রবীন্দ্র-কথা' ক্ষীণকায়, কিন্তু সুখপাঠ্য। অবশ্যই এই স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কোন নোতুন রূপ পাঠকের সামনে ধরে দেওয়া একান্ত অসম্ভব। কিন্তু নোতুন আলোকপাত এক কথা, আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোচনাকে মালা করে গেঁথে দেওয়া আর-এক কথা। এর মূল্য আলাদা, স্বাদও আলাদা। তাই রবীন্দ্র-কথা সেই স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাবান শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘ ও অজন্তা' ইতিমধ্যে রসিক সমাজে সমাদর পেয়েছে। বাঘ ও অজন্তার বিবরণ এবং অজন্তার চিত্রগুলির বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে শিল্পী মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় চিত্রকলায় পাণ্ডিত্যের প্রমাণ। কিন্তু সে পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিলেও আমার

মতো সাধারণ পাঠকের কাছে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা লাভ হল বাঘ ও অজন্তার গুহাচিত্রের অনুলিপি।

রত্নসাগরে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা থেকে বোঝা যায় সম্পাদকদের চোখ কোন এক বিশেষ দিকে আবদ্ধ নেই। চিত্রশিল্পের সঙ্গে অর্থনীতির সমস্যার আলোচনা করতে তাঁরা দ্বিধা করেন না। তাই পরিধি তাঁদের স্বভাবতই বড়। তাই এর যেমন সুবিধে আছে, অসুবিধে আছে তেমন। এক ধরনের বই আছে যা বিশেষজ্ঞদের কাছে দাম পায়; সাধারণ পাঠকের কাছে মূল্য তার তত বেশী নয়। অবশ্যই যদি বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ পাঠককে একসঙ্গে আনন্দ দিতে পারা যায় তার চেয়ে বড় আর কী আছে। সে দিক থেকে 'রবীন্দ্র-কথা' ও 'বাঘ ও অজন্তা' সার্থক। কিন্তু "কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো" সেই উচ্চ প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারে নি। সেই জন্যে সম্পাদকদের কাছে সমস্যাটা তুলে আমার আলোচনা শেষ করলাম।

রাম বসু

রঙের বিবি ॥ বারীন্দ্রনাথ দাশ ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ তিন টাকা

যতদূর জানি বারীন্দ্রনাথ দাশ প্রথম শুরু করেন সাহিত্যের খিড়কি দরজায় ঘা দিয়ে। তাতে চমক ছিল, চরিতার্থতা ছিল না। আনন্দের কথা, লেখক নিজেই সে বিষয়ে সচেতন হতে পেরেছেন, যার প্রমাণ 'রঙের বিবি'। যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখক এই বইয়ে তাঁর পাত্রপাত্রী ও সমাজকে নিরীক্ষণ করেছেন তার মধ্যে অভিনন্দনযোগ্য একটা ঋজুতা ও সুস্থতা বর্তমান। গল্পটি গড়ে উঠেছে যে পরিবারকে নিয়ে, তারা ভাঙনের মুখে। কেরানি বাপের তিন মেয়ে, এক ছেলে। নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও প্রেমদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যৎ নির্বাচন করে নিচ্ছে। বড়ো মেয়ে সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা দীপালী যে পরিবেশে পৌঁছেছে সেখানে কেরিয়ারের হৃদয়হীন দুশ্চিন্তা আর মনোবৃত্তির হাস্যকর ক্ষুদ্রতা। মেজো মেয়ে শ্যামলীর পথ গেছে পরিবারের জন্যে আত্মত্যাগ এবং প্রীতি ও দরদের একটি স্নিগ্ধ রেখা সৃষ্টি করে। ভাই রজতের দুঃসহ বেকারিত্বের অবসান হয় এবং কেরিয়ারের পথ উন্মুক্ত হয় শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক ভাঙতে পারার কৃতিত্ব

দেখিয়ে এবং সে-কৃতিত্বে অন্যতম বলি হয় তার নিজেরই ছোটো বোন রুপালী, যে নতুন পথ কাটে বিদ্রোহে আর লেবার-ওয়ার্কের আনন্দে। স্পষ্টই বোঝা যায় লেখকের সহানুভূতি রুপালীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত এবং সেই পরিমাণেই মোহিত, ক্ষমা প্রভৃতি উঁচুতলার টিকিটধারীদের প্রতি মৃদু অথচ তীব্র বিদ্রূপে শানিত। কাহিনীর শেষে বেদনার রেশ রেখে যায় পাঞ্জাবী রেফ্যুজি মেয়ে ডলির সুন্দর মানবিক কাহিনীটুকু। সন্দেহ নেই বারীন্দ্রনাথ দাশের কলম অনেক চলতি লেখকের চেয়ে পাকা, ভাষা ঝরঝরে, বিশেষ করে নাগরিক আমেজ সৃষ্টিতে এবং রেখাচিত্র অঙ্কনে সুনিপুণ। সেই জন্যেই একটি আক্ষেপ জানাতে চাই—'রঙের বিবি'-তে তিনি তকটা টান দিয়েছেন ততটা ভরাট করেন নি, নিপুণ মূর্তি জুড়েছেন যতটা ততটা চরিত্র গড়েন নি। গল্পের বিস্ময় বানাবার জন্যে তিনি যতটা উৎসাহী, জীবনের বিস্ময় সৃষ্টির জন্য ততটা উদ্যোগী নন। আশা করি, তাঁর পরবর্তী বইগুলিতে এ আক্ষেপের কারণ থাকবে না।

ননী ভৌমিক

আমার বাংলা। সম্পাদনা: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥ কলকাটা ইউথ ফোরাম॥ দাম চার আনা

বাঙলা দেশ ও বাঙালী সত্তার অস্তিত্বধ্বংসী সর্বনাশা চক্রান্তের প্রতিবাদে দৃঢ় উচ্চারিত কবিকণ্ঠ "আমার বাংলায়" সঙ্কলিত হয়েছে। 'আমার বাংলায়' লিখেছেন: রামনিধি গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি। দেশজোড়া প্রতিবাদ আন্দোলন যখন দুর্বার হয়ে উঠেছে তখন অনুরূপ সঙ্কলনের সত্যই ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে। সম্পাদকের আন্তরিকতার প্রতি কটাক্ষ না করেও আমরা বলব, সঙ্কলনের দায়িত্ব সামগ্রিক বাঙালী কবিসত্তার দেশপ্রেমিক রূপটি তুলে ধরা। খ্যাত, অখ্যাত—পুরোনো,

নতুন বহু কবির স্বাক্ষর না দেখে পাঠককে অবশ্যই মনে করে নিতে হবে যে সম্পাদকের অতিক্রুত সঙ্কলনের ব্যবস্থার জন্যই তাঁদের রচনা সংযোজন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও সংকলয়িতার আন্তরিকতাকে ধন্যবাদ জানাই। সংকলনে এমন কিছু কবিতা আছে যা পাঠককে তন্ময় করে তুলবে। নিধুবাবু, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, দেবন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কবিদের অতিপরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলি 'আমার বাংলায়' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া বিদ্যুৎ চমকের মতো চোখে পড়ে :

আমরা পতাকা এনেছি
ব্যথার কাপড়ে বেদনার স্থচে
ভালবাসা লাল রঙের স্থতোয় বুনেছি...

(দিনেশ দাশ)

কিংবা　　ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা

(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

আবার আত্মগত মন্ত্রোচ্চারণের মত শুনি :

আবার আসব ফিরে—পৃথিবীতে কত দৈব ঘটে
সমুদ্রমেখলা বাঙলা পর্বতে-প্রান্তরে-সমতটে
দূরে দূরান্তরে মাগো। কত ভালোবাসো
বুক ভেঙে যায়
আনন্দে বিষাদে বেদনায়।
কী মন্ত্র শেখায় দেখো আনন্দিত শালবীথি, বলে আশারাখো
জীবনের যত অসম্ভবে।
সব ছিল মন বলে, আবার আবার সব হবে ॥

(নরেশ গুহ)

যে বাঙলাদেশে কবি জীবনানন্দ "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়"—তারই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উচ্চারিত কবিকণ্ঠ :

আর আমি বাঙলার কবি,
পরান্নভোজীর পাপে, অশ্লীল লোভের বেষ্টনে

অবরুদ্ধ, তথাপি এ দুঃসাহস কবিত্বেই শ্রেয় বলে মানি—
এও তোমারই বাণী
হে বাঙলা আমার বাঙলা ॥

(বুদ্ধদেব বসু)

আমরা নিবিড় আগ্রহে হৃদয়ে ডেকে নিই। আমরা জেনেছি, সব কেড়ে নিলেও কী কী বড়বাবু কেড়ে নিতে পারবে না। আমার বাঙলার জীবিত-মৃত কবিদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বাঙলাদেশের দেশপ্রেমিক মানুষ জানাবে।

তরুণ সান্যাল

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

বাঙলার মাটি বাঙলার জলে একদিন যে সোনার ফসল ফলেছিল, অতীত থেকে সেই স্বর্ণবর্ণগুচ্ছ তুলে এনে আর একবার যদি বাঙালীর চোখের সামনে ধরা যায়, তাহলে কি হয়? হয়তো হয় না কিছুই—আমরা জাদুঘরের সিন্দুকের মধ্যেই হয়তো বাঙলার সংস্কৃতিকে তুলে রেখে দিই;—হিন্দী মহব্বতী গানা কিংবা ইংরিজি সুরের চুটকি গান নিয়ে স্টেডিয়ামে আসর জাঁকাই কিন্তু তবুও এরই মধ্যে নগরাভিমানী মনে সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে এক একবারও যে অস্বস্তিকর প্রশ্ন ওঠে শুধু এরই জন্যে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমরা ইংরিজি-শিক্ষার ফলে পূর্বাপর ভুলতে বসেছিলুম; আত্মাভিমানী বাঙালী সমাজে এরূপ ব্যক্তি অবিরল নন যাঁরা এখনো উনিশ-শতকী বাঙালী সংস্কৃতিকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন। বঙ্গ সংস্কৃতির উদ্যোগে পূর্ব-উনিশশতী সংস্কৃতির উৎস ও তার বিভিন্ন বিকাশের সঙ্গে জনগণকে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করা হচ্ছে। তবে এই প্রয়াস আরো ঐতিহাসিক দৃষ্টিপ্রসূত ও পারম্পর্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

সংস্কৃতির ও সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে আজকাল যখন নতুন উদ্যম পরিলক্ষিত হচ্ছে, তখন এই ঐতিহাসিক পারম্পর্য আশা করা অন্যায় নয়।

বহুবিধ অনুষ্ঠানের সমাবেশে এই যে মেলা—প্রত্যেকের রুচির সঙ্গে তাকে মেলানো সম্ভব না হলেও, উদ্যোগীরা অনুষ্ঠান নির্বাচনে আরেকটু সাবধানী হতে পারতেন।

যদি তাঁরা ছোটোখাটো দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠানগুলি নিজেরা দেখে, সর্বজনসমক্ষে সেগুলির প্রচার-যোগ্যতা বিচার করে নির্বাচন করে আনতে পারতেন তাহলে গত তিন বছরের অনুষ্ঠানে পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা কম থাকত; অবশ্য এক্ষেত্রে রুচিশীল ও সঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এগিয়ে এলে ভালো হয়। কেননা লোকসংস্কৃতির সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির প্রতি যে একটু অবিচার করা হয়েছে একথা বলতেই হয়। ঐগুলি এবার যেমন সংখ্যালঘিষ্ঠ তেমনি আবার অন্যান্য অনুষ্ঠানের চাপে যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ।

স্মৃতি হাতড়ে তবুও কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের আলোচনায় আসা যাক যেগুলি মনোজ্ঞ ও সংস্কৃতির চর্চায় অপরিহার্য। প্রথমে ধরা যাক তারাপদ লাহিড়ী সম্প্রদায়ের গম্ভীরা গানের কথা।

গম্ভীরের অর্থ শিব। বৈদিক সংহারের রুদ্রদেব কালের পরিবর্তনে কখন একান্ত ঘরোয়া হয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে ঘিরে "বড়ো তামাসা, ছোটো তামাসা'—কখনো বা দৈনন্দিনের দুঃখদুর্দশার কথা শোনাচ্ছে। "গম্ভীরা" গানের রচয়িতা কোনো কোনো কবি ভারত স্বাধীন হলে শিবকে যোড়শোপচার পুজো দেবেন এমন কথাও জানিয়েছেন। এই ভাবে প্রচলিত হয়েছে শিবের গাজন। শিবায়ন কাব্যে শিবের এমনি মানবিক রূপ ধরা পড়ে যেখানে আদর্শ কৃষক শিব ভৃত্য ভীমকে নিয়ে মাঠে লাঙল দিচ্ছেন।

প্রাচীন বাঙলা গানের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে ভালো লেগেছে কালিপদ পাঠকের টপ্পা। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যে খানসাহেব আবদুল করিমের গানে পাঞ্জাবী টপ্পার একেকটি কাজ শ্রোতাদের কি রকম মাতিয়ে তুলত।

সুনীল পালের পরিকল্পনায় জরির-ঝালর-দোলানো দরবারী সঙ্গীতের আসরে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সারারাত জেগেছি। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহারে ধামার শুনলাম। ঐ সুরেই গাওয়া ভানুসিংহের পদাবলী তাঁর

গাইবার ভঙ্গিতে অপূর্ব লাগল। তারাপদ চক্রবর্তীর দরবারী কানাড়া বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। কিন্তু তান-লয়ের কিছুটা নৈপুণ্য দেখেই ফিরে আসতে হল—দরবারী মেজাজই এল না।

ঐদিনের আসরে তারের বাজনাই হয়েছিল সর্বোৎকৃষ্ট। আলাউদ্দিন ঘরানার নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারে ও আলি আকবর স্বরোদে শ্রোতাদের পরিশ্রমকে সার্থক করেছেন। আমার এক একবার মনে হয় আলি আকবর, রবিশঙ্কর আজকাল সচরাচর যে মিশ্ররাগ বাজিয়ে থাকেন তা বোধহয় দ্বৈত যন্ত্রানুষ্ঠানে আরো জমাট শোনায়; আলাদা আলাদা ভাবে বিলায়েতের বাজনা এবং রবিশঙ্কর ও আলি আকবরকে বাজাতে শুনলে হয়তো অনেকেরই একথা মনে হবে। পোলিশ সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে ভারত পরিভ্রমণরত পোলিশ বেহালা-বাদকের বাহারে বাজানো রবীন্দ্রসঙ্গীত সেদিন দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপীয় হার্মনিতে অভ্যস্ত হাতে সেদিন ভারতীয় মেলডির যে সঞ্চার হয়েছিল তাতে জড়তার লেশমাত্র ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বেশ ভালো লাগলেও টপ্পার কাজওয়ালা কোন গান সেদিন তার কণ্ঠে শুনলাম না, এটা দুঃখের বিষয়। বহুদিন আগে তাঁর কণ্ঠে গীত 'আজি যে রজনী যায়' মনে আছে বলেই সেদিন এ আক্ষেপ জেগেছিল।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য এবার বিশেষ জমেনি। এর একটা কারণ বোধহয় যথেষ্ট রিহার্সালের অভাব। সখীদের সমবেত নৃত্যেই এটা বারকয়েক প্রকট হয়ে উঠেছে। শ্যামার ভূমিকায় উমা গান্ধী- প্রতিশ্রুতিশীল অভিনয় করেছেন। কোটালের ভূমিকায় উইলসনও উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী কণিকা ও শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠের জন্যই কোনরকমে উৎরে গেছে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমতী সেবার নৈপুণ্য একবার স্মরণ করি।

বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ একদিন শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুভ্রশির যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কাছে বঙ্গভাষা-ভাষীর ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁরা বহুদিনের প্রাপ্য সম্মান লাভ করায় উদ্যোগীরা আমাদেরও কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন।

এই উপলক্ষ্যে একদিন একটি সাহিত্যসভারও আয়োজন করা হয়েছিল শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে। রথীন্দ্র রায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, শিবনারায়ণ রায় ও গোপাল হালদার এই চারজন সাহিত্যবিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। সাহিত্যের আসরে হঠাৎ রম্যরচনা জাঁকিয়ে বসে আজকে নির্মল জলকে যে কতখানি ঘোলা করে তুলেছে—যার ফলে লোকে গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেও ভুলে যাচ্ছে—চারজন বক্তাই এবিষয়ে সকলকে অবহিত হতে বললেন। ব্যাপারটা সত্যি ভেবে দেখবার মত। যে আমরা সাহিত্যে জর্নালিজ্‌ম্‌ দেখে মর্মান্তিক ক্ষেপে যাই, সেই আমরাই এই জর্নালিজ্‌ম্‌-মার্কা রম্যরচনা নিয়ে কবৃছর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলে হৈ-হৈ করি তার চেয়ে লজ্জা আর পরিতাপের বিষয় কি আর কিছু আছে!

জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন ষোড়শ শতকে নবজাগ্রত মানবতাবাদের স্পর্শে বাঙলা সাহিত্যে যেমন জোয়ার এসেছিল—বিশ শতকের সাহিত্যের উৎসও হয়তো তাতেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

গোপাল হালদার বলেছিলেন যে ভারী শিল্পের উন্নতির ফলে হয়তো এক নতুন সমাজের পত্তন হবে। আগামী কালের সাহিত্য রচিত হবে তাদের নিয়ে। চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত নায়কের পরিবর্তে, আধুনিক কথাশিল্পীদের গল্পে-উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণীসম্ভূত নায়ক নিয়েও সার্থক কাহিনী রচিত হয়েছে।

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই পর্যায়ের আলোচনায় শিবনারায়ণ রায় প্রশ্ন তুলেছিলেন—রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি আমাদের দেশে যে যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা হয়েছে তার উত্তরাধিকার হারিয়ে আমরা কি আজ রামকৃষ্ণ ভজনা করবো? বলাই বাহুল্য, কোন কোন সাহিত্যিক ও সিনেমা-সেবীর ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ী উদ্যমের প্রতিই তাঁর এই যুক্তিসঙ্গত কটাক্ষ।

সুবোধ সেনগুপ্ত "বিশুদ্ধ আর্টের নীতির" স্বপক্ষে কিছু অতিভাষণ করে তাঁর অভিভাষণ শেষ করেন।

"বিশুদ্ধ আর্টের" এই অর্বাচীন নীতির (যার জন্ম একশো বছরের বেশি নয়) অসারতা নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে—এ নিয়ে এখানে নতুন প্রবন্ধ ফাঁদবার বাসনা আমার নেই। সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন কিনা এবিষয়ে

সুবোধবাবু সেদিন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সন্দেহের উত্তরে বলা যায় শুধু প্রতিফলন নয় সাহিত্য জীবনের মন্তব্যও।

সুবোধবাবু কোলরিজ ও হুইটম্যানের কৈবল্যসিদ্ধিকে একই শ্রেণী ও পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন এটাও মারাত্মক। 'ক্রিষ্টাবেলের' ভূতুড়ে রোমাঞ্চকর আবহ সৃষ্টিতে মহা কবিত্ব না মহৎ কবিত্ব রয়েছে বিশ্বাসে ও গভীর ভালবাসায় উদ্দীপিত হুইটম্যানের মানবপ্রেমের কাব্যে সে কথা তাঁকে বোঝাতে চাই না, তবু ভেবে দেখতে বলি যে বহু বছরের ধুলোঝড় পেরিয়ে আজও ঐ দুটির কোনটির প্রভাব মানুষের মনে অধিকতর স্থায়ী এবং কোনটির আবেদন এখনো মানুষের মনে সজীব; মহৎ কাব্য বিচারের এটিও অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে চারটি নাটকের অভিনয় এবারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

'সধবার একাদশী' 'বাঙলার মাটি' 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রেঁা' এবং 'মাইকেল মধুসূদন' এই চারটি নাটকই মোটামুটি সুঅভিনীত ও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

শিশির ভাদুড়ীকে এই প্রথম বোধহয় মঞ্চের বাইরে সাধারণ দর্শক ঘনিষ্ঠ ভাবে পেল। অসংখ্য দর্শকের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেদিন 'সধবার একাদশী' দেখেছি। শিশিরবাবুর বিস্ময়কর অভিনয় দেখে আমার আগের ধারণা বদ্ধমূল হল—এখনো পর্যন্ত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'ই বাঙলা দেশের সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক।

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কলকাতায় দ্বিতীয় নাট্যোৎসব

গত ১৭ই মার্চ্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত সাতদিন নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে হুমায়ুন থিয়েটার্স ও ক্যালকাটা থিয়েটার সেন্টারের যুগ্ম প্রযোজনায় ও পরিচালনায় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল। এত বড় একটা সম্মেলনের গুরু দায়িত্ব নিতে গেলে নিন্দা প্রশংসা দুইই সমান ভাবে কুড়োতে হয়, তবু উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যের সততার জন্য এঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গত বছর মার্চ-এপ্রিলে এঁদের প্রযোজিত প্রথম নাট্যোৎসব ও একাঙ্ক নাটিকা প্রতিযোগিতা নাট্যআন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশময় বিরাট সাড়া জাগিয়েছিল। গতবছরের কার্যক্রমে বাঙলা আর হিন্দী নাটকেরই স্থান ছিল কিন্তু এবারে বাঙলা আর হিন্দী ছাড়াও গুজরাটী, তেলেগু ও ইংরাজী নাটকও স্থান পেয়েছে।

গল্প, কবিতা বা উপন্যাস থেকে নাটক কিছুটা স্বতন্ত্র—বরং গল্প-কবিতা বা উপন্যাসের কংক্রিটাইজড্ ফর্ম হল নাটক। তাই ভাষা এক না হলেও রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে ভাষার বৈষম্য খুব একটা দুরতিক্রম্য বাধা নয়। এর প্রমাণ পাওয়া গেল তেলেগু 'দেবলাদেবী' আর গুজরাটী নাটক 'সন্ধ্যা দীপিকা' থেকে।

উৎসবের উদ্বোধনে অধ্যাপক হুমায়ূন কবির উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁদের "ভারতীয়" মনোভাবের জন্য। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও সেই এক কথাই বলেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় নাটককে এক জায়গায় জড়ো করে তার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়ার এই যে প্রচেষ্টা এ বস্তুতই প্রশংসনীয়।

এখানে কিন্তু একটু খুঁত রয়ে গেল। মারাঠী আর ওড়িয়া নাটক বাদ না গেলে এ অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহসংগীত ও সামগ্রিক পরিচালনা —সব দিক থেকে বিচার করলে এ যজ্ঞে রাজচক্রবর্তীর সম্মান দিতে হয় "বহুরূপী" সম্প্রদায়কে তাঁদের "রক্তকরবী" নাটকের জন্য। অভিনয়ের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নোতুন রূপ সৃষ্টি করেছিলেন একদিন নাট্যাচার্য আর সেই পথেই চলছিল এতদিন বাঙলার মঞ্চাভিনয়; কিন্তু তাঁর পরেই অভিনয়ের নোতুনতম আঙ্গিক সৃষ্টি করলেন প্রয়োগবিদ্ শম্ভু মিত্র। আমি কেবল তাঁর রাজার চরিত্রাভিনয়ের কথাই বলছি না কেননা ও চরিত্র অভিনয় সম্বন্ধে তাঁকে সমালোচনা করা যায় না—তিনি অনন্য; আমি বলছি তাঁর প্রয়োগ-কুশলতার কথা।

কিছুদিন আগে এক বক্তৃতায় তেনজিং বলেছিলেন পর্বত অভিযান মানে rope work। একজনের বিশ্বাসঘাতকতা মানে সকলের বিনাশ। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও যে এই rope work মস্ত কথা এর প্রমাণ দিলেন বহুরূপী-সভ্যরা

তাঁদের সামগ্রিক অভিনয়ে আর প্রমাণ দিলেন Dramatic Club of Calcutta ডোনাল্ড্ বার্নেট্-এর পরিচালনায় Dial M for Murder নাটকে। যূথভ্রষ্ট হয়ে শুধু নিজেকে প্রদর্শন করার প্রবৃত্তি এঁদের কারোর মধ্যেই দেখা যায় নি।

Dial M for Murder নাটকখানি সম্প্রতি লণ্ডনে খুব নাম করেছে। নাম এঁরাও করলেন। মঞ্চে যাঁদের দেখলাম তাঁদের নামও কোনোদিন শুনিনি। কিন্তু অভিনয়-চাতুর্যে আর শিল্প-নিষ্ঠায় এঁরা সেদিন দর্শক সাধারণের মন হরণ করে নিলেন। এ নাটকের বহুল অভিনয় হওয়া উচিত।

এর পরেই বলবো জাতীয় নাট্য পরিষদের "ক্ষুধিত পাষাণ"এর কথা। রোমান্টিক ভাবকল্পনাই এ গল্পের প্রাণরস। এ গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়ার মধ্যে তরুণ রায়ের বাহাদুরি আছে। তাঁর সৎসাহসেরও প্রশংসা করি, কিন্তু তিনি এর প্রাণরসের সন্ধান পান নি। অভিনয়ে একমাত্র মেহের আলি ছাড়া আর কেউ তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। খাঁ সাহেব ধ্রুব গুপ্ত কিছুটা ঐতিহাসিক। যথেষ্ট Stage free হওয়া সত্ত্বেও নায়ক তরুণ রায় নিরাশ করেছেন। নাচ অত্যন্ত মামুলী ধরনের। নাটকের সঙ্গে নাচ মেশেনি। নাটকের সঙ্গে নাচের যেটুকু সংশ্রব তা, কেবল মেহের আলিকে পাগল করা নাচখানি—নাটকের ঐ অংশটুকু সত্যিই মনে রাখবার মত। আলোকসম্পাত নিখুঁত নয় বরং দুষ্ট। এ নাটকে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি করার পক্ষে আলোকসম্পাত বড় একটা ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু দেখা গেল, আলোর খেলায় একটু রোমাঞ্চকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও ছন্দটা সব সময় বজায় থাকে নি। দপ করে একটা লাল আলো কোথা থেকে এসে তাল কেটে দিয়েছে। কুশলী আলোকশিল্পী তাপস সেনের কাছে এমনটা আশা করি নি।

"হাম্ হিন্দুস্থানী হ্যায়" আর হিন্দী "বিজয়া" আমি দেখে উঠতে পারিনি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না।

গুজরাট সাহিত্যমণ্ডল প্রযোজিত "সন্ধ্যা দীপিকা" বেশ ভালো লাগল। ঝকঝকে তকতকে একখানি নাটক। পরিষ্কার মঞ্চসজ্জা। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে গুজরাট সাহিত্য মণ্ডল পিছিয়ে নেই—এটা মনে মস্ত আশার সঞ্চার করল।

বহু অভিনীত বাংলা "দেবলাদেবী"কে তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করেছেন শ্রী জি-ভি-রাও। ভাষা না বুঝলেও নাটকখানিকে জানি। জি-ভি রাওয়ের বাঙলা-সাহিত্য-প্রীতি প্রশংসনীয়। অভিনয়ে কাফুরের ভিলেনী বেশ ফুটেছে। খিজির শুধু বীর আর উদার নন, প্রেমিকও। খিজিরের অভিনয়ে কাব্য যেন একটু কম ফুটেছে বলে মনে হল।

আমাদের দেশে ভাদুরে ক্লাব বলে এক রকমের ক্লাব আছে। এরা সাধারণত ভাদ্রমাসের বর্ষার দিনে ব্যাঙের ছাতার মত গজায়। উদ্দেশ্য—বই ধর হে বই ধর, পুজোয় নামানো চাই। পুজোর পর এদের আর পাত্তা মেলে না। নাট্য উৎসবে বহুরূপী বা জাতীয় নাট্য-পরিষদ কিংবা ক্যালকাটা ড্রামাটিক ক্লাব ছাড়া আর যাঁরা দুখানা বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাঁরাও ওই অনেকটা ভাদুরে দলের। আমি 'মিশরকুমারী" আর "চক্রান্ত"র কথা বলছি।

"মিশরকুমারী" নাটক অভিনয়ের প্রয়োজন আজ নিশ্চয়ই আছে, বরং আগের চেয়ে বেশী করে আছে। কেননা ডেমোক্রেসির যুগে আজও "কালার বার" থাকে কেন? এই কালার বার আজ শুধু মাত্র বিশেষ দেশেই প্রচলিত নয় —এ সর্ব দেশেই এর রথচক্র চালাচ্ছে—বিভিন্ন রূপে। কোথাও গায়ের রং, কোথাও পোশাকের রং, কোথাও বা আবার পকেটের রঙ, বড় হয়ে উঠছে। সামন্দেশের আক্ষেপ, "বিশ্বের দেবতা আমন দেব, কেন, কেন তুমি এই কাফ্রী জাতটাকে সৃষ্টি করেছিলে" আজও শোনা যায় না তা নয়। অবশেষে এও দেখা যায় আবন-সামন্দেশ নিকটাত্মীয়। এইখানেই সামন্দেশের ট্র্যাজেডি। এই পুরোনো দিকে নোতুন পাত্রে পরিবেশন করার একটা বিরাট সুযোগ রয়েছে না কি? সান্ধ্য বাসরের পরিচালক ছবি বিশ্বাস এ দিকটা কি ভেবে দেখেছিলেন? ওঁদের অভিনয় সম্বন্ধে যত কম বলা হয় ততই ভালো, কেননা প্রম্প্টার একাই সকলকে টেনে নিয়ে গেছেন—তাই নিন্দা প্রশংসা যা-কিছু সবই ওই প্রম্পটারেরই প্রাপ্য। কিন্তু এ প্রহসন কেন? লিট্‌ল থিয়েটার বিনা প্রম্পটে অভিনয় করে—বহুরূপী করে—আরও দু-চারটা সম্প্রদায়কে জানি যাঁরা প্রম্পটারকে বাদ দেওয়ার জন্য চেষ্টিত। মার্কিন মুল্লুকে গিয়ে শিশিরকুমারকেও এ দুর্নামের ভাগী হতে হয়েছিল—শুনেছি স্বর্গীয়া প্রভাদেবীর মুখে। উইংস-এর দুপাশে দুজন প্রম্পটারকে

বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওঁরা নাকি মন্তব্য করেছিলেন—They do not know their lines. Are they are actors, strange ! প্রম্পটার নামধারী ওই তুইজন ভদ্রলোককে তাই বাদ দিতে হবে—নবনাট্য আন্দোলনের এ একটি প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত।

শেষ দিনের অনুষ্ঠান ছিল ধীরাজ ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত "চক্রান্ত" নামক রহস্যমূলক নাটক। Dial M for Murderও রহস্য মূলক নাটক। কিন্তু কি অভিনয়ে কি আঙ্গিকে কি প্রয়োগকৌশলে তুয়ে কি তফাত। এঁদের অভিনয়ে নিবেদিতা দাস ও বনানী চৌধুরীর নাম করতে হয় আগে। ধীরাজবাবুর সেই এক ধরনের "মার্কা-মারা" অভিনয় পালটাবার দিন এসেছে। তবু ধীরাজবাবুকে অভিনন্দন জানাই। তিনি নিজে যেমন অভিনয়ই করুন না কেন একটা দলকে চালাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। আজকের এই নাটকের তুর্দিনে নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা এঁদের স্বাগত জানাই। দরকার তো ছিল এঁদেরই এগিয়ে এসে আন্দোলনের সব ভার কাঁধে তুলে নেওয়া। এঁরা পেশাদার শিল্পী, অভিনয়ের সঙ্গে এদের অন্নবস্ত্রের যোগসূত্র রয়েছে। আর শিল্প যদি মার খেয়ে যায় শিল্পী বাঁচে কি করে?

সপ্তাহব্যাপী নাট্য-উৎসব শেষ হল। অনেককে দেখলাম। দেশের তাবৎ জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হল এ কদিন ধরে নিউ এম্পায়ারে। অভিনয় আরম্ভ হবার আগে বিশেষজ্ঞরা সারগর্ভ বক্তৃতাও দিলেন। সবই হল কিন্তু আমাদের দেশের অভিনয়কে যিনি নতুন রূপ দিয়েছেন সেই নাট্যাচার্যের দেখা পেলাম না কেন? নটশ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী থিয়েটার সেন্টারের একজন কর্মকর্তা। আশার কথা। সাল-তামামীর আগেই সব ঝেড়ে ফেলে তিনি রক্তকরবীর রাজার মতোই বেরিয়ে এসেছেন। তাঁকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই।

কিন্তু নাট্যাচার্য কি আজও ছিন্ন পাতার তরণী সাজিয়ে একা একাই খেলা করবেন?

অমরেন্দ্র পাঠক

সাহেব-বিবি-গোলাম

কলকাতার কয়েকটি চিত্রগৃহে একযোগে 'সাহেব বিবি গোলাম, দেখানো হচ্ছে। বিমল মিত্র রচিত বহু-আলোচিত এবং বহু-পঠিত সুবৃহৎ উপন্যাসের এটি চিত্ররূপ। জনপ্রিয় কাহিনীর সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কুশলী কারুকর্মীদের সমন্বয় ঘটায় সাহেব-বিবি-গোলাম দর্শক-সাধারণের কৌতূহল জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছে। মানতেই হয় কি অভিনয়ে কি গঠন-কৌশলে ছবিটি অনেক পরিমাণেই চিত্রামোদীদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পেরেছে।

চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে উপন্যাসটিকে অনেক কাট-ছাট করতে হয়েছে। তাতে বরং ফল ভালোই হয়েছে। বিমল মিত্রের উপন্যাসটি রচনা হিসাবে ঢিলেঢালা, অনর্থক দীর্ঘায়ত। সেদিক থেকে কাটছাট কাহিনীকে ঘনীভূত করতেই সাহায্য করেছে।

কলকাতার বনেদী বংশ চৌধুরী পরিবারের উত্থান-পতনের কাহিনী হলেও সাহেব-বিবি-গোলাম-এর মুখ্য চরিত্র দুই নারী—একজন চৌধুরী বাড়ির ছোট গিন্নি পটেশ্বরী, অন্যজন জবা—আলোকপ্রাপ্তা ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে ভূতনাথ চক্রবর্তীর ওরফে অতুল চক্রবর্তীর জবানিতে। যদি কাউকে নায়ক বলে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে ভূতনাথই এ কাহিনীর নায়ক—পটেশ্বরী এবং জবার স্নেহ ও ভালবাসার টানাপোড়েনে যার হৃদয় দ্বিধা-বিভক্ত। ছবিতে অবশ্য একমাত্র পোশাক ছাড়া জবাকে আলোকপ্রাপ্তা বলে চেনা যায় না—সেটা অভিনয়ের দোষ নয়—কাহিনীরই দোষ। তাছাড়া, জবা এবং ভূতনাথ কেন যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হবে—তারও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা কারণের ইঙ্গিত অবশ্য আছে—তা হচ্ছে, নিতান্ত শিশুকালে তাদের উভয়ের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের উভয়ের পরিচয়ই উভয়ের কাছেই অজ্ঞাত আর মন্ত্রশক্তির উপর অতটা আস্থা স্থাপন করা আজকালকার যুগে দুষ্কর। পটেশ্বরী তথাকথিত সতী-সাবিত্রী গোষ্ঠীর অন্যতমা—যাঁরা চলচ্ছক্তিরহিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে বহন করে বারবণিতালয়ে পৌছে দিয়ে আসতে দ্বিধা করে না। পটেশ্বরী স্বামীর জন্যে মদ্যপান করে, বারবণিতার মতো গান গেয়ে স্বামীর চিত্ত বিনোদন করার চেষ্টা করে—যদি স্বামীকে ঘরে রাখা যায়। কেননা চৌধুরী বাড়ির দস্তরই এই যে, পুরুষেরা রাত্রে বাড়ির বাইরে কাটাবে—মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে।

সাহেব-বিবি-গোলামের এই হচ্ছে মূল চরিত্র। এ ছাড়া আর যারা আছে (এবং তারা রীতিমত একটা ভিড়) কাহিনীর গতিতে তাদের অংশ সামান্যই। তারা অলঙ্করণ মাত্র। অবশ্য অভিনয় এরা প্রায় সকলেই ভালো করেছেন।

কিন্তু এ-গুলি গৌণ সমালোচনা।

সাহেব-বিবি-গোলামকে বলা হয়েছে যুগ-উপন্যাস (Period Novel)। আমার সমালোচনার মুখ্য বিষয় হচ্ছে এই যে—এই উপন্যাস এবং সেই কারণেই চিত্ররূপে—যুগসত্য প্রতিফলিত হয় নি, যা কিনা যুগ-উপন্যাসের মূল লক্ষণ। কাহিনীর পটভূমি—ঊনবিংশ শতাব্দী, বাংলার ইতিহাসে যা নব-জাগৃতির যুগ বলে চিহ্নিত। এই যুগের মূলসত্য এই যে, একদিকে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিলোপ ঘটছে আর তারই ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠছে নতুন উদারনৈতিক মূল্যবোধ।

বিমলবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীকে পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করলেও কাহিনী ও পটভূমির মধ্যে সমন্বয় করতে পারেন নি। ফলে কাহিনী যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়েছে এবং যবনিকা টানার প্রয়োজনে পটেশ্বরীর নাটকীয় অপহরণ ও হত্যার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর এই কারণেই এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে এদের কার্যকলাপ অনেক সময় কৌতূহল জাগ্রত করতে সক্ষম হলেও এদের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হওয়া যায় না।

অবশ্য এ-সব কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে, এ কথাও বলতে হয়ে বিমল বাবু—বাংলা উপন্যাস-জগতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন—এবং চলচ্চিত্র হিসাবে সাহেব-বিবি-গোলামও তা পেরেছে।

পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় স্বজনশীল প্রতিভার পরিচয় না দিতে পারলেও—দুর্লভ-দক্ষতার পরিচয় নিশ্চয়ই দিয়েছেন। পরিচালনার গুণেই ছবিটি শেষ পর্যন্ত দর্শকদের টেনে রাখে। অভিনয়ে সুমিত্রা দেবী স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি উত্তমকুমারও উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন। তাছাড়া, ছবি বিশ্বাস, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন, শ্যাম লাহা প্রমুখও ভালো অভিনয় করেছেন।

শচীন বসু

পরিচয়

বৈশাখ, ১৩৬৩

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আধুনিক বিদ্বানমহলে গভীর মতবিরোধ আছে। একটা মত হল, গৌতম ছিলেন নিপীড়িত মানুষদের প্রতিনিধি, আদিপর্বে বৌদ্ধধর্ম তাই এক বিপুল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। অপর মতে, গৌতম ছিলেন দীনহীনের প্রতি উদাসীন—তাঁর আসল সম্পর্ক ধনী এবং অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গেই।

মত দুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু প্রথম মতের সঙ্গে রিস্‌-ডেভিড্‌স্‌ এবং দ্বিতীয় মতের সঙ্গে ওলডেনবার্গ-এর নাম জড়িত। বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ হিসেবে উভয়েই এতখানি শ্রদ্ধেয় যে কারুর কথাই আমরা অসংকোচে অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আমরা দেখাবার চেষ্টা করব, এই মতবিরোধের মূল কারণ বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি-বিষয়ে কোনো পক্ষেরই জ্ঞানের অভাব নয়। কিন্তু উভয়পক্ষই প্রাচীন-সমাজ-সংক্রান্ত সাধারণ-ভাবে-জানতে-পারা তথ্যের প্রতি উদাসীন: এ-বিষয়ে মর্গানের গবেষণা আধুনিক বিদ্বানমহলে উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি, ফলে আদিম-সাম্যবাদের ধারণাটুকুই অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট—এমনকি অজ্ঞাত বা অস্বীকৃত।

আমাদের যুক্তি হবে, প্রাচীন সমাজকে সম্যকভাবে চেনবার ভিত্তিতে আমরা যদি পুরোনো পুঁথিপত্রর তথ্যগুলি বিচার করতে সম্মত হই তাহলে তার উপর নতুন আলোকপাত হতে পারে।

॥ ১ ॥

প্রথমে দেখা যাক আধুনিক বিদ্বানমহলে এ-বিষয়ে মতবিরোধটা কত গভীর।

কোনো কোনো বিদ্বান মনে করেন, গৌতম ছিলেন "সার্থক রাজনৈতিক সংস্কারক। দীনহীনের পক্ষ নিয়ে তিনি ধনী ও আভিজাত্যিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং জাতিভেদ নির্মূল করবার আয়োজন করেছিলেন।"

এই মতের সমর্থনে নানা রকম তথ্যর সমর্থন দেখানো যায়।

শ্রমণদের উপদেশ দিয়ে গৌতম বলেছেন, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি মহানদীগুলি যতই পৃথক হোক না কেন মহাসমুদ্রে প্রবেশের পর সেগুলি তাদের পুরোনো নাম এবং পুরোনো উৎসর স্বাতন্ত্র্য হারায়,—তখন তাদের একমাত্র নাম হয় মহাসমুদ্র,—তেমনই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের মানুষ যখন ধর্ম ও সঙ্ঘর শরণ নেয় তখন তারাও তাদের পুরোনো নাম এবং পুরোনো বংশ-পরিচয় হারিয়ে শাক্য-পুত্রর অনুগামী শ্রমণ হিসেবে একমাত্র পরিচয় পায়।

গৌতমের সঙ্গে রাজা অজাতশত্রুর একটি কথোপকথনের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার একমাত্র তাৎপর্য হল সঙ্ঘের কাসাব-বসনের সামনে রাজা ও দাসের পার্থক্য বিলীন হয়। অজাতশত্রুকে গৌতম প্রশ্ন করেছেন, আপনার কোনো ভৃত্য বা দাস যদি সঙ্ঘের কাসাব-বসন গ্রহণ করে তাহলে কি তারপরও আপনি তার কাছে পূর্বের মতো ভৃত্য বা দাসের ব্যবহার আশা করবেন? অজাতশত্রু বলছেন, তা নয়; তখন আমি তার কাছে নত হব, ইত্যাদি।

বুদ্ধ জনগণের উদ্দেশ্যেই বাণী প্রচার করেছিলেন। আর এই কারণেই দেখা যায় তাঁর সঙ্ঘর মধ্যে হীনযোনি বা হীনজাতির অনেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছেন। উপালি ছিলেন নাপিত, সুনীত পুক্কুস নামের হীনজাতির মানুষ, সাতি জেলেদের সন্তান, নন্দ গোয়ালা, পন্থকদ্বয়ের জন্ম এক উচ্চবর্ণের নারীর গর্ভে কিন্তু ক্রীতদাসের ঔরসে; চাপা ছিলেন

ব্যাধের মেয়ে, পুণ্ণা ও পুণ্ণিকা দাসীকন্যা, সুমঙ্গলমাতা চাটাইকারদের কন্যা, সুভা কামারের মেয়ে। রিস্ ডেভিডস্ এই দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এ-জাতীয় আরো বহু দৃষ্টান্তর উল্লেখ করা সম্ভব। তাঁর ধারণায়, তখনকার বাস্তব সমাজে হীনজাতি এবং হীনবৃত্তি মানুষের যে-অনুপাত ছিল বৌদ্ধসঙ্ঘর মধ্যেও মোটের উপর সেই রকমই অনুপাত। এবং এইজাতীয় দৃষ্টান্তর উপর নির্ভর করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, বুদ্ধ তাঁর নিজের সঙ্ঘর মধ্যে —এবং এই সঙ্ঘর উপরই-তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল—জন্মগত ও শ্রেণীগত সমস্ত বাধাবিঘ্নকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপরপক্ষে, ওলডেনবার্গ-এর মন্তব্য কী রকম তীক্ষ্ণ তাই দেখা যাক। "কেউ যদি বৌদ্ধধর্মর গণতান্ত্রিক দিকের কথা বলতে চান তাহলে তাঁর পক্ষে মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয় জীবনকে কোনোভাবে সংস্কার করবার উৎসাহের সঙ্গে···এই সঙ্ঘর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে ভারতবর্ষে সামাজিক অভ্যুত্থান ধরনের কোনো কিছুই ঘটেনি।···রাষ্ট্র ও সমাজ যেমন আছে তেমনই থাকুক। যাঁরা ধর্মের শরণ নিয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন তাঁদের পক্ষে পৃথিবীর দুঃখদুর্দশা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যারা সংসারে রইল তাদের জীবনে জাতিভেদের নিয়ম-কানুনের জন্যে যা-দুঃখকষ্ট তা দূর করা বা কমাবার জন্য নিজের প্রভাবকে প্রয়োগ করবার কথা বুদ্ধের কাছে কখনোই উদিত হয় না।"

সঙ্ঘর নেতারা প্রধানতই ধনী ও অভিজাত বংশের মানুষ। যে-দুজন সব প্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা উভয়েই শ্রেষ্ঠী, তারপর উল্লেখযোগ্য নাম পাওয়া যায় কাশীর এক অত্যন্ত ধনী পরিবারের এবং সেই ধনী পরিবারটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ধনী ও সম্ভ্রান্তদের। তারপর উরুবিল্বয় অলৌকিক শক্তির প্রতাপ প্রদর্শন করে বুদ্ধ কাশ্যপ বংশের ব্রাহ্মণদের মন জয় করেন। উরুবিল্ব থেকে রাজগৃহ—সেখানে মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধকে প্রণতি জানান। এই রাজগৃহতেই সারিপুত্ত এবং মোগ্গলান—দুজনেই ব্রাহ্মণ—বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই হল প্রথম দিককার কিছু কিছু শিষ্যের নমুনা আর এঁরা সকলেই বণিক, ব্রাহ্মণ বা রাজা।

এর সঙ্গে মগধ রাজ্যের সাধারণ মানুষদের মনোভাবটা তুলনা করা যায়। তখন মগধের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে।

ফলে জনসাধারণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট—তারা কানাকানি করে, রেগে যায়, বলে, সন্ন্যাসী গৌতম আমাদের সন্তানহীন করতে এসেছে, সন্ন্যাসী গৌতম আমাদের বৈধব্য এনেছে, সন্ন্যাসী গৌতম আমাদের ঘর ভাঙতে এসেছে। —গণআন্দোলনের নেতার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই এ-রকম হয় না।

তাছাড়া, শ্রদ্ধার অর্ঘ হিসাবে রাজা এবং শ্রেষ্ঠীরা বুদ্ধের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন তার কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না। রাজা বিম্বিসার বেনুবন বলে তাঁর নিজের প্রমোদ-উদ্যান বুদ্ধকে উপহার দেন, অনাথপিণ্ডদ নামের অসামান্য ধনী শ্রেষ্ঠী উপহার দেন জেতবন বলে প্রমোদ-উদ্যান। এই প্রমোদ-উদ্যান আগে ছিল এক রাজপুত্রের। অনাথপিণ্ডদ এটি বুদ্ধকে উপহার দেবার জন্য কিনতে চান, কিন্তু রাজপুত্র বিক্রি করতে রাজি নন। অনেক দরাদরি হয়, এবং শেষ পর্যন্ত দর ঠিক হয়, পুরো প্রমোদ-উদ্যানটিকে ঢেকে ফেলার জন্যে যত স্বর্ণমুদ্রা লাগবে—তাই। মূল্য খুব কম নয়।

সঙ্ঘে প্রবেশ করবার অধিকার-সংক্রান্ত কতকগুলি নিয়মের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেমন, পলাতক ক্রীতদাস সঙ্ঘে প্রবেশ করতে পারবে না, পলাতক সৈনিকেরও সে-অধিকার নেই। এইজাতীয় নিয়ম থেকেও বোঝা যায় বুদ্ধ কায়েমী স্বার্থের খুব বেশি বিরোধিতা করতে রাজি হননি।

॥ ২ ॥

দুটি বিরুদ্ধ-মতের উল্লেখ করা গেল। বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে প্রথম মতটির সমর্থনে আরো যুক্তি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়তো কঠিন নয় এবং দ্বিতীয় মতটির বিরুদ্ধে হয়তো তর্ক করে বলা যায় যে, যে-তথ্যের ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত তার প্রকৃত তাৎপর্য অন্য রকম হতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা ঐ মতবিরোধের মীমাংসা করবার চেষ্টা করব না। কেননা, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম সত্যিই গণতান্ত্রিক ছিল কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আরো মৌলিক একটি প্রশ্নের উত্তর আগে পাওয়া দরকার।

গৌতম বুদ্ধ আধুনিক পৃথিবীর মানুষ নন। তাই আধুনিক পৃথিবীতে

আমরা গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি বুদ্ধের সময়েও যে তাইই বোঝাত একথা কল্পনা করবার কারণ নেই। আদিপর্বের বৌদ্ধধর্ম সত্যিই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল কিনা—এ-প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে আরো দুটি প্রশ্ন তোলা দরকার।

এক : তখনকার পৃথিবীতে গণতন্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝানো সম্ভবপর ছিল? কিংবা গৌতম বুদ্ধর পক্ষে গণতন্ত্র হিসেবে ঠিক কোন্ ধরনের সংগঠনকে চেনা সম্ভব ছিল?

দুই : গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে বুদ্ধর পক্ষে একমাত্র যে-জাতীয় সংগঠনকে চেনা সম্ভব, তার প্রতি তাঁর প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম ছিল?

আমরা এই দুটি প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

এক : প্রাচীন পৃথিবীতে গণতন্ত্রর একমাত্র যে-রূপটির পরিচয় সম্ভবপর তাহল তথাকথিত ট্রাইব্যাল গণতন্ত্র। 'তথাকথিত' শব্দ ব্যবহার করছি, তার কারণ আধুনিক যুগে আমরা গণতন্ত্র বলতে একরকম রাষ্ট্রযন্ত্র বুঝে থাকি এবং রাষ্ট্র-যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল একটি শ্রেণীর পক্ষে অপরাপর শ্রেণীকে জোর করে অবদমন করে রাখবার আয়োজন। কিন্তু ট্রাইব্যাল সমাজ—অর্থাৎ, ট্রাইব্যাল সমাজ যতদিন পর্যন্ত আদি-অকৃত্রিম রূপে বর্তমান থাকে,—আসলে হল প্রাক্-বিভক্ত সমাজ। তার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ফুটে ওঠেনি; তাই কোনো এক শ্রেণীর পক্ষে অপরাপর শ্রেণীকে অবদমন করবার সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। তার সঙ্গে গণতন্ত্রের সাদৃশ্য শুধু এইদিক থেকে যে প্রকৃত ট্রাইব্যাল সমাজেরও মূলমন্ত্র হল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এবং মনে রাখা দরকার যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অমন চূড়ান্ত বিকাশ ঐতিহাসিকভাবে আমাদের জানা কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রর মধ্যেই দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। এই কারণেই, গণতন্ত্রর বদলে এর সঠিক বর্ণনা হিসেবে আদিম সাম্য-সমাজ বা প্রিমিটিভ কমিউনিজম্ পরিভাষাটি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

দুই : এইজাতীয় আদিম সাম্যসমাজই গৌতম বুদ্ধর কাছে সঙ্ঘ গঠনের প্রধানতম প্রেরণা ছিল। তিনি সচেতনভাবেই ওই আদিম সাম্যসমাজের সংগঠনকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু এর থেকে আমরা যদি অনুমান করি যে গৌতম বুদ্ধ নিজে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট ছিলেন তাহলে ঠিক যে ভ্রান্তির বিরুদ্ধে আমাদের মন্তব্য, আমরা

নিজেরাও তারই পুনরুল্লেখ করে বসব। ভ্রান্তিটি হল, প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যে আধুনিক পৃথিবীকে আবিষ্কার করা, বা, আধুনিক রাজনীতির ধ্যানধারণা দিয়েই প্রাচীন বাস্তবকে সনাক্ত করা। আদিম সাম্যবাদ এবং আধুনিক অর্থে সাম্যবাদ এক নয়—উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য, যেমন পার্থক্য পাথর-যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে আজকের কলকারখানার। এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটাই ছিল গৌতম বুদ্ধর কাছে মূল অনুপ্রেরণার উৎস। তাই আধুনিক অর্থে তাঁকে সাম্যবাদী বলে কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে।

অপরপক্ষে এইদিক থেকে চিন্তা করলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মর যেটা প্রকৃত গৌরব আর যেটা প্রকৃত সংকীর্ণতা—দুইই বুঝতে পারা যেতে পারে। সংকীর্ণতার দিকটা অস্পষ্ট নয়। মৌলিক সমাজ-বিপ্লবের রূপ পাবার বদলে আদি বৌদ্ধধর্ম শেষ পর্যন্ত তার নিজস্ব অতীতের বিপরীতে পর্যবসিত হল, হয়ে দাঁড়াল এক রাষ্ট্রধর্ম : যে হিংসা, লোভ, মিথ্যা, অসাধুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে তার জন্ম হয়েছিল সেগুলিরই জ্বালা-যন্ত্রণাকে স্বীকার করে নেবার বা সহ্য করতে পারবার জন্যে যেন এক মাদকতার মতো। কিন্তু তাই বলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মর গৌরবের দিকটার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। প্রাক-বিভক্ত সমাজ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল বলেই প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম মতাদর্শ ও সংগঠন উভয় দিক থেকেই সামগ্রিকভাবে শ্রেণীসমাজের ভ্রান্তি বা মোহ থেকে বিমুক্ত ছিল। আর সেইটেই হল প্রাচীন বৌদ্ধধর্মর প্রকৃত গৌরবের দিক।

|| ৩ ||

আলোচনার সুবিধের জন্যই আমরা উপরোক্ত দুটি প্রশ্নের দ্বিতীয়টি থেকেই শুরু করব : ট্রাইব্যাল সমাজের প্রতি বুদ্ধের মনোভাবটা কী রকম ছিল ? মহাপরিনির্বাণসূত্রর শুরুর অংশেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

মহারাজ অজাতশত্রু বজ্জি বলে একটি ট্রাইবের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষাকারকে বুদ্ধর কাছে পাঠালেন, এই অভিযানের ফলাফল-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী বুদ্ধর

মুখ থেকে শুনে আসবার জন্য। ব্রাহ্মণ বর্ষাকার বুদ্ধর কাছে গিয়ে রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তখন আনন্দ তথাগতর পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিলেন। বুদ্ধ রাজমন্ত্রীর কথা শুনলেন, কিন্তু সরাসরি তাঁকে কোনো উত্তর দিলেন না। তার বদলে তিনি আনন্দকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জানো, আনন্দ, এই বজ্জিরা প্রায়ই একত্রে সমাবিষ্ট হয় এবং সভায় গমন করে? আনন্দ বললেন, শুনেছি, ভগবান। তথাগত বললেন, বজ্জিরা যতদিন এইভাবে প্রায়ই সমবেত হবে এবং সভায় উপস্থিত হবে ততদিন, আনন্দ, তাদের অবনতি হবে না—উন্নতিই হবে।

এইভাবে পরপর আনন্দকে প্রশ্ন করে এবং আনন্দের কাছ থেকে উত্তর পেয়ে তথাগত ওই বজ্জিদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাতটি শর্তর কথা আলোচনা করলেন: যতদিন ওরা একত্রে মিলিত হবে, একত্রে উঠবে, একত্রিতভাবে উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি—ততদিন তাদের উন্নতিই হবে, সমৃদ্ধিই বাড়বে। আলোচনাটি স্পষ্টই ট্রাইব্যাল-সমাজের গণ-বন্ধনের বর্ণনা।

তারপর তথাগত ব্রাহ্মণ বর্ষাকারকে বললেন, আমি যখন বৈশালীর সারন্দদ বিহারে ছিলাম তখন বজ্জিদের উন্নতির এই শর্তগুলি তাদের শিখিয়েছিলাম। এবং যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই শর্তগুলি বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের অবনতির বদলে আমরা সমৃদ্ধিই আশা করতে পারি।

ব্রাহ্মণ বললেন, এই সাতটি শর্তর মধ্যে একটি মাত্র বর্তমান থাকলেই যদি ওদের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়, তাহলে সাতটিই বর্তমান থাকবার ফলে ওদের সমৃদ্ধি তো আরো বেশি সুনিশ্চিত হবার কথা। অতএব, গৌতম, মগধ-রাজের পক্ষে ওদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়—অর্থাৎ যুদ্ধে নয়, তার বদলে কূট-নীতির সাহায্যে ওদের গণ-বন্ধন ছিন্ন না করলে নয়। তাহলে গৌতম, এবার আমরা বিদায় গ্রহণ করব, কেননা এখন আমাদের অনেক কাজ।

গৌতম বললেন, আপনারা যা ভালো বোঝেন।

ব্রাহ্মণ বর্ষাকার বিদায় গ্রহণ করলেন।

ব্রাহ্মণ বিদায় নেবার পরেই তথাগত আনন্দকে উদ্দেশ করে

বললেন, আনন্দ, যাও, রাজগৃহর কাছাকাছি যত শ্রমণ আছে সকলকে চৈত্যগৃহে সমবেত করো।

আনন্দ তাই করলেন।

তথাগত আসন ছেড়ে উঠলেন এবং চৈত্যগৃহে প্রবেশ করে উপবেশন করলেন এবং শ্রমণদের উদ্দেশে বললেন :

শ্রমণগণ, সঙ্ঘর উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাতটি শর্তর কথা আমি বলব···

এবং ব্রাহ্মণ বর্ষাকারকে শোনাবার জন্য বুদ্ধ বজ্জি ট্রাইবদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলসূত্র হিসেবে যে-সাতটি শর্তর কথা বলেছিলেন, বৌদ্ধসঙ্ঘর উন্নতির শর্ত হিসেবে তিনি আবার ঠিক সেই সাতটি শর্তর পুনরুল্লেখ করলেন।

মহাপরিনির্বাণ-সূত্রর এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্ঘ গড়বার সময়ে বুদ্ধর সামনে ঠিক কোন্ ধরনের আদর্শ ছিল, ঠিক কোন্ ধরনের সংগঠনকে তিনি সচেতনভাবে অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন—তা এই রচনাটি থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা সম্ভব। কেবল এখানে একটি anachronism সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বৌদ্ধগ্রন্থে তথাগতর মহিমা বিশদভাবে দেখাবার আশায় তাঁর মুখে এই অসম্ভব দাবিটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তিনিই ওই ট্রাইব্যাল সমাজের মানুষগুলিকে গণবন্ধনের মহিমাটা বুঝিয়েছিলেন। এ দাবি স্পষ্টই অসম্ভব, কেননা ঐতিহাসিক ভাবে ট্রাইব্যাল সমাজ ও তার গণবন্ধনের গুরুত্ব বৌদ্ধধর্মর জন্মর চেয়ে অনেক বেশি পুরোনো হতে বাধ্য। অতএব ধর্মগ্রন্থটিতে আমরা একটি বাস্তবেরই পরিচয় পাচ্ছি, কেবল সে-বাস্তব উলটোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাহলে এই অংশর ইঙ্গিত ঠিক কী? বৌদ্ধধর্মর উদ্ভবের সময়ে ভারতের যে অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সেখানে তখনো অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রাইব্যাল সমাজ টিঁকে ছিল এবং এ শক্তির মূলে ছিল ট্রাইব্যাল সমাজের গণবন্ধন। এবং একদিকে অজাতশত্রুর মতো উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তির নায়ক যখন এই জাতীয় ট্রাইব্যাল সমাজকে পরাজিত করতে বদ্ধমনস্থ হয়েছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে বুদ্ধর আশীর্বাদ চাইছেন, অপরদিকে তখন স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর সঙ্ঘ গড়বার উদ্দেশ্যে অন্তত সংগঠনের দিকটুকুর জন্য এই ট্রাইব্যাল সমাজের গণজীবনকেই অত্যন্ত সচেতনভাবে অনুকরণ করবার প্রচেষ্টা করছেন।

কৌটিল্যর রচনাতেও দেখা যায় তখনকার উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তির একটি মূল উদ্দেশ্যই হল এ-জাতীয় ট্রাইব্যাল সমাজকে ধ্বংস করা। সে-কথা আমরা পরে উল্লেখ করব। তার আগে পূর্বপক্ষর একটি প্রশ্নর জবাব দেওয়া প্রয়োজন: এই সংগঠনগুলি যে আসলে ট্রাইব্যাল সমাজ তার প্রমাণ কী? বস্তুত জয়সওয়াল প্রমুখ বিদ্বানেরা এগুলিকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন। এই যুক্তিটির খণ্ডন প্রসঙ্গেই আমরা শুরুতে যে-দুটি প্রশ্ন তুলেছিলাম তার প্রথমটির উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে: গণতান্ত্রিক সংগঠন বলতে বুদ্ধর পক্ষে ঠিক কোন ধরনের সংগঠনের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর ছিল?

॥ ৪ ॥

বুদ্ধর জন্ম হয়েছিল শাক্য-গণে। তাঁর জীবদ্দশাতেই কোশলরাজের আক্রমণে এই গণটি স্বাধীনতা হারায়। প্রশ্ন হল, গণ মানে কী?

রিস্ ডেভিড্স্ এখানে গণ কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে সরাসরি ট্রাইব (tribe) শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং পালি পুঁথিপত্র থেকে এই শাক্য-গণের যে-বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই মর্গান-বর্ণিত ইরোকোয়াদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ডক্টর ফ্লিট এবং স্যার ভাণ্ডারকর-ও গণ শব্দকে ট্রাইব অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এফ্ ডাব্লিউ টমাস এবং জয়সওয়াল গণ শব্দের এই অর্থের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জয়সওয়াল দাবি করেন গণ শব্দের একমাত্র অর্থ হল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

'পরিচয়'এ ইতিপূর্বে এবিষয়ে আলোচনা করেছি এবং আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি রিস্ ডেভিড্স্, ফ্লিট ও ভাণ্ডারকরের মতের পক্ষেই প্রমাণগুলি অবিসংবাদিত। এখানে সে-আলোচনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমানে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এই গণ-এর সাক্ষ্যগুলি সত্যিই দুর্মূল্য। বৌদ্ধসাহিত্য গণের কথায় পরিপূর্ণ। গণ বলতে যদি ট্রাইব্যাল সংগঠন বা তার সুস্পষ্ট স্মারকই বুঝিয়ে থাকে এবং এ-সংগঠনের আদি অকৃত্রিম রূপটিকে যদি আদিম সাম্যসমাজ বলেই সনাক্ত করবার অবকাশ থাকে, তাহলে মানতে

হবে বৌদ্ধ-ভারতের নানা জায়গায় এ-জাতীয় আদিম সাম্যসমাজের গড়ন অবশিষ্ট ছিল। এবং বুদ্ধ স্বয়ং তারই সংগঠনকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিজের সঙ্ঘ গড়বার চেষ্টা করেছিলেন।

কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বলা দরকার। ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। আমরা নিশ্চয়ই একথা বলতে চাইছি না যে বৌদ্ধযুগে ভারতের অবস্থা আদিম সাম্যদশাই ছিল। তার বদলে আমরা অসমান উন্নতির নিয়ম (law of uneven development-এর) প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।

বুদ্ধর আগে ভারতে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব যে ঘটেনি তা নয়। বুদ্ধর প্রায় তিন হাজার বছর আগেই সিন্ধু উপত্যকায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ বলতে এতটুকু জায়গা বোঝায় না এবং সারা ভারত জুড়ে সব মানুষেরই যে সমান তালে উন্নতি ঘটেছে এ-কথাও মনে করবার কোনো কারণ নেই। এমনকি আজকের দিনেও ভারতবর্ষ থেকে ট্রাইব্যাল সমাজের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়নি। বুদ্ধর যুগে ট্রাইব্যাল সমাজগুলির রূপ নিশ্চয়ই আরো অক্ষুণ্ণ ছিল; কেননা তখন বণিক, পাদ্রি এবং আড়কাঠি প্রভৃতির দল এমনভাবে এগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেনি।

সিন্ধু উপত্যকা সম্বন্ধে যে-কথা সত্যি গঙ্গা উপত্যকা সম্বন্ধে তা সত্যি হতে বাধ্য নয়। কিন্তু তার মানে এও নয় যে বুদ্ধর সময়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। "কয়েক শতাব্দী আগে থাকতেই গঙ্গা উপত্যকায় রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং যেন সারা ভারতের পক্ষেই রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত হবার সময় ঘনিয়ে আসছে।" একথা ঠিক। এবং একথাও ঠিকই যে জাতকের গল্পগুলি থেকে বৌদ্ধভারতেই পণ্য উৎপাদনের রীতিমতো উন্নত পর্যায় এবং এমনকি মুদ্রা-প্রচলনের প্রমাণও পাওয়া যায়। এ-সবের আনুষঙ্গিক হিসেবে তখন নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো রকম ক্রীতদাস-প্রথাও প্রচলিত থাকতে বাধ্য। জাতকের গল্পে সেই ক্রীত-দাসদের বর্ণনার অভাব নেই।

এই দিককার কথাগুলি বর্তমানে বড়ো করে বলবার প্রয়োজন নেই। কেননা, ইতিপূর্বেই ফিক, রিস ডেভিড্‌স্ প্রভৃতি বিদ্বানেরা বৌদ্ধভারতের এই দিকগুলির কথা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। অপরপক্ষে যে-দিকটির কথা সাধারণত আলোচিত হয় না,—এবং যে-দিকটির কথা

বাদ দিলে সামগ্রিক অর্থে বৌদ্ধভারতের চিত্র অনেকাংশেই অস্পষ্ট থাকতে বাধ্য,—বর্তমানে আমাদের পক্ষে বিশেষ করে তার আলোচনা তোলাই অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। সেদিকটির কথা হল, তখনো ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে নানা এলাকা জুড়ে আদিম সাম্যসমাজের চিহ্ন অক্ষুণ্ণ ছিল। এবিষয়ে বিস্ময়ের অবকাশ নেই, কেননা অসমান উন্নতির নিয়মের দরুনই এই রকম।

এই দিকটির কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই জাতীয় সংগঠন থেকে বুদ্ধ কিভাবে প্রেরণা পেয়েছিলেন তার কথা বাদ দিয়ে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মর সংগঠন ও মতাদর্শ, কোনো বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে বোঝবার উপায় নেই। আমরা দেখাবার চেষ্টা করব, আদি বৌদ্ধধর্মর যেটা প্রকৃত সাফল্য আর যেটা প্রকৃত বিফলতা—উভয় বিষয়ই এই দিক থেকে বোঝবার অবকাশ আছে।*

[আগামীবারে সমাপ্য

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

২৫শে বৈশাখ সমাগত, এমন সময় হাতে এল শ্রীযুক্ত অমল হোমের লেখা "পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ"।* এই রকম জাঁকালো বিশেষণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জাহির করা খুব সমীচীন কিনা তা বিবেচ্য; কিন্তু বইটি যে সময়োপযোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। কেননা পঞ্চনবতিতম রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকীর আয়োজনে বাঙলা দেশ সরগরম। যেভাবে এ অনুষ্ঠানটি পালিত হয় সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয় দু-চারটি বেশ কড়া কথা আমাদের শুনিয়েছেন। মনে হয় তা শোনাবার দরকার ছিল। অমলবাবু বলেছেন, এই অনুষ্ঠানগুলিতে শুধু হয় হৈ-হুল্লোড়-নাচ-গান, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বা রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ এই অনুষ্ঠানগুলিতে অল্পই ঘটে।

অমলবাবুর মত এই যে সত্যিকারের রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাতে এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে লোকে কবির শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। হুজুকপ্রিয়তা সম্পর্কে অমলবাবুর মন্তব্য আমি সম্পূর্ণ মানি। কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্পর্কে অমলবাবুর আদর্শ মনে হয় না যে খুব সহজে পালনীয়। অবশ্য চেষ্টা করা উচিত। তবে অমলবাবু রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের

---

* পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ : অমল হোম ॥ এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ ॥ ২ টাকা ॥

প্রসঙ্গে যে অধিকার-ভেদের কথা লিখেছেন, তাও খুব যুক্তিসহ কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

যাই হোক অমলবাবুর সৎসাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না। কেন না এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন গত বৎসর মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তীর একটি অনুষ্ঠানে। তাঁর সাহস আরো প্রশংসনীয় এই কারণে যে তাঁকে বলা হয়েছিল 'মায়ার খেলা' সম্পর্কে আলোচনা করতে। এবং এই সুযোগকে তিনি কাজে লাগান রবীন্দ্রজয়ন্তীর নামে যে ছেলেখেলা হয় তারই প্রতিবাদে কিছু অপ্রিয় সত্য বলতে। কিন্তু এই অপ্রিয় সত্য 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' (যার নামে বইটির নামকরণ) প্রবন্ধের অবতরণিকা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যে সত্যই পুরুষোত্তম ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ এরপর অমল-বাবু উল্লেখ করেছেন কবির জীবনের একাধিক মর্মস্পর্শী ঘটনা। এই ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতা, তাঁর অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব শুধু এই কটি ঘটনার মধ্যেই নিঃশেষিত নয়। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয়ের পক্ষে তাই প্রবন্ধটি যথেষ্ট বলে মনে হয় না। অমল-বাবুর মতন যাঁরা কবির রচনা ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত তাঁদের কাছে আমরা এর চাইতেও বড়ো জিনিস আশা করি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ'। এটিও পঠিত এক রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে। এই প্রবন্ধের বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও 'গোরা'য়, এমন-কি দু-একটি কবিতাতেও অল্প নিরীহ ও দরিদ্র চাকুরিজীবী কেরানী বাঙালীর মর্মস্পর্শী চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। 'পোষ্ট মাষ্টার'-এ রতনের মনিব, 'বিচারক'-এর পতিতা, 'সমাপ্তি'র ঈশান, 'অতিথি'র তারাপদ, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নায়ক, 'গোরা'র মহিম, 'শাস্তি'র—"একখানি নূতন তৈরী নৌকার মত সুডোল দেহ" চন্দরা, 'একরাত্রি'র সুরবালা ও আর দু-একটি উদাহরণ একত্রিত করেছেন। ঠিক—কিন্তু অভাব-অনটন-পীড়িত উপরিওলা ও হাকিম-সাহেব-শাসিত কেরানী বাঙালীর বাস্তব চিত্রের মানদণ্ড স্থাপন কি লেখকের উদ্দেশ্য? বোধহয় না। লেখক শুরুতে বলেছেন মার্কসবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে দোষারোপ করেছেন বুর্জোয়া লেখক বলে। বলেছেন তাঁরা, কবির লেখা বস্তুতন্ত্রহীন ও এ-সম্পর্কে বিনয় ঘোষের "নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা"র উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে অমলবাবুর বক্তব্য

কবির ছোটগল্প ইত্যাদি বস্তুতন্ত্রপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী লোকের নয়, দারিদ্র্যের সার্থক চিত্র। সম্ভবত অমলবাবুর উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পাদিতে বাস্তবিকতার মান প্রতিষ্ঠিত করা। বিনয় ঘোষের লেখা বেশ কিছু দিন আগের এবং তাঁর মতও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। অমলবাবুর সেকথা অবিদিত না থাকাই সম্ভব। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের কি ছোটগল্প কি উপন্যাস—মায় 'চতুরঙ্গ' সমেত, রোম্যান্টিক পর্যায়েরই, অমলবাবু যা-ই বলুন। কিন্তু তা বলে তাঁর রচিত কথাচিত্র বা কবিতা অবাস্তব হবে কেন? রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি সারা রবীন্দ্রসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। লেখক কয়েকটি গল্পের নায়ক-নায়িকার উদাহরণ দিয়ে যা বলেছেন তা খুবই ন্যায্য, কিন্তু তাঁর উদাহরণগুলি নিতান্তই গুটিকয়েক। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পের মধ্যেই সাধারণ বাঙালীর আশা ও ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, অসামঞ্জস্য, ভ্রম, বিড়ম্বনা, অজ্ঞতা, রূপের গৌরব ও মোহ, ভাবপ্রবণতা, স্বদেশী যুগের উন্মাদনা—ইত্যাদি সু-বাস্তব রূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। চাষী, মজুর ও দারিদ্র্য-নিষ্পেষিতের প্রতি তাঁর দরদ গল্পে ও কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। একজন সুপরিচিত লেখক 'সোনার তরী'র মার্ক্সিস্ট ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে কবিতাটি মহাজন কর্তৃক খাতকের সামান্য আয় আত্মসাৎ করার চিত্র। রবীন্দ্র-সৃষ্টির মূল্য যাচাইয়ে এরকম ব্যাখ্যার অথবা 'একরাত্রির' সুরবালা ও 'বিচারকের' পতিতার উদাহরণ একত্রিত করে মার্কসবাদীদের 'বুর্জোয়া' লেখক আখ্যা খণ্ডনের চেষ্টার কি প্রয়োজন আছে? ঢের ভালো হত যদি অমলবাবু ছোটগল্পগুলি নিয়ে একটু সম্যক ও বিস্তারিত আলোচনা করতেন। প্রমথ বিশী ও বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-নাথের গল্প সম্বন্ধে অধুনা অতি সুন্দর সারগর্ভ রচনা প্রকাশ করেছেন। বহুদিন পূর্বে ধূর্জটিবাবু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরেজিতে লেখা একটা বই ছাপিয়েছিলেন তাতেও ছোটগল্পের বেশ সুন্দর আলোচনা আছে। অমলবাবু নতুন ও একটু ভালো করে যদি রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধে বলতেন বা কিছু নতুন আলোকপাত করতেন তো পাঠকবৃন্দ ধন্য হত। তাঁর আলোচনার অনুপাতে উদ্ধৃতাংশের পরিমাণ বেশি হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধ "জালিয়ানওয়ালাবাগের চিঠি" পুস্তিকার শ্রেষ্ঠাংশ। যে সময় রাওলাট বিল পাশ হয় সে সময় লেখক দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন, তার অব্যবহিত পরেই কলকাতায় ও ঠিক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের

দিন লাহোরের পথে অমৃতসর স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে সময়কার দিল্লী ও লাহোরের ঘটনাবলী লেখক বর্ণনা করেছেন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে। অমৃতসর স্টেশনে ট্রেনে বসে জালিয়ানওয়ালাবাগের মেশিনগানের গুলি বর্ষণ শুনতে পান। অমলবাবুর লেখনীতে ঐ সব অঞ্চলের পরিস্থিতি অপরূপ জাজ্বল্যমান হয়েছে। এর পরের ঘটনা, ৩০শে মে ১৯১৯এ লিখিত কবির নাইট উপাধি পরিত্যাগ-পত্র ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, অর্থাৎ আগের ইতিহাস, ও কবির উপাধি ত্যাগের পর Englishman পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য— "It will not make a ha'porth worth of difference", এবং কয়েক মাস পরে কবির বিলাত যাত্রা ও সেখান থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে লেখা চিঠি-পত্রাদির বিবরণ সমাবেশ করে অমলবাবু আমাদের দেশের ইতিহাসের একটা চিরস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছেন ও সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। এর পূর্বে প্রফেসার প্রশান্ত মহলানবিশ কবির নাইট উপাধি ত্যাগের সময়কার কয়েকটি ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন; যা হোক অমলবাবুর লেখা প্রবন্ধ অনেক তথ্যপূর্ণ।

একটা কথা মনে উদয় হয় এখানে। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে লেখা কবির চিঠিতে নিরস্ত্র পরাধীন ভারতীয়দের হত্যার ধিক্কারের যে অনল ছিল, একবছর পরে লণ্ডন থেকে লেখা তাঁর চিঠিতে তা স্তিমিত হয়েছে ও তৎপরিবর্তে দেখা দিয়েছে রুদ্রের দক্ষিণমুখের স্তুতি। বলেছেন,—নিরপরাধ মানুষের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড যেন ঢেকে দিতে পারি আমরা এই প্রার্থনা দিয়ে—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন পাহি নিত্যম্।" প্রার্থনা ও করুণা দিয়ে এমন অপরাধ ঢেকে দেওয়া বীর্যবানের বাণী হতে পারে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার পর দেশ যে পথ বেছে নিল ও যার প্রত্যক্ষ ফল ভারতের স্বাধীনতালাভ সে অসহযোগের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নাইট উপাধি ত্যাগ করলেও। অবশ্য তিনি ছিলেন না বা হতে চান নি পোলিটিক্যাল লিডার। নীরবে শান্তিনিকেতনের সৃষ্টির কাজই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থ-পার্বণ

২৫শে বৈশাখ এসে পড়েছে। কেমন করে এই স্মৃতিটিকে উদ্‌যাপন করা যায় তা নিয়ে অনেকে ভাবছেন। সত্যিই, উদ্‌যাপনের মধ্যে যে একটা শূন্যগর্ভ আড়ম্বরের দিক ইদানীং প্রাধান্য লাভ করেছে, তা পীড়াদায়ক। টাকা ওঠে, খরচও হয়, কিন্তু স্থায়ী কিছু, সার্থক কিছু গড়ে ওঠে না। এই শূন্যগর্ভতাকে পরিহার করে রবীন্দ্রজন্মোৎসবকে রুচিময় মনোময় করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

সন্দেহ নেই যে সে কাজ তত সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে পণ্ডিতম্মন্য আলোচনা করলেই যে সেটা হয়, তেমন মনে হয় না। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ শুধু আলোচ্য এক তত্ত্ব মাত্র নন। তাঁর জন্মোৎসবে রসের নিমন্ত্রণ একটা থাকবেই। তাঁর রচনাপাঠ, তাঁর গান শোনা, তাঁর নাটকের অভিনয়কে নাচগান হৈ হল্লা বলে একেবারে ঠেলে রাখা নিতান্তই ছুৎমার্গীর কাজ হবে।

কিন্তু অন্তত একটা জিনিসে আমরা এখন থেকেই জোর দিতে পারি। শ্রদ্ধার ভাবটা যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা এবং বিশেষ করে বই পড়ার অভ্যাসটিকে বাড়িয়ে তোলা। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত প্রেমেন্দ্র মিত্র যে আবেদন করেছিলেন সেটির প্রতি আমরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি। ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষ করে একটি গ্রন্থপার্বণের সূত্রপাত করা হোক। জাতীয় কবির আবির্ভাব মিশে থাক জাতির গ্রন্থ-উৎসবের মধ্যে। আধুনিক সভ্য দেশগুলির অনেক স্থানেই বছরের একটা সময় বইয়ের মেলা বসানোর রেওয়াজ আছে। কবির নামে বাঙলা দেশেও তার চল হোক।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন

সুহৃৎ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে সাধারণত কোনও গায়ক বা গায়িকা যখন গান করেন, তখন তিনি বিশেষ কোন গানটা গাইলেন সেটা কিছু বড় কথা নয়—গায়কের কাছে নয়, শ্রোতার কাছেও নয়। যে-কোনও একটা গান গেয়ে গায়ক সন্তুষ্ট, শ্রোতাও শুনে খুশি। গানের কথা ও ভাব কাল, স্থান ও পাত্রানুযায়ী কিনা সে-বিষয়ে কেউ বিশেষ ভাবে না।

কালোয়াতি গানে পদের সঙ্গে সাধারণত শ্রোতার কোনও যোগ নেই—আর গায়কও গানের পদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। সে-গানে রাগ-রাগিণী ওস্তাদের ওস্তাদিতে নানারূপে বিস্তারিত হয়ে শ্রোতার মনকে স্পর্শ করে, স্বরের সৌকুমার্য আনন্দ দিয়ে থাকে। কালোয়াতি গান সম্বন্ধে এ উক্তি সত্য হলেও আমাদের অন্যান্য সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্য নয়। শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, বাউল, পদাবলিকীর্তন, পল্লীগীতি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রভৃতির পদই হল মুখ্য বস্তু। এই সকল গানে পদের ভাবকে বহন করবার জন্যেই যথাযথ সুর-সংযোজনা।

বিচিত্র রস, ভাব ও সুরের অতুলনীয় সমাবেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাঙালির এক অতি অপূর্ব সম্পদ। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক-গায়িকা গানের পদ বা ভাবের দিকটায় ততটা সজাগ নন যতটা সুরের দিকে। তাই আমাদের দেশীয় ধারাকে অনুসরণ করে আজকাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত দাঁড়িয়েছে

একটা বিশেষ ঢঙের গান—যেমন খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল বিশেষ ঢঙের। যে-মন নিয়ে লোকে খেয়াল-টপ্পা শোনে বা গায়, ঠিক সেই-মন নিয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় বা শোনে। অর্থাৎ গানের সুরটা কেমন এবং কেমনভাবে সেটা গাওয়া হয়েছে এইটেই হল বিচারের বিষয়—গানের পদ বা ভাব সুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মনের উপর কেমন ছাপ দিলে সেটা নিয়ে কেউ ভাবে বলে মনে হয় না। গানের পদ ও ভাবের সঙ্গে গায়কের ও শ্রোতার যোগ থাকা যে বাঞ্ছনীয় এ সম্বন্ধে উভয়েই উদাসীন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে এই ঔদাসীন্য বড় পীড়াদায়ক। ভাবের সঙ্গে সুরের সঙ্গতি হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষত্ব। চারদিকের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগসাধনের সূত্র হল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। আমাদের মনের ভাবাবেগের উৎস, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, আমাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা, আমাদের কর্মে অনুপ্রেরণা, আমাদের আনন্দের সহচর হল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। এ সঙ্গীতের মধ্যে যে অখিল সম্পদ রয়েছে তার সঙ্গে দেশের লোকের যোগসাধন করতে হবে। এ দায়িত্ব হল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক-গায়িকার এবং কলকাতা আকাশবাণীর—যার মাধ্যমে গায়কগায়িকারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

কিন্তু এঁরা কি এই গুরু দায়িত্ব যথাযথ বহন করছেন? এ বিষয়ে উভয় পক্ষের ঔদাসীন্যের জন্যেই ১লা বৈশাখের শুভদিনে অনুষ্ঠিত জলসায় গায়কের মুখে শুনতে হয়, "আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল···" আর ঠিক দুপুর-বেলা কাঠফাটা রোদের মধ্যে কলকাতা আকাশবাণী থেকে পরিবেশিত হয়; "তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি. ...." অথবা "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো .." নয়তো বা শুনি শ্রাবণ মাসের ঘনবরষাধারার মধ্যেঃ

"এতদিন যে বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।"

কিম্বা সন্ধ্যা সাতটা আটটায় ভোরের রামকেলি সুরের অতি সুমধুর গানখানি 'তিমির দুয়ার খোলো, এস এস নীরবচরণে'। সঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতার রুচির পরিমার্জনার ভার নিয়েছেন আকাশবাণী, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন সম্বন্ধে তাঁদের এই ঔদাসীন্য মনকে ক্ষুব্ধ করে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক-

গায়িকা ও পরিবেশক আকাশবাণী এ বিষয়ে যদি অবহিত না হন, তাহলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিন দিন বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে যেতে বাধ্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে দেশবাসীর কাছে যথাযথ পরিবেশন করা আকাশবাণীর একটি মুখ্য কাজ। এই উদ্দেশ্যে গানের জাতীয় সাপ্তাহিক এক বৈঠকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। ঐ বৈঠকে জনৈকা সর্বজনপ্রিয় সুগায়িকা প্রথম যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি গেয়েছিলেন তার প্রথম পংক্তির কথাগুলি হল :

'কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।'

আমাদের দেশের গায়কগায়িকারা তাঁদের দ্বারা গীত গানের পদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—এই অভিযোগ যে সত্য তা উপরের গানটির পদ ও ভাবার্থ অনুধাবন করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিনটা ছিল দোল-পূর্ণিমা। ফাল্গুন মাসের চাঁদের আলোয় এ দেশের আকাশ-বাতাস উদ্ভাসিত। ঐ দিনটাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ কত গান লিখেছেন। একে ফাল্গুনের পূর্ণিমা তার উপরে দোল—ঐ দিন সন্ধ্যায় গাইবার উপযোগী রবীন্দ্রনাথের কোনও গান না গেয়ে গায়িকা গাইলেন কিনা ঘোর বর্ষাদিনের একটা গান! এর থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি ঔদাসীন্য আর কী হতে পারে? যদি ফাল্গুনের পূর্ণিমায় যে-কোনও একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত, বিশেষত ঘোরতর বর্ষাদিনের গান গাইলেই চলে, তাহলে বিভিন্ন ঋতুতে গাইবার উপযোগী এত অজস্র প্রকৃতির গান কবি লিখলেন কি জন্যে? আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও প্রকৃতির আবেষ্টনের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্যে তাঁর কবিপ্রাণ সদাজাগ্রত ছিল। প্রকৃতির সংস্পর্শে নিজে যে আনন্দ পেয়েছেন সেই আনন্দ তাঁর কাব্যে গানে আমাদের জন্যে রেখে গেছেন বলেই তো আমরা সে আনন্দের আস্বাদন পাই। আর এই আনন্দ-বণ্টনের ভার রয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিবেশকদের উপরে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি আকাশবাণী সঙ্গীত-সম্মেলন উপলক্ষে দিল্লীতে এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতের জলসা হয়ে গেল। তার মধ্যে একদিন রাত সাড়ে বারোটার সময়ে কুড়িমিনিটের জন্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতকেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। ঐ দিনটি ছিল দেওয়ালি উৎসবের দিন। দেওয়ালি বা দীপান্বিতা উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে-সুন্দর গানটি (হিমের রাতে ঐ গগনের

দীপগুলিরে………) আছে, আশা ছিল গায়কগায়িকাগণ ঐ গানটি সর্বভারতীয় শ্রোতাদের কাছে সেদিন পরিবেশন করার সুযোগ কিছুতেই হারাবেন না ; কিন্তু তাঁরা ঐ গানটি অথবা প্রকৃতিসম্বন্ধীয় সময়োপযোগী কোনও গান না গেয়ে যে চারটি গান পর পর করেছিলেন সেগুলির সঙ্গে দেওয়ালি, হেমন্ত ঋতু বা গভীর রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের স্পর্শের কোন যোগই ছিল না—অথচ এ ধরনের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভাণ্ডারে কিছু কম নেই। সেদিন প্রযোজক মশায় ও গায়কগায়িকা (অধিকাংশই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বিশেষ নাম করা) রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরের বৈচিত্র্য দেখাতেই ব্যস্ত ছিলেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—গানের কথা ও সুরের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ—শ্রোতার কাছে উপস্থিত করা হল কিনা তার জন্যে তাঁদের কোনও উদ্বেগ ছিল বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রযোজক, গায়কগায়িকা ও পরিবেশক আশাকরি মনে রাখবেন যে তাঁদের উপরেই নির্ভর করছে এই সঙ্গীতের আদর, প্রচার ও স্থায়িত্ব!

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কগায়িকারা আকাশবাণীতে পনর মিনিটে দুটি গান সাধারণত গেয়ে থাকেন। অনেক সময়ে দুটি গানের মধ্যে ভাবের কোনও সঙ্গতি থাকে না। প্রথম গানটি মনে যে ভাব আনে দ্বিতীয় গান তার পরিপোষক না হয়ে অনেক সময়ে অন্তরায় হয়। এই সেদিন একজন গায়িকা প্রথমে গাইলেন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কীর্তনটি "ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ, আমি মর্মের কথা, অন্তর-ব্যথা কিছুই নাহি কব।" এই পারমার্থিক গানটি মনে যে ভাবাবেশ আনে এবং মনকে যে-উচ্চতর গ্রামে উন্নীত করে তার রেশ শেষ হতে-না-হতে তিনি দ্বিতীয় গান ধরলেন 'মায়ার-খেলা'র একটি হাল্‌কা প্রেমের গান :

সুখে আছি, সুখে আছি, সখা আপন মনে—

এ যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের দুই পিঠ—এক পিঠের গানের সঙ্গে অন্য পিঠের গানের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কগায়িকা তো গ্রামোফোন রেকর্ড নন যে পরপর যে-কোনও দুটি গান গেয়ে দিলেই হল—তাদের পরস্পর ভাবের কোনও সামঞ্জস্য থাক-না-থাক? আমরা শ্রোতারা এতেই সন্তুষ্ট! এর কারণ হল—কি-গায়কগায়িকা, কি-শ্রোতা, আমরা

গানের ভাবার্থের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না—দরকার বোধ করি না। মনে করি গান শুধু কানের তৃপ্তিসাধনের জন্যেই—সে-গান তাই কানের ভিতর দিয়ে আমাদের মরমে পৌঁছায় না—প্রাণকেও আকুল করে না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া এবং শোনা আমাদের কাছে অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে গায়কগায়িকার কাছে নিবেদন, তাঁরা যখন আকাশবাণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন তখন যেন এক এক দফায় একই ধরনের গান করেন—অর্থাৎ প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, স্বদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন ভাবের গান দফায় দফায় যদি করেন তাহলে সঙ্গতি রক্ষা হয়। আজকাল অনেক গায়কগায়িকা চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, মায়ার খেলা প্রভৃতি নৃত্যনাটের অন্তর্গত গান গেয়ে থাকেন। যে-সব গান নাট্যের আখ্যায়িকা ও নৃত্যের সঙ্গে মিলিয়ে শুনলে মনকে যেমন স্পর্শ করে, সেসব গানই আলাদা করে অন্য কোন গানের সঙ্গে একই সময়ে গাইলে মনকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে না। সেই জন্যে নাটকের অন্তর্গত গান গাইবার সময়ে এক দফায় একই নাটকের গান পর পর করা ভাল। তার উপর কোন্ গান কোন্ পাত্র-পাত্রী কোন্ অবস্থায় গাইছেন একটু বলে দিলে গানগুলি বেশি করে উপভোগ করা যায়। নির্দিষ্ট সময় পূরণের জন্যে একই গান বার বার না গেয়ে প্রত্যেক গান গাইবার আগে দু-এক মিনিট সময় ভূমিকার জন্যে দেওয়া হলে গানগুলি আরও হৃদয়গ্রাহী হয়। এরকম ভূমিকা করা গায়কগায়িকার পক্ষে সম্ভবপর না হতে পারে, কিন্তু আকাশবাণীর প্রচারকর্তা এ ব্যবস্থা সহজেই করতে পারেন। আকাশবাণীর মহিলামহলের পরিচালিকা রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও কবিতা পরিবেশনের সঙ্গে যে ধরনের ভূমিকা করে থাকেন, তাতে গান ও কবিতা বোঝবার ও উপভোগ করবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় তা শ্রোতামাত্রেই উপলব্ধি করে থাকেন। আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও কাব্য পরিবেশনের সঙ্গে যদি এই ধরনের ভূমিকা সব সময়ে করা হয় তাহলে শ্রোতারা রবীন্দ্রসাহিত্যের রসগ্রহণে সমর্থ হবেন তা বলা বাহুল্য।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা ও সুরের সমন্বয়ের বিষয়ে বলা হল—কিন্তু যারা ভাষা বোঝে না তাদের কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করা যায় কি করে? যারা বাঙলা ভাষা জানে না তাদের কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথার বিশেষ কোনও

মূল্য নেই কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের বৈশিষ্ট্য থেকে অ-বাঙালি সঙ্গীতরসজ্ঞ শ্রোতা বঞ্চিত হবে কেন ?-যন্ত্র-সঙ্গীতের সাহায্যে এই অভাব দূর করা যায় না কি ? রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভাণ্ডারে এমন অনেক সুর আছে যেগুলি যন্ত্রের সাহায্যে যথাযথ পরিবেশিত হলে বাঙালি, অ-বাঙালি সকল শ্রোতাই উপভোগ করবে। সেইজন্যে আকাশবাণীর কাছে নিবেদন তাঁরা যেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশিষ্ট সুরের একক এবং ঐকতান বাজনা তাঁদের সুদক্ষ যন্ত্রীসম্প্রদায় দিয়ে পরিবেশনের ব্যবস্থা সময়ে সময়ে করেন। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি বা হিন্দি অনুবাদের সঙ্গে যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অবাঙালী শ্রোতারা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রসগ্রহণে সমর্থ হয় বলে বিশ্বাস। গাইবার আগে গানের বিষয়বস্তু, রবীন্দ্র-সুরের বিশেষত্ব প্রভৃতি অল্প কথায় ভালরকম ভূমিকা করে দেওয়া যে দরকার তা বলা বাহুল্য।

এবার রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার ঢঙ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

একবার সঙ্গীতপিপাসু দুটি কিশোর বন্ধুর এইরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল :

১ম বন্ধু : একটা গান গা ভাই।

২য় বন্ধু : কী গান গাইব ? রবীন্দ্র-সঙ্গীত ?

১ম বন্ধু : রবীন্দ্রসঙ্গীত ? না, দরকার নেই—ঐ তো গড়িয়ে গড়িয়ে গাইবি !

অনেক গায়কগায়িকা রবীন্দ্র-সঙ্গীত এমনভাবে গেয়ে থাকেন যে তাঁদের গাইবার ঢঙের জন্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত হয়ে দাঁড়ায় প্রাণহীন, মিন্‌মিনে, বিশেষত্ব-হীন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়ার ঢঙ সম্বন্ধে অভিযোগ আজকাল নতুন নয়, ১৭।১৮ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথও এ-সম্বন্ধে অভিযোগ করে গেছেন। তাঁর উক্তিটি উদ্ধৃত করে দিই—এটি ছাপা হয়েছিল ১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসের "মাসিক বসুমতী" পত্রিকার ৩২২ পৃষ্ঠায় :

"......আজকাল বাইরের লোকের মুখে যা গান শুনি, সে যে কতো ক্লান্তিকর কী বলবো। বিশেষ করে রেডিয়োতে যখন ওরা আমায় চাপায়—কেবল শুনতে পাই একটানা একঘেয়ে কান্নার সুর। এ কান্না বিনে রবীন্দ্রনাথ যেন আর কিছুই জানে না।......বাধ্য হয়ে এ সব উৎপাতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে রেডিয়ো আমায় বন্ধ করেই রাখতে হয়।..."

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার ঢঙের যথাযথ কারণগুলি বিবেচনা করে দেখা দরকার।

গান হল আগুনের মত—এক শিখা হতে অন্য শিখা জ্বালিয়ে নেবার জিনিস। তাই একজন গায়কের কাছ থেকে আর-এক জনের শিখতে হয় গান। সেইজন্যে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ওস্তাদের—যাঁর পারদর্শিতার উপর শিষ্যের শিক্ষা ও সাফল্য নির্ভর করে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিক্ষা সম্বন্ধেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখতে হলে উপযুক্ত গুরু চাই। কিন্তু সে-গুরু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কেবলমাত্র সুর, তাল শেখাবেন না, সে-গানের সঙ্গে তাঁকে নিজেকে দিতে হবে। অর্থাৎ তিনি নিজে ঐ গান গেয়ে যে-আনন্দ পান, সে-আনন্দ ও ভাবাবেগ শিষ্যের মধ্যে সংক্রামিত করতে না পারলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই সঙ্গীতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে, তার মধ্যে যথার্থ ভাবাবেগ আনতে না পারলে এ সঙ্গীত কখনও শ্রোতার মনকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যে-অতুলনীয় শব্দ-সম্পদ, অপূর্ব ভাব-ঐশ্বর্য, প্রাণ-স্পর্শী সুরের সমাবেশ আছে, সে-সব যখন গায়ক-গায়িকা যথার্থ উপলব্ধি করে নিজেকে গানের মধ্যে ঢেলে দিতে পারেন, তখনই সেই গান শ্রোতার হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করে জাগিয়ে তোলে মূর্ছনা, কেননা—

"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে ত কলতান উঠে"।

মোটকথা শিক্ষাপদ্ধতির জন্যেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া বর্তমানে এমন প্রাণহীন। আজ যদি গায়কগায়িকার গাইবার ঢঙের দোষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধারণ শ্রোতার কাছে সমাদর লাভে অপারগ হয়, তার দায়িত্ব রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিক্ষা-পদ্ধতি এড়াতে পারে না। সে-শিক্ষায় শিষ্যেরা হয়ত গানের টেকনিকটুকু শেখে কিন্তু প্রাণের শিখাটুকু জ্বালিয়ে নিতে পারে না। তারা সুর-তাল নির্ভুল শিখতে পারে কিন্তু গানের মধ্যে দরদ ফোটাতে পারে না। তাই অধিকাংশের গান হয় যান্ত্রিক—একটানা, একঘেয়ে, নির্জীব—তা প্রাণকে স্পর্শ করে না।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শব্দ-বিন্যাস হল আসল বস্তু। যে গায়ক-গায়িকা গাইবার সময় ঐ শব্দগুলি সম্পূর্ণ অনুভব ও উপভোগ না-করবে, সে কখনই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। কোনও কোনও গায়কগায়িকা যেন

ঘুমের ঘোরে কলের মত কথাগুলো আউড়ে যান ; গানের কথা, ভাব ও স্বর-লালিত্য তাঁর মনের মধ্যে কোনও রকমের সাড়া জাগাতে সমর্থ হচ্ছে তার পরিচয় তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে পাওয়া যায় না।

তার উপরে গলা-ছেড়ে প্রাণ-খুলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া যেন আজকাল একটা অপরাধ—তাই অধিকাংশ গায়কগায়িকা গলার স্বাভাবিক গতি ও আবেগকে যতদূর সম্ভব খর্ব করে নিচু গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে থাকেন—এমনকি কেউ কেউ বাঙলা শব্দগুলিকে আধো-আধো অথবা বিকৃত বিজাতীয় ভাবে উচ্চারণ করবার প্রয়াস করেন—এই সব কারণে গান হয়ে পড়ে নির্জীব —শ্রোতার মনকে স্পর্শ করতে তো পারেই না, উপরন্তু অনেক সময়ে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার সময়ে তাঁদের এই প্রাণহীনতার কারণ কি ? এর জন্যে কি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা ও স্বর দায়ী, না, রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিক্ষা-পদ্ধতি দায়ী !

বলা বাহুল্য এই প্রাণহীনতার প্রভাব এড়িয়ে যে দু-চারজন গায়কগায়িকা স্বাভাবিক গলায় দরদ দিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে থাকেন, তাঁদের গান শুনলে সত্যই মন আনন্দিত হয়ে ওঠে।

অনেক গায়ক-গায়িকা স্বরলিপি থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখে থাকেন। বিদেশী সঙ্গীত যে-লয়ে বা speedএ বাজাতে হয় তার নির্দেশ স্বর-লিপিতে (অর্থাৎ music sheetএ) দেওয়া থাকে বলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। যে-লয়ে গান বা বাজনা শ্রুতিমধুর এবং ভাবব্যঞ্জক হয়, তা জানা থাকে, তাই যে-কোনও গায়ক বা বাদক সেই লয়ে বাজিয়ে গান বা বাজনাকে সজীব করে তুলতে পারেন। আমাদের স্বরলিপিতে সে-রকম কোনও নির্দেশ থাকে না, তাই কোন্ লয়ে কোন্ গানটা গাইতে হবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ঠিক করা দুরূহ হয়। বিশেষত অনেকের ধারণা রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিলম্বিত লয়ে টেনে টেনে গাইবার জন্যে। তাই অনেক সময়ে যথাযথ লয়টি স্থির করা অসম্ভব হয়। কোন্ গান কোন লয়ে গাইলে শ্রুতিমধুর ও ভাবব্যঞ্জক হবে একথা অধিকাংশ গায়ক-গায়িকা ভেবে দেখেন না—তাই তাঁরা অধিকাংশ রবীন্দ্র-সঙ্গীত অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে গেয়ে থাকেন। সেইজন্যে অনেক সময় সে-গানে শুনতে পাই "একটানা, একঘেয়ে কান্নার স্বর—এই কান্না বিনে

রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেন আর কিছুই নেই।" অবশ্য সময় এবং মনের অবস্থা বিশেষে বিলম্বিত লয়ে গাওয়া গান ভাল লাগতে পারে কিন্তু যদি কেউ "চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী" ধরনের গানও টেনে টেনে গেয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে কি বলা যায়?

পরিশেষে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কগায়িকার কাছে বিনীত নিবেদন তাঁরা যেন এই কথাটা মনে রাখেন যে রবীন্দ্রনাথের গান ফরমাসি গান নয় অর্থাৎ বাইরের প্রয়োজনীয়তার তাড়নায় কারও উপরোধে অনুরোধে তিনি গান লেখেন নি। তাঁর গান তাঁর অন্তর্নিহিত কবিশক্তির বিকাশ—তাঁর জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য। সে-গান তাই মানুষের কাছে প্রেমরূপে নিবেদিত হয়েছে, কখনও দেবতার কাছে পূজারূপে উৎসৃষ্ট হয়েছে, কখনও বা প্রকৃতির স্পর্শে চঞ্চল ও মুখরিত হয়ে উঠেছে। যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভার নেন, তাঁদের নিজেদের দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। গাইবার আগে ভাল করে ভেবে দেখা দরকার এ গান স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী কিনা। তারপর চাই গাইবার সময়ে গানের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করে ফেলা। কারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত কেবলমাত্র তো রাগরাগিণীর বাহক নয়—সে-যে কবির 'হৃদয়-মন্থন করা ধন'। গায়কের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে শ্রোতার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলতে না পারলে সে-গানের সার্থকতা কোথায়?

"সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ—
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়—"

এ-গান কি শুধু সুরের বাহন, স্বরগ্রামের সমাবেশ? এ গান যে শ্রোতাকে কর্মে উদ্দীপনা, জীবনে অনুপ্রেরণা দেবে—তার ভয় থেকে, সংকোচ থেকে, বিহ্বলতা থেকে মুক্ত করে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ গান গাইবার সময়ে গায়কগায়িকা নিজে যদি অনুপ্রাণিত না হন, জীবনে অনুপ্রেরণা লাভ না করেন, তাহলে তাঁদের গান কি করে শ্রোতাকে উদ্বোধিত করবে? তাই গান গাইবার সময়ে চাই দরদ, চাই অনুভূতি, চাই সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে গাওয়া এবং গানের ভাবের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া, তবেই না তার ঢেউ লাগবে শ্রোতার বুকে!

"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, আমার সাধের সাধনা—
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা,—
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম অসীম চিত্তবিহারী।"

এই অতি রমণীয় প্রেমের গানটি যখন কেউ গাইবেন, যদি এর সুর ও কথার মধ্যে গায়কগায়িকা নিজের প্রাণের দরদ, অনুভূতি, আবেগ ও আবেশ ঢেলে দিতে না পারেন, তাহলে এ গান তো মনকে স্পর্শ করবে না। গায়ক বা গায়িকার কাছে এ গান সত্য হয়ে উঠলেই শ্রোতার প্রাণে গিয়ে পৌঁছবে তার প্রতিঘাত, আর শিরায় শিরায় বাজতে থাকবে : "তুমি আমারি-যে তুমি আমারি মম অসীম গগনবিহারী"।

"চলিগো চলিগো যাই গো চলে
পথের প্রদীপ জ্বলে গো গগনতলে—"

এ গান গাওয়ার চটুলভঙ্গি ও দ্রুত লয়ে শ্রোতার পা আপনি চঞ্চল হয়ে উঠলেই এ গান-গাওয়া সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক ও শ্রোতা উভয়কেই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের প্রিয় এই ভুবনখানিকে চিনতে হবে, জানতে হবে,—তবেই না রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া এবং শোনা সত্য হয়ে উঠবে আমাদের জীবনে!

নায়িকা প্রসঙ্গ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা সাহিত্যের কালপুরুষকে যদি জিগ্যেস করা যায়—হিসেব রেখে রেখেছেন কত রকমের মেয়ে দেখলেন সারা জীবনে? কালপুরুষ বলবেন—তা বাপু নেই নেই করেও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নেহাত কম হল না। ধলা, কালা, ছিপছিপে, নধর, বেঁটে, এবং লম্বা নানান প্রকারের এবং সাইজের ভ্যারাইটি শো খুলে বসেছে বাঙলা নভেল-নাটক-গল্পের বাজার। বাজার কথাটায় কেউ দোষ ধরবেন না জানি বলেই বললাম (ওটা বঙ্কিমবাবু বলে গেছেন—সুতরাং আপ্তবাক্য)। অবশ্য মেয়েদের এই বিচিত্র বাহার কতখানি খোলতাই হয়েছে তা নিয়ে গোলমাল করা চলে। চলুক। তবু বলব অনেককে দেখলাম। কেউ কেউ শাওন আকাশের মত বেওজর খানিকটা ভ্যাঁক করে কেঁদেই হয়তো বাজিমাত করেছেন, তাইলেও 'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া'।

দ্বার খোলাটাকে যদি আবির্ভাবের সঙ্গে একার্থক করা যায় তবে সার্থক এবং উজ্জ্বল আবির্ভাব ঘটেছে বৈকি বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে। ধরা যাক কৃত্তিবাসের সীতা। সে যুগের সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের কাছে শুভ্র নম্র সীতা বাঙলার মাটির প্রতীকিনী হয়ে যেদিন দেখা দিলেন—কিংবা ধরা যাক বেহুলা—স্থির অবিকম্প অভিযাত্রীর দৃঢ়তা নিয়ে যেদিন দেখা দিলেন সেদিনকে আবির্ভাব-দিবস বলা যায় না? নতুন করে দেখাই শুধু নয় নতুন

করে দেখানোও হল তখন। এই দেখা-দেখানোর মুন্সিয়ানায় বাল্মীকির সীতা বাঙালীর কাছে রয়ে গেলেন দেবনাগরী হরফের হিজিবিজিতে। কৃত্তিবাসের সীতা আসন নিলেন গৌড়-বঙ্গের রসিক মানুষের হৃৎকমলের কেন্দ্রবিন্দুতে। তারপরে সেই সীতা-বেহুলা-রাধার কাল, আর এই লাবণ্য-কমলের কাল। মাঝখানে কেটে গেছে রোহিণী-বিনোদিনীর কাল। এখনকার একেবারে হাল আসলের কুসুম কাশীর বৌ এদের কথাও ভুললে চলবে না। রূপের দিকে তাকিয়ে তাদের আঁখি ঝরে, গুণের কথা ভাবলে মন ভোর হয়ে যায় এমনই এক-একজনা। আছে বঙ্কিমের দুরাশা-সুদূর নায়িকার দল। সংস্কৃত ক্ল্যাসিকের রূপ নিয়ে। রূপ তাদের আগুন, যৌবন তার শিখা। আছে রবীন্দ্রনাথের ফলসাপাড়-শাড়িপরা, বকুল-ফুলের-মালা জড়ানো খোঁপায় সকৌতুকনয়না নায়িকা, আছে শরৎচন্দ্রের ছায়াছায়া স্নিগ্ধ-হাসি মেয়ে—ফল দেয়, পাখির কূজন দেয়, ফুল দেওয়ার ভারটা শুধু ছেড়ে দিয়েছে রবিঠাকুরকে। আছে বুদ্ধদেবের আহা-মোমের-মতো-নরম ব্রাউন রঙের মেয়েরা, তারাশঙ্কর-মানিকবাবুর মাথায়-লেবুতেলঘসা আঁটসাঁট-শাড়ি-পরা প্রগলভযৌবনার দল, কিংবা একান্তই মা-পিসিমা। চরিত্রই বা কত বিচিত্র। ধরুন বুদ্ধদেবের নায়িকা, একটু খুকি-খুকি হবেনই তিনি। একটা চকোলেট কি গোল আলুসেদ্ধ খেতে দিন, একচিলতে মিষ্টি হাসি পাবেন। অথবা মনে করুন প্রবোধ সান্যালের ডেঁপো মেয়েরা, একটু প্রিয়-বান্ধবী-মার্কা লেকচার পাবেন। শরৎচন্দ্রের তরুণীদের কথা ভাবুন—চোখের সামনে ভাসবে গোলগাল মেয়েটি একথালা লুচি নিয়ে সাধাসাধি করছে—সব কথানা খেয়ে উঠবেন কিন্তু। রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের কথা ভাবছেন—ভাবুন, কিন্তু গানের ফরমাশ করবেন না যেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক গান গেয়েছেন, তা বলে সুচরিতা গায় নি, লাবণ্য গান গেয়ে অমিতকে কিছু বলবে ভাবাই যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের নায়িকারা কথা কয়েছে গান গেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের নভেলের নায়িকারা গান গেয়েছে কথা কয়ে। আর বঙ্কিমের ললনাকুল? আমি একটু ভয় করি ওঁদের। সেই অমরনাথ-লবঙ্গলতার সাক্ষাৎকারের পর থেকেই ভয়টা হয়েছে। বেমক্কা কথা কয়ে ফেললে মোটেই বিচিত্র নয় যে শুনতে হবে 'দরোয়ান, বাবুকো নিকাল দেও।' দেবী চৌধুরানী অথবা শ্রীমার্কা রমণীকুল এক হিসাবে বেশ কাটিয়ে গেছেন। চোখের-জল-

ফেলা বাঙালী মেয়েদের নিন্দাবাচনে যাঁরা পঞ্চমুখ তাঁরা থমকে যাবেন প্রফুল্ল কিংবা শান্তি কিংবা শ্রীর সঙ্গে একবার মুখোমুখি হলে। এঁরা মেয়ে নিঃসন্দেহেই—কিন্তু মেয়েলিপনার ধার এঁরা ধারেন না। রবীন্দ্র-আমলে এঁরা কিছুটা দেশত্যাগী হয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথের মেয়েরা সব সময় শুধুই মেয়ে নয়, এক ধরনের নতুন নারীত্বের নিরবয়ব তত্ত্বও কখনো কখনো। বঙ্কিমের ডাঁটো মেয়েদের ক্বচিৎ খুঁজে পেয়েছি মিছিলে জাঠায়—সাহিত্যে কই চট করে মনে তো পড়ছে না। 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' এ তো সরল স্বীকারোক্তি নয়—বরং প্রেমের অহঙ্কারে দর্পিতা নারীর বীরোক্তি। আমি ভালবাসি এমন কথা এমন করে বাঙলা সাহিত্যে আর কে বলেছে। ভ্রমর ক্ষীরিকে একটা চৌচাপটে চড় হাঁকিয়েছিল, তাতে তার নায়িকাত্ব ঘোচেনি—ভাবুন দিকি রবীন্দ্রনাথের নায়িকা কাউকে চড় লাগাচ্ছে, রসাভাব ঘটে যাবে। বুদ্ধদেবের নায়িকা কীটস ছুঁড়ে মেরেছিল বটে তবে সেটা কীটস বলেই সম্ভব হয়েছিল, দাশুর পাঁচালী হলে আর বোধ হয় মারা হয়ে উঠত না। রবীন্দ্রনাথের কুমু অত গোলযোগের মধ্যেও কেমন করে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল ভাবলেই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে মাথায় কী মাখত। অন্যদিক দিয়েও যে যার পথে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের মেয়েরা যখন প্রেম করেছে তখন তারা যেন মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ছে—সকলেই যেন কবি রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা, ডানা লাগিয়েছেন কবি স্বহস্তে। শরৎচন্দ্রের মেয়েরা ভালবাসে বড়বোনের ভঙ্গিতে। রাজলক্ষ্মী রাত দুপুরে শ্রীকান্তের পায়ে হাত বুলিয়েছে—কিন্তু শুধু পায়েই, ইংরাজিতে যা foot বটে, leg নয়। ভিজে কাপড়ের আড়ালে রমার যৌবনশ্রী রমেশ নিশ্চয়ই হাঁ করেই দেখেছিল —কিন্তু খেতে বসে সে ক্ষণবিকার নিঃশেষে ধুয়ে গিয়েছিল। বড়দিদিই শরৎচন্দ্রের মনের মেয়ে। সুচরিতা যেমন রবীন্দ্রনাথের। বাহাদুরি বলব বঙ্কিমের। তাঁর মহিলাদের যেমন গড়নপেটন রকমারি, তেমনি আচার-ব্যবহার বহুরূপী। প্রেমের বেলায় তারা সব জ্বলন্ত মশাল, আলো দিতেও পটু, আগুন দিতেও পেছপা নয়। তবু কি বলা যায় না আয়েষাই বঙ্কিম মানস-কন্যা।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে একালের নায়িকারা সব যেন ভিজে ভাত টাইপের। পেট হয়তো ভরায় কিন্তু আশ মেটায় না। রূপের দিক থেকে

তারা ভোল পালটিয়েছে অবশ্যই। চারুমধ্যা স্থনিতম্বিনী কেউ নয়। ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরানী বা টেলিফোন গার্ল নায়িকা যদি কালিদাসের নায়িকার মতো মরালগামিনী হয় তাহলে ট্রামট্রেনের হাঙ্গামায় চাকরি যাবে না? তাছাড়াও আজকাল নায়িকাদের দেখতে ভাল বলেই যে ভাল লাগে তা নয়। ভাল লাগে বলেই তাদের ভাল দেখায়। এদিক দিয়ে অন্তত আমরা সাবজেক্টিভ হয়েছি। হলেও নায়িকা নির্ণয়ের নতুন কালেও ঠকিনি আমরা। সাদা-ব্লাউজপরা, সাধারণ-শাড়ি-চড়ানো ছিমছাম নায়িকা, অফিসের শেষে বাদামের ঠোঙা হাতে করে নায়ক সম্ভাষণে যাবে গড়ের মাঠের নরম ঘাস স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতোয় মাড়িয়ে—যাই বলেন আমার শুধু ভাল লাগে বলছি না—বলছি তোমাকে চিনি চিনি হে স্বদেশিনী।

তা সত্ত্বেও বলব একালের নায়িকারা প্রেমিকা নয়। একেবারে হালের কথা ছাড়ুন, 'পয়লা' ডাকে ঘোষণা করা যায় এমন ঔপন্যাসিকদেরও লেখায় মনে রাখবার মতো প্রেমিকা নায়িকা কই। বসন আর ঠাকুরঝি (সেই স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল) ছাড়া তারাশঙ্করের প্রেমিকা নায়িকার কথা মনে করাই মুশকিল, বনফুলের কিংবা বিভূতিভূষণের কোন্ নায়িকা প্রেমের পথে বিজয়িনী? এ কি কালের দোষ? কেননা সেকালের প্রায় লেখকই নায়িকামুখীন এবং একালের সব লেখকই নায়কসর্বস্ব। হেতুটা বোধহয় এখানেই যে একালের লেখকেরা জীবনকে দেখতে চেয়েছেন স্বভাবতই সেকালের লেখকদের চেয়ে ব্যাপক আকারে কেননা জীবনের বিস্তার একালে বেশি। সীমায়িত জীবনের মাঝে বন্দিনী নারীকে নিয়ে তা হবার নয়। তবু এরি মাঝখানে মনে রাখা চলে মানিকবাবুর পুতুলনাচের ইতিকথার কুসুমকে—পেটব্যথার ছল করে শশীকে যে রাত্রে ডাক করিয়েছিল কিন্তু আসল ব্যথার কথা যে কিছুই বলতে পারেনি। যার জন্যে সেই তালবনের উঁচু টিলাটার উপরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার সাধ শশী ছেড়ে দিল ইহজীবনের মতো। কুসুমের শেষ আক্ষেপ কাকে ডাকছেন ছোটবাবু শুধু আক্ষেপোক্তি নয়, ব্যর্থ নারীত্বের রক্তিম হাহাকার।

কিন্তু কুসুমের কথা আর কতটুকু বলুন। তা বাদে আর কই? বিষ খাওয়ার পর হঠাৎ প্রগল্‌ভ কুন্দনন্দিনী আজীবনের নীরবতা পরিহার করে মুখর হয়ে উঠল। তার মতো বেদনার্ত মুহূর্তের অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও

এখন ঠিক অমনটি আর পাবেন না। পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রভাতশুক্র-তারারূপিণী রোহিণী ভেবেছিল মরিব কেন—অনেক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালী নায়িকারা একালে আর অমনটি ভাবে না। কেননা একালের নায়িকারা প্রেমিকা নয়। একালের বাঙলা নভেল থেকে নির্বাসিত প্রেম বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো হয়ে বাঙলা ফিলমে আশ্রয় নিয়েছে। বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো হলে যা হয় প্রেমেরও তাই হয়েছে।

সেই জন্যই আমরা যারা কৈশোর কাটিয়েছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আর যুবক হলাম যুদ্ধের মধ্যে আমাদের অবস্থা হয়েছে ন যযৌ ন তস্থৌ। আমাদের মন পড়ে রইল বিগত যুদ্ধের নায়িকাদের কাছে আর আমাদের বুদ্ধি আঁকড়ে ধরল এ যুগের নায়িকাদের আঁচল। ফলে আমাদের নায়িকা-বাসনা রকমারি নারী-চরিত্রের একত্র-মিশ্রিত ককটেলে রূপান্তরিত হল। আমরা খুঁজেছি শৈবলিনীর মতো সুন্দরী, কুন্দের মতো করুণ, সুচরিতার মতো রিজার্ভড এবং কুমুর মতো ইমোশনাল একজনাকে। যা হবার নয়। তাই আমাদের নায়িকা সম্ভাষণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ যাকে পেলাম আমরা, সে ঐ কজনার কেউ নয়। এখনকার নায়িকাকে সাতশ ঝঞ্ঝাট সামলে তবে নায়িকা হতে হয়। অথর্ব বাবা, পীড়িতা জননী, অপোগণ্ড ভাইবোন—অফিসের ইউনিয়ন এবং ধর্মঘট এই সমস্তের দাবি মিটিয়ে তবে সে প্রেমের আকাশ খুঁজে পায়। সেই জন্য লক্ষ্য করে দেখবেন এখনকার নায়িকারা কথা কম বলে—কাঁধে ব্যাগঝোলানো দ্রুতগামিনীরা সুচরিতা এবং সাবিত্রীর মতো কেবল কথা বলে যাচ্ছে এটা আশা করেন কী করে। বঙ্কিমের নায়িকারাও কথা বলেছে কম—তবে যা বলেছে সব মোক্ষম মোক্ষম কথা। বঙ্কিমের নায়িকাদের অনেকেরই কথা সাধারণ্যে মুখস্থ তা ঐ মোক্ষম কথা বলেই। 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' লোকে কী লাইটে নিয়েছিল জানতে গেলে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়ুন। 'আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকিতে জল অধোগামিনী কেন' কিংবা 'প্রতাপ আজি এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?' এ সমস্ত কথাই বাগবৈদগ্ধ্যের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। একালের নায়িকারা সেদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছেন। প্রেমের কথা মানের কথা সবই তাঁদের যেন কথার কথা। কথা কম বলুন মহাশয়াগণ ক্ষতি নেই কিন্তু কিছু কথা বলুন যা শুধু কথা নয়। একেবারে হাল আমলের নরেন মিত্তিরের মেলানকলিক

নায়িকারা কখনো কখনো কথা বলেছে কৌশলে—সে সমস্ত কথায় সেই সব পিপাসাক্লিষ্ট নারীত্বের ব্যক্তিবেদনা ফুটেছে। কিন্তু এ রকম দুটি একটিকে বাদ দিলে বর্তমান বাঙলা উপন্যাসের দিকে তাকালে স্বতঃই মনে না হয়ে পারে না যে একালের বাঙালী মেয়েরা আর সেকালের বাঙালী মেয়েদের মতো বাক্‌-পটীয়সী নেই। তারাশঙ্করের মা-মা ধরনের মেয়েদের কাছে বসলে একধরনের পুরনো কথার সুর শোনা যায় যা তারাশঙ্করের অতীতাশ্রয়ী রূপকথাকারের মনোভাব থেকে জন্মেছে। তারাশঙ্করের দুলে-বাগদী মেয়েরা অবশ্য মাঝে মাঝে আশ্চর্য সব কথার জাল বুনেছে। সত্যি বলতে কি তাদের উক্তি-প্রত্যুক্তির দ্রুত শানিত চমকের গ্রাম্য সরল বলিষ্ঠতায় মাঝে মাঝে থতিয়ে না গিয়ে উপায় থাকে না। 'যম তো আর নসুর বাবা নয় যে তুই যার কাছে বলবি তার কাছে যাবে' নসুর মাকে বলা এই কথার মধ্যে কী রস যে আছে প্রসঙ্গবিচ্যুত লাইনটুকুতে তা হয়তো ঠিক বোঝা যাবে না। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কাহার মেয়ের দল কথার রং ধরাতে কতখানি ওস্তাদ ছিল তা জানতে গেলে আমাদের হাঁসুলী বাঁকের উপকথার নায়িক হতে হয়।

তাই বলছিলাম যাই বলুন না কেন উনিশশতকের মধ্যবিত্ত জীবনের সেই সব আশ্চর্য নায়িকাদের আমরা হারিয়েছি। সুচরিতা—সে যেন শক্ত করে বাঁধ দেওয়া নদীর মতো—কূল অক্ষুণ্ণ রেখে যার সমুদ্রাভিসার। ভ্রমর—সে যেন গত যুগের চিতাভস্ম ঝেড়ে ফেলা নতুন নারী। প্রথমে ব্যক্তিত্বের উপলব্ধিতে যে মৃৎপ্রদীপের শান্ত শিখার মতোই স্থিরদ্যুতি, কিন্তু অনুজ্জ্বল। লবঙ্গলতার মতো, কিম্বা বড় কথায় কাজ কি ইন্দিরা কি মানভঞ্জনের গিরিবালার মতো বিশিষ্টা নায়িকাদেরও এখন আর আমরা খুঁজে পাব না। তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতিভূষণ বা মানিকবাবু অথবা কনিষ্ঠদের মধ্যেই যদি ধরেন সমরেশ বসুর ভাইব্রেটিং নায়িকা এবং নরেনবাবুর মেলানকলিক নায়িকার দলও সেই অপূর্বপথগামিনী স্বতন্ত্র নারী নয়। অথচ এখনকার নারীর বেদনা, তার অচরিতার্থতা-বোধ স্বভাবতই বাঙলাদেশের জীবনাবর্তে আরো জটিল হয়ে উঠেছে। প্রেমের বেদনাই শুধু নয়—একালের মেয়েরা তো দুচোখ ভরে দেখেছে তার নিজেরই ক্রীড়নক রূপ—দেখেছে তার ব্যক্তিত্বের প্রতিমার চক্ষুদান বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা কিছুই হল না। কাজেই এই বেদনার নীলপদ্মে একটি মর্ত্যমানবীর দেহ আর মনের ধ্যানমূর্তি গড়ে তোলা যেত। গেল

না কেবল আমাদের লেখকেরা নায়িকাদের প্রেমে পড়তে ভুলে গেছেন বলে। বঙ্কিম কি রোহিণীকে কম ভালবাসতেন? রোহিণীকে কত কটূক্তি করেছেন কিন্তু পড়ে দেখুন দেখবেন রোহিণীর বিশেষণে, সংস্করণের পর সংস্করণে রোহিণীর স্বভাব পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে রোহিণী-মুগ্ধ বঙ্কিমকে। রোহিণী প্রভাতশুক্রতারারূপিণী, রোহিণী বালনখরছিন্ন পদ্মিনী, রোহিণী প্রথম আবির্ভাবে চোর, দ্বিতীয় আবির্ভাবে শুধুই কাঙালিনী। শেষ দৃশ্যে গোবিন্দলাল-মানসপটে (প্রথম সংস্করণে) রোহিণী যতটা, ভ্রমর তার থেকে অধিক কিছু নয়। আমি তো এখনো রোহিণীকে কল্পনায় দেখতে পাই, সুন্দর ঠোঁটে পিচ করে পানের পিক ফেলে গোবিন্দলালের প্রসঙ্গে যেন বলতে চাইছে—ঝাঁটা মারি—যেমন মমের রেন গল্পের সেই মেয়েটি বলেছিল—You filthy dirty pigs. You are all the same. You men.।

তবে একথা নিশ্চয় যে একালের নায়িকা সেকালের মতো হলে কালৌচিত্যেরই হানি হবে। কিন্তু একালের নায়িকা একালের মতন করেই গড়ে উঠুন মহৎ উপন্যাসের চরিত্র হয়ে। একালের নায়িকারা অতীতের ফাঁকি বর্তমানের বিশূন্যতা সব জড়িয়ে এক মানবিক বেদনার প্রতিভূ হিসাবে আবির্ভূত হবেন বাঙলা উপন্যাসে। একালের মেয়েদের ব্যক্তি-মানসের নতুন সংঘাত, নতুন জিজ্ঞাসা আমাদের বিগত-মোহ করে তুলবে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আইডিয়াল নায়িকার পর আমরা এবার সত্যিকারের রিয়্যাল নায়িকার সন্ধান করছি। পুরনো মানদণ্ড জীবনেও পালটাছে শিল্পেও পালটাবে তাতে আর সন্দেহ কি? কর্মী এবং কর্মিষ্ঠা, জীবন সংগ্রামের হাসপাতাল ডিউটিটুকুতেই শুধু নয়। যথার্থ সৈনিক মেয়ে সমাজে যথাতথাই দেখতে পাচ্ছি। সাহিত্যেও এই নারীকুল বাঙলা সাহিত্যের নায়িকা প্রকরণের নব পর্যায় শুরু করেছেন। এঁদের জয়কামনা করে এই নায়িকা-প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানলাম।

সোবিয়েত রাশিয়ায় লাইব্রেরী ব্যবস্থা

শান্তি দেবী

মানুষের সহজাত জ্ঞানোন্মেষের বিকাশ সভ্যতায়; এবং সভ্যতার সম্যক প্রকাশ হয় একটা জাতির শিক্ষা, সংস্কারের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষার প্রধান সহায়ক পুস্তক। মানুষের জীবনের বিভিন্ন চিন্তা ও অভিব্যক্তির প্রকাশ মানুষের লেখায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে—আর তা থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা জোগায় অন্য আরও সকলকে। এই পুস্তক ও লিপিবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের প্রচার ও সংরক্ষণ হতে পারে লাইব্রেরীর মাধ্যমে।

আজ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই সেখানে শিক্ষার এবং সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীর কত ব্যাপক প্রসার। সর্বক্ষেত্রে নব নব উন্নতির পথে অগ্রণী সোবিয়েত রাশিয়ায় জ্ঞানভাণ্ডার হিসাবে সেখানকার লাইব্রেরীগুলির প্রসার ও উন্নতি আজ পৃথিবীর বিস্ময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ছাড়া লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়ক হিসাবেও কাজ করছে সেখানকার লাইব্রেরীগুলি।

লাইব্রেরী সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত হওয়া অনেকাংশেই নির্ভর করে রাষ্ট্রের সহায়তার উপর। সোবিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগঠনের প্রথম অবস্থা থেকেই রাষ্ট্র দেশের ব্যাপক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভার নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীগুলির সংস্কার ও সংগঠনের দায়িত্বও নিয়েছে। দেশের সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার দেশের মধ্যেই সুরক্ষিত করবার

জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে চারটি বিশেষ বিধি (decree) প্রণয়ন করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে যেসব ছোট ছোট লাইব্রেরী ছিল তার সমস্ত বই, মূল্যবান গ্রন্থসমূহ ও পুঁথিপত্র এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, ধ্বংসপ্রায় বা অবলুপ্তপ্রায় লাইব্রেরীগুলির বই প্রভৃতি সমস্তই রাষ্ট্র স্বয়ং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। যাতে এই সমস্ত সামগ্রী উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে তার মধ্যে দিয়ে এইগুলিকে ব্যবহার করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সমস্ত গ্রন্থপ্রণয়ন ও মুদ্রণ সবই স্বয়ং রাষ্ট্রের পরিচালনায় হয়। ১৯২০ সাল থেকে সেখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থপ্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে—এবং সেই কাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য তার বইএর সংখ্যায়—এবং বিভিন্ন মানুষের বহুমুখী অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক জোগানোর মধ্যেই তার সার্থকতা। প্রয়োজনানুযায়ী সোবিয়েত রাশিয়ায় লাইব্রেরীগুলিকে প্রধানত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করে লোকশিক্ষার ব্যাপক সহায়তার কাজে লাগানো হয়েছে।

যেমন—

১। রাষ্ট্রীয় সাধারণ লাইব্রেরী (State Public Library) ;

২। বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক লাইব্রেরী (Library of Academy of Sciences) ;

৩। বিশেষ বিষয়ক লাইব্রেরী (Special Libraries) ;

৪। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী ;

৫। ট্রেড ইউনিয়ন লাইব্রেরী :

৬। জনসাধারণের লাইব্রেরী (Mass Libraries)—

এর মধ্যে রয়েছে স্কুল ও শিশুদের লাইব্রেরী, গ্রাম্য লাইব্রেরী, সৈনিকদের লাইব্রেরী, ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী (Travelling Library) প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯৩৯ সালে যেখানে লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল ২৪০,৭৫৬ এবং বইএর সংখ্যা ছিল ৪৪·২ কোটি ১৯৫৩ সালের মধ্যে সেখানে ৩৮০,০০০ লাইব্রেরী হয়েছে এবং সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ১০০ কোটি। এই সমস্ত লাইব্রেরীর মধ্যে গ্রাম্য

লাইব্রেরীর সংখ্যাই ২৮৫,০০০। ১৯৫০-৫৫এর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লাইব্রেরীর সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। ১৯৫৩ সালে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে ব্যাপকভাবে স্থানীয় লাইব্রেরী ও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

এবার বিভিন্ন শ্রেণীর লাইব্রেরীগুলির সংস্থা ও কর্মপদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত **রাষ্ট্রীয় সাধারণ লাইব্রেরী**—এই লাইব্রেরী সংস্থার মধ্যে রয়েছে জাতীয় লাইব্রেরী (National Libraries), প্রাদেশিক লাইব্রেরী (Provincial Library) ও আঞ্চলিক লাইব্রেরী (Regional & Municipal Library) গুলি। সেগুলি সবই কপিরাইট লাইব্রেরী অর্থাৎ সারাদেশে যত বই প্রকাশ ও সঙ্কলন হয় তার প্রত্যেকটিরই কপি এই লাইব্রেরীতে থাকে। লেনিন লাইব্রেরী হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরী।

আজ মস্কোর লেনিন লাইব্রেরীর কথা বিদ্যোৎসাহী সকলেই জানেন। ১৮৬২ সালের প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরী বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতির পথে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। ১৯৫২ সালে তার বইএর সংখ্যা ছিল ১·৫ কোটি, এবং বৎসরে ৬০০,০০০ হিসাবে তার পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃহৎ লাইব্রেরীতে ১২টি পড়বার ঘর (Reading Room) রয়েছে যাতে একসঙ্গে ১২০০ থেকে ১৫৪০ সংখ্যক পাঠকের স্থান সংকুলান হতে পারে। সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরী সকাল ৯ থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকে, এবং দৈনিক ৪,০০০ হাজারের উপর লোক এই লাইব্রেরীতে আসে ও বই নেয়। সম্প্রতি সেখানে আরও নূতন নূতন পড়বার ঘর বাড়ানো হয়েছে। বই রাখবার জন্য ১৮ তলা তাকের (18 tier stacks) ব্যবস্থা রয়েছে। এই লাইব্রেরীর প্রধান পুস্তক পরিবেশন কেন্দ্র (main distributing centre) থেকে পাঠগৃহে বই সরবরাহ করবার জন্য রয়েছে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক ট্রেনের ব্যবস্থা। এক একটি ট্রেনে ১০০ পাউণ্ড ওজনের বই নিয়ে —এই ট্রেনগুলি সমস্ত লাইব্রেরীতে বই সরবরাহ করে।

এই তো গেল দৈনন্দিন পুস্তক সরবরাহ ব্যবস্থা। তাছাড়াও রয়েছে আন্তর্লাইব্রেরী পুস্তক আদান-প্রদানএর (Inter-Library loans) ব্যবস্থা। ১৯৪০-৪৮ সালের মধ্যে যা হিসাব পাওয়া যায়, তা প্রায় ৩৭,০০০ সংখ্যক

পুস্তকের আদান-প্রদান। আন্তর্জাতিক লাইব্রেরীর আদান-প্রদানেরও (International exchange) ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে মাইক্রোফিল্ম্স্এর ব্যবস্থা করায়—এই আদান-প্রদানের কাজ আরও সুগম হয়েছে। লাইব্রেরী-বিজ্ঞান ও বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্যও রয়েছে বিশেষ বিভাগ। যৌথ প্রণয়ন পদ্ধতিতে (Co-operative basis) ১৭০৮ সাল থেকে রাশিয়ায় মুদ্রিত সমস্ত বইএর একটি সংযুক্ত পুস্তক তালিকা (Union Catalogue) প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা চলেছে।

লেনিনগ্রাদের 'জাতীয় লাইব্রেরী'টিও এমনই আর একটি লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এখান থেকে যাবতীয় রাশিয়ান্ বইএর একটি সাধারণ গ্রন্থসূচী (General Catalogue) প্রণয়নের কাজ চলেছে। তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে লেনিন লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক লাইব্রেরী ও সংযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন সংঘ লাইব্রেরী (All Union Book Chamber) প্রভৃতি। এই শেষোক্ত লাইব্রেরী থেকে রুশসাহিত্য-পঞ্জি তৈরি করা হচ্ছে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রেই এই রকম বৃহৎ রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরী রয়েছে।

সোবিয়েত রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণা—অ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্সগুলি (Academy of Sciences) দ্বারা পরিচালিত। এবং এই গবেষণা ও শিক্ষার সহায়ক হয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ক লাইব্রেরীগুলি। এগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(ক) পদার্থ ও গণিতশাস্ত্র (Physics and Mathematics); (খ) ভূতত্ত্ব ও ভূগোল (Geology and Geography); (গ) প্রাণীতত্ত্ব, (ঘ) কারিগরিবিজ্ঞান (Technology), (ঙ) ইতিহাস ও দর্শন, (চ) অর্থশাস্ত্র ও আইন, (ছ) সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব। এই প্রতিটি বিষয়ের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন লাইব্রেরী। ১৯৫০ সালে মস্কোতে ২৬টি এবং লেনিনগ্রাদে ১৩টি এই ধরনের লাইব্রেরী ছিল। এছাড়া বিভিন্ন শাখা লাইব্রেরী ও গবেষণা লাইব্রেরীর (Research Library) সংখ্যা ধরলে বহুসংখ্যক এই শ্রেণীভুক্ত লাইব্রেরীর হিসাব পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানের লাইব্রেরীগুলি যেমন বিজ্ঞান গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যম হয়েছে, অন্য অন্য বিষয়ক লাইব্রেরীগুলি তেমনি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হয়েছে।

যেমন—মস্কোর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লাইব্রেরী, সমাজতত্ত্ববিষয়ক লাইব্রেরী,

সংযুক্ত পুস্তকসংঘ লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থা লাইব্রেরী (Central Institute of Labour); পররাষ্ট্র সচিব মণ্ডলীর লাইব্রেরী (Library of the Ministry of Foreign Affairs); কেন্দ্রীয় চিকিৎসক লাইব্রেরী এবং লেনিন্‌গ্রাদের লান্‌চেবুস্কি থিয়েট্রিকাল লাইব্রেরী (২০০,০০০ বই; ১৯৫০), বোটানিকাল গার্ডেন লাইব্রেরী, ভূতত্ত্বপর্যবেক্ষক লাইব্রেরী ও রাষ্ট্রীয় কৃষিশিল্প লাইব্রেরী প্রভৃতি। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভাগীয় লাইব্রেরীগুলির থেকেও এই লাইব্রেরী-গুলি আরও বিশেষ বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ ও পরিবেশন করে।

এবার আমরা ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীগুলির কথা বলি। প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতেই এক-একটা বৃহৎ লাইব্রেরী রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মস্কোর লোমোনোসভ্ স্টেট ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী। ১৯৫০ সালে কয়েকজন অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক মিলে এই লাইব্রেরীটিকে আরও বর্ধিত করবার পরিকল্পনা নেন—যাতে সেখানে প্রায় ১,৮০০,০০০ সংখ্যক বইএর সংকুলান হয়। ১৯৫৩ সালে এই নূতন লাইব্রেরীটির উদ্বোধন হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের বই ও বিভাগীয় লাইব্রেরীর সমন্বয়ে এই লাইব্রেরী আজ আয়তনে ও প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যত বই প্রকাশ হয় তার প্রত্যেকটির একটি করে কপি এই লাইব্রেরী পায়। যাতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের কোন সময়েই কোন বই পেতে অসুবিধা না হয় সেজন্যে সমস্ত বইই দুই পর্যায়ে ভাগ করে রাখা হয়েছে। কিছু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বই আছে যেগুলি লাইব্রেরীতে বসেই পড়তে হয়—অধ্যাপকদেরও বিশেষ অধ্যাপনার জন্য এই ব্যবস্থা। আর এছাড়াও রয়েছে ২০০,০০০ বই যা ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়তে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বই গবেষণাকক্ষগুলির কাছেই রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে। লাইব্রেরীটি ষোল তলা এবং সেখানে যে তেত্রিশটি ঘর রয়েছে—তাতে একসঙ্গে ১,০০০ পাঠক বসে পড়াশুনা প্রভৃতি করতে পারে। প্রত্যেক তলাতেই রয়েছে গ্রন্থসূচী এবং বিভিন্ন তত্ত্বসমন্বিত ব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে তথ্য সংগ্রহ সংস্থা।

এই লাইব্রেরীটি ছাড়াও আরও অনেক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী রয়েছে। যেমন টম্‌স্ক-এ কুইবিশেভ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী—বইএর সংখ্যা ১.৪ লক্ষ, টিফ্লিসের জে, ভি, স্তালিন লাইব্রেরী ও কাজান্, ওডেসা,

টাসকেণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার লাইব্রেরীগুলি। এর প্রত্যেকটিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরী।

ট্রেড ইউনিয়ন লাইব্রেরী—সোবিয়েত ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সংগঠিত এই লাইব্রেরীগুলি ম্যাক্সিম গোর্কি সেণ্ট্রাল সিণ্ডিক্যাল লাইব্রেরী এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন লাইব্রেরী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত।

১৯:৮ সালে মাত্র ৬,০০০ বই নিয়ে ম্যাক্সিম্ গোর্কি লাইব্রেরীর কাজ শুরু হয় আর ১৯৪৮ সালে সেখানে বইএর সংখ্যা হয় ৮১,০০০ এবং সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৬,০০০ এবং বর্তমানে সোবিয়েত রাশিয়ায় যা বই ছাপা হয় তার প্রত্যেকটির এক কপি এই লাইব্রেরীতে দেয়। এই লাইব্রেরীর উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে প্রধান প্রধান বইএর ছয়টি তালিকা ও বিশিষ্ট রাশিয়ান উপন্যাসের ছয়টি গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করা হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের যে বিজ্ঞান লাইব্রেরী আছে, তাতে রয়েছে ৩৩০,০০০ পুস্তক এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র। এই সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সোবিয়েত ইউনিয়নের সাময়িক পত্রিকাই ৬৭৩খানা, এবং ৪০,০০০ এর উপর বাঁধানো ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকা রয়েছে যার মাধ্যমে সমস্ত দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে জানা যায়, আর রয়েছে ৮০০ খানেক বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকা।

১৯৩৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল ৮,৬৮০ এবং পুস্তক সংখ্যা ছিল ৫·১ কোটি। কিন্তু ১৯৪৪ সালে সেগুলির সংখ্যা ২,১৮০ করা হয়। তারপর আবার ১৯৪৯ সালে লাইব্রেরীর সংখ্যা হয় ৪,৯১১ এবং পুস্তকসংখ্যা ৩·০ কোটি এবং এখন ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে।

জনসাধারণের শিক্ষা ও জ্ঞানপিপাসা মেটাবার জন্য যে লাইব্রেরীগুলি রয়েছে সেই সংস্থায় আসে স্কুল ও শিশু লাইব্রেরী এবং গ্রাম্য লাইব্রেরী প্রভৃতি।

(ক) স্কুল ও শিশু লাইব্রেরীগুলির মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে **কিয়েভ্ লাইব্রেরী**। ১৯৪৯ সালে এর বইএর সংখ্যা ছিল ১৩৫,০০০, সবশুদ্ধ ঘর ১৯টি, এবং একসঙ্গে ২০০ ছেলেমেয়ে বসতে পারে এমনি একটা পড়বার ঘর। এর কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে গ্রন্থপরিবেশন কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। ১৯৫০ সালের হিসাবে পাওয়া যায় যে এখানে ৯৬টি পরিবেশন কেন্দ্র আছে।

এই পরিবেশক লাইব্রেরীগুলি—পায়োনিয়ার ক্যাম্প, শিশু স্বাস্থ্যাবাস, হাসপাতাল, শিশুআগার এইং ট্রেড এগ্রিকাল্চারাল্ স্কুলগুলিতে বইএর জোগান দেয়।

শিশু লাইব্রেরীগুলির কার্য পরিচালনা সাধারণত স্কুল লাইব্রেরীগুলির সঙ্গেই করা হয়। লাইব্রেরীর রীডিংরুমেই অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে এবং যারা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ছুটির সময়েও বই দেবার ব্যবস্থা। গ্রীষ্মকালে ছেলে-মেয়েদের জন্য খোলা বাগানে ক্লাসের বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের হিসাবে জানা যায় যে সারা সোবিয়েত রাশিয়ায় এমনি শিশু লাইব্রেরী যুদ্ধোত্তর সময়ের থেকে ১৫৩ গুণ বেড়ে গেছে।

(খ) **গ্রাম্য-লাইব্রেরী ও শহরের উপকণ্ঠবর্তী লাইব্রেরী**—(Rural Libraries & County Libraries)—বিশাল সোবিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের লাইব্রেরী গঠন করা ও তার কাজ চালানো খুব সহজসাধ্য নয়। প্রথমত তার বিশাল বিস্তৃত পরিধি, দ্বিতীয়ত বিভিন্ন জায়গা জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা। সোবিয়েত সরকার অবশ্য বিভিন্ন উপায়ে এই সকল সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে লোকশিক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে উপকণ্ঠ লাইব্রেরী সংগঠনের কাজ করে চলেছেন। ওই সুবিস্তৃত, জনবহুল এলাকায় যেভাবে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার কিছু কিছু এখানে বলা হল।

১। ডাকযোগে বই দেওয়ার ব্যবস্থা (Postal Loan)।

২। বাক্স মারফত বই সরবরাহ করা। যেসব অঞ্চলে এখনও লাইব্রেরী গড়া হয় নাই বা সেখান থেকে নিকটতম লাইব্রেরীতে আসাও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বা এমন জায়গা যেখানে নিয়মিতভাবে যাতায়াতের অসুবিধা আছে সেইরকম জায়গাগুলির জন্যই এই ব্যবস্থা।

৩। পুস্তকবাহক মারফত (Book Carriers)—এই ব্যবস্থাটা সাধারণত অসুস্থ লোক বা সাময়িকভাবে লাইব্রেরীতে আসতে অক্ষম এমন লোকদের জন্যই।

৪। ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী—এই শেষোক্ত উপায়েই এখন যতদূর সম্ভব বই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা গত মহাযুদ্ধের পর থেকেই শুরু

হয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রথম পুস্তকবাহী গাড়িতে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর কাজ শুরু হয়, এবং ১৯৪৮ সালের মধ্যেই তা বেশ ভালভাবে চালু হয়। ১৯৫০ সালে এমনি ৫৫টি লাইব্রেরী সমস্ত এলাকায় পুস্তক পরিবেশন করে, তবে এই ব্যবস্থার ক্রমে আরও উন্নতি ও প্রসার হচ্ছে। এই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর এক-একটি গাড়িতে ১,১০০ থেকে ১,২০০ বই থাকে এবং পাঠক পাঠিকাদের প্রয়োজনানুযায়ী নূতন নূতন বইও সরবরাহ করা হয়। সমস্ত গাড়িগুলিতেই রেডিও লাগানো থাকে এবং যেখানেই গাড়িটি থামে রেডিও থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও নানারকম খবর লোকদের শোনানো হয়। এলাকার দূরত্ব অনুসারে কোথাও কোথাও ১১ থেকে ১২ দিন ধরে একটা গাড়ি ঘুরে ঘুরে বই দেয়—কোথাও আবার ৩ থেকে ৫ দিনও লাগে। প্রয়োজনমতো একদিনেই বই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। সাধারণত ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যে এই বই দেওয়া ও নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীগুলি ১,৭৬৭ গ্রামবাসীদের বই দিতে পেরেছে এবং পাঠকদের সংখ্যা প্রায় ১৪৫,৯১৩-এর মতো এবং বই বিলি করা হয়েছে ৩০৯,৮০৯। গ্রাম্য লাইব্রেরীগুলিতে প্রায় প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যার দিকে লাইব্রেরীর উদ্যোগে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে খবরের কাগজ পড়া ও বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়।

শীতকালে বেশিরভাগ সময়ই বরফ পড়ার জন্য বইএর গাড়িগুলি যখন নিয়মিত যাতায়াত করতে পারে না তখন বই-দেওয়ার সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া কৃষকরা যখন ক্ষেতের কাজের জন্য গ্রাম থেকে বাইরে ক্ষেতের কাছাকাছি কয়দিনের জন্য থাকেন তখন তাঁদের জন্যও সেই সময়-কালীন বই সরবরাহ করবার ব্যবস্থা রয়েছে।

এই তো গেল মোটের উপর লাইব্রেরী ব্যবস্থা ও বিভিন্ন লাইব্রেরীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন এই লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সেখানে হয়েছে সে সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন।

মস্কো, লেনিনগ্রাদ, খারকোভ্ এবং অন্যান্য কয়েকটি লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। রুশবিপ্লবের পূর্বে এই লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষাব্যবস্থা নামেমাত্র ছিল। ছয়মাস পড়িয়েই এক-একজনকে ডিপ্লোমা দেওয়া হত। এখন সেখানে চার বৎসরের জন্য

শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরীর মধ্যে যা যা করণীয় তা তো শেখেই—সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে বক্তৃতা দেওয়ারও শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক মাসে যে সাহিত্যচক্রের অধিবেশন হয় তাতে কিছু না কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এই সঙ্গে, রেডিওতে বার্তাপ্রচার কৌশলও শেখানো হয়।

প্রত্যেকটি লাইব্রেরীয়ান্ শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকেই শিখতে হয় কিভাবে উপযুক্ত বই বাছাই করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন লাইব্রেরী পরিদর্শন করতে যেতে হয়—তাছাড়া শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা, লাইব্রেরী পরিচালনা ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও হাতেকলমে কাজ করে শিক্ষা নিতে হয়। এই সমস্তর মধ্যে দিয়ে তারা সমগ্র দেশেরই সবরকম লাইব্রেরী পদ্ধতির একটা সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

এ ছাড়াও যারা গ্রাম্য লাইব্রেরীতে ও ট্রেড ইউনিয়ন্ লাইব্রেরীতে কাজ করবেন তাঁদের জন্য রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা এবং যাঁরা শিশু লাইব্রেরীতে কাজ করেন তাঁদেরও স্কুল শিক্ষকদের উপযোগী শিক্ষা নিতে হয়।

এই চার বৎসরের শিক্ষাকালীন খরচ সরকারই বহন করেন।

সমান্তরাল

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

পা টিপে টিপে উঠে এলো প্রকাশ। ধীরে ধীরে পর্দাটা সরিয়ে উঁকি দিল। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকল। ফেরেনি এখনো।

দ্রুত হাতে ড্রেসিং গাউনটা পরে নিয়ে আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিল তারপর। শান্তাকে মালকানির বাসায় পৌঁছে দিয়েই চলে এসেছে, পার্টিতে সে যায়নি, করবীর সঙ্গে দেখা হয়নি তার, সেই তিনটে থেকে বসে বসে অফিসের কাজগুলো শেষ করছে।

কেমন লেগেছে তার করবীর সান্নিধ্য, দুটি ঘণ্টা কেমন করে কেটেছে অর্থহীন বিলাপ-প্রলাপে, সেকথা এখন আর মনে পড়ছে না। এতক্ষণ সে মনে মনে চেয়েছে শান্তা যেন এর মধ্যে না ফিরে থাকে, আবার ঠিক এই মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কাটা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্মচেয়ারে বসে বসে অস্থির হয়ে উঠছে সে। কোথায় গেল মালকানি শান্তাকে নিয়ে? সিনেমা থেকে বড়োজোর 'এম্‌ব্যাসি' কি 'গে-লর্ড'। কিন্তু সে-ও তো ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগার কথা নয়। তবে কি? না, শান্তা অত কাঁচা মেয়ে নয়।

তবুও, যদিও নিজে থেকেই প্ল্যান করে পাঠিয়েছে সে, অস্থির হয়ে উঠল প্রকাশ।

আরো একঘণ্টা পরে ফিরল শান্তা। প্রকাশের অস্থির আশঙ্কাটা

তখন ব্যাকুলতা ছাড়িয়ে রাগের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে বলল, না ফিরলেই পারতে।

ঘা খেয়ে থামল না শান্তা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সমান ব্যঙ্গে উত্তর দিল, সেকথাটা আমিও তোমাকে বলতে পারি।

চমকে উঠে প্রকাশ বলল, তার মানে? —তার মানে আমিও তোমাকে করবী মিত্রর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি।

কৈফিয়তের অপেক্ষা না করেই ওয়ার্ডরোবের দিকে চলে গেল শান্তা।

মুখ নিচু করে নিভে যাওয়া পাইপটা আর-একবার ধরাল প্রকাশ। মাথার ওপরে ফ্যানটা ঘুরছিল অদৃশ্যভাবে, তবুও গরম, অসহ্য গরম লাগছিল এতক্ষণ, এবার যেন হেমন্ত বাতাসে শীতের আভাস। ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে আবার এসে বসল, তারপর আবার উঠল, পায়চারি করতে করতে মনে মনে বলল, তবে কি ওরাও ইণ্ডিয়া গেটে ঘুরছিল এতক্ষণ। এমন জেদী করবীটা, ইণ্ডিয়া গেটেই যেতে হবে!

শান্তা বলল, খেয়ে এসেছে সে। কে জানে। তবু একা-একাই ডিনার টেবিলে বসতে হল প্রকাশকে, হয়তো শুধু হোটেলে খেয়ে আসেনি করবীর সঙ্গে, এটাই প্রমাণ করার জন্যে।

মিনিট কুড়ি পরে ঘরে এসে দেখল আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে শান্তা। এর মধ্যে যে ঘুমোয়নি সেকথাটা যে-কেউ বলে দিতে পারে। অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল প্রকাশ, যদি কোনো সাড়া পাওয়া যায় শান্তার। তারপর কুণ্ঠিত অপ্রতিভ গলায় শুধোল, কী বলল মালকানি বললে না তো।

জবাব পেল না।

আর-একটু কাছে এসে খাটের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, শান্তা, লক্ষ্মীটি, শুনছ—

য়ূড ইউ প্লীজ্ লেট মি এলোন। কঠিন কণ্ঠে জবাব এলো এবার।

কৈফিয়ত চায়নি শান্তা, তারই দেবার কথা। কিন্তু দিল প্রকাশ। বলল, মিছিমিছি তুমি রাগ করছ শান্তা। কোনো ভদ্রমহিলা যদি বাড়িতে এসে

বলেন, আমাকে একটু ঘুরিয়ে আনবেন, কী করতে পারি বলো। বিশেষ করে মিস্টার মিত্র যখন গাড়িটা নিয়ে গেছেন বাইরে।

চুপ করে রয়েছে শান্তা। হয়তো বা নরম হচ্ছে মনটি। খাটের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা খুঁজতে লাগল প্রকাশ অন্ধকারে। —বিলীভ্ মি, লক্ষ্মীটি; কুড আই রিফিউজ হার। তুমিই বলো। মিসেস মিত্রকে হাতে রাখা ভালো নয়? মালকানি রেকমেণ্ড করবে বটে, কিন্তু ফাইন্যাল ডিসিশন তো মিত্রর হাতে। হঠাৎ উঠে বসল শান্তা। —তার মানে আমাকে কি করবী মিত্রের স্বামীর কাছেও যেতে হবে। কী চাও তুমি?

গলার স্বরে চমকে উঠল প্রকাশ।

—কী হয়েছে স্থ, মালকানি কি মিস্‌বিহেভ করেছে তোমার সঙ্গে?

এবার আর হাতটা সরিয়ে দিল না শান্তা, নিজে থেকেই ধরা দিল। মুখ লুকিয়ে কাঁপা চাপা-গলায় বলল, কেন তুমি যেতে বললে আমাকে, রাস্কেলটার কাছে?

—কী হয়েছে স্থ?

যেটুকু বলল শান্তা তার থেকে বোঝা গেল, মালকানির ফ্যামিলি সম্প্রতি এখানে নেই, একলাই ছিল, নিয়ে গিয়েছিল ইণ্ডিয়া গেটে। হাতটা ধরেছিল শান্তার, আরো কী মনে ছিল কে জানে, পালিয়ে এসেছিল সে ট্যাক্সি ডেকে। তারপর কনট্ প্লেসে করবী আর প্রকাশকে একসঙ্গে পাশাপাশি মোটরে বসে যেতে দেখে রাগ করে মাননগরে গিয়ে বসেছিল এতক্ষণ সবিতাদের বাড়ি।

অভাবনীয় নয়, সন্দেহও হয়েছিল প্রকাশের। হয়তো, হয়তো কেন, ইচ্ছে করেই তো সে জেনেশুনে পাঠিয়েছিল শান্তাকে মালকানির ফাঁকাবাড়িতে। কী ছিল গোপনমনে নিজেও জানে না, হয়তো ভেবেছিল শান্তার একটু সান্নিধ্যের প্রতিদানে—সুন্দর মুখের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না মালকানি। হয়তো বা সেসময় মনের গভীরে যুক্তি ছিল, কী বা ক্ষতি শান্তার, প্রকাশের যদি কয়েকটি ঘণ্টার গ্লানির পরিবর্তে সারা জীবনের গতি তাদের ফিরে যায়!

এই মুহূর্তে অন্ধকার রাত্রির রোমাঞ্চময় কান্নার বন্যাতরঙ্গে সেই গ্লানিময় যুক্তি-চিন্তাগুলি কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে গেছে।

গভীর সমবেদায় সান্ত্বনা দেয় শান্তার ক্ষুব্ধ রুষ্ট স্বামী, যে স্বামী তাকে

একটি প্রোমোশনের জন্য একাকী স্ত্রী-বিরহী পুরুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

শান্তা বলল, কাজ নেই তোমার প্রোমোশনে। চাকরি তো আর যাবে না। একটু হিসেব করে চললে কিসের অভাব আমাদের। দেখো তুমি, এবার থেকে আর টাকার জন্য বিরক্ত করব না তোমাকে।

প্রকাশ বলল, জানলে কখনো পাঠাই তোমাকে? দেখে নিও তুমি স্থ, ওর ভাইপো আছে আমার আণ্ডারে, এর শোধ আমিও তুলব। আর কিছু না পারি, ইন্‌ক্রিমেণ্টটা তো আমার হাতে—

শান্তা বলল, থাক্‌গে ওসব কথা। রাত হয়েছে অনেক।

দেখা হতে মালকানি বলল, শী'জ এ নাইস গার্ল। আই এনভি ইউ। প্রকাশ হেসে ধন্যবাদ জানাল। তারপর বললে, আমার কেস্‌টা স্যার?

—ওহ্‌ হো, ডোণ্ট ওরি। আই'ল সেণ্ড ইট টুমরো। অমায়িক হেসে মালকানি প্রতিশ্রুতি দিল।

তার একমাস পরে খোঁজ নিয়ে জানল প্রকাশ, কিছুই করেনি মালকানি। করবীর কাছ থেকে শুনতে পেল, ফাইলটা চেপে রেখেছে সে। মিঃ মিত্র বলেছেন, কই ওর কেস্‌ তো আসেনি এখনো।

তবুও এলো মালকানি একদিন নিজে থেকেই, ক্রিসেণ্ট পার্কের বাংলো থেকে প্রকাশদের কাকানগর কলোনিতে।

গুড্‌ ইভনিং জানিয়ে শান্তার হাতের কেক খেতে চাইল অমায়িকভাবে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত গল্প করে গেল, গান শুনল শান্তার উচ্ছ্বসিত হয়ে, আর যাবার আগে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল দুজনকেই।

এমনকি শান্তার ব্যবহারেও কোনো খুঁত ধরা গেল না। বরং এক-এক সময় মনে হল প্রকাশের, সে যেন খুশি করবারই চেষ্টা করছে।

খুশি হল প্রকাশ। আর কারো নাম পাঠাবার মতলব থাকলে নিজে থেকে আসত না মালকানি। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ধীরে ধীরে পুরোনো যুক্তিগুলো মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে আবার। কিন্তু সাহসও নেই।

নিখুঁত ব্যবহার করছে শান্তা, কিন্তু একথাও তো সত্যি যে খরচ কমাতে

শুরু করেছে সে। সেদিনের পর থেকে অনেকগুলো পার্টি বাদ দিয়েছে! হয়তো বা মালকানিকে এড়াবার জন্য, হয়তো বা প্রকাশের প্রোমোশন না পাওয়ায় অসম্মানটা গায়ে লেগেছে বলে, অথবা হয়তো প্রকাশের সমপদস্থ বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না বলে।

এর জন্যে ঠাট্টাবিদ্রূপ শুনতে হয়েছে শান্তাকে ফোনে ফোনে। কেউ বা বাড়ি বয়ে এসে দেখিয়ে গেছে হ্যামিল্টনের গহনা অথবা পাঁচহাজার টাকার ফারকোট। মনে মনে জ্বালা ধরেছে শান্তার, বলতে পারেনি কিছু। সেও তো এতদিন এদেরই দলের একজন ছিল। প্রকাশের বারো শো টাকা মাইনেয়, তিনহাজারী আই. সি. এস. অথবা ধনী বা উপরিধন্য অফিসারদের সঙ্গে রেশারেশি করে সম্ভ্রম রেখেছে সে, আর সেকশন-অফিসার থেকে রুটিনগ্রেডে প্রোমোশন-পাওয়া আণ্ডার-সেক্রেটারির বৌটি যখন ঈর্ষাকাতর চোখে রেফ্রিজারেটারটার দাম শুধিয়েছে, করুণা অনুভব করেছে শান্তা।

আজ সেই সমাজলোভী বৌটি পর্যন্ত যখন নতুন কেনা (হয়তো ধারের টাকাতেই) গাড়িখানা দেখিয়ে গেল, সব প্রতিজ্ঞা উড়ে গেল শান্তার। দাঁত কামড়ে পায়চারি করল কিছুক্ষণ, তারপর ফোন্‌টা তুলে নিল।

নতুন একটা ভালো গাড়ি চাই তার। পুরোনোটা কি বদলে নেওয়া যায় বাড়তি টাকা দিয়ে?—ওকে, নো নো, আই'ল কল অ্যাট ইওর শো-রুম! থ্যাঙ্কস্।

মোটা খরচের কথা শুনে চটে উঠল প্রকাশ। নতুন গাড়ি কেনার কথা সেও যে ভাবেনি তা নয়, কিন্তু প্রোমশোনটা না পেলে ম্যানেজ করবে কি করে। বিশেষ করে প্রস্তাবটা শান্তার কাছ থেকে আসতেই যেন রাগ বেশি তার। শাড়ি-গহনা বা গৃহস্থালির গ্যাজেট হলে কথা ছিল, শান্তার ব্যাপার, তাছাড়া খরচও এমন বেশি নয়। কিন্তু নতুন গাড়ি, যার অর্থ হাজার ছয়েক ক্যাশ! হত যদি—কিন্তু নিজেই তো বাধা দিয়েছে শান্তা।

বিদ্রূপের স্বরে হেসে বলল, দুমাসে কত টাকা জমিয়েছ তুমি যে নতুন গাড়ির স্বপ্ন দেখছ।

শান্তার আজ নতুন চেহারা। কাছে ঘেঁসে এসে আবদারের ভঙ্গিতে

বলল, না লক্ষ্মীটি, না বললে শুনব না। এই কথাটা রাখতেই হবে তোমাকে। কালার বৌ নতুন 'ডি সোটো' চড়ে বেড়াবে আর তুমি চালাবে এই ঝর্‌ঝরে অস্টিন?

চা-টা নিজে হাতে ছেঁকে দিয়ে সোফার হাতলে বসল শান্তা।—তাছাড়া ক্যাশ তোমার কতই বা লাগছে এক্ষুনি, ইন্‌স্টলমেণ্টে দিলেই চলবে। আর আমি কথা দিচ্ছি যতদিন না তোমার মোটরের টাকা শোধ হয় আমার হাত খরচ দিতে হবে না তোমাকে। আর কিছু চাইব না। কেমন রাজী তো এবার?

একটু নরম হল প্রকাশ, অনেকখানি সমস্যা নিজেই মিটিয়ে দিয়েছে শান্তা, তাছাড়া নিজেরও কি কম শখ তার নতুন গাড়ির। বলল তাহলেও তো হাজার দুয়েক অন্তত দিতে হবে এখন, সেটাই বা পাচ্ছি কোথায়?

অর্থাৎ রাজী হচ্ছে প্রকাশ। আদুরে ভঙ্গিতে ঘাড়টা দুলিয়ে শান্তা বলল, আ—হাঃ। দু হাজার টাকার জন্যে সব যেন আটকে যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে তোলো না কিছু।

ব্যাঙ্কের টাকাটা যে করবীকে ধার দিয়েছে সে, কেমন করে বলবে প্রকাশ। আমতা আমতা করে, মাথাটা চুলকে বলল, ব্যাঙ্কে টাকা কই? দু-দুবার প্রিমিয়াম দেওয়া হল না। তারপর গাড়িটা সারাতে সেবার শ তিনেক গেল।

রাজী হয়েছে প্রকাশ, তাতেই খুশি শান্তা। খোঁজ করল না অত। বলল, বেশ তো, ইনসিওরেন্স পলিসি থেকে ধার নাও তাহলে। লক্ষ্মীটি সত্যি বলছি, নতুন একটা গাড়ি নইলে আর মান থাকছে না।

তারপর হঠাৎ বানিয়ে বানিয়ে একটা মিথ্যা কথা বলল, জানো আমি পার্টিতে আজকাল যাই না কেন, শুধু তোমার ওই নড়বড়ে গাড়িটার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত কেনাই হল গাড়িটা এবং নতুন গাড়ির আনন্দে একদিন মালকানির বাংলো পর্যন্ত ঘুরে এলো শান্তা। আহা করুণাও হয় লোকটাকে দেখলে। এমন স্মার্ট সুপুরুষ চেহারা ভদ্রলোকের, অথচ বৌটা হয়েছে জুজুবুড়ী। সোসাইটিতে বের করবে কি, লুকিয়ে রাখবার মতো।

দুঃখ করল মালকানি। কেন একজন সঙ্গী খোঁজে, কেন একা একা

ড্রিঙ্ক করতে হয় বারে বসে! বিয়ারটুকু পর্যন্ত বাড়িতে আনার উপায় নেই বুড়ীটার জন্যে।

ঝকৃঝকে আলমারিভরা বই দেখিয়ে বলল, দেখছ, এত বই, একজন আলোচনা করার না থাকলে পড়তে ভালো লাগে কখনো। তুমিও তো শিক্ষিতা, পড়াশুনা করেছ, তুমি তো জানো। আমার মিসেস শুধু জানে রান্না আর সংসার। পারেই না ভালো পড়তে, বুঝবে কি?

মিসেস মালকানির উপর রাগ হচ্ছিল শান্তারও। সেই যে তখন একবার নমস্কার করে প্যাণ্ট্রিতে গিয়ে ঢুকেছে, আর পাত্তা নেই। সাধারণ কথা, দু-চারটে ভদ্র আলাপও তো করতে পারত। ইংরেজি না জানুক, হিন্দী বলতে তো পারে।

কফি খেতে খেতে প্রকারান্তরে ক্ষমা চাইল মালকানি, সেদিনকার ঘটনার জন্য।

এর দিন পাঁচেক পরে যখন সত্যি সত্যিই প্রকাশের প্রোমোশনের খবর পাওয়া গেল, মালকানির উদারতার প্রশংসা না করে পারল না শান্তা।

ইতিমধ্যে মালকানির পাশাপাশি প্রকাশের অগভীর মনের তুলনা করতে বসে হোঁচট খেয়েছে শান্তা। ইংরেজি-আমেরিকান বাজে ম্যাগাজিনগুলোর পাতা ওল্‌টানো ছাড়া আর কি পড়ে প্রকাশ? বড়োজোর এক-আধখানা ডিটেক্‌টিভ নভেল আর খবরের কাগজ, তাও বুঝি ওপর-ওপর চোখ বুলিয়ে চা খেতে খেতে। আর তারো পরে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়টা যখন তার ক্রমেই পিছিয়ে যেতে লাগল, ধীরে ধীরে কঠিন হতে শুরু করল শান্তা।

মাস চারেক পরে একদিন হঠাৎ আবার মালকানি এসে হাজির। সেদিনও প্রকাশ যথারীতি ফেরেনি তখনো। শুনে বলল, আয়াম সরি। ডিস্টার্বড্‌ ইউ?

তারপর নিজেই বলল আবার, থট্‌ আয়ুড ড্রপ ইন। হ্যাভ্‌ নট মেট হিম সিন্স হি লেফট আওয়ার অফিস।

সত্যিই তো, মালকানির একটু কৃতজ্ঞতাও কি পাওনা নেই। কি স্বার্থপর প্রকাশ, প্রোমোশনটা পাওয়ার পর একবার দেখা করা উচিত ছিল

না তার! প্রকাশের হয়ে শান্তাই ক্ষমা চাইল, তারপর আপ্যায়ন করল একটু বেশি সহৃদয়তার সঙ্গে।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। ঘড়ি দেখে মালকানি বলল, স্ট্রেঞ্জ, হি'জ নট কামিং ইয়েট। যতদূর জানি কোনো পার্টি তো আজ নেই! আর থাকলেই বা কি, তোমার মতো স্ত্রীকে ফেলে—আই ওয়াণ্ডার!

তারপর গলা নামিয়ে চরম অস্ত্র ছাড়ল—ইফ্ আয়াম নট ইনট্রুডিং টু-মাচ্—সেদিন একটি মেয়েকে দেখলাম—ওর সঙ্গে। নো, নো, ইট ওয়াজ্‌ণ্ট মিসেস মিত্র, আই নো হার ওয়েল। এটি আনম্যারেড এণ্ড ইয়ং, শী হ্যাজণ্ট দ্যাট ভারমিলিয়ন মার্ক। ওটাই তো আপনাদের বাঙালী মিসেসদের চিহ্ন। অ্যাম আই রাইট!

সে কথার উত্তর দিল না শান্তা। উত্তেজিত চাপা গলায় বলল, যুড্ ইউ মাইণ্ড টেকিং মি আউট, আয়াম হ্যাভিং হেল অব্ এ হেডএক্।

অবাক খুশি গলায় মালকানি বলল, শিওর, আই'ল বি অনলি টু গ্ল্যাড, ইউ নো। কিন্তু অনেক রাত হয়ে যায়নি কি?

কী যায় আসে। জেদ করে গেল শান্তা। তবুও কিন্তু পারেনি নিজেকে বিলিয়ে দিতে।

ফেরার পর প্রকাশের প্রশ্নের জবাব দেবার সময় শোধ তুলল—হ্যাঁ গিয়েছিলাম মালকানির সঙ্গে। একদিন তুমি নিজে পাঠিয়েছিলে, আজ নিজে থেকেই গিয়েছিলাম। আর একটা প্রোমোশনের ব্যবস্থা করে এলাম, খুশি!

শান্তার কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে প্রকাশ বললে, কী বলছ তুমি! আর ইউ ড্রাঙ্ক? অ্যাণ্ড দ্যাট্ স্কাউণ্ড্রেল—

পাল্টা আঘাত করল শান্তা মরিয়ার মতো। সে যদি স্কাউণ্ড্রেল হয়, তুমি কি? তুমি,—কী না করেছ করবীর সঙ্গে, আবার তারপর নতুন একজন ধরেছ—

রাগে জিভটা জড়িয়ে গেল শান্তার।

থমকে দাঁড়াল প্রকাশ। তারপর শান্ত করার জন্য হাতটা আর একবার ধরার ব্যর্থ চেষ্টায় বলল, হাউ সিলি আর ইউ। মাথা খারাপ হয়েছে তোমার—ওই ওল্ড হ্যাগার্ডটার সঙ্গে—হোয়াট অ্যান আইডিয়া। ফর ইওর

ইনফর্মেশন শান্তা, মিসেস মিত্রের সঙ্গে প্রেম আমি করিনি, প্রোমোশনটার জন্য একটু খুশি রাখছিলাম।

অবিন্যস্ত কাপড়টা ঠিক করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল শান্তা। তেমনি ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে বলল, ওহ্, আর এই নতুনটি।

—নীতা? ওহ্‌হো, নিয়ে আসব একদিন। শী'জ স্টিল ইন হার টিনস—নীতা হল মিঃ মুখার্জির একমাত্র মেয়ে—হোপ আই হ্যাভ এক্‌সপ্লেন্‌ড নাউ।

অবাক হল প্রকাশ। সব কথা শোনার পরেও কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হল না শান্তা, ক্ষমাও চাইল না। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, ইউ শুড্ বি অ্যাশেম্‌ড ফর দ্যাট। শুধু সুপারিশের জোরে উন্নতি করতে চাও তুমি, কারো স্ত্রী, কারো মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে করে—অ্যাণ্ড হু নোজ ইফ্ ইট স্টপস দেয়ার—

প্রকাশ একটু চেঁচিয়েই বলল, আই ক্যান্ অ্যাশিওর ইউ অন্ দ্যাট পয়েন্ট—

ডিনার টেবিলে বসে শান্তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল প্রকাশ জেদের বশেই বলেছে সে কথাগুলো, এমন কিছুই হয়নি। পারবে না ও, শান্তার বিবেক বড়ো বেশি দুর্বল। ভালোই, খুশি হল প্রকাশ।

শান্ত হয়ে পাইপ ধরিয়ে বলল, কী ছেলেমানুষ তুমি সু, সুপারিশ না থাকলে শুধু মেরিটের জোরে এখানে যে কিছুই হয় না।

সেদিন বোঝেনি শান্তা, বুঝল বছরখানেক পরে, চেম্‌স্‌ফোর্ড ক্লাবের রাত্রিটির পর।

অনভ্যাসের ফলে এক রাউণ্ড নাচের পরই হাঁপিয়ে পড়েছিল সে, পরম যত্নে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথায় সেহ্‌গল নিয়ে গেল লাউঞ্জে। হোস্টেস শান্তা, আর গেস্ট সেহ্‌গল, এই-ই তো নীতি।

না না করেও তুলে নিতে হল এক পেগ গিমলেট।

তারপর ক্লান্ত বিস্মিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ঊনপঞ্চাশী লেডী সেহ্‌গলের যৌবনকল্প নাচ, আর প্রকাশের নিখুঁত অভিনয়।

ড্রাই জিনের কয়েকটা পেগ শেষ করে মদিরা-চঞ্চল সেহ্‌গল আবার বলল, হাউ অ্যাবাউট অ্যানাদার রাউণ্ড?

প্রত্যাখান করতে পারেনি, চুক্তি ছিল প্রকাশের সঙ্গে।

শেষ নাচের পর বাড়ি ফিরে বমি করে ফেলল শান্তা, স্নান করে শুচি হল।

কিন্তু রাগ করতে পারল না।

লেডী সেহ্‌গলের মন জুগিয়ে চলতে হয়েছে বলে বরং করুণা অনুভব করছিল প্রকাশের ওপর। গভীর আশ্লেষে গলা জড়িয়ে মুখ লুকিয়ে বলল, এবার থেকে আর সন্দেহ করব না তোমাকে, কিন্তু—

—কী কিন্তু?

—নাইবা চাইলে প্রোমোশন এমনি করে, নাইবা গেলে নিজেকে ছোটো করতে?

হো হো করে হেসে উঠল প্রকাশ।—ছোটো, ছোটো মনে করলেই ছোটো। সবার কাছে বড়ো হওয়ার জন্য হলামই বা একটু ছোটো। সিলি গার্ল, আই লাভ ইউ ফর দিজ্ স্ক্রুপল্‌স।

তারপর অবাক স্তম্ভিত শান্তাকে হঠাৎ কাছে টেনে নিয়ে পিষে ফেলতে চাইল।

দিন পনেরো বাদে, সত্যিই ট্রান্‌সফারের খবর এলো, আর তার মাস তিনেক বাদে একদিন উল্লসিত প্রকাশ এসে জানাল, জার্মানি যাচ্ছি অফিসের কাজে।

জার্মানি, ইউরোপ! বার্লিন, রোম! স্বপ্নসাধ। উচ্ছল হয়ে উঠল শান্তাও। বলল, আমিও যাব, বহুদিনের শখ আমার।

তুমি! হেসে উঠল প্রকাশ, হোয়াট্ অ্যান আইডিয়া। কতো খরচ জানো? তুমি কি মিনিস্টারের বৌ, না গুড্‌উইল ডেলিগেশনের মেম্বার যে সরকারী খরচে যাবে।

তারপর শান্তার নিভে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝি করুণা হল। বলল, তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন? সিমলা বেড়িয়ে এসো বরং, সেহ্‌গল যাচ্ছে।

সিমলা! শ্রীনগর হলেও কথা ছিল। শান্তা বলল, তার চেয়ে মার কাছ থেকে ঘুরে আসি বরং।

ফিরে এসে প্রতিশ্রুতি মতো বুইক কিনে দিয়েছে প্রকাশ,

সোসাইটিতে সম্মান বেড়েছে শান্তার, ক্রিসেণ্ট পার্ক না হোক, পৃথ্বীরাজ রোডে বাংলো পেয়েছে সে, অল্পবয়সী অফিসাররা এখন তার কাছেই ঘোরাফেরা করে, কিন্তু তবু খুশি হতে পারে না মনে মনে।

বাধা দেবারও অনেক বাধা। সে কি পারবে স্থিতিশীল হয়ে এইখানে বসে থাকতে। তবে কেন পারী-ফেরত মিসেস সিন্‌হাকে ঈর্ষা করে সে, সামনের আসনটি না পেলে কেন খুঁতখুঁত করে?

ফাঁকিটাকে ফাঁকি বলে জেনেও সেটাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চলেছে শান্তা প্রকাশের পাশাপাশি। কিন্তু কোনো দিন মিলবে না তারা।

কী বলে? সমান্তরালও নাকি মেলে অনন্তের কোলে? কে জানে অনন্তকাল তো আর তার জীবন নয়।

বিষন্ন দুপুরের ক্লান্তিতে আর অতন্দ্র রজনীর ঘুমভাঙা নির্জনতায় শিউরে উঠে ভাবে শান্তা।

সেদিনও তখন দুপুর। ডেজার্টকুলারের শীকর-স্নিগ্ধ জড়তাটা দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে মন পর্যন্ত এমনি সময় উঠে বসল শান্তা।

গাঢ় কালো পর্দাটা সরিয়ে উঁকি দিল মুমূর্ষু দুপুরটার দিকে। পাঁচটা বেজে গেছে, তবুও শ্রান্তি নেই নিদাঘ-দাহের।

ক্লান্ত অসন্তুষ্ট মনে ফিরে এলো শান্তা আবার বিছানার কাছে। আগে আগে বই পড়ত, এখন আস্তে আস্তে সব কিছু ভালো-লাগা হারিয়ে ফেলছে সে।

আরো একঘণ্টা অনায়াসে ঘুমিয়ে নিতে পারে সে। কিন্তু ঘুম তো নয় ফিন্‌ফিনে তন্দ্রার পর্দা ছিঁড়ে কুৎসিত বিভীষিকার কিলবিল উঁকিঝুঁকি।

কান্না পায় শান্তার এমনি সময়ে, ঠিক এই উদাসীন ক্লিষ্ট দুপুরে, যখন নয়া দিল্লীর পথে পথে নামে মন-কেমন-করা ঝিমুনি আর ওর মনে অবসর ক্লান্ত শূন্যতা।

বেশ আছে প্রকাশ, সাড়ে নটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত, অফিস, বার আর ক্লাব নিয়ে। মাঝে মাঝে ঈর্ষা করে শান্তা, মনে করে সে-ও মেতে যায় এই অগভীর খরস্রোতে। তবুও ফিরে আসে, উৎপলাহত অতৃপ্তি নিয়ে।

হঠাৎ মোটরের হর্ন শুনে চমকে উঠল শান্তা। এখনও তো সময় হয়নি

অরুণাংশুর। মনে আছে বৈকি রোশনারা ক্লাবে নিয়ে যাবে বলে জিদ ধরেছে। জানে না কি শান্তা কিসের গরজ ওর; নতুন অফিসার, প্রোমোশন চায় একটা, টাকার জন্যে নয়, সম্মানের জন্য। সবই জানে শান্তা।

কিন্তু সে তো সেই সাতটার পর, সন্ধ্যার মুখোমুখি।

যে-ই হোক, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি তো। এগিয়ে গেল শান্তা দরজা খুলে। অরুণাংশু নয়, প্রকাশের নিজের গাড়ি।

অবাক হয়েছিল শান্তা প্রকাশকে ফিরতে দেখে, শঙ্কিত হল মুখের দিকে তাকিয়ে।

প্রশ্নের প্রয়োজন হল না, নিজেই বলল প্রকাশ, পর্যুদস্ত হেরে-যাওয়া গলায়, অপমানের তিক্ততা আর আবেদনের আকুতিতে কোনো কিছু না লুকিয়ে।

—ধরা পড়ে গেছি শান্তা। এবার বুঝি আর সামলাতে পারলাম না।

শুনল শান্তা স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে। আশ্চর্য, তবু তারি মধ্যে একটা তৃপ্তি পায়, এ-ই যেন সে চেয়েছিল, প্রকাশের উন্নাসিক অগভীর জীবনদৃষ্টির এই পরিণতিই যেন সে মনে মনে কামনা করেছিল।

ভগ্ন, বিধ্বস্ত প্রকাশকে এই মুহূর্তে করুণা করতে শুরু করেছে শান্তা, অনেক যেন কাছাকাছি এবার। ভালোবাসা? না, ভালোবাসা নয়, সহানুভূতি।

শান্তার চোখের দিকে তাকিয়ে শেষে আকুতি জানাল প্রকাশ, তুমি একটা কিছু করবে না, স্থ!

—আমি? আমি কী করতে পারি বলো। ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো উড়িয়ে দিল শান্তা।

নিভে-যাওয়া চোখে হঠাৎ বিদ্যুৎ জ্বলল প্রকাশের:—পারো, তুমি পারো—পারতেই হবে তোমাকে, তুমি তো জানো মালকানিকে—কেস্‌টা ওরই হাতে—

পারলে বুঝি শান্তা চোখের আগুনে পুড়িয়ে ফেলত প্রকাশকে, অন্যদিনের মতো আজও পারল না।

ঠিক এই মুহূর্তে মনে হল, তারপর?

পারবে না। এই স্বাচ্ছন্দ্যকলঙ্কিত জীবনকে ঘৃণা করেও ছেড়ে যেতে পারবে না।

শিউরে উঠল শান্তা, আর প্রকাশ শুনতে পেল দুটি শঙ্কাত্রস্ত অভয়বাণী:

—যাবো, চেষ্টা করব আমি।

ছারপোকা

নীলকণ্ঠ

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা বলে আমরা যাকে জাহির করে থাকি, আমার কাছে আসলে তা ছারপোকার অসভ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুরারোগ্য ব্যাধির সাজ্যাতিক ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার যুগেও এখনও যেমন সেই আদি ও অকৃত্রিম 'সর্দি'-র কিছু করা যায় নি, তেমনি দুর্দান্ত বাঘ-ভালুক থেকে মারাত্মক পোকা-মাকড় মারবার নানারকম 'Gun-Powder' চালু হবার পরেও ছারপোকা তেমনই টিকে আছে। Survival of the fittest,—এই পরীক্ষার ফি test-এই ছারপোকারা first! ছারপোকারা টিকে আছে, ছারপোকারাই টিকে থাকবে। রক্তশোষিত আর রক্তশোষকের লড়াই-এর একদিকে সামান্য মানুষ, অন্যদিকে অসামান্য ছারপোকা। মানুষের সভ্যতা বলে যার আড়ালে অমানুষিক অসভ্যতা আজও দেশে দেশে আমরা চালু রেখেছি, সে-সভ্যতার যথার্থ ও একমাত্র প্রতীক হল এই ছারপোকা। ছারপোকারাই ছারখার করছে সব। এমন সন্দেহও আমার মনে প্রায়ই উঁকি-ঝুঁকি দেয় যে ছারপোকারা থাকলেও, মানুষ একদিন আর থাকবে না।

ব্রহ্মদৈত্য যেমন যত বড়ই হোক ব্রহ্মের তুলনায় নয় তেমন; ছারপোকার তুলনায়ও তেমনই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোকারাও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছারপোকাদের অধিষ্ঠান; গো-যান থেকে মোটর তথা বাষ্পীয় যানের আবিষ্কার মানুষের জান যাবার জন্যে কি দূরকে নিকট করবার কারণ কে

জানে,—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে কিন্তু ওই ছারপোকারাই শুধু। তাদের ticketless travel আজও অব্যাহত। এবং যান থেকে মানুষের কাছা ধরে, তাদের গৃহে-গৃহে রবাহুত আতিথ্য গ্রহণ; দেশে-বিদেশে ছারপোকাদের অবাধ যাতায়াত ভিসার অপেক্ষা না রেখেই, বিনা-পাসপোর্টেই।

মশার জন্যে মশারি আছে; মাছির জন্যে ফুল স্পীডে ফ্যান; তেলাপোকা এবং অন্যান্যদের জন্যে নানারকম ফ্লিট আর পাউডার। কিন্তু ছারপোকা হচ্ছে 'মরেও না মরে, এ কেমন বৈরী'। গরম জলে আর রোদে ছারপোকারা বিপর্যস্ত হয়; খুব শীতের সময়েও ছারপোকারা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যাবার আগে তারা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়; জানিয়ে দিয়ে যায় যে তারা যাচ্ছে বটে কিন্তু রেখে যাচ্ছে তাদের সংখ্যাতীত সন্তান-সন্ততি। বংশপরম্পরায় তারা তাদের ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছে। রক্তচোষা এই সভ্যতার একমাত্র ধারক ও বাহক রক্তমোক্ষণকারী ছারপোকারাই। পুরাণের যুগের চেয়েও তারা পুরানো। তার প্রমাণ 'রক্তবীজের' উল্লেখ। 'রক্তবীজ' বলে যাকে বলা হয়েছে, সে আর কেউ নয়, এই ছারপোকাই।

আগে যে বলেছি গরুর গাড়ি থেকে পাখা-গাড়ি পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে মানুষ সবই নিজের জন্যে, কিন্তু কাজে লাগিয়েছে ছারপোকারাই; সেই সূত্র ধরেই আবার বলি, বসবার-শোবার-ব্যবহার করবার জন্যে মানুষ বানিয়েছে খাট-চৌকি-চেয়ার-টেবিল; কিন্তু সেখানে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে ছারপোকারাই। বসেছে, শুয়েছে, খেয়েছে। নিজের বাড়ি, বাসা-বাড়ি; মেস-বাড়ি এদের কাছে কোনও পার্থক্য নেই। স্কুলের বেঞ্চি, খেলার মাঠের গ্যালারি, সিনেমা-থিয়েটারের গদি,—কিছুতেই আপত্তির অভাব।

মানুষের রক্ত এদের Capital! প্রত্যেকটি ছারপোকা একেকটি Blood Bank! রক্ত খাবার পর আবার রক্ত খেয়েও, এরা blood-pressure-এ মারা যায় না।

রক্তের অভাবে অপেক্ষা করতে জানে শিকারের। অনাহারে মুমূর্ষু হয়; মরে না। খাবার সময় জাত বিচার করে না। সাহেব থেকে মোসাহেব; রাঁচী থেকে করাচী; রানী থেকে কেরানী; যত জাত আছে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার এই বজ্জাতদের। হিন্দুস্থান-পাকিস্থান জানে না; কমনওয়েলথ

-রিপাবলিক মানে না; অ্যাসেম্বলি-পার্লামেন্টের স্পীকারের রুলিং করে অস্বীকার। এরা জানে শুধু এদের জাত-ব্যবসা ঃ রক্ত-মোক্ষণ।

মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে পারতেন, এই কারণে মেঘনাদ বিখ্যাত এ-ভুবনে। ছারপোকা কিসের আড়ালে থেকে কামড়ায় জানি না কিন্তু তারা invisible ও invincible দুই-ই। ভীষ্ম 'ইচ্ছামৃত্যু' বরণ করেছিলেন, শরশয্যায় শুয়ে। মেস-বাড়ির খাটিয়ায় রোজ রাতেই ছারপোকারা রচনা করে শরশয্যা; এবং তখন বোধগম্য হয় কেন ভীষ্ম 'ইচ্ছামৃত্যু'-র বরকেই শ্রেষ্ঠ বর বলে মেনেছিলেন। কেউ-কেউ উপদেশ দিয়ে থাকেন, সেই অব্যর্থ উপদেশ, ছারপোকাদের ধরো আর মারো। এ-যেন পুলিশের অপহৃত গৃহস্থকে উদ্দেশ্য করে মোক্ষমবাণী ঃ যে নিয়েছে, তাকে ধরে নিয়ে আসুন; ঠেঙিয়ে বার করে দিচ্ছি আপনার মাল। অথবা কালোবাজারীকে সবচেয়ে কাছের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেবার সদিচ্ছার মতো। অর্থাৎ কালোবাজারীরা রয়ে যায়, ল্যাম্পপোস্টও থাকে, ক্ষমতা হাতে আসবার পর শুধু সেই সদিচ্ছা কাজে পরিণত করবার সময় কেমন যেন অক্ষমতা দেখা দেয়; ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত, কে বলবে।

মধুসূদন যতই বলুন; জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে! একথা মানুষের সম্বন্ধে সত্য হলেও, ছারপোকার ক্ষেত্রে নয়। আর নয় পাওনাদারের ক্ষেত্রে। ছারপোকা এবং পাওনাদার, মরজগতে শুধু এরাই অমর। যদি বলেন, এ-কথা আমার আগের কথার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, অর্থাৎ মধুসূদন-বাক্যকে মানুষদের সম্বন্ধে সত্য বলে মানবার পরেও এ-কথা বলায়, তাহলে বলব ঃ না, পাওনাদারেরা আর যাই হোক মানুষ নয়। এবং এই কারণেই ছারপোকারা একমাত্র পাওনাদারদের কাছেই জব্দ। পাওনাদারদের কামড়েও তাড়াতে পারে না; কিম্বা হয়তো পাওনাদারদের রক্ত ছারপোকাদের পক্ষেও সুপেয় নয়। ছারপোকা শুধু ছার; পাওনাদার,—নচ্ছার।

শত্রুব্যূহে ঢুকবার কৌশল জেনে এবং বেরিয়ে আসবার অপকৌশল আয়ত্ত করতে না পেরে অভিমন্যুর কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন থেকে অসময়ে প্রস্থান। ছারপোকা শুধু ঢুকতেই চায়; বেরুতে জানেও না; চায়ও না। কারণ ছারপোকা যেখানে প্রবেশ করে সেখান থেকে তাদের যাবার প্রয়োজনই হয় না; বরং সেখানকার বাসিন্দারাই বেরুতে পারলে বাঁচে। খবরকাগজ

যেমন দশ পয়সা দাম থেকে আর কমবে না কোনোদিন ; ট্রামের ফার্স্ট ক্লাস পাঁচ পয়সা থেকে ; ছারপোকারাও তেমনি একবার সিঁধোতে পারলে হয়!—তাদের জীবন-নাট্যে 'প্রবেশ' আছে ; 'প্রস্থান নেই !

পাওনাদার ছাড়া আর যাদের সঙ্গে ছারপোকাদের তুলনা করা চলে তারা হল বাঙলা সাহিত্যের সমালোচক। যার গায় যত রক্ত, সে ছারপোকার তত প্রিয় ; সমালোচকের আক্রমণ তার লেখার বেলাতেই তত মর্মান্তিক, যার লেখা যত জনপ্রিয়। সংস্কৃতে বলেছে প্রিয় বলবে, অপ্রিয় বলবে না। বলবার বেলায় হয়তো তাই ; কিন্তু লেখবার বেলার তাবলে তা নয়। অপ্রিয় লেখারও মাফ আছে ; কিন্তু জনপ্রিয় লেখকের নেই। যে-বই যত বিক্রি, সেই বই মনীষীদের পক্ষে তত অস্বাস্থ্যকর। Popular হলেই Intelligentsiaর সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য। স্থূল সমালোচকের হুল ফোটানো যেলেখা নিয়ে হুলুস্থুল যত বেশি। ছারপোকা চায় রক্ত ! আর আমাদের লেখা সমালোচকের হাতে হয় রক্তাক্ত !

অবাস্তব কল্পনার ওপর যে-সাহিত্যের ভিত্তি, সে-সাহিত্যে ফুল-পাখি থাকবে, কিন্তু ছারপোকা যে থাকবে না, এ তো জানা কথাই। বাঙলা সাহিত্য মধ্যবিত্তদের আসল সমস্যা সম্পর্কে এখনও বোবা এবং বধির। তাই যে-মধ্যবিত্তরা যুগে-যুগে দেশে-দেশে বিশেষভাবে নিপীড়িত রক্তশোষকদের হাতে, সেই ছারপোকা সম্বন্ধে এখনও ভরতবাক্য উচ্চারিত হতে দেরি যে অনেক, এ আর বিচিত্র কী ?

মোসাহেবরা যাকে ছারপোকা বলে, সাহেবরা তাকে বলে bug, এই bug বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর ! বাগে আসে না কিছুতেই। অক্ষম হয়ে পড়বার পর তবেই বাঘ মনুষ্যরক্ত আস্বাদনে বাধ্য হয়। ছারপোকা মনুষ্য-রক্তের স্বাদ মুখে নিয়ে জন্মায়। বাঘকে মানুষ ভয় করে, মানুষকেও ভয় করে বাঘ। ছারপোকা মানুষকেও ডরায় না ; বাঘকেও না। চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে আছে সবাই; খাঁচার বাইরে আছে শুধু মানুষ আর ছারপোকা। একই খাঁচার মধ্যে মানুষ আর বাঘ আছে সার্কাসে। মানুষ আর ছারপোকা এক খাঁচার মধ্যে থাকলে আত্মারাম কার আগে খাঁচা-ছাড়া হত, সেকথা জিজ্ঞেস করবার মতো হলেও জবাব দেবার মতো নয়।

পাঁক থেকে জন্ম পদ্মের; ক্লেদ থেকে ছারপোকার। পৃথিবী যত ক্লেদযুক্ত হবে ততই বাড়বে ছারপোকারা। অ্যাটম বোমায় মানুষ মরবে; ছারপোকার কিছুই হবে না। রক্তশূন্য এই সভ্যতার শেষ অঙ্কের রক্তিম গোধূলি-লগ্নে সাধারণ মানুষের শেষ রুধিরটুকু শুষে নেবার পর ছারপোকারা উদ্যোগী হবে পরস্পরের রক্তমোক্ষণে, সেদিনই শুধু মানুষকে ছেড়ে দেবে ছারপোকা; তার আগে নয়।

পরস্পরের রক্তমোক্ষণ করে মোক্ষপ্রাপ্তির সেই মুহূর্তটি ত্বরান্বিত করবে ছারপোকারাই! কিন্তু তার আরও দেরি কত?
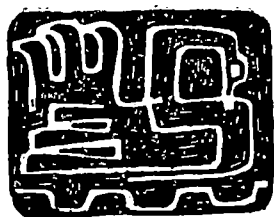
কবিতা

ভয় পাই

বিষ্ণু দে

হেসো না, কারণ ক্ষুরধার হাসির নখর
তোমারও গলায় পড়ে, কারণ তুমিও চাও,
আমরাও সবাই চাই স্বস্তি বা বিশ্রাম
চিন্তার খাড়াই পাহাড় গহন জঙ্গল থেকে নিরাপদ জনপদে,
অভ্যাসের পাকা শানে, খিলতোলা দ্বারে,
প্রাসাদকুটিরে, নিজের অন্যের মই দেওয়া ধানে ধানে।

মননের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা কেবা বলো চায়,
যখন মন্ত্রীরা সব মন্ত্রণার সোজা পথ বাতলায়, তখন কেন বা
নিজে নিজে পথ খুঁজে মরা ? পরিশ্রম
তাতে যে বিস্তর, তাছাড়া কোথায় কোন কোণে কোন
নির্মম বিপদ উঁকি দেয়।

আমরা সবাই চাই সংক্ষেপিত সুখ,
কারণ দুঃখও তাতে সংক্ষেপিত হতে পারে।

গড্ডলিকাবাদে আছে স্বচ্ছ সুখ, সোজা স্বস্তি, অভ্যস্ত আরাম।
তাই তো আমরা এত ভয় পাই ঝুঁকি নিতে মনের জঙ্গলে,
যেখানে চোখের দাবি কানের ঘ্রাণের
সারা শরীরের দাবি দঙ্গলে দঙ্গলে ভিড় করে পাহাড়ে-প্রান্তরে,
দাবি তোলে দিনরাত্রি অমান্যের আন্দোলনে।
অথচ সাত্ত্বিক সভ্য জনপদ সরল ব্যবস্থা বিধি,
তাছাড়া মন্দির আছে, মস্‌জিদ্‌, গির্জাও, নানাবিধ ঘুম, স্বপ্ন,
ঠাকুর মহাত্মা কর্তা নেতা বা নায়ক—
আঙিনা বা পাড়ার মণ্ডপে নুড়ির নানান রূপ।
তাই একদিকে থেকে থেকে রূপধারী ভেবে বসে
হয়তো বা সত্যই সে নুড়ি বুঝি, দেবতা বা দেবী,
পূজা চায় ঝুড়িঝুড়ি।
অন্য দিকে আস্তিকেরও মনে হয় লোকগুলো অথবা লোকটা
ঠাকুর মহাত্মা কর্তা নেতা বা নায়ক অবতীর্ণ দেবদেবী
নুড়ি নয়, প্রকৃত মানুষ. নড়েচড়ে, দোষেগুণে জড়িত মানুষ ;
নুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়; হয়তো বা আরেক নুড়ির লোভে,
হয়তো বা নাস্তিক [illegible] মাথা কোটে, বলে, হায় হায়
নুড়িবাদ খুবই মন্দ নুড়ি ব[illegible]দ।

এতে হাসির কিছুই নেই, তোমরা সবাই, আমরাও
স্বস্তি চাই, সস্তা সহজের জনপদে, গির্জার ঢিপিতে,
আইকে মাইকে সোনায় রূপায় খুঁজি গুরু, প্রভু, সাঁই ;
পথে পথে গড়াগড়ি দিই আজ কারো নাক কেটে
কাল কারো কান জুড়ি
আজকে বিযুক্তি আর কাল সংযুক্তিতে।
মননে জঙ্গলে উতরাই খাড়াই ব্যক্তিস্বরূপের আপদে বিপদে
বুনো মহিষের পাল শখ করে কেই বা চরাই ?

আমাদের সাহস অভ্যাসে, আমাদের অহঙ্কার—
নিতান্ত সে শৈশবের পরে, বড়ো কম, বড়ো অসহায়।
আমাদের সত্তা শত অশত্থ তলায় বুলির বাতাসে নিত্য ঝুরুঝুরু,
ভয় পাই খাড়াই চূড়ায় মননে জঙ্গলে তেপান্তরে,
ভয় পাই মনের মুক্তিতে।

২

একটি অতীত

সিদ্ধেশ্বর সেন

একটি অতীত ভরে থাক কানায় কানায়
দৃষ্টির টল্‌টলে জল

ভরে থাক মগ্নশোভা দুই তট
গভীর পল্লবে থাক দূর দূর স্মৃতির প্রচ্ছায়

আমি তার দিকে চে[illegible]কি
নৈঃশব্দ্যফেনায় হাত [illegible]খে
তারি দিকে অপলক নিরবধিকাল

একটি অতীত ভরাচোখে চেয়ে থাকে

আমি তার দিকে রিক্ত হয়ে ফিরে যাই
পূর্ণতা ফিরিয়ে আনব বলে
আপন সত্তার জাগরণে আমি তার সুপ্তিকে মিলাই

মিলাই অতীত এই দৃশ্য বর্তমানে॥

সে ও আমি

রাম বসু

(আমার হৃদয়ে দেবদারুর স্তব্ধ রহস্য
প্রত্যাশার মুহূর্তগুলো একে একে অগণ্য নক্ষত্র
প্রতীক্ষার দুই চোখ মাস্তুলের ওপর দিকহারা পাখি
অকস্মাৎ উজ্জ্বল স্বপ্নের মতো আমাকে আচ্ছন্ন করে সেএলো।)

আমি ঃ তোমাকে ঢেকে দেই আমার ছায়ায়
তোমার চোখে চোখ রেখে অন্ধ হই
গন্ধবহ অন্ধকারে আমরা সম্পূর্ণ
প্রত্যেক দৃষ্টি আমাদের শুভদৃষ্টি।

সে ঃ এখানে থেমো না। চলো আরো দূরে
নক্ষত্রের আলো গায় মেখে পল্লব পাখির দেশে
দু হাতে ছড়াই—যা পেয়েছি, যা পাব আর
পলকে পলকে নতুন তোমায় আবিষ্কার করি আমাদের
এক উৎস থেকে দুই বিপরীত পথে বাঁধি পৃথিবী।

আমি ঃ তোমার আঙুলের মুখে শুনতে চাই নদীর গান
নিশ্বাসের তাপে ফোটাতে চাই চোখের পাপড়ি
তোমার হঠাৎ হাসির উচ্ছ্বাস মনে হবে এক ঝাঁক পাখি
কোমল অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন আমি ঘুমিয়ে পড়ব কখন
ঘুমিয়ে পড়ব তোমার গানের ছলাত ছলাত
শব্দ শুনতে শুনতে
আবার সকালে অরণ্যের মতো জাগাবে আমাকে
কণ্ঠের জলতরঙ্গে।

আমার স্বপ্নের বাসর সাজানোর লগ্ন
আসবে না কোনোদিন ?

সে : সংজ্ঞা দিয়ে বেঁধে দিয়ো না যা আছে সংজ্ঞার অতীত
টবের চারার মুখে শুনতে চেয়ো না অরণ্যের গান
বিকেলের আশ্চর্য গোধূলি আসে না
পাঁচিলের বেড়ার ভেতর।
তোমার ভালোবাসা আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে
আমি চিনেছি নিজেকে ; আর সেই চেনার গর্বে
আমি রোদ্দুর থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাব।

আমি : প্রত্যক্ষের সীমায় দাঁড়িয়ে দেখব না নগ্ন অগ্নিশিখা
পাখির মতো লুপ্ত হব না নীড়ের নিবিষ্ট আঁধারে
মাটির ভেতর বীজের মতো ছোঁব না রহস্যের তল ?
আমি পরিমিত পরিধিতে আঁকব একটা নিটোল ছবি
অনন্ত কালের ধারে সেই আমাদের জয়ের সীমানা,
রাজ্যের পত্তন।

সে : খণ্ড কোরো না যা অখণ্ড
আমাদের প্রকৃতি বদলে যাবে
আমরা হব অপরিচিত
দুই বাহু দিয়ে দিগন্তকে বাঁধতে গেলে
আনব শুধু শূন্যতা
নিজের হাতে সাজাব তারই চিতা
যাকে সৃষ্টি করতে এত আয়োজন, এত প্রতীক্ষা।
তার চেয়ে এস ছড়িয়ে দেই আমাদের সমস্ত সঞ্চয়
ব্যাপ্ত হই মেঘে আগুনে ; মাটিতে নদীতে,
মনে ও কথায়, জন্মে ও বিনাশে

সীমার চিহ্ন মোছা বনবন্যা থেকে সূর্যে, সূর্য থেকে
অন্ধকারে।

আমি ঃ আমি বয়ে নিয়ে যাব আমার স্বপ্নের শব
সময়ের ঘাটে ঘাটে ফেরি করব অসমাপ্ত গান
প্রতীক্ষা করব অবিচ্ছিন্ন শূন্যতার, আর আমার বিনাশ
নামহীন সংজ্ঞাহীন নৈরাশ্যের দেশে ?

সে ঃ মৃত্যু তো সমাপ্তি। অন্তহীন আমাদের অন্বেষণ
আমরা স্বপ্ন পাই, তাই আমরা সত্য ও কঠিন
পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাব চিরকাল
অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাব না
সূর্য যেমন দেখতে পায় না রাত্রির মুখের ভাস্কর্য
রাত্রি যেমন সূর্যের বুকে মাথা রেখে
শুনতে পায় না মৃত্যুর গান
অথচ দুজনার ভালোবাসার আদরে রূপবতী মাটির পৃথিবী।
আমরা তেমনভাবে আমাদের পাব চেতনার সীমায়
আমি লুপ্ত হব তোমার চোখের মণিতে
আমার ভেতরে তুমি স্পন্দমান হৃদয়ের ধ্বনি
এক উৎসমুখ থেকে আমরা দুই নদী
দুই ভিন্ন পথে পৃথিবীকে ধারণ করব।

আমি ঃ অন্ধকার তো আলোর প্রতিরূপ
সূর্যের প্রচ্ছন্ন আভায় চাঁদের যৌবন

সে ঃ যেমন তোমার আভায় আমি—আমাদের প্রচ্ছন্ন একত্ব।
(চেয়ে দেখি রোদ্দুরের ঝলকে সোহাগী পৃথিবী
কচুরিপানার মুকুট নিয়ে ত্বরিত-গতি নদী
আর আমি লঘুপক্ষ মেঘ দুঃখভারহীন
আমার দৃষ্টিতে শিল্পীর মুগ্ধ আবেশ।)

আমি সৈনিক নই

মার্টিন কার্টার

যেখানে তুমি মরবে কমরেড, আমি জন্ম নেব সেখানে,
উত্তর মেরুর রাতে সূর্য অদৃশ্য হবে যখন
সেখানে উদিত হব তক্ষুনি।
নির্মম বন্দুকধারী আমি কোন সৈনিক নই,
নরঘাতক বা মৃত্যুর চণ্ডাল-কুকুরও নই,
আমি আমার কবিতা, বিশেষ আনন্দে আমার আবির্ভাব,
পৃথিবীর এই আশার উষায়, প্রিয় বন্ধু,
তোমার সঙ্গে জেগে উঠলাম।

কোথাও তুমি পড়ে আছ, রক্তাক্ত,
হে অজ্ঞাত কমরেড,
আমার জীবনের বিদ্রোহী ভূগোলে
যন্ত্রণার অক্ষরেখাগুলি তাই
তুষার-কন্‌কনে আমার অন্তর্দাহের দুই মেরুকে ভেদ করে।
আহা, আমার হৃদয় একখণ্ড চুম্বক
আবেগের তড়িৎস্পর্শে ভালবাসার কিরণ ছড়ায়
ভাবীকালের জ্বলন্ত কম্পাসকে ঘিরে আমাতে দুলছে,
তার দিক্-নির্ণয়ের কাঁটার সামনে
আমার পিতামহের দেশ, দুঃখিনী আফ্রিকা
সূর্যকিরণের অপ্রসন্ন হ্রদ,
ভয়াবহ চাঁদ……

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি
রাতের প্রচণ্ড আওয়াজে যেন আচ্ছন্ন হলাম,
দিবালোকের দিকে উঁকি মেরে
আমার নৈশ-কুঠুরির লৌহগরাদ চেপে ধরলাম।
তামস নদীতে কোথায় যেন তামস দ্বীপ,
ওগো নিষ্পেষণের অরণ্য,
ওগো যন্ত্রণার স্রোত আর সহ্যের প্রণালী,
আমার অন্ত্রে অন্ত্রে গভীর বেদনা যে উদ্‌গিরণমুখী,
আকাশের কালো রঙ ফেটে চৌচির হয়ে পড়ছে,
শীতল বৃষ্টিই কুয়াশা! বাতাস, আমার শ্বাস-প্রশ্বাস!

ভুরুতে আমার পট্টি-বাঁধা একটি দুঃস্বপ্ন,
কমরেডের রক্তাক্ত ধুলোর উপর দোল খেতে খেতে
একটি মিনিট একটি ঘণ্টা একটি বছর
ফাঁসির দড়ির একটি দোলনদণ্ড চরম সাহসের উদ্দেশে
বুঝি কুচকাওয়াজ করে।
ওগো জীবনের মানচিত্রকার, আমাকে মহাসমুদ্ররূপে আঁকো,
বক্ষে বিরাট জাহাজ, জাহাজের তলা আর ধাতুময় হাল।
সে যাত্রা করেছে সূর্য যখন শিশু এবং
চন্দ্র যখন বিবর্ণ ছিল,
কিন্তু যেখানেই তোমার পতন, কমরেড,
আমার অভ্যুদয় সেখানে।
নতুন বর্বরেরা দস্যুর মতো মালয়ে
যেখানে তোমার মাংস খায়,
সেখানে অথবা কেনিয়ায়
যেখানে দুর্ভিক্ষের রঙে তোমার চামড়ার কালো বরন

অথবা আমার অশ্রুমতী কোরিয়ায়
যেখানে জনপদ আজ একান্ত নির্জন
আমি জেগে উঠব
অশ্রু মুছে তোমার দিকেই তাকাব কেবল
ওগো অজ্ঞাত কমরেড…

নিজ মহত্ত্বের দীর্ঘচূড় পাহাড়ে পাহাড়ে
বীরেরা ফুটন্ত লাল ও হলুদ ফুলের স্বপ্ন দেখল
আমি যাব তাঁদের কাছেই,
হৃদয়বাহী হয়ে প্রত্যেক বন্ধুর কাছে পৌঁছাব।
আহা,
তুমি যেখানে ঝরবে, আমি সেখানে জাগব,
আমার আত্মার ঘূর্ণ্যমান সৌরমণ্ডলে যে
সুখের কত সারি সারি ছায়াপথ
স্তালিনের জনগণ আর মাও-সে-তুংয়ের দোসর
এবং একাব্রের গোষ্ঠী, আমার মায়ের শক্তিশালী কটিদেশ,
আমার পিতার গান, আমার জনগণের জয়ভেরী।
তবে এসো, স্বাধীনতার জ্যোতির্বিদ এসো,
এসো নক্ষত্রদ্রষ্টার দল
চেয়ে দেখো আকাশে
আমি তো বলেছি আমি আগেই দেখেছি
অন্ধকারে যা জন্মায় তার জ্যোতির্ময় বীজপুঞ্জ
এবং একটি জ্যোতিষ্ক, আমার হাতের ঘূর্ণ্যমান চাকায়,
আমার হৃদয়ে, আমার মাথায়,
আমার স্বপ্নে, আমার উন্মথিত রক্তে
এই গ্রহ সমাসীন।

বন্ধুর যেখানে পতন, আমার অভ্যুত্থান সেখানে
আমি জঙ্গল-শিকারী সৈনিক নই
আমি সমর্পিত একটি কবিতা।

অনুবাদকঃ রামেন্দ্র দেশমুখ্য

* মার্টিন কার্টার ব্রিটিশ গায়নার তরুণ কবি। জন্ম ১৯২৭ সালে। এটি তাঁর প্রতিরোধের একটি অতিবিখ্যাত কবিতা।—অনুবাদক

পাড়ি

সমরেশ বসু

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময়ে পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এল হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে—এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট অশ্বত্থ-পিটুলি-শজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচির পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে মা হয়েছে গঙ্গা। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে। দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে

পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকছে হঠাৎ। তারপর লাটিমটির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস্ করে! বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এখন ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্রস্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তর্‌তর্ করে।

দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঝের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই দুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে বসে দেখছিল। সেই সময়ে জানোয়ারগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত নেই তেমন। বাইরে থেকে মনে হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধু ধু করছে ইঁট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ় এসেছে ইঁট পোড়াবার মরশুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা। জেলে নৌকারও তেমন ভিড় হয়নি এখনো। তার মাঝে এ দুজন বসেছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বন ঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপজঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাট করে কাপড় পরা। গোঁফ-জোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো নরম, রোঁয়াটে ভাব যায়নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আভাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে, শরীর মানেনি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের মতো পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে!

হা হা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে তুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল।

এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চোপ বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপয় 'মিসিপালটির' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই!

গাঁয়ের মানুষ নন্কু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দার। তুমাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিনপ্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেট ভাতায় ছিল তুটিতে গাঁয়ে। নন্কু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল্। মাস গেলে তুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপ্ রে বাপ। ষাট টাকা। সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছমাস। একলা মানুষ নয়, যে মনের রাশ নেই, শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরের তুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে-কোনো অভিযানে নামতে পারে। নাগিনপ্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল তুটিতে নন্কুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা! তুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে মাসে।

দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে তুটিতে। কাজ নেই। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙ্গড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। ননকুকে বললে, কেন কাজ নেই?

ননকু বললে, ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল।

ওরা বললে, তবে কি হবে?

কি হবে! ননকু বোধহয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম।

আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গিদ্ধরের বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল ননকুর কান্নায়, রোহ, রোহ, তু তু তু, রহো সর্দার, ন রো। তুমি ভালো মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

এরা দুটিতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গেছল? ননকু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে।

সাতদিন কোনোরকমে খাইয়েছিল কেউ কেউ দুটিকে। পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।

গতকাল সারাদিন কেটেছে এখানে। আজো এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। শহরের-মধ্যে থাকা যায় না। পুবের উঁচু পাড়ের খানিকটা গেলেই ধাঙ্গড় বস্তি। সেখানেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে-পড়া কুকুরের মতো হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জীইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন ওদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল। জল আরো লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণের বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল। ভেজা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদের চারপাশ ঘিরে, বটতলায় পিঁপড়েরা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোয়ারের শুরুতে। একটা পুরো জোয়ারের উজান গেছে। তারপরে নেমেছে দীর্ঘ সময় ধরে একটা ভাঁটার ঢল। আবার লেগেছে জোয়ার।

এমন সময়ে এল সেই জানোয়ারগুলি পুবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এল কালো কুঁত্‌কুঁতে চোখো, ছুঁচলো মুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল!

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুয়োরের দল একবার থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে। তারপর আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পেছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে। দুটি সামনের দাঁত পুরো সোনার। শুয়োরগুলি কিনেছে এ অঞ্চলের যাবত ধাঙ্গড়-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপারে। সঙ্গে আর একটি লোক। সামনের বস্তির ময়লা টানা গাড়ির গাড়োয়ান।

এই দুটিকে দেখে সোনার মাকড়িকে বলল, মহাশয়জী, এ দুটোকে দিয়ে আপনার কাজ হতে পারে?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এল। দেখল দুটিকে একবার। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োয়ান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদের চেনে। বেকার বসে আছে। রাজী হয়ে যেতে পারে।

সোনার মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আরো খানিকক্ষণ। আর শুয়োরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়ের শাঁসের সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবার হুঁ দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সরে যাবে কিনা ভাবছে।

তারপর বলল সোনার মাকড়ি, কাজ করবি?

কাজ। কাজ মানে খাওয়া! ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হল। পুরুষটি বলল, কি কাজ?

সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি নিয়ে যেতে হবে দরিয়ার ওপারে।

আরে বাপ্। ভরা দরিয়া, আরো বাড়ছে। ফুলছে, নাচছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে! ওরা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে। দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই শুয়োরগুলির পাশে পাশে। ওইটি নিয়ম। কিন্তু সোনার মাকড়ি সেদিকে ঢু-ঢু। নৌকার পয়সা খরচ করতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিরে তাকাল দরিয়ার জলে।

তারপর শুয়োরগুলির দিকে। কালো কিম্ভূত দলা দলা ছড়ানো। মাদীই বেশি। চোখগুলি ট্যারা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য আছে ঠিক মানুষের দিকে।

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তেই মনে মনে রাজী হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপড়ে কষুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেয়েমানুষ। বললে, কিন্তু বিনা লাও, পারব তো?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আনা দুজনের মজুরি। আর উপরি পাওয়া যাবে কিছু কেড়ুয়া তেল, দরিয়ার থেকে উঠে গায়ে মাখার জন্যে। একটি জানোয়ার খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

বলে তার হাতের লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দিল পুরুষটির দিকে। মেয়েটি পাতা ছাড়িয়ে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ান, দুজনেই চোখাচোখি করল হতবাক হয়ে। রাজী হয়ে গেল দুটোতেই? শেষে জানোয়ারগুলি মেরে দুটোতে মরবে না তো। কিন্তু ওদের দুজনকে শুয়োরগুলিকে ঘিরে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সে তরর্ হয়ে গেল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল একটানা, উ-র্-র্-র্-র্-র্-আ…

আর পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায়, আ…হুঃ! আ…হুঃ! যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।

জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ

শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চক্‌চক্ ক'রে উঠল কুঁত্‌কুঁতে গোল চোখ্‌গুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সবাই গায়ে গায়ে। গায়ে গায়ে সবাই ঠিক জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝখানে।

উ-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-আ - উ-র্‌-র্‌-র্‌-আ . .

আ...হুঃ! আ···হুঃ!

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চকচকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ারগুলির মতো। গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অভর পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে, সেই আশায়। সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে তাগ্‌ বাগ। চেনে না শুধু দরিয়াটাকে। লাল দরিয়া চলেছে খরবেগে তর্‌তর্‌ করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, একজায়গায় থুকথুকিয়ে উঠেছে কালো কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

ওরা যত জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এল কাছাকাছি। মেয়েটি আড়চোখে ফিরে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল, লাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া।...

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পেছন-টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে।

পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে খালি, হাঁ, বহুৎ বড়!

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত ? পুরা রূপয়োর বেশি না কম ?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ। সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রূপোয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধার একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন। কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন ?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবারী। জানোয়ারের তখ্‌লিফ পরোয়া করে না।

ওরা ডাকছে স্বরে স্বর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে শুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী। হ্যাঁ, কিন্তু একটা গাভিন যে! গাভিন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনোটা পাঁচটা দেয়, কোনোটা ছটা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পাবে তো!

পাবে। নয়া গাভিন। এখনো হালকা আছে।

ডাকের স্বরটা কিছু রকমফেরে তাড়া দেওয়ার স্বর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো ?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ হাঁ।

হাঁ বাবা! এতবড় দরিয়া, যুঝবে কি করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে, তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ণ বিলম্বিত হাঁক দিল, হাঁ-ই—হা—হা…

মেয়েটা টান দিল, উ-র্‌-র্‌-র্‌—আ,—উ-র্‌-র্‌-র্‌-আ…

জানোয়ারগুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের স্বরে। গোল গোল ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাঠি আর ছপ্‌টি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ভাবখানা এ সবের

মানে কি। কি চাই? গায়ে গায়ে ঘষার একটা খস্‌খস্ শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মতো।

তারপর লাঠি-ছপটির নিশানা আর হাঁকের ইশারায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিরল নদীর দিকে। পরমুহূর্তেই কোনো খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতের লাঠি আল্‌তোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেয়ে, মাটিতে অদ্ভুত শব্দ করে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনের লাঠি-ছপটি হাতের ঘেরাওয়ে উনত্রিশটি জানোয়ার। বড় জাতের জানোয়ার।

ততক্ষণে আষাঢ়ের জোয়ারের গঙ্গা এগিয়ে এসেছে কল্‌কল্ করে। বাড়ছে। আরো বাড়বে।

কালো-কালো খোঁচা-খোঁচা লোমওয়ালা পিঠের ঢেউ থমকে থমকে পড়ছে। শুয়োর জল চায়। টানের দরিয়ায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদের টানা ঘোলা স্রোতের শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস করছে, কি হবে? কোথায় যেতে হবে?

পুরুষটি রূঢ় হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে তোয়াজের সুর দিচ্ছে, আহু আহু আহু, উতারো, উতারো। তোদের দরিয়া পার করি তারপর।...হোই... হা হা...

উ-র্-র্-র্—আ... উ-র্-র্-র-আ...

মেয়েটি কেবল দেখছে, দরিয়া বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ততই যেন ফুলছে, স্রোতের টান বেঁকে বেঁকে হিল্‌হিল্ করে যাচ্ছে। দেখছে আর ফিরছে পুরুষের দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলের কিনারায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোয়ারেরা। এ ওকে গুতিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে পেছিয়ে আসছে নিজে। এমনি করে অনিচ্ছায় এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটি জানোয়ার তীব্র চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই গাভিন শুয়োরীটি। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ছুটেছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ করে বলছে, যাব না, কখ্‌খনো যাব না!

যাবে না। ভয় পেয়েছে। হারামজাদীর পেটে বাচ্ছা আছে কিনা!

কিন্তু মেয়েটি হুতোশে পেছন তাড়া করতে গিয়ে, জলের ধারের কাদায়

পড়ল হুমড়ি খেয়ে। আবার উঠে ছুটতে যাবে। পুরুষটি হাঁক দিল, মত্ ছুট্ - মত্।

কাদা মেখে প্রায় খালি-গায়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেপে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুয়োরের দলের সঙ্গে। পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।

জলে নামাল না শুয়োরের দলকে। ডাঙার উপর দিয়ে চলল নরম স্বর ছাড়তে ছাড়তে। উররর-আ, উররর-আ, আ-হুই! আ-হুই!

শুয়োরীটা অনেক দূর গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে তেমনি। চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে আবার মুখ নামিয়ে কি সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।

এরা দুটিতে জলের ধার দিয়ে দলটাকে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। শুয়োরীটা দেখছে, খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতেই পিল্‌পিল্ করে ছুটে এল দলের মধ্যে। কিন্তু চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে! শয়তান মানুষ!

মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবার। সময় হয়েছে। এইবার! এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবার সরে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি।

শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তার সব কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হঁ হঁ! কোনো ডর নাই। হঁ-হঁ। আ-হুই! বলতে বলতে সে আবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা। গঙ্গামায়ী! যেন খিলখিল করে হাসছে, কল্‌কল্ করে কিসব বলছে। আর যেন ঠিক চেয়ে আছে ওদের দিকে। কি যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস? আসবি? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হয়েছি।... এই বলছে আর হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আর মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই

যেন দরিয়ার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কি রহস্য আছে সেখানে। কি ভয় আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মরণের।

এইবার বোঝা যাচ্ছে, ওরা দুটি যেন শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁচল আঁটছে কোমরে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড়, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয় গিরিশৃঙ্গের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক। পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রোঁয়াটে গোঁফ আর এবড়োখেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পার করাচ্ছে বিনা নৌকায়। উনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ! দুটো মানুষ! হাই বাপ্! জানোয়ারগুলোর কোনো দোষ নেই। হেই মায়ী! দুদিন ধরে দেখছ, আমাদেরও কোনো দোষ নেই।

ওরা বলছে আর দরিয়া যেন যোগেড়ী নাচওয়ালীর মতো কল্‌কল্ ঝুম্‌ঝুম্ করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওরা কেবলি সরে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষদুটোর দিকে। কান পাতছে বাতাসে আর জলে। বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে যেন ওরা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবার। এইবার। পুরুষটি জানোয়ার পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হয়ে যা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেরাতে হল জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবার জলে পড়লেই স্রোতের টান। তখন আর কিছু ভাববার অবসর থাকবে না।

শেষবার দুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটির সীমানায়। জানোয়ারগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাড়ছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল একটি তীব্র

চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহু এসে পড়তে লাগল জানোয়ার-গুলির গায়ে।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দরিয়া খানিকটা টেনে নিয়ে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পেছনে রেখে, জানোয়ারগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এরকম উত্তর দিকে গেলে, এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হত না।

পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ্‌, জল্‌দি।

তখনো বুকজল। দুজনে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কিসব বলাবলি করছে। গাভিন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির সামনে। উনত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার জানোয়ারের মতো ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে, গঙ্গার ওপারের দিকে। মেয়েটি পেছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না কোনোমতে। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা—ই! হা—ই! পেছন থেকে মেয়েটি হুম্‌হুম্‌ শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবিনে।

শুয়োরগুলি তখনো ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। এখনো বোধহয় পেছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই এগিয়ে যেতে চাইবে। এখন ভয়ে ও শঙ্কায়

ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, অ্যাঁ? মরতে হবে? কি চায় এরা!

ওপারে নিয়ে যেতে চায়।

পুরুষটি কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পেছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরো উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল, ঠেলে থাক্! জোরে ঠেলে থাক্। খবরদার ইধারে আসিস্‌নে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। কিন্তু তীব্র স্রোতে হাত-পাগুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটোর জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে পড়ছে, সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ারগুলি মরত নির্ঘাত।

পুবে হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে, সেইটাই ভয়ের! মেঘগুলি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হু-হু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন কি এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গভীর কালিমায়। ভাব-ভঙ্গি ভালো নয়। মেঘ তাতে আরো জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুটিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনো সেটুকু ভাববার, অনুভব করার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে, হা—হা—! মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক-একটা জানোয়ার। আর ওরা

দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে! কে তোকে কি করেছে। ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়।

ভাবতেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা ওদের দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। কিছু নয়। কিছু নেই। কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মতো লাফিয়ে উঠল জলে। কি হল?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁ পোঁ করে পালাচ্ছে উত্তর পুবে। যাবে না, কিছুতেই আর যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি।

পুরুষটি এক মুহূর্ত আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পেছন ধাওয়া করল। কাছাকাছি গিয়ে, মুখোমুখি হল। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস্ করে। ছুঁচলো মুখ আবার ফিরল। সেই গাভিনটা। আর দুটো উঠতি বয়সের। সময় হয়েছে গাভিন হওয়ার। এখনো মানুষ চিনতে শেখেনি, বিশ্বাস আসেনি মনে।

পুরুষটার রাগ হল, আবার মায়াও হল। খালি বলল, জানোয়ার। একদম জানোয়ার। হাই—হাই!

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে। লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জানোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি। পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মতো। বলছে, আমি আছি না, অ্যাঁ? হারামজাদী!…

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখই শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে। ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরো বাড়ছে। ফুলছে। এক-একটা জায়গায় জল যেন নিচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক-এক জায়গায়। ওখানে মাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। ঢালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।

শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্‌ করছে জলের মধ্যে। গোঁ গোঁ করে কিসব বলাবলি করছে। জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছপটি। তবু ওরই মধ্যে যত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে।

আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনো মাঝামাঝিও আসা যায়নি। জলের ধাক্কার ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে, মাথায় শিরাগুলি টানটান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের পা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।

জল হাসছে কল্‌কল্‌ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস? আয়, আরো আয়।

বলছে আর সমুদ্র উজাড় করে খল্‌খল্‌ করে আসছে।

হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী! মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোনো দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া কেবলি বাড়ছে আর ওর চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না। দূরে সরে যাচ্ছে কেবলি। হাতের ছপটি আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।

পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। যদি বলে, নাই সকৃতি! আর পারছিনে। বিদায় দাও।......বাবুসাহাব নাগিন-প্রসাদ ওদের বিয়েতে দুটো শুয়োর মেরেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিয়েছিল চার জালা তাড়ি।

আকাশ আরো নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই কড়কড় ব্যুম্‌ করে শব্দ হল।

অমনি জানোয়ারগুলি মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল। অ্যাঁ অ্যাঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা।

মেয়েটাও লাফ দিল মস্তবড় কাতলা মাছের মতো। ছপটি উঠেছে আবার হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খবরদার। কিছু ডর নেই, চল্। যত জল্দি পারিস্ চল্।

যা দু-একটা জেলে নৌকা ছিল আশপাশে, তারা সব পার ঘেঁসছে।

যত পশ্চিম, ততই স্রোত। পশ্চিমে বাঁকা। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির-কোথায়? শিউমন্দির? ওই, ওই যে। অনেক দূরে। এখনো অর্ধেক। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিয়ে উঠছে।

ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুয়োরগুলির কাছ থেকে। শুয়োরগুলি চাক বাঁধা। সেজন্যে ওদের গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওরা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মতো।

জানোয়ারগুলির বিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষদুটোর উপর। ওদের সরে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকছে বারবার।

আর ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পারছে না। ওরা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আর হাঁটুতে টান পড়েছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেয়েটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল! বলল, আচ্ছা, আমরা ফিরে আসব কি করে? খেয়া পারের পয়সা দেবে তো?

মেয়েটা মেয়েমানুষ। ও এখন ফিরে আসার ভাবনায় পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানিনে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মতো রেখাহীন অথচ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এক লহমায় মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি?

এই যে!

না, ডোবেনি। পুরুষটি গোঁফের ফাঁকে হাসবার চেষ্টা করল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেয়েটাকে হারাবার ভয় হয়েছে। বলল, কি, তখলিফ হচ্ছে ?

তখলিফ! এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিকৃচিক্ করে উঠল। একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।

আবার গতি বাড়ল জানোয়ারগুলির। অর্থাৎ স্রোত আরো বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ার-গুলিও!

মেয়েটা কি যেন টেনে টেনে তুলছে। কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের আসকে পিটের মতো ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বারবার, আর এই ঘোলা জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ওদের বিয়েতে কী বাঁশিটাই বাজিয়েছিল রামুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী দরিয়ায়—

চিকৃচিক্ দ্যুম! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

পুরুষটি ঢোকে ঢোকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস্?

হাঁ। আছি।

আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে, উনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে গেছে, না?

হ্যাঁ।

গঙ্গা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, দুলে দুলে যেন হেসে উঠছে ওদের কথায়।

আবার: আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায়?

পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাঁটা পড়ে গেল নাকি। সর্বনাশ! মন্দিরের কাছাকাছি এসে আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে! একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের হাতে উনত্রিশটা জানোয়ার।

পরমুহূর্তেই সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণি। ঘূর্ণি।

জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত পেল। ওরা পুরুষটির দিকেই এগুতে লাগল।

পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই। উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ। হেই মায়ী।

আবার জোর ফিরে এল দুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার। খবরদার।

সে ঘূর্ণি কাছাকাছি চলে গেল জানোয়ারগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হল, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল। কাপড়। দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।

পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মুড় করে উত্তরে ছোটে।

কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী। সেই গাভিন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন উপায়।

শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও

যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওইরকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু উপায়।

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এস। ওকে মরতে দাও।

মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।

বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এল থাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এল শেষ পর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।

হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরল শুয়োরীটার মুখের কাছে, নে, পারিস্ তো ধর কামড়ে।

কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পেছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নিচের পাটিতে কয়েকটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভালো করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।

পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাঠিটা গেল ফস্কে। দেখা গেল শুয়োরীটা পুরুষটির মাথার কাছে। দুজনেই ভাসছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে অনেকদূর। দাঁড়াবার উপায় নেই জোয়ারের ধাক্কায়।

শুয়োরীটা আরো জোরে চেঁচাচ্ছে তখন। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।

আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ্, চুপ্ কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে, ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।

দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, কী হ—ল ?

পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।

বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘনঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।

মন্দিরটার সামনেই নিচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা শুয়োরগুলো নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটি ভেসে গেল সেইদিকে।

কাছে এসে দেখল মেয়েটা বারবার ডুবছে। আর শুয়োরগুলি ভেসেই যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি, এখানে, এই জায়গায় তুলতে হবে।

কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে যে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।

মেয়েটার তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও নিদারুণ ক্লান্তি। ফিসফিস্ করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া। আমি জানোয়ারগুলোকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও। বলল, দরিয়ার দিল্লেগী।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এল, জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এল সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাঁচার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামিশি

হয়ে গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে হ্যাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আশেপাশে।

পরশু রাতের পর এই আবার খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল এসে পড়ছে। ছোট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা ঢাকতে পারেনি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ন রো! কাঁদিস্ নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরুণদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারো অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুন্‌গুন্ করতে লাগল,

যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবন-সুত মহাবীর—হই রামো!

আর তার রামা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।

ছেঁড়া চিঠি

অমল দাশগুপ্ত

এখন অনেক রাত। এত রাত যে ঝিঁঝিঁর ডাক পর্যন্ত স্তব্ধ। শুধু ঝিরঝিরে বাতাসে ভেসে আসছে ভাঁটুই ফুল ও আমের মুকুলের বুনো গন্ধ। জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যায়, মস্ত একটা দেবদারু গাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে অনবরত মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আরও দূরে চুর্নী নদীর সবুজ জলে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি। চারপাশের গভীর জঙ্গল সারা মাথায় চাঁদের আলো মেখে শিশুর মতো হাসছে।

আর ঠিক এই সময়ে হ্যারিকেনের আলোয় চিঠি লিখতে বসেছি, মনে হচ্ছে, তুমি বহুদিন যে-প্রশ্নের জবাব জানতে চেয়েছ, আজ বোধহয় তার জবাব দিতে পারব। জবাব দেবার জন্যে এমন একটি রাতেরই প্রয়োজন ছিল; এমন একটি রাত যখন তুমি থাকবে অনেক দূরের কলকাতায় আর আমি থাকব নদীয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামে আর সারা আকাশে-বাতাসে মাতাল জ্যোৎস্না দিশেহারা হয়ে মাথা কুটবে।

তুমি বহুদিন আমাকে প্রশ্ন করেছ, আমি কেন তোমাকে ভালোবাসি? আমি জবাব দিইনি। এতদিন আমার ধারণা ছিল, এ প্রশ্নের জবাব নেই। এটা হচ্ছে নিতান্তই উপলব্ধির ব্যাপার। জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো স্পষ্ট একটি সংজ্ঞা দিয়ে কক্ষনো বলা যায় না, কেন একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসে। কিন্তু তুমি এমন অবুঝ যে এই সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝতে

চাও না। বারবার আমাকে এই একই প্রশ্ন করো। এমনকি তোমার শেষ চিঠিতেও এই প্রশ্ন।

এতদিন তোমার প্রশ্ন শুনে লজ্জা পেয়ে এসেছি। আজ মনে হচ্ছে, জবাব দিতে পারব। জবাবটা তোমার কাছে তো বটেই, আমার নিজের কাছেও।

আবারও বলি, জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো স্পষ্ট একটি সংজ্ঞা দিয়ে এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। আমি শুধু তোমাকে একটা ঘটনা বলব। সেই ঘটনার মধ্যেই তোমার জবাব খুঁজে পাবে। আমি নিজে পেয়েছি।

তুমি জানো, নদীয়া জেলার এই অখ্যাত গ্রামে আমি এসেছি নিতান্তই চাকরির দায়ে। গ্রামের মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তুমি আসতে পারনি বলে মন খারাপ করেছ। শেষ দুদিন ভালো করে কথাও বলোনি। পরে আমি চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মস্ত একটা চিঠি লিখে নিজের দোষ কাটাতে চেষ্টা করেছ। চিঠিটা পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমাকে বলতে বাধা নেই, তোমার ওই অবুঝ-পনাও আমার খুব ভালো লাগে।

নদীয়া জেলার এই গ্রামটিকে অখ্যাত বললাম বটে কিন্তু বনেদিয়ানার দিক থেকে এ গ্রামের গৌরব কিছুমাত্র কম নয়। গ্রামে ঢুকলেই চোখে পড়ে, তিনটি আকাশছোঁয়া মন্দির—দুটি শিবের, অপরটি শ্রীরামচন্দ্রের। তিনটি মন্দিরই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের ; পলেস্তরা-খসা দেয়ালে আর ফাটল-ধরা চত্বরে শতাব্দীর ছাপ বিচিত্র আলপনা হয়ে ফুটে আছে। কোথাও গম্বুজ ধ্বসে পড়েছে, কোথাও বা অশথগাছ আষ্টেপৃষ্ঠে শেকড় মেলেছে—কিন্তু এখনো মন্দিরের চুড়োয় অষ্টধাতুর কলস সূর্যের আলোয় আগুনের মতো জ্বলতে থাকে।

এই মন্দির তিনটিকে আমার মনে হয়েছে, সারা গ্রামের প্রতিচ্ছবি। পাশাপাশি ভাঙন আর দীপ্তি। গ্রামের পুরনো রাজবাড়ি বলতে এখন দেখা যায় শুধু কয়েকটি জীর্ণ প্রকোষ্ঠ আর মস্ত উঁচু একটা মাটির ঢিবি। হাতিশাল ঘোড়াশাল সমেত গোটা রাজবাড়িকে পাতাল গ্রাস করেছে। আর ঠিক তারই পাশে লুপ্তস্রোতা কঙ্কনার শ্যামল তৃণভূমিতে ছিটেবেড়ার কুটির—পূর্ববাঙলার উদ্বাস্তুরা নতুন ঘর বেঁধেছে। চূর্নীনদীর সবুজ জল কাঁচের মতো

স্বচ্ছ—সবুজ জলের ভেতরে আরো সবুজ শ্যাওলার অরণ্যকে রহস্যময় বলে মনে হয়। মুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠতে হবে—বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে রুপোলী আঁশওলা ছোট্ট একটা মাছ। পায়ে-চলা মেঠো রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হোগলার বন থেকে বাঘের বুনো গন্ধ এসে নাকে লাগে। আবার ওদিকে আম-জাম-কাঁঠাল-পেয়ারার বাগানে কোকিলের ডাকেরও বিরাম নেই। এ গ্রামে পায়ে পায়ে ঝোপঝাড়, পায়ে পায়ে বুনোফুল।

প্রথম দিনেই গ্রামকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তখনো পরিচয় হওয়া বাকি ছিল। এই পরিচয়টুকু হবার পরে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। কী কল্পনাতীত দারিদ্র্য অথচ তার মধ্যেও কী উদ্দাম জীবনীশক্তি। এখনকার মেয়েদের নিটোল শরীর, কালো চোখ আর মাছি-পিছলানো গাল দেখে আমরা শহুরে মেয়েরা লজ্জা পাই। এমনি একটি মেয়ের কথা তোমার কাছে লিখতে বসেছি।

তার আগে নিজের কথা আরেকটু বলে নিই। আমাকে নিয়ে সারা গ্রামে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছে। এত বেশি আদর ও ভালোবাসা পেয়েছি যে এক একসময় ভুলেই যাই যে আমি এদের ঘরের লোক নই; আমি এসেছি নিতান্তই চাকরির খাতিরে, দু দিন পরে আমাকে চলে যেতে হবে। এত অজস্র ঘটনা ঘটেছে যা লিখে জানানো সম্ভব নয়। দেখা হলে বলবো এবং প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনা চিরজীবন মনে রাখার মত।

এবার আসল ঘটনা বলি।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমি এখানে আসার সপ্তাহখানেক পরে। সেদিন গিয়েছিলাম গ্রামের একেবারে শেষ সীমায়। মূল গ্রাম থেকে খানিকটা যেন বিচ্ছিন্ন হয়েই দশ-বারোটি পরিবার থাকে এদিকে। এদের কারও কোনো স্পষ্ট জীবিকা নেই, এমনকি নিজস্ব ঘরবাড়িও নেই। দূর থেকে মনে হয়, বিস্তীর্ণ এক জঙ্গল, মস্ত মস্ত আকাশছোঁয়া গাছ ঘন ডালপালা ছড়িয়েছে। সামনে এগিয়ে এলে বোঝা যায়, সবটাই জঙ্গল নয়, তারই মধ্যে রয়েছে এককালের বিরাট এক চকমেলানো দালানের ভগ্নাবশেষ। এই ভগ্নস্তূপের বর্ণনা আমি দিতে চেষ্টা করব না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মস্ত একটা

কিছুকে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে এত মন খারাপ হয়ে যায় আমার !

আর এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে দু-এক জায়গার কোনোরকমে টিকে থাকা ছাদের আশ্রয়ে মাথা গুঁজেছে দশ-বারোটি পরিবার।

আমি আগেই খবর পাঠিয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েরা ভিড় করে ঘিরে ধরেছিল আমাকে। আমবাগানের ঘন ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপরে বসেছিলাম।

আর এখানেই সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা। নাম তার কুসুম। মেয়েটির চেহারার একটু বর্ণনা দিয়ে নিই। নিটোল শরীর, কালো চোখ, মাছি-পিছলানো গাল—শুধু এটুকু বললেই সব বলা হয় না। স্বাস্থ্য এবং রূপ মেয়েটির যথেষ্ট আছে। যে কোনো পোর্ট্রেট শিল্পী ওকে মডেল করে বিখ্যাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি ওর মুখখানা দেখে। হাসি আর কান্না যেন একসঙ্গে ফুটে উঠেছে সে মুখে। বর্ণনা দেবার মতো ভাষা আমার নেই। তবে আমার মনে হয়েছিল থমথমে কালো মেঘে ভারী আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে আর সেই বিশেষ মুহূর্তের অনির্বচনীয় রূপটি ধরা পড়ছে ওর মুখের ভাবে। কুসুমকে দেখতে কেমন তা জানতে হলে ওকে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে।

আমি এখন ফাইলপত্র সাজিয়ে বসেছি, জন বারো বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীলোক আমাকে ঘিরে বসে উদগ্র কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এমন সময় সেই ভগ্নস্তূপের আড়াল থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে কুসুম এসে হাজির। অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে বলে ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে, একরাশ রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপরে, খসে পড়েছে আঁচল।

আমি একটি কথা বলবারও সুযোগ পেলাম না। তার আগেই কুসুম আমার সামনে উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলে উঠল, দিদি তুমি তো কলকাতা থেকে আসছ। তুমি নিশ্চয়ই জানো। কি করলে আমি মা হতে পারব বলে দিয়ে যাও !

আমি কুসুমকে তুলে ধরে বসিয়ে দিলাম। ওর দু-চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে, ভারী নিশ্বাসে ওঠানামা করছে বুকটা। আমার দিকে তাকিয়ে তেমনি স্বরে আবার ও বলল, দিদি, কি করলে আমি মা হতে পারব বলে দিয়ে যাও।

স্বীকার করতেই হবে যে এমন অবস্থায় পড়ব তা আমি কল্পনাও করিনি। অন্য যারা আমাকে ঘিরে বসেছিল তারাও সবাই নির্বাক। তারা কেউই বিশেষ অবাক হয়নি। বুঝতে পারলাম, কুসুমের এধরনের ভাবাবেগের সঙ্গে সবাই পরিচিত।

দৃশ্যটা একবার তুমি কল্পনা করো। একটি কিশোরী মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছে। আমগাছের ডালে ডালে বাতাসের মাতামাতি। আমের মুকুলের মাথা-ঝিমঝিম-করা গন্ধ। কোকিলের ডাক। এবং আরো যে কত কী তা লিখে শেষ করা যায় না। মুহূর্তের জন্য নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হতে লাগল।

একজন বিধবা মহিলা বললেন, হতভাগীর বিয়ে হয়েছে অনেকদিন কিন্তু এখনো কোল ভরেনি। বাচ্চা হবার জন্য করেনি হেন কাজ নেই। কত ঠাকুরের কাছে ধন্না দিয়েছে, কত সন্নেসীর ওষুধ খেয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। এবার এসেছে তোমার কাছে। যা হোক দুটো ভরসার কথা বলে দাও, নইলে ও বাঁচবে কী নিয়ে!

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে কুসুমকে একটু শান্ত করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বয়স কতো?

কুসুম বলল, ষোলো।

তোমার স্বামী কোথায়?

সেই ভগ্নস্তূপের এক অনির্দিষ্ট দিকে আঙুল বাড়িয়ে ইঙ্গিতে ও জানাল যে স্বামী এখানেই থাকেন।

আমি বললাম, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? সময় হলে নিশ্চয়ই তুমি মা হবে। কী বা এমন বয়স হয়েছে তোমার! আমি বলছি, মা তুমি নিশ্চয়ই হবে।

কুসুম বলল, দিদি, তুমি আমাকে বলে দিয়ে যাও কি করলে আমি মা হব, কবে আমি মা হব।

আমি বললাম, তোমার কিছু করতে হবে না। সময় হলেই তুমি মা হবে।

কবে হব দিদি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবে তোমার বিয়ে হয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে ও জবাব দিল, আড়াই বছর বয়সে।

কত বছর ?

আড়াই বছর।

স্পষ্ট জবাব। অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আমি পরের প্রশ্নে এলাম, তোমার স্বামীর বয়েস কত ?

কুসুম বলল, পঞ্চাশ।

প্রশ্নের জবাব পেতে একটুও দেরি হচ্ছিল না। কিন্তু এমনভাবে ও আমার দিকে তাকিয়েছিল আর এমনভাবে জবাব দিচ্ছিল যেন এসব প্রশ্ন আর জবাবের মধ্যেই ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমি ক্রমশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

ও আবার বলল, দিদি, কবে আমি মা হতে পারব বলে দিয়ে যাও।

স্বামীর বয়েস শুনে আমার মনে অন্য যে প্রশ্নটা উঠেছিল, তাই এবার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি প্রথম পক্ষ ?

এবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম না। প্রশ্ন শুনেই ওর মুখখানা কালো হয়ে গেছে। নিজের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে জোরে কামড়ে ধরে মুহূর্তের জন্যে তাকাল আমার দিকে। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও জবাব না পেয়ে আমি আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম।

ও বলল, জানি না।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে সেই ভগ্নস্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুসুমের বৃত্তান্ত আমি পরে শুনেছি। সংক্ষেপে জানাচ্ছি তোমাকে। কুসুমের মা ছিলেন পূর্ববাংলায়। সেখানেই তাঁর বিয়ে, সেখানেই কুসুমের জন্ম। কুসুমের জন্মের ছ-মাসের মধ্যে কুসুমের মা বিধবা হন। তারপর ছ-মাসের বাচ্চাকে নিয়ে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় যখন তাঁর না-খেয়ে মরবার মতো অবস্থা তখন তিনি কাশীতে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। এই আত্মীয়টির বয়স খুব বেশি নয়, তবুও তিনি সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হয়েছিলেন। কুসুমের মার চিঠি পেয়ে তিনি একেবারে সশরীরে এসে হাজির। গ্রামে রাত্রিবাস করেন নি। মা ও মেয়েকে নিয়ে সেদিনই

দেশত্যাগ করেছিলেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এসে সংসার পেতেছিলেন নদীয়া জেলার এই অখ্যাত গ্রামে। কুসুমের মার এই আত্মীয়টি কেন অল্প বয়সেই কাশীবাসী হয়েছিলেন, কেন কুসুমের মা বিশেষ করে এই আত্মীয়টির কাছেই চিঠি লিখেছিলেন, কেন এই আত্মীয়টি চিঠি পাবার সঙ্গেই সশরীরে ছুটে এসেছিলেন, কেন আবার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দেশে এসে সংসার পেতে বসেছিলেন—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তোমার যদি কৌতূহল থাকে তো পরে একসময়ে শুনে নিও। আমি তোমাকে শুধু মূল ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। নদীয়া জেলার এই অখ্যাত গ্রামে এসে নতুন করে সংসার পাতার পরে কুসুমের মা বেশিদিন বাঁচেননি। বছর দুয়েক পরে তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। কুসুমের বয়েস তখন আড়াই বছর। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে নিশ্চয়ই তাঁর খুব দুশ্চিন্তা হয়েছিল। তখন তিনি এক কল্পনাতীত কাণ্ড করে বসলেন। নিজে সামনে থেকে তাঁর নতুন-পাতা সংসারের পুরুষটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গেলেন নিজের আড়াই বছরের মেয়ের।

সেই আড়াই বছরের কুসুম এতদিনে পূর্ণযৌবনা ষোড়শী। কোনো অভিযোগ নেই, কথাবার্তায় কোনো রকম জ্বালা প্রকাশ পায় না, শুধু আছে একটিমাত্র কামনা—মা হতে পারা। কোলভরা একটি সন্তানের অপেক্ষায় আছে ও।

পরে কুসুমের সঙ্গে আবার আরেকবার দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুসুম, তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসো ?

কুসুম বলেছিল, ভালোবাসি।

এত স্পষ্টভাবে বলেছিল যে আমি পর্যন্ত অবাক হয়েছিলাম। সাধারণত গ্রামের মেয়েরা এ-ধরনের প্রশ্ন বুঝতে পারে না, বুঝতে পারলেও জবাব দিতে চায় না। কিন্তু কুসুম আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

তারপরে আমি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম, কেন ভালোবাসো ?

এই প্রথম দেখলাম, সেই মাছি-পিছলানো গালে রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। কালো চোখ মাটির দিকে নামানো। এ-প্রশ্নের জবাব কুসুম মুখ ফুটে বলতে পারেনি। লজ্জা পেয়েছিল।

কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ও কি বলতে চায়।

কাহিনী

বারীন্দ্রনাথ দাশ

ওপারে ময়নাডাঙার বস্তি। মাঝখানে অনভিজাত দোহারা রাস্তা—চায়ের দোকান মুদির দোকান শালকরের দোকান মিষ্টির দোকানে ঠাসাঠাসি। সে পথে সরকারী বাসের নতুন রুট হয়েছে। তার এপারে কৃষ্ণচূড়া টেরেস।

পাড়ার মানুষগুলি শৌখিন, জাতে উচ্চ-মধ্যবিত্ত। হালফ্যাশানের দু-একটি বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা কখনো বা টুং-টাং পিয়ানো বাজে, স্ত্রী-পুরুষের দুরান্ত কম্বুকণ্ঠে উন্নাসিক ভারতীয়-ইংরেজি শোনা যায় কখনো সখনো। কিন্তু প্রায় সব বাড়িতেই এখনো শাঁখ বাজে সন্ধ্যেবেলা, তারপর নতুন বয়েস-হওয়া মেয়েরা গলা সাধে।

এ পাড়ার নাম কেন কৃষ্ণচূড়া টেরেস কেউ বলতে পারে না। এ পাড়ায় কৃষ্ণচূড়ার গাছ আছে শুধু একটি। কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ দেখা যায় বাস্-রাস্তার দুপাশে, ময়নাডাঙা বস্তির আশেপাশে, বস্তি অঞ্চলটিকে এদিককার শৌখিন পরিবেশ থেকে আড়াল করে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি কলকাতায় যখন বসন্ত আসে, তখন কোকিলের ডাক ভেসে আসে ময়নাডাঙার ওধার থেকেই। চৈত্র পেরিয়ে বৈশাখ পড়তে না পড়তে ময়নাডাঙার মাটির ঘরগুলোর খাপরার চাল লালে লাল হয়ে যায় ঝরে-পড়া কৃষ্ণচূড়ার পাপড়িতে।

কৃষ্ণচূড়া টেরেসের ঝকঝকে রাস্তার দুপাশের বারান্দা আর দু-চার ছটাক বাগানের শূন্য টবগুলোয় ডালিয়ার মরসুম শেষ হয়ে যায় তার অনেক অনেক আগেই।

এ পাড়ার যে একটি মাত্র মাঝারি সাইজের কৃষ্ণচূড়ার গাছ, সেটি চাটুজ্জেদের বাড়ির সামনে। তারই ঝরা পাপড়িতে ছেয়ে যাওয়া সওয়া তিন ইঞ্চি কাঁচা ফুটপাথের এধারে দত্তদের পাঁচিল ঘেঁষে যে পানের গুমতি, সেখানে বসে পান সাজে বিড়ি পাকায় আর মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়ার সোনালী-লাল ফুলের গোছার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গুনগুন করে গজলের সুর ভাঁজে ছোটেলাল তিওয়ারি।

সেই সকালবেলা যখন কর্পোরেশনের লোক রাস্তায় জল দিতে আসে তখন দোকানের ঝাঁপ খোলে ছোটেলাল। অনেক রাতে যখন টহল শেষ করে ভাঙা হারমোনিয়াম বাজিয়ে এ পথ দিয়ে বাড়ি ফেরে ময়নাডাঙার মেহের আলি আর তার পেছন পেছন যায় সস্তা রেশমের ঘাঘরা-পরা পায়ে-ঝুমুর দুটি বাচ্চা মেয়ে, তখন ছোটেলাল ঝাঁপ নামিয়ে দেয়। এর মাঝখানে সারাদিন নানারকম লোক আসে তার দোকানে। সকালবেলা এ বাড়ির ঠাকুর ও বাড়ির চাকর সে বাড়ির ঝি এসে সিগারেট কিনে নিয়ে যায়। বেলা হলে অফিস যাওয়ার পথে সিগারেট কিনতে আসে বাবুরা, কেউ বা পুরো প্যাকেট, কেউ আধ প্যাকেট, কেউ বা খুচরো একটা দুটো। দুপুর বেলা ঝি-চাকরদের পান আনতে পাঠায় আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা। তারপর বাড়ির কাজকর্ম সেরে ঝি-চাকর-ঠাকুরেরা পান-বিড়ি খেতে আসে। কিছুক্ষণ জটলা করে দোকানের সামনের বেঞ্চিতে নয় ফুটপাথে বসে। সুখদুঃখের গল্প করে নানারকম। বিকেল বেলা বাচ্চা কোলে করে আসে ঝিয়েরা, প্র্যাম ঠেলে আসে সচ্ছলতম দু-চার বাড়ির আয়া, মুখে পান গুঁজে ধীরে সুস্থে নিতম্ব দুলিয়ে চলে যায় বড়ো রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে আরো বড়ো রাস্তার ট্রাম লাইনের ওপারের পার্কে। সন্ধ্যের পর ব্যারিস্টার সায়েবের বেয়ারা এসে এক ডজন সোডা কিনে নিয়ে যায়। অধর-রাগ-রঞ্জিতা নাগরিকাকে পাশে বসিয়ে স্পোর্টস গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায় ড্রেস-স্যুট-পরা নাগরিক। ছোটেলালের দোকানের সামনে দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাতে গিয়ে মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটি আনমনে তাকিয়ে থাকে। রাত্তিরে আবার এসে ভিড় করে সিগারেটের খদ্দের, পানের খদ্দের। আরো অনেক রাত্তিরে বাড়ির কাজ সেরে দোকানের সামনে এসে জড়ো হয় ঠাকুর-চাকর-ঝিয়েরা। তারপর যখন নিঝুম হয়ে আসে চারদিক, অন্ধকার হয়ে যায় আশেপাশের বাড়ির

জানলাগুলো, ঢং ঢং করে প্রহর বাজে দূর রেল লাইনের ওপারের কারখানায়, মেহের আলির হারমোনিয়ামের স্বরের পেছন পেছন আসে জুজোড়া শ্রান্ত ঝুমুর, এক একজন করে উঠে পড়ে, ফাঁকা হয়ে আসে দোকানের সামনের বেঞ্চি, টিমটিম করে গ্যাসের আলো আর আস্তে আস্তে ঝাঁপ নামিয়ে দেয় ছোটেলাল তিওয়ারি।

এমনি করে কেটে গেছে বছরের পর বছর—কয়েকটা নিঃসঙ্গ বছর। কোনোদিন দেশে যায় নি, কোনোদিন একবেলা দোকান বন্ধ করে নি। কবে সেই আঠারো বছর বয়েসে সে এপাড়ায় এসে দোকান খুলেছিল, তারপর দীর্ঘ দশটা বছর কেটে গেছে। এই দশটা বছর পাড়ার লোকে তাকে দেখেছে দিনে রাত্তিরে এই দোকানেই। দোকানের নিচের খুপরিতে তার গেরস্তালি, এক পাশের তোলা উনুনে অবসর সময়ে চটপট দু চারখানি রুটি সেঁকে নেওয়া। পথের পাশের ডাকবাক্সর সম্বন্ধে পাড়ার লোকের যেমন কৌতূহল নেই, কোত্থেকে সেটি এলো আর কদ্দিন থাকবে, ছোটেলালের সম্বন্ধেও তেমনি নিস্পৃহ। পথের ধারের ঘাস যেমনি গজিয়েছে, ছোটেলালও যেন তেমনি গজিয়েছে এপাড়ার একপাশে।

মাঝে মাঝে কৌতূহল প্রকাশ করে ঠাকুর-চাকর-ঝিয়েরা—

"তোমার দেশ কোথায় ছোটেলাল?"

"য়্যাদ নেই ভাইয়া, যেখানে থাকি সেটাই আমার দেশ।"

"তোমার মা-বোন কেউ নেই ছোটেলাল?"

"আলবত আছে। তোমাদের মা-বোনও হামার মা-বোন।"

"তোমার বৌ নেই ছোটেলাল?"

ছোটেলাল কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই সরকারদের বাড়ির ঝি হরিদাসী বলে ওঠে, "ওকে আর ওসব জিজ্ঞেস কোরো নি ঠাকুর, বলবে—তোমাদের বৌয়েরাই হামার বৌ।"

হাসি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে কথার স্রোত এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। ছোটেলালের সম্বন্ধে কেউ আর বিশেষ কিছু জানতে পারে না।

ছোটেলাল কিন্তু খবর রাখে পাড়ার সব বাড়িরই। আর সে খবর আসে ঠাকুর-চাকর-ঝিয়েদের মারফত। কোন বাবুর মাইনে বাড়ল, কোন গিন্নি-মার সঙ্গে বাবুর বনিবনাও নেই, কার মেয়ে নিজের-পছন্দ-করা ছেলেকে বিয়ে

করবে বলে বাপমায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, কোন বাবু নিজের বৌকে ঝিয়ের মতো খাটায়, কার ছেলে বাড়িতে টাকা পাঠায় না—সব প্রসঙ্গের আলোচনা ছোটেলালের দোকানে, দুপুরবেলার আর অনেক রাত্তিরের আড্ডায়।

এসব খবর জানায় বেশি আগ্রহ নেই তার। ওরা বলে যায়, সে চুপ করে শোনে।

কিন্তু ওরা যখন আলোচনা করে নিজেদের সুখদুঃখের কথা তখন সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে এটা সেটা। সান্ত্বনা দেয়, সহানুভূতি জানায়, সাধ্যমতো সাহায্য করবার চেষ্টা করে।

গুপ্তদের ঠাকুর দুমাস মাইনে পায় নি। ছোটেলাল তাকে আজকাল দুটো চারটে বিড়ি খাওয়ায় এমনিতেই, পয়সা নেয় না।

গাঙ্গুলীদের বাড়ির ঝিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ভাঁড়ার থেকে বিস্কুট চুরি করে খায় এই অপবাদ দিয়ে।

"সাচমুচ খেয়েছিলি নাকি?"

একটু চুপ করে থেকে গঙ্গা বললে, "না ভাই, সে অন্য ব্যাপার।"

"বোল্ না হামাকে—!"

"শুনে আর কি করবি। বড়লোকের বাড়ির কেচ্ছা! ছোড়দাদাবাবু তো লোক ভালো নয়। একলা পেলে হাত ধরে না টানত! একদিন বললাম, গিন্নী মাকে বলে দেব। ঘরের বাইরে থেকে গিন্নী মা শুনতে পেয়েছিলেন। এই—।"

ছোটেলাল বলল, "ও কাজ গেল তো ভালোই হল। পনেরো নম্বর বাড়িতে যা। ওরা নতুন এসেছে। বুড়ো বাবু বলছিল একটা ঝি দিতে। লোকজন কম আছে, কাজও কম আছে। বাবু, মাঈজী, আর এক লেড়কী। ওখানে গিয়ে বল, ছোটেলাল ভেজে দিয়েছে।"

দত্তদের বাড়ির চাকর ভোলা এসে একদিন বললে, "ভাই ছোটেলাল, আমায় অন্য কোথাও একটা কাজ ঠিক করে দে।"

"কেন রে, এখানে তো সোলা রূপায়া তনখা পাচ্চিস।"

"আর বলিসনে। ওরা টাকাটা একসঙ্গে দেয় না। দুটাকা তিন টাকা করে দেয়। দেশে মায়ের অসুখ। ঠিকমতো টাকা পাঠাতে পারি না। টাকা দেয় না, আবার খেতেও দেয় না।"

"খেতে দেয় না!"

"হ্যাঁ ভাই, বাবুদের একরকম খাওয়া, আমাদের একরকম খাওয়া। আমাদের যে চাল দেয় না, সে শেয়াল কুকুরও খাবে না, এমন গন্ধ! আমরা গরিব মানুষ, চিরকাল মোটা চালই খেয়েছি, কিন্তু এ রকম বিচ্ছিরি গন্ধ, এ চাল জন্মেও খাই নি। কোন দেশের চাল কে জানে। তরকারি কম করে রাঁধে, বাবুদের দিয়ে থুয়ে যা বাঁচে তাতে কুলোয় না, নুন মেখে খেতে হয়। এমনি করে কদ্দিন পারা যায় বল! আগে গোয়াবাগানে যখন কাজ করতুম ভালোই ছিলুম। ওনারা ছিল সাধারণ গেরস্ত, মাইনেও দিত কম, কিন্তু নিজেরা যা খেত আমাদেরও তাই দিত। বড়মানুষের বাড়ি চাকরি করতে এসে এখন উপোস করতে হচ্ছে। মায়ের অসুখ, নইলে কবে ছেড়ে দিতুম এ কাজ।"

এমনিতরো সব অভাব অভিযোগ। এদের বাড়ির চাকদের ভোর ছটা থেকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত খাটায়, হপ্তায় একবেলা ছুটি দেয় না। ওদের বাড়ি ঝিয়ের মাইনে কেটে নেয় একদিনের ছুটি নিয়ে শালখেতে বোন-ঝিকে দেখতে গেলে। কাদের বাড়ির ঠাকুরের যেন জ্বর এসেছিল একবেলা। তখন চারদিকে বসন্ত হচ্ছে। ঠাকুরকে দিনে দিনে তাড়িয়ে দিল। দত্তদের বাড়ির চাকর কাজ করছে আজ পাঁচ বছর। এক টাকা মাইনে বাড়ায় নি। সেদিন মাইনে বাড়ানোর কথা বলেছিল, বাড়ির কর্তা যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়েছে, বলেছে—তুই ফাঁকিবাজ, কাজ করিস না, পানের দোকানে আড্ডা দিস, বাজারের পয়সা চুরি করিস। চৌধুরীদের বাড়িতে একটি বাচ্চা ছেলে রেখেছে, ভীষণ বোকা, নতুন এসেছে গাঁ থেকে, তাকে বলে দিয়েছে, খবদ্দার, পাড়ার চাকরদের আড্ডায় মিশবি না, যদি কোনোদিন ওদের মধ্যে দেখি তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

আর হ্যাঁ, ব্যারিস্টার সায়েব সেদিন মদের ঝোঁকে তার বেয়ারাকে ভীষণ মার মেরেছে, এমন মেরেছে যে নাকমুখ ফেটে রক্ত বেরিয়েছে—তার পরদিন সকালে তার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছে, ও কিছু নয়রে, ও রকম আমার মাঝে মাঝে হয়।

"অমন মার খেয়েও তুই ওখানে কাজ করছিস, পাঁচু?"

পাঁচু গালে হাত বুলিয়ে উত্তর দিল, "বোনটার কাপড় ছিঁড়ে গেছে,

একজোড়া শাড়ি চাইছিল অনেকদিন থেকে। ভাবলাম, যাকগে, ফোকোটে পাঁচটা টাকা পাওয়া গেল, বোনের একজোড়া শাড়ি হবে—।"

মিত্তিরদের বাড়ির ঠাকুর বুড়ো হয়েছে। বললে, "সেকালে চাকরি করেছি পলাশপুরের চৌধুরীদের বাড়ি। বাবুরা গোরুর মতো খাটিয়েছে, পান থেকে চুনটুকু খসবার জো ছিল না, কিন্তু যখন যা চেয়েছি তাও দিয়েছে।"

ছোটেলাল বলল, "ভাই, সে এক জমানা ছিল, এ আরেক জমানা। তবে তখনও গোলাম, এখনও গোলাম। বাবুরা যদি মেহেরবানি করে তো আচ্ছা, তা নইলে মুসীবত।"

"এমনি করে আর কদ্দিন চলবে," বললে পনেরো নম্বরের ঝি গঙ্গা।

বাইশ নম্বরের চাকর রামেশ্বর নিভে-যাওয়া বিড়িটি ধরিয়ে বলল, "যারা কলে কারখানায় চাকরি করে ওরা আছে সুখে।"

"বটে? এমন গুল কে মারলে তোর কাছে," জিজ্ঞেস করল হরিদাসী। "আমার ভাই কাজ করে বেলঘরিয়া চটকলে। কিরকম সুখে আছে তার কাছে গিয়ে জেনে আয়।"

"আরে বাবা, আর কিছু না হোক রোববারটা ছুটি পায় তো!"

"ভাই সুখে কেউ নেই," বললে গঙ্গা, "বাবুরা যে অমন বড়ো বড়ো চাকরি করে, তেনারাও সুখে নেই। ওনারা জুতো খায় ওনাদের মুনিবদের কাছে তারপর আমাদের এসে জুতো মারতে চায়। আমাদের নিচে তো কেউ নেই, তাই আমরা শুধু জুতো খেয়েই মরি, কাউকে জুতো মারতে পারি না।"

"তোর নিচে কেউ থাকলে তাকে জুতিয়ে তুই খুশি হতিস গঙ্গা?"

গঙ্গা প্রথমটা কোনো উত্তর দিতে পারল না। তারপর পানের পিক ফেলে একগাল হেসে উত্তর দিল, "গাঙ্গুলীদের বাড়ির ছোটদাদাবাবুকে জুতো মারতে পারলে খুব খুশি হতাম, মাইরি।"

"কিন্তু জুতো কেনবার পয়সা কোথায় গঙ্গা," পাঁচু বললে, "সে টাকায় আমার বোনের একটি জামা হয়।"

"আমার মায়ের একশিশি ওষুধ হয়—।"

"তোর মা কেমন আছেরে ভোলা?"

"আগের মতোই। আর সারবেও না। যে কদিন আছে নিজেও ভুগবে, আমাদেরকেও ভোগাবে।"

"তুই বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছিস ভোলা।"

"ভোলা রোগা হয়ে যাচ্ছে তো তোর কিরে গঙ্গা ?"

"দেখ পাঁচু, যা তা ইয়ারকি করবিনে বলে দিচ্ছি। সেদিন তোর সায়েবের কাছে মার খেয়েছিস, আজ আমার কাছে মার খাবি।"

"নে বাবা, কি কথায় কি কথা এসে গেল," বললে হরিদাসী, "পাঁচুর কথায় কান দিসনি গঙ্গা। পান খাবি নাকি বল। ও ভাই ছোটেলাল, পান সাজো দুটো। আমারটায় জর্দা। সুখে আছে আমাদের ছোটেলাল, কি বলিস, কারো চাকরি করে না, কারো ধার ধারে না। বৌ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, মনিব পর্যন্ত নেই—যা কামায়; তাই খায়, মাসকাবারের জন্যে বসে থাকতে হয় না, ওর চেয়ে সুখী কে বল ?"

সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে ছোটেলালের চাইতে সুখী আর কেউ নেই।

সুখী! মনে হলে ছোটেলালের হাসি পায়। ওরা যদি জানত! সংসারে সবাই ভাবে, তার নিজের দুঃখের শেষ নেই, সুখী অন্য একজন কেউ। সত্যিকারের সুখী কেউ আছে নাকি ? হ্যাঁ আছে বইকি একজন। মনে পড়তে ছোটেলালের মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠল। একটু পরেই তাদের চাকর বংশীর সঙ্গে পান কিনতে আসবে সে।

তার নাম খুকুমণি। বয়েস পাঁচ বছর। ছোটেলালের দোকান ছাড়িয়ে একটুখানি এগিয়ে গেলে চারটি ফ্ল্যাটের একটি দোতলা বাড়ি। তারই একতলায় থাকে খুকুর বাবা। কোন একটি দিশি ফার্মে একটি মাঝারি গোছের চাকরি করেন। বৌ আর এই মেয়েটিকে নিয়ে ছোট্টো সংসার।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর খুকুর মা বংশীকে পাঠান পান কিনতে। খুকু সঙ্গে আসে। তারও একটি পান চাই। প্রত্যেকদিন তার জন্যে একটি ছোট্টো পান বেছে রাখে ছোটেলাল! খুকু এলেই তাকে আগে পান সেজে দেয়। খুকুর মায়ের জন্যে দুটো পান সাজতে তার যতক্ষণ নেয়, এতক্ষণে খুকুর ঠোঁটদুটো লাল হয়ে আসে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ির মতো।

"ছোটেলাল, তুমি ইস্কুলে যাও না ?"

"না খুকুমণি, হামি ইস্কুলে যাই না।"

খুকুমণি হেসে খুন। "এ লোকটা 'আমি'কে 'হামি' বলে।"

ছোটেলাল হাসে। অন্য দু-চারজন যারা থাকে তারাও হাসে। দু-চারটে হিন্দি কথার বুকনি থাকলেও ছোটেলালের বাঙলাটা মোটামুটি পরিষ্কার, শুধু "আমি" তার মুখে কিছুতেই আসে না, সেটি তার মুখ থেকে বেরোয় "হামি" হয়ে।

"তুমি ইস্কুলে যাও না খুকুমণি ?"

"আমি ? না। আমি এখনো ছোটো কিনা, তাই এখনো আমি বাড়িতে পড়ি। বাবা বলেছে, কিছুদিন পর আমি যখন বড়ো হব, বাবা তখন আমায় ইস্কুলে দিয়ে আসবে। তখন কিন্তু তোমার পান খাব না। ইস্কুলে মেয়েদের পান খেতে নেই কিনা! আচ্ছা, আচ্ছা, খাব। শুধু রোববার। সেদিন তো ইস্কুল বন্ধ। তারপর যখন মায়ের মতো বড়ো হব তখন আবার প্রত্যেক দিন তোমার পান খাব।"

ছোটেলালের সঙ্গে খুকুর এমনিতরো গল্প প্রত্যেক দিন।

"এই ছোটেলাল, আমার পান ?"

"এই যে, দিচ্ছি, খুকুমণি।"

পান সাজবার অবসরে খুকুর সঙ্গে গল্প। তার বন্ধু ইভুর জন্মদিনে কে কে এসেছিল, আজ সকালে বাবা কি এনে দেবে বলেছে, রোববার দিন মা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে বলেছে, ছোটপিসী তার জন্যে কি পাঠিয়েছে—এই সব গল্প।

"তুমি পান খাও না ছোটেলাল।"

"খাই খুকুমণি।"

"কখন খাও ? কোনোদিন তো দেখি নি।"

"দুপুরবেলা খাই।"

"সত্যি সত্যি খাও ? আচ্ছা এখন একটা খাও তো দেখি!" খুকু পান নিয়ে চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় ছোটেলালের। অনেক বছর আগে তার ঠিক এরকম একটি বোন ছিল। সেও পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে বসে থাকত সারা দুপুর।

মাঝে মাঝে খুকু যখন শ্যামবাজারে মামার বাড়ি যায় দু-একদিনের জন্যে

সামনের কৃষ্ণচূড়ার গাছটির সমস্ত রঙ যেন মুছে যায় ছোটেলালের চোখের সামনে।

এই খুকু মেয়েটিকে সবচেয়ে সুখী মনে হয় ছোটেলালের।

ছোটেলাল সুখী! তার সম্বন্ধে কী জানে তার এপাড়ার বন্ধুবান্ধবীরা! রাত্তিরে যে ঘুম হয় না ছোটেলালেরও।

আজ দশ বছর হল দোকান করেছে সে, দুটো পয়সা হাতে করতে পারে নি। দোকানের আয়ে দোকানটি চলে কোনোরকমে আর চলে যায় তার নিজেরও। ব্যবসা না বাড়ালে এভাবে আর কদ্দিন চলবে? পাওনা টাকা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। একটি পয়সা উসুল নেই। পাড়ার বাবুরা ধারে সিগারেট নিয়েছে, কিন্তু এখনো কারো টাকা পাওয়া যায় নি। যদি একদিন অসুখ করে বসে, মুখে জল দেওয়ার কেউ নেই। এবার কাউকে নিয়ে সংসার না পাতলে নয়। দত্তদের বাড়ির ছেলে আর গাঙ্গুলীদের বাড়ির মেয়েটি রাস্তায় পায়চারি করে সন্ধ্যের পর, রাস্তা একটু নির্জন থাকলে একজন আরেক-জনের হাত ধরে। একত্রিশ নম্বর বাড়ির চাকরটি পানের দোকান থেকে কিছু দূরে ফুটপাথের উপর বসে গল্প করে সাঁইত্রিশ নম্বর বাড়ির আয়াটির সঙ্গে।

আশেপাশে বাড়ির কাজ চুকিয়ে ফেলার পর কৃষ্ণচূড়ার তলায় বসে মেথরানি-বৌ মেথরের চুলের উকুন বেছে দেয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ছোটেলাল, আর ভাবে জীবনে মেহনতই শুধু করলাম, আর তো কিছু হল না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ভোলা এসে বললে, "কাউকে এখন বলিসনি ছোটলাল, গঙ্গার সঙ্গে আমার বিয়ে।"

"ওদের বাড়ি কাজ করছিস, বিয়ে করবি কি করে?',

"ওদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দেব। রেল লাইনের ওপারে নতুন যে বনস্পতির ফ্যাক্টরি হয়েছে সেখানে কাজের চেষ্টা করছি। সেটা হয়ে গেলে পরে আমি আর গঙ্গা সেখানে গিয়ে থাকব। ওরা কোয়ার্টার দেয়। তুই কিন্তু মাঝে মাঝে আসবি আমাদের বাড়ি বুঝলি? বিড়ি দে রে এক পয়সার আর একটা পান দে। পয়সাটা থাকবে বুঝলি; কাল দিয়ে যাব।"

পান সাজতে সাজতে ছোটেলাল কখন যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সেটা ভোলা টের পেল না।

ভোলা চলে যাওয়ার পর ছোটেলালের আস্তে আস্তে মনে পড়ল পুরোন দিনের কথা। ছোটেলালের বাপ তার মা বর্তমানেই আরেকটি বিয়ে করে আনল। তার মা স্বামী আর সতীনের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারল না বেশিদিন। ছোটেলাল আর তার ছোটো বোন লখিয়ার হাত ধরে মা বেরিয়ে পড়ল। ছোটেলালের মামা থাকত কলকাতায়। সেই লাহেরিয়াসরাই থেকে সোজা কলকাতায় চলে এলো এরা, মামার কাছে আশ্রয় পাবার প্রত্যাশায়। মামা রাজী হলেও, মামী রাজী হল না। ভায়ের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার করে ছোটেলালের মা উঠে এলো ময়নাডাঙার বস্তিতে। তারপর দুটো বছর কী কষ্ট। মা ছেলে মেয়ে মিলে সকালবেলা গোবর কুড়োতে বেরুত। গোবর কুড়িয়ে দেওয়ালে ঘুঁটে ঠেসে, তারপর মাথায় ঘুঁটের ভারা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সেই ঘুঁটে বেচে কায়ক্লেশে দিন চালাত ওরা তিনজন। কতদিন এই কৃষ্ণচূড়া টেরেসে ঘুঁটে বেচে গেছে ছেলেবেলায় ছোটেলাল। তখন এ পাড়ায় থাকত অন্য লোক আর এপাড়ার নামটিও ছিল অন্য। সেই সাবেক দিনের অধিবাসী এ পাড়ার কেউই নেই, তাই পাড়ার কেউই জানেও না যে পানওয়ালা ছোটেলাল একদিন এপাড়ায় ঘুঁটে ফেরি করে বেড়িয়েছে।

কিন্তু বেশিদিন নয়। হঠাৎ কলেরা এলো ময়নাডাঙার বস্তিতে। রাতারাতি মা গেল, লখিয়া গেল, সেই দুদিনে আপনজন-হয়ে-ওঠা আরো কতজন গেল।

তারপর দিন কেটে গেছে দুঃস্বপ্নের মতো। চায়ের দোকানে মুদির দোকানে চাকরি করে, বেদিয়াহাটের বাজারে সবজি বেচে, দু-চার পয়সা হাতে আসতে সে এ পাড়ায় এসে পানের দোকান খুলে বসল।

অনেকে অনেক কিছু করাবার পরামর্শ দিয়েছিল। সে কানে তোলে নি। সে ঘোরাঘুরি অনেক করেছে, আর ভালো লাগে না তার। সে চেয়েছে এমন একটি ব্যবসা যেখানে খদ্দেরকে আসতে হয় তার কাছে। আর চেয়েছে পয়সা করতে বড়লোক হতে নয়, চেয়েছে নিরিবিলি পাড়ায় চুপচাপ নিরিবিলি থাকতে, চেয়েছে ইজ্জত না বেচে ভদ্রভাবে সামান্য কিছু কামিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে সাদাসিধে ভাবে থাকতে। চেয়েছে একটুখানি বাসা……

"এই ছোটেলাল, আমার পান?"

খুকু এসে গেছে চাকর বংশীর সঙ্গে।

"এই যে দিচ্ছি খুকুমণি। তুমি তুদিন আসো নি কেন?"

"মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। জানো মামা বলেছে আমায় গানের ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে। সেখানে আমি গানও শিখবো, নাচও শিখবো। তুমি গান গাইতে পারো ছোটেলাল? ...."

কার জীবনে কে কখন কিভাবে আসে কেউ জানে না। ছোটেলালও জানত না।

সেদিন তুপুরবেলা বেশ গরম পড়েছে।

খুকুমণি এসেছে পান কিনতে, তার পেছনে ছাতা ধরে আছে বংশী।

পান সাজছিল ছোটেলাল।

খুকুমণি বলছিল, "ইন্দুদি কি বলেছে জানো?"

"কি বলেছে?"

"বলেছে আমি নাকি খুব ভালো নাচতে পারব। ইন্দুদিকে জানো?"

"কে?"

"ইন্দুদি আমাদের নাচের মাস্টার।"

বংশীর পেছনে কে যেন দাঁড়িয়েছিল। একখিলি পান চাই না কি যেন একটা চাই বলেওছিল। কিন্তু ছোটেলাল তখন খুকুমণির জন্যে পান সাজতে ব্যস্ত, ফিরেও তাকায় নি সেদিকে।

বংশীর হাত ধরে খুকু চলে যেতে ছোটেলাল আবার বিড়ি বাঁধতে বসল। তখন শুনল বাঁশির মতো গলায় কে যেন বলছে, "ক্যা-জী, পান একটা দেবে কিনা! না দিলে বলে দাও চলে যাই।"

চোখ তুলে তাকাল ছোটেলাল। একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। নিকষ কালো তার রঙ, টানাটানা তুটো চোখ, মুখ ঘামে ভিজে উঠেছে, মসৃণ কোমরের একটি ভাঁজ বেরিয়ে আছে কালো কাঁচুলি আর হলদে-লাল ছিটের ঘাগরার মাঝখানে। গোল গোল হাতে রূপোর কাঁকন, গলায় রূপোর হাঁসুলি, পায়ে রূপোর মল। মাথায় একটি গামছা বিড়ের মতো পাকানো। ফুটপাতের একপাশে একটি ঝাঁকা, তাতে চীনেমাটির প্লেট, ডিশ, কাপ, এলুমিনিয়ামের ডেকচি, কড়াই, কাঁচের বাসন ইত্যাদি!

"কতক্ষণ ধরে একখিলি পান চাইছি,—চোখ তুলে তাকানোর ফুরসতও হল না। বলো তো আবার বচপনে লওট্ যাই। ছোটিসি লড়কি না হলে তো তোমার এখানে পান মিলবে না।"

হঠাৎ মনটা কি রকম যেন একটু দুলে উঠল! অপ্রস্তুত হাসি হেসে ছোটেলাল বললে, "না, না, কেন মিলবে না, জরুর মিলবে।"

"দুবার তিনবার চারবার বলেছি। তোমার কানেই ঘুসেনি। ওই মেয়েটির সঙ্গে বাতচিতে মশগুল।"

"খুকুমণির সঙ্গে আমার খুব দোস্তি।"

ওইটুকু মেয়ের সঙ্গে দোস্তি! মেয়েটি খুব হাসল কিছুক্ষণ।

তারপর বললে, "আচ্ছা আচ্ছা ছোটেলালজী— !"

চমকে উঠল ছোটেলাল "তুমি আমার নাম জানলে কি করে?"

"ময়নাডাঙার বালকিষণজী বলে দিয়েছে!"

"ও বালকিষণজী? ওর সঙ্গে তোমার জান পহচান আছে নাকি?"

"আমরা ময়নাডাঙায় নতুন এসেছি। আমি আর মা। আগে থাকতাম মানিকতলা। আমি এসব বাসনপত্র ফেরি করি। বালকিষণজী বললে এ পাড়ায় কার বাড়ি যাব না যাব তুমি দেখিয়ে সমঝিয়ে দিতে পারবে।"

"তুমি এসব ফেরি করে বেড়াও? এই ধূপে?"

হাসল মেয়েটি, "ধূপ না তো চাঁদের রোশনাই পাব কোথায়?"

"না, সেকথা বলি নি। এই দোপহরে ফেরি করে বেড়ানো কী কষ্ট সে আমি জানি। তুমি এতটুকু মেয়ে——"

"আমি এতটুকু মেয়ে!!!!"

"এত কষ্ট করে—"

"কষ্ট না করলে রুজি-রোজগার হবে কোত্থেকে। সবাই তো তোমার মতো নসীব নিয়ে জন্মায় নি একটি চিড়িয়ার বসেরা বানিয়ে সেখানে বসেই পয়সা কামাবে?"

ছোটেলাল হাসল, "তোমার নাম কি?"

'তিতলী।'

"বাঃ, বেশ নাম; তিতলীরা তো তাদের রঙিন পাখা মেলে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়।

"হাঁ জী, তিতলী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "এই দোপহরের ধূপে আমি বর্তনের ভারা মাথায় নিয়ে ফুলে ফুলে মধুই খেয়ে বেড়াচ্ছি!"

একটু রাগ করেই যেন সে তার ঝাঁকাটি মাথায় তুলে হেলতে দুলতে চলে গেল সেই খটখটে রোদ্দুরে।

কিন্তু আবার এলো তার পরদিন।

তখন বেলা বারোটা।

ছোটেলাল খুব ভালো করে একটি মিঠে পান সেজে দিল তাকে। তারপর গল্পে জমে গেল তার সঙ্গে,—আস্তে আস্তে জেনে নিল কোথায় তার দেশ, কেন দেশ ছেড়ে ওরা কলকাতায় এলো, কেন মানিকতলা ছেড়ে এলো ময়নাডাঙায়·········

"এই ছোটেলাল!" তীক্ষ্ণ হুইশল্‌এর মতো সরু আওয়াজ এলো।

"কে? ও খুকুমণি? এসো, এসো, আমি তোমার জন্যে বানিয়েই রেখেছি। আর ভাবছিলাম তোমার এত দেরি কেন।"

"হ্যাঁ, ভাবছিলে," খুকু বলল, "আমি কতক্ষণ ধরে তোমায় বলছি পান দিতে, তুমি শুনছই না।"

তিতলী হেসে সরে দাঁড়াল। "নাও, তোমার দোস্ত এসে গেছে। আগে ওকে পান দাও, তারপর আমার সঙ্গে কথা বলবে।"

ছোটেলাল খুকুর মায়ের পান দুটো সাজতে লাগল।

খুকুর মুখে কোনো কথা নেই।

"খুকুমণি, চারদিকের খবর-টবর কি বলো!"

"আমি জানি না, যাও।"

তিতলী হেসে খাঁটি দেহাতী ভাষায় বলল, "তোমার সঙ্গে যে খুব দোস্তি। রাগ করেছে তোমার উপর।"

"ও রাগ দুমিনিটে চলে যাবে।···চুপ করে কেন খুকুমণি, বাতচিত করো, শুনি—।"

"আর কথা বলব না। বড়ো হয়ে বলব," খুকু বলল।

"বড়ো হয়ে? কেন?"

"আমি ছোটো বলে কেউ আমার কথা শোনে না। আমি যখন বড়ো হব তখন দেখব মজা।"

তিতলী আবার একটু হাসল।

খুকুর হঠাৎ মনে পড়ল যে তার গানের মাস্টার তাকে একটি নতুন গান শিখিয়েছে—দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে, আমার বটে বাটের ছায়ায় সারা সকাল গেল খেলে।—

গাম্ভীর্য অবলম্বনের সঙ্কল্প ভেসে গেল। চটপট খবরটা শুনিয়ে দিল, ছোটেলালকে এক লাইন গেয়ে শুনিয়েও দিল। তিতলী খুব খুশি।

খুকু চলে যাওয়ার সময় ছোটেলাল বলল, "খুকুমণি, একে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমার মাকে বোলো ছোটেলাল ভেজ দিয়েছে, খুব ভালো ভালো বর্তন ওয়াগেরা আছে এর কাছে, নগদও কিনতে পারেন, পুরনো কাপড় দিয়েও কিনতে পারেন। এমনি কিনতে চান তো পয়সা পরে দিলেও চলবে।"

তিতলীকে বলল, "চলে যাও খুকুমণির সঙ্গে। ওর মা খুব ভালো লোক।"

*　　*　　*　　*　　*

কেটে গেল আরো কয়েকদিন। ফাল্গুন কেটে গিয়ে চৈত্র শুরু হল। ছোটেলালের দোকানের সামনে আরো রক্তিম হয়ে উঠল কৃষ্ণচূড়ার সম্ভার। অন্যান্য দিনের মতোই তার এখনকার দিনগুলো, সেই সকালবেলা কর্পোরেশনের লোক এসে রাস্তায় জল দেওয়ার সময় দোকানের ঝাঁপ খোলা আর আর অনেক রাত্তিরে মেহের আলির হার্মোনিয়াম বাঁজিয়ে চলে যাওয়ার সময় ঝাঁপ নামিয়ে দেওয়া আর দুপুরবেলা রাত্রিবেলা দোকানের সামনে পাড়ার ঠাকুর-চাকর-ঝিয়েদের জটলা! তবু যেন আগের চাইতে অন্যরকম—দুপুরবেলা এ পাড়ায় কাচের বাসন ফেরি করতে এসে তিতলী তার সঙ্গে গল্প করে যায় কিছুক্ষণ।

আর আগের মতোই আসে খুকু নামে সেই মেয়েটি, তার চাকর বংশীর সঙ্গে, এসেই বলে, "এই ছোটেলাল, আমার পান?"

কিরকম যেন একটা আমেজ লেগেছে ছোটেলালের মনে, ঠাকুর-চাকর-ঝিয়েদের কথা তার কানে পৌঁছয় না, মন পড়ে থাকে অন্য কোথায়। খেয়াল থাকে না যে একটা দুটো পরিবর্তন ঘটছে তার চেনা পরিবেশে। তার

বাড়িওয়ালা দত্তদের বাড়ির একপাশটা মেরামত হচ্ছে। দত্তদের বড়ো ছেলে ফিরেছে বিলেত থেকে, পুরনো ধরনের বাড়ি তার পছন্দ নয়, সামনের দিকটা একেবারে বদলে ফেলা হবে—চাকরদের আড্ডার এ খবর তার কান পর্যন্ত পৌঁছল না। দত্তদের চাকর ভোলার মুখ বিষণ্ণ, কারো কথাবার্তায় যোগ দেয় না, চুপচাপ আসে, পান খায়, বিড়ি ধরায়, তারপর চুপচাপ চলে যায়—এও যেন লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করল না ছোটেলাল। গঙ্গা আসছে না দু-তিন দিন, যেন লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করল না, কাউকে জিজ্ঞেসই করল না তার কথা।

লক্ষ্য করল না যে খুকু নামে সেই মেয়েটি আজকাল একা আসে, বংশী আসে না তার সঙ্গে। বংশী আর কাজ করে না তাদের বাড়িতে। অন্য বাড়িতে কাজ নিয়েছে।

শুধু লক্ষ্য করল যে তিতলীর আজকাল আর ফেরি করার উৎসাহ নেই, সেই আসে পান খায়, গল্প করে, হাসে তারপর চলে যায়। জিজ্ঞেস করলে বলে অন্য পাড়ার চেয়ে এ পাড়ায় বিক্রি কম।

একদিন সকালবেলা যখন দূরের তালগাছের আড়াল থেকে একটি কোকিলের ডাক ভেসে এল পাড়ায়, ছোটেলাল মন স্থির করে ফেলল। ভাবল, নাঃ, এরকমভাবে আর একলা থাকা যায় না। তিতলীকে খোলাখুলি বলতে হবে। রাজী হবে না সে ? আলবত হবে।

সে নওজোয়ান ছেলে, এখনো তিরিশ পেরোয় নি, একটি চালু পানের দোকান আছে, আর কি চায় তিতলী। তার সুরতের বাহার দেখিয়ে কোন বাদশাহজাদাকে ভোলাবে সে। আর সেও যদি না চাইবে তো প্রত্যেকদিন এমনি এমনি তার কাছে পান খেতে আসবেই বা কেন ?

কিন্তু কিভাবে কথাটা পাড়া যায় ? অনেক ভেবে স্থির করল ভোলাকে একবার জিজ্ঞেস করবে, সে কিভাবে কথাটা পেড়েছিল। তার কাছে দু-চার টাকা পাওনা আছে, সেগুলো আদায় করতে হবে। বাবুদের কাছে সিগারেটের পয়সা বাকি পড়ে আছে, সে সবও উসুল করতে হবে। এখন টাকার দরকার। উপস্থিত পানের দোকান যেমন চলছে চলুক। কিন্তু এবার আস্তে আস্তে ট্রাম রাস্তার দিকে সরে যেতে হবে। আয় বাড়ানো

দরকার। ময়নাডাঙায় একটা ঘর ভাড়া করতে হবে। সংসার পাতলে তো আর দোকানে থাকা যাবে না।

ভোলা আসতে ভালো করে একটি পান সেজে দিল ছোটেলাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "গঙ্গাকে কবে শাদী করছিস ?

"গঙ্গাকে ?" ভোলা তার বিষণ্ণ চোখ দুটো তুলল। "না, বিয়ে করছি না এখন।"

"সে কি রে ?"

ম্লান হেসে ভোলা বলল। সে বনস্পতির ফ্যাক্টরিতে চাকরিটা পায় নি। পাঁচু কোন এক সরকারী অফিসে বেয়ারার কাজ পেয়েছে। গঙ্গা তার সঙ্গে চলে গেছে।

ছোটেলালের মুখে আর কথা সরল না। একটি বিড়ি এগিয়ে দিল ভোলার দিকে। পানের পয়সা, বিড়ির পয়সা নিল না।

কিছুক্ষণ পরে ভোলা আস্তে আস্তে বলল, "ছোটেলাল, আমায় দশটা টাকা ধার দিবি ভাই ? মায়ের অসুখ বেড়েছে। দেশে টাকা পাঠাতে হবে। মাইনেটা পাব দু-তিন দিনের মধ্যেই। তখন এটাও দিয়ে দেব। আগের তিন টাকাও দিয়ে দেব।"

সেদিন তিতলী এসে দেখল ছোটেলালের মুখ বিষণ্ণ। জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার। সে আস্তে আস্তে বলল ভোলা আর গঙ্গার কথা।

শুনে একগাল হাসল তিতলী। "ধরে রাখতে না পারলে চলে যাবেই। মেয়েরা কারো কেনা বাঁদী নয়। ও, তোর সঙ্গেও কেউ এমনি বেইমানি করবে ভেবেই বুঝি কাউকেই তুই অ্যাদ্দিন বলিস নি ?"

ছোটেলাল কিছু বলার আগেই সে হাসির ঢেউ তুলে চলে গেল।

তারপর এসে তিতলী দেখে ছোটেলালের মুখ আরো বিষণ্ণ।

"আবার কি হল রে ?"

এর আগে দিন দুই খুকু আসে নি। বৃথা তার জন্যে পান সেজে রেখেছিল ছোটেলাল। সেদিন দেখে দুপুরবেলা মুদীর দোকান থেকে কি যেন কিনে নিয়ে যাচ্ছে খুকু। তাকে ডাকল ছোটেলাল।

"এসো এসো খুকুমণি। এ দুদিন দেখি নি কেন। মামার বাড়ি গিয়েছিলে ? ...এখানেই ছিলে ? তবে আসোনি কেন ? বংশী কোথায় ? ...ছাড়িয়ে

দিয়েছ? ও, এসো, তোমার পান নিয়ে যাও। এই দেখ, তোমার জন্যে কী সুন্দর, ছোট্টো একটুখানি পান সেজে রেখেছি।"

"না আমি পান খাব না।"

"কেন খুকুমণি?"

"না, মা বলেছে, আমরা আর পান খাব না।"

ছোটেলাল দেখেছে অনেক, কিছু বুঝতে দেরি হয় না তার। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "আচ্ছা, আজকে যেটা সেজে রেখেছি, নিয়ে যাও।"

পান নিয়ে চলে গেল খুকুমণি।

বাইশ নম্বর বাড়ির ঝি দাঁড়িয়েছিল সেখানে। বললে, খুকুর বাবার চাকরি চলে গেছে।

ছোটেলালের কাছে এসব শুনল তিতলী। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "ছোটেলাল, তুই সব্বাইকে খুব প্যার করিস, না? আর সবই তো তোর পর।"

"আমার তো আপনার জন কেউ নেই। পরকে প্যার না করব তো কাকে করব বল।"

তিতলীর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল ছোটেলাল, সে চোখ রেল লাইনের ওপারের আকাশের মতো।

সেদিন রাত্তিরে ভোলা এসে একটি শার্ট আর একটি লুঙ্গি রাখল ছোটেলালের দোকানে। বলল, "এখন এগুলো এখানে থাক। কাল নিয়ে যাব। দেশে যাচ্ছি রে। মায়ের খুব অসুখ। তোর টাকা কাল দিয়ে যাব।"

তার পরদিন সকালে এল খোদ বাড়িওয়ালা, দত্তবাবু। বললে, 'ছোটেলাল, আমার ছেলে একটি গাড়ি কিনছে। এদিকে একটি গ্যারেজ তৈরি করিয়ে নিতে হবে।"

"বেশ তো। করিয়ে নিন না।"

"কিন্তু, তাহলে তো তোমায় উঠে যেতে হবে ছোটেলাল।...না, না, এখুনি নয়। এই ছয়-সাত দিনের মধ্যে। এক কাজ করো না ছোটেলাল।

বড়ো রাস্তার ওদিকে ভালো করে দোকান করো। এ পাড়ায় আর কিই বা বিক্রি।"

"ছ-সাত দিনের মধ্যে পারব না বাবুজী। এ পাড়ায় অনেক টাকা পাওনা পড়ে আছে। উসুল করতে সময় লাগবে। তা ছাড়া বড়ো রাস্তার ওদিকে আমি যাব—তবে এখন নয়, দু-তিন মাস পরে।"

"কিন্তু অদ্দিন তো আমি সবুর করতে পারব না ছোটেলাল।"

আস্তে আস্তে দুপক্ষের আওয়াজ চড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত ছোটেলাল বলল, "গায়ের জোরে তো আর তুলে দিতে পারবেন না। তুলে দিতে হয় তো আদালতে যান।"

সেদিন তিতলী এসে বলল, "তোর কি হল রে ছোটেলাল, আজ তিন দিন তোর মুখে হাসি নেই!"

ছোটেলাল আস্তে আস্তে বলল, "জানিস, খুকুমণিরা আজ সকালে এ পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। এত টাকা বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না ওর বাবা।" একটু ম্লান হেসে বলল, "আমার একটি খদ্দের কমল। অতটুকু পান এপাড়ায় আর কেউ খায় না।" একটু চুপ করে থেকে বলল, "আর খদ্দের রেখেই বা কি হবে। দোকানই তুলে দিতে হচ্ছে আমায়।"

"কেন?"

"দত্তবাবু আমায় উঠিয়ে দিচ্ছে। এখানে গ্যারাজ হবে বড়দাদাবাবুর জন্যে। আমি বলেছি উঠব না। তুমি আদালতে যাও।"

তিতলী শুনে বলল, "ওসব ঝামেলার মধ্যে যাস্‌নে ছোটেলাল। তুই আমাদের পাড়ায় চল। আমাদের পাশে একটা ঘর খালি আছে। আর সেদিন বলছিলি না বড়ো রাস্তায় ভালো করে দোকান দিবি? তারই কোশিশ কর।"

"সে তো চট করে হবে না। সময় লাগবে। তদ্দিন আমার খাওয়া জুটবে কোত্থেকে?"

"কেন? আমি নেই?" তিতলী বলল।

ছোটেলাল তাকিয়ে দেখল তিতলীর দিকে। রোদদুরে চিকচিক করছে তার কালো মুখ।

পান সাজল দুটো। একটি তিতলীকে দিল, আরেকটি নিজের মুখে

পুরল। বিড়ি ধরাল একটি। তারপর বলল, "আমায় সাদী করবি তিতলী ?"

তিতলী হাসল। পানের রাঙা রসে কৃষ্ণচূড়ার মতো রঙিন তার হাসি। বলল, "আজ সন্ধ্যেবেলা আয় না আমাদের বাড়ি। মা আছে। মাকে একবার বলতে হবে না ? আর রাত্তিরে আজ আমার ওখানেই খানা-পিনা করবি, কেমন ? কি আর খাওয়াব ! রোটি, ডাল, সাগ আর আলুর তরকারি। তবে তোর চাইতে অনেক ভালো পাকাতে পারি, বুঝলি ?"

একটা অদ্ভুত রঙিন আমেজে ভরে গেল ছোটেলালের মন। মেয়েদের হাতের রান্না কত দীর্ঘদিন খায় নি সে। মায়ের কথা মনে পড়ল, বোন লখিয়ার কথা মনে পড়ল। একটু সজল হয়ে এল চোখদুটো। বড়ো ভালো লাগল পৃথিবীকে——যে পৃথিবীতে দত্তবাবুর মতো লোক যেমন আছে, তেমনি আছে তিতলীর মতো মেয়ে। এমন বাদশাহী মেজাজ এল ছোটেলালের, দুপুরবেলা যখন ভোলা এল তার শার্ট লুঙ্গি নিতে আর তেরোটা টাকা দিয়ে বলল, "ভাই ছোটেলাল, চললাম, দত্তবাড়ির কাজ ছেড়ে দিলাম। ফিরে এলে দেখা হবে।" ছোটেলাল বললে, "টাকার যদি খুব জরুরত থাকে তো আমার টাকা এখন নাইবা দিলে, মা ভালো হয়ে গেলে ফিরে এসে দিয়ো।" ভোলা শুনল না, জোর করে টাকা গুঁজে দিল ছোটে-লালের হাতে। ছোটেলাল এক বাণ্ডিল বিড়ি দিল তাকে, পান বানিয়ে দিল দু খিলি। দাম নিল না।

সারা দুপুর বসে ছোটেলাল ভাবল তিতলীর কথা, আসন্ন সন্ধ্যেবেলার কথা। দীর্ঘ দশ বছরে আজ এই প্রথম সন্ধ্যে না হতেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেবে ছোটেলাল।

একবার একটু মনে পড়ল, পাঁচ বছরের মিষ্টি মেয়ে খুকুমণি আর আসবে না তার কাছে, এসে বলবে না রিনরিনে মিঠে গলায়, "ছোটেলাল আমার পান ?"

বেলা গড়িয়ে এল, রোদ পড়ে এল চাটুজ্জেদের বাড়ির ছাতের ওপারে। মেয়ে ইস্কুলের বাস এসে নামিয়ে দিয়ে গেল এ বাড়ি ও বাড়ির মেয়ে। টিউব-ওয়েল থেকে জল ধরে ফুটপাথের একপাশে চান করে নিল ছোটেলাল।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে দত্তবাবু এসে উপস্থিত।

"ছোটেলাল, ভোলা এসেছিল তোমার দোকানে ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ও ?"

"দেশে গেছে।"

"কোথায় ওর দেশ ?"

"তা তো জানি না বাবু ?"

"জানো না ?" দত্তবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ছোটেলালকে। "আচ্ছা।"

দত্তবাবুর রকম-সকম ভালো লাগল না ছোটেলালের। যাঁকগে, কে এখন মাথা ঘামায়। আজ তিতলীর ওখানে যেতে হবে।

তখনো সন্ধ্যে হয় নি। পরিষ্কার ধুতি আর শার্ট পরে একটি পান খেয়ে ছোটেলাল দোকানের ঝাঁপ নামাচ্ছিল।

এমন সময় পুলিশের ভ্যান এসে থোমল তার দোকানের সামনে। দত্তবাবুও বেরিয়ে এলেন।

"তোমার নাম ছোটেলাল ?"

'হাঁ জী।"

"চলো থানায় যেতে হবে। তোমার নামে পরোয়ানা আছে।"

স্তম্ভিত হল ছোটেলাল। তাকে ভেতরে তুলে নিয়ে ভ্যান চলে গেল।

অফিস-ফেরত অনেকে এসে ভিড় করেছিল। কি ব্যাপার দত্তবাবু—একজন জিজ্ঞেস করল।

ব্যাপার গুরুতর। দত্তবাবুর চাকর ভোলা টাকা আর গয়না চুরি করে পালিয়েছে। তাকে নাকি প্রায়ই ছোটেলালের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফাস করতে দেখা যেত। কাল রাত্তিরে কারা যেন দেখেছে ও ছোটেলালকে কি একটা বাণ্ডিল দিচ্ছে। আজ দুপুরেও তাকে দেখা গেছে ছোটেলালকে টাকা দিতে আর তার কাছ থেকে কিসের একটা বাণ্ডিল নিয়ে চলে যেতে। এই ছোটে-লাল কোনোদিন রাত একটার আগে দোকান বন্ধ করে না, আজ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে কেটে পড়ছিল কোথায় ? সন্দেহের ব্যাপার!

"ব্যাটাচ্ছেলে আরো আমায় বলেছিল আদালতে যাও। বাছাধন ঠ্যালা বুঝুক এবার," বললেন দত্তবাবু।

"হ্যাঁ, এই পানের দোকানগুলো যত চোর-জোচ্চোরদের আড্ডা। সমস্ত চোরাই মাল পাচার হয় এদের হাত দিয়ে," বলল একজন।

মন ভার করে সরে পড়ল অন্যান্য-ঠাকুর-চাকর-ঝি-আয়া, যারা জড়ো হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যের পর যখন চাঁদ উঠল রেললাইনের ধারের তালগাছগুলোর ওপারে, আর অশথতলায় খাটিয়া পেতে সুর করে তুলসীদাস পড়তে লাগল রামকিষেণের বুড়োবাপ প্রেমকিষণজী; অনেক দূরে কোথায় যেন ঢোল বাজিয়ে দেহাতী গান শুরু করে দিল কারখানা-থেকে-ফিরে-আসা বিহারীরা—হাতে মেহেদী মেখে, চোখে কাজল টেনে, পরিষ্কার নীলাম্বরী শাড়ি পরে তিতলী দাওয়ার উপর বসল পিঁড়ি পেতে, সেখানে বসে আটা মাখতে লাগল। চাঁদ আস্তে আস্তে অনেকখানি উঠে এল তালগাছগুলো ছাড়িয়ে। আটা মেখে, রুটি বেলে, সেগুলো একপাশে সরিয়ে ঢেকে রাখল, ছোটেলাল এলে গরম গরম সেঁকে দেবে বলে। তারপর হাত ধুয়ে এসে দাঁড়াল তাদের পাড়ার কৃষ্ণচূড়া গাছটির নিচে।

অনেক দূরে ডালিমতলা থানার হাজতঘরে চুপচাপ উবু হয়ে বসে ঝিমোচ্ছিল ছোটেলাল। সেও কি স্বপ্নে দেখছিল কলকাতার আকাশে সন্ধ্যার চাঁদ আর খোলার বস্তির সামনের কৃষ্ণচূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে একটি কালো মেয়ে, যার পরনে নীলাম্বরী শাড়ি, হাতে মেহেদীর রঙ, চোখে কাজল, যে রুটি বেলে রেখেছে তাকে গরম গরম সেঁকে দেবে বলে? বুড়ো রামকিষণজীর তুলসীদাস, বেহারীদের ঢোল আর দেহাতী গানের রেশ কি ভেসে আসছিল তার কাছেও?

সত্যি সত্যি সে যা স্বপ্ন দেখছিলো সে তার চিরদিনকার মধুরতম স্বপ্ন। তার স্বপ্নে ছিল না শহুরে বসন্তের চাঁদনী সন্ধ্যা আর নীলাম্বরী পরা মেয়ে তার স্বপ্নে তখন রোদ্দুরে ঝলমল চৈত্রের দুপুর। কৃষ্ণচূড়া টেরেসের একপাশে একটি পানের দোকান, সেখানে পাড়ার ঠাকুর-চাকর-ঝিয়েদের ভিড়। অফুরন্ত হাসি আর গল্প। তাদের মাঝখানে তিতলী তার ঝাঁকাটা নামিয়ে রাখা, নানা পাড়া টহল দিয়ে চোখে ক্লান্তি, ঘামে ভিজে গেছে তার জামা, সে হাসছে তো হাসছেই।

আর তাদের মাঝখান দিয়ে পথ ঠেলে এগিয়ে এল পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়ে খুকুমণি। কৃষ্ণচূড়ার মতো রাঙা তার ঠোঁট। এসে তার রিনরিনে মিঠে গলায় বললে, "এই ছোটেলাল, আমার প্রান?"

কবিতা

ঝড়ের কেন্দ্রে

অরুণ মিত্র

আমরা ঝড়ের কেন্দ্রে বসলাম
এখানে সুস্থির হওয়া যায়
সামনের সীমানা পার হয়ে
আলোড়নের পথগুলো ছাড়িয়ে যেতে থাকুক
এখানে চলুক আমাদের গল্প।

ঐ ঘরছাড়া ছেলেটার মুগ্ধ চোখ ছাখ
মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কল্পনার রাজ্যে পৌঁছে গেছে
ওর এলোমেলো চুল যেন তারা জড়ানো
অন্ধকারে মাথা রেখে এমন উজ্জ্বলতা পেয়েছে ও।

আমরা এক শান্ত আকাশের কাহিনী বলি
সেখানে আমাদের ঘরকন্নার পৃথিবী
স্থির দীপ্তি দেয়

আমরা তুফানের পরের কাহিনী বলি
যখন গাছপালা-ক্ষেত প্রলয়ের জলে ধোয়া
নতুন মাটি দিয়ে সমস্ত ইচ্ছার মূর্তি তৈরি করা যায়
বীজ ফেটে ফেটে শস্য জন্মানোর সঙ্গে
নানান রঙের দিনগুলো জন্মায়।

ঘরছাড়া ছেলেটার চোখে তন্ময়তা দ্যাখ
যেন মার দিকে শেষবার তাকিয়ে আবিষ্ট হয়ে আছে
যেন এই কাহিনীতে ওর ফেরবার ঘর গড়ে তোলা হল
ওর সেই মাটির পিদ্দিম থেকে রোশনাই জ্বালিয়ে রাখা হল।

আমরা একসঙ্গে বসেছি
এখন আচ্ছন্ন পৃথিবীর শিয়রে হাত রেখে ডাকছি
রূপকথার স্বরে
তাকে ঝড়ের পাখায় উড়িয়ে নিয়ে যাব বলছি।

আনন্দের শুল্ক দিতে

মণীন্দ্র রায়

আনন্দের শুল্ক দিতে
চাই একযৌবনের তামস ঐশ্বর্য!

মামুলি হাতের পাঁচ হাতে রেখে শুধু
পাওয়া যায় তিনশূন্যে একটি ইলেক
তার বেশি নয়।
আমরা যা খুঁজি তার বারুদে-আগুন
তীব্র বিস্ফোরণে যেন বদলে দেয় আমাদেরই মন—
মুখস্থ পদ্যের মতো নিঃসাড় পৃথিবী
ঝলমল যৌবন নিয়ে তরুণীর চোখের খুশিতে
বলে দেয়ঃ কিসে বাঁচা আর কিসে কড়িকাঠ গোনা।

হয়তো অনেক দিন কেটে যায় পদ্মার বাঁকের
খাড়াই পাড়িতে ভয়াবহ
শিমূলের মতো একা ঢেউয়ের গর্জন বুকে সয়ে,
হয়তো সর্বাঙ্গে তার জাগে নগ্ন কাঁটা,
ভাঙা পাড়ে উদ্বাস্তু শিকড়
শূন্যে হাত মেলে খোঁজে নষ্ট জীবনের চেনা মাটি,
তবুও, বরং যেন তখনই, সে বোঝে
কী আনন্দে সূর্য রোজ রাত্রিকে দুপায়ে দলে হাসে,
ধূমল মেঘের বুকে বিদ্যুতের কী তীক্ষ্ণ বাহার!

নিয়ত ধ্বংসের স্রোতে মুখ দেখে তাই
সে মানে না ভয়ের ভ্রূভঙ্গ,
যন্ত্রণাকে হাতে নিয়ে ফুল করে ছুঁড়ে দেয় ডালে—
যৌবনের স্পর্ধিত এ রঙ্গ॥

বসন্ত-পরজ

স্বদেশ সেন

নেই কোকিল, নেই ছায়া
না নাগকেশর।
চৌমাথার ব্রোঞ্জের মুখের মতো
স্বপ্নহীন এই শহর
রোদের তামায় বাঁধানো সমস্ত আকাশ
মাথায় করে চলেছে
অগ্নিকোণের দিকে।

দগ্ধ কুতুবের মতো কালো, ধূমল চিমনির নিচে
মূর্ছিত মধুমাধব।
ঝরা পাতায় ভারী বুটের শব্দ।
শুধু ভাঙা কুলোর মতো ছড়ানো
শহরতলীর অযত্নের আক্রোশে
একরাশ কৃষ্ণচূড়ার রক্ত আর হত্যার যন্ত্রণা।

আমাদের বুকের খোলা সেতারে
তবু কে কঠিন আঙুলে বাজায়
বসন্ত-পরজ।

———

কুমারসম্ভব

সুকুমার ঘোষ

সে একজন ঘুমিয়ে ছিল না
জেনেছিল ত্রিসংসারে সত্যি মিথ্যে প্রকৃতির দান
যেখানে সে চোখ মেলে সেখানেই ফুলের নিভৃত
রূপের গভীর পাত্রে সৌরভের ছড়া
বেদনার স্বেচ্ছাসূত্রে বেঁধেছিল নিজের কামনা
দেখেছিল সূর্য আর সময়ের গণ্ডী-পরিবৃত
একটি রেখা যাতায়াতে গড়া
বিন্দু থেকে অতলান্ত
যৌবনের শীর্ষ থেকে কৈশোরের প্রথম শিশিরে
কখনো সহজ দিন আর রাত্রি আর ব্যবধান
পাখির ডানার ঘায়ে শূন্য থেকে শূন্যের নীলান্ত
শুভ থেকে ব্যথিত শোভায় ফিরে ফিরে

প্রথম আঘাত আসে পায়ে
হাতের উপরে লাগে দীপ্তির আঘাত
তৃতীয় আঘাত আসে অতৃপ্ত হৃদয়ে
যেমন মেঘের মধ্যে স্থির থাকে তারার ত্রিবলি
কালোয় হারিয়ে যায়
বিদ্যুতের নিবিড় প্রকাশ
আঘাত অন্যের হাতে কিন্তু তার দীপ্তি স্বপ্রকাশ
ফুলের স্তব্ধতা ভাঙে বাতাসের হাত

পৃথিবীর দিকে দিকে এত দৃশ্য এত গন্ধ
গলায় অপরাজিতা-নীলকণ্ঠী
চিকন নদীর পাড়ে ধুয়ে আসে সবুজ আঁচল
ফুলের রেণুতে খোলে অজানিত দিন
বাতাসে উড়িয়ে দেয় শেষ অশ্রু
হাতের মুঠোয় যাকে ক্ষয়ে ফেলে
অথচ চোখের সামনে নিরুপায় কঠিন সড়কে
সে কেবল ভ্রূভঙ্গির ক্ষয়
যৌবন বিজয়ে তার এই প্রিয়তমা

শিল্প যদি জাদু জানে সে শুধু প্রাণের
গানের আরোহে থাকে অনিরুদ্ধ দিন
অথচ রাত্রির মোহ অবরোহণের
বিকাশে নবীন দীপ্তি প্রকাশে প্রবীণ
সেই ছায়া নেমে আসে ঘোর অন্ধকারে
যখন বিজন ঘরে হৃদয়ের সব কাজ খেলা
সায়াহ্নে ফুরিয়ে যায় সারা বেলা
অশান্ত দিনের অভিসারে
রাত্রি অবহেলা

প্যাঁচার আকণ্ঠ বিষে নির্জন মগ্নতা
একাকিত্বে অসহায়
সংশয়ের খণ্ডকালে টুকরো টুকরো জনমত কাঁপে
দিগন্তে গণ্ডীর মতো পরাভব ক্রমশ এগোয়
পরিধির সংকোচন স্থির কেন্দ্রে
নৃত্য থেকে নিয়ন্ত্রণ
দিনের প্রবেশ থেকে রাত্রি পরিবেশ

হে পৃথিবী হে আদি মোহিনী ছায়া
তোমার অক্ষত হাতে তার রক্ত হাত
উদ্ধত আঘাত থেকে সমুদ্রের মহানীলে
কেন্দ্রের আগুন থেকে প্রদাহী হৃদয়ে আমাদের
প্রার্থী সে······সে একজন জেগে ছিল
এত দিন হারিয়েছে হারানোর আগে সে ভেবেছে
প্রবাহের পরম্পরা সংখ্যাহীন
যোজনে জড়িয়ে আছে বরাভয় হে পৃথিবী

তোমার যন্ত্রণা থেকে ফুটে উঠল শিশু
উত্তাপে আহার নিল ছায়ায় বিশ্রাম
অভিরাম শোভা এল দর্শকের খোলাচোখে
ছাতায় মানিয়ে নিল রোদ বৃষ্টি
শক্রর আঘাতে ফের লুটিয়েছে ধুলোর কিরণে
আগাছার আবেষ্টনে বাড়িয়েছে মাথা
কেন্দ্র ছুঁয়ে পরিধি পিছিয়ে

তোমার কপোলে কার অশ্রুবিন্দু
তৃষ্ণার অতল থেকে আমাদের সমুদ্রশাসনে
কামনার অন্য নাম সপ্তসিন্ধু
আদি অন্ত যৌবনের নির্ভীক ভাষণে
তোমার হৃদয় তুমি বলেছিলে দেবে
হাত দেবে আহত হৃদয়ে আমাদের
সোনার মুকুটে ছোঁবে আমাদের কপালের রোদ
আমরা তো জেনেছি স্বর্গ এইখানে
দস্যু যারা করে কণ্ঠরোধ
তাদের নরক এইখানে সে একজন জেগে ছিল

করুণার নাট্যে তার আনাগোনা শেষ
সূর্য তো পিছনে ছিল
মিছিলের তীক্ষ্ণ ছায়া তার মূর্তি আগে আগে হাঁটে
পথের স্পন্দনে তার নামে ওঠে পা।
একহাত এগিয়ে যায় কণ্ঠস্বর
সূর্যের বাদামি রেখা লিখে রাখল অন্তহীন আশা
পাখির ডানার মধ্যে যেটুকু লুকোবে
যেটুকু হারাবে এই লক্ষ পদতলে
এই যে সময়ে কাঁপে এত পদক্ষেপ
আক্ষেপে হারিয়ে যায় আকাশের স্তব্ধতার ভান
পার্কের গোছানো ঘাস এলোমেলো
যে বেঞ্চি পিছন ফিরে স্বরূপে নিমগ্ন ছিল
সে আজ তাকাল এই রাজপথে

হে পৃথিবী হৃদয়ের আবরণ খোলো
তোমার দুয়োরে তার আশার তরঙ্গ ভেঙে পড়ে
কড়ায় আছাড় খায় প্রাণপণ
নক্ষত্রের ধারা থেকে খুলে দাও দুর্নিবার দিন
রাত্রি করো আনন্দিত নদী
সমুদ্রের দ্রুত লয়ে বেঁধে দাও হাওয়ার আবহ
সে একজন জেগেছিল
অন্ধকারে দিবালোকে দিবারাত্রে
খুঁজেছিল প্রান্তর পাহাড় সমাহারে
শিল্পত্বে ঘুচিয়ে ছিল বর্ণ আর বর্ণনায় ভেদ
বেদনায় গড়েছিল প্রণয় প্রতিমা

জেনে গেল
দিনে আর রাতে কোনো ছেদ নেই

মিছিলে-মেলায়

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আর কিছু নয়, শুধু জীবনের মুঠো মুঠো রাঙা মেঘ
ভোরের আকাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ঘুম-ভাঙা পৃথিবীর,
নিজের হৃদয় ভরে নেওয়া তার দুচোখের বিস্ময়ে।

তাই চলি আজ খেয়ালের নানা পশরা সাজিয়ে
সকলের দোরে সূর্য-ঘড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে
গ্রাম-পথে ভয়ে চোখ-তুলে-চাওয়া শিশুর গলায়
গলাগলি করে, সুখী বৃদ্ধের নিরুদ্বিগ্ন হাসির হাওয়ায়
পাখি হয়ে ভেসে—ছড়িয়ে দিয়েছি নীলাকাশে কতোদূর
আমার বুকের উত্তাপ এই সকালের রোদ্দুর।

অতীত দিনের হারানো স্বর্গে
নেইকো আমার দাবি,
আমার কাব্যে খুঁজোনাকো সেই
হৃত স্বর্গের চাবি।

বরঞ্চ আমি স্পন্দিত হব মাটির বুকের
হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকে, আনি বর্তমানের সহজ সুখের
উদয়াস্তের উচ্ছ্বাসভরে আমার পাতার বাঁশি
শুনে তার রাঙা মুখে ফোটে যেন দুঃখবিজয়ী হাসি।

আকাশের চাঁদে, কোলের শিশুকে যে পরায় টিপ
কবিতা আমার তার ঘরে জ্বালা মাটির প্রদীপ;

অপরাজিত যে মানুষ ভেঙেছে বাধার পাহাড়
তার রক্তের আবেগ বাজুক ছন্দে আমার।
কালের আগুনে হয়েছি দগ্ধ, তবুও আমরা
বুক পেতে সব সয়েছি বাঁচাতে চাইনি চামড়া
শিশুদের ভিড়ে শিশু হয়ে সব চাইনি ভুলতে,
দুরাশার মোহে, উচ্চচূড়ায় চাইনি ঝুলতে ;

চোখের জলের আলপনা দিয়ে লিখেছে অনেকে কাব্য
আমি বলি আজ বাঁচব, তীব্র বাঁচব।
বৈশাখে জ্বলা কৃষ্ণচূড়ার প্রাণের রঙ্গে
আমি বাঁচি আর সেও বাঁচে আজ সবার সঙ্গে।
এ-জীবনে যতো রোদে হাঁটি পথ, ধুলো মাখি গায়
তারি ভালোবাসা বৃষ্টির মতো আমাকে নাওয়ায়,
একদিন যার চোখে চোখ রেখে পড়েনি পলক
চুলে তার গুঁজে দেব একগোছা টিয়ার পালক—
সে আসবে ভেঙে আমার ঘরের শক্ত দেয়াল
বিশ্বের যতো প্রতিবেশী জেনো জড়ো হবে কাল।
মিছিলে-মেলায় খেয়ালের নানা পশরা সাজিয়ে
আজ চলি তাই সূর্য-ঘড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে।

বঙ্গসংস্কৃতির আধুনিক যুগ

বিনয় ঘোষ

আদিযুগ মধ্যযুগ আধুনিকযুগ, এইভাবে সংস্কৃতির ইতিহাসের যুগভেদ করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, কোন যুগের সীমানা কোথায় টানা হবে এবং কি কারণে টানা হবে? প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদও দেখা দেবে। বিচার করতে গিয়ে দেখা যাবে, সনতারিখ ধরে সংস্কৃতির ইতিহাসের কোন মাইলপোস্ট নির্ণয় করা কঠিন। সংস্কৃতি স্রোতস্বিনীর মতন প্রবহমান। উৎস থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত তার অগ্রগতি অবিচ্ছিন্ন। অবশ্য তার গতি ঘাঁকাবাঁকা, কখন ক্ষীণস্রোতা, কখন খরস্রোতা, কখন তরঙ্গসঙ্কুল, কখন বা চড়াই-বহুল। যুগে যুগে সংস্কৃতির স্রোত বাঁক ফেরে, দিক-পরিবর্তন করে। শাখানদীর মতন অন্যান্য সংস্কৃতিধারা এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন আবর্তের সৃষ্টি করে। তখন তীব্র তরঙ্গাঘাতে তীর ভেঙে গড়ে, নতুন পথ ধরে সে বয়ে চলে।

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার সংস্কৃতিধারাও এইভাবে বাঁক ফিরে নতুন পথে বইতে আরম্ভ করেছিল। সেই বাঁকের সীমারেখা হল অষ্টাদশ শতাব্দী।

আধুনিক যুগের এই সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল—অতীতের মতন এ-সংস্কৃতি গ্রামকেন্দ্রিক নয়, শহরকেন্দ্রিক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রাম্যসমাজ। নগর যে তখন ছিল না তা নয়, কিন্তু বৃহত্তর

জনসমাজে তার কোন প্রভাব ছিল না। গ্রামীণ সংস্কৃতিধারায় তার কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হত না। জীবনের স্রোত নগরের পথে বইত না, প্রধানত গ্রামের পথেই বইত। আধুনিক যুগের শহর যখন উন্নত অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত হল, তখন গ্রাম ও নগরের ভারসাম্য প্রথমেই নষ্ট হয়ে গেল। একদিকের ভার ক্রমেই বাড়তে লাগল, নাগরিক জীবনের ভার। ক্ষুদ্র নগর হল দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহানগর। প্রবল তার আকর্ষণীশক্তি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মহানগর যেন রোমান ডিক্টেটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। বাংলার ইতিহাসে আধুনিক যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ডিক্টেটর হল কলিকাতা মহানগর। রাজনৈতিক ইতিহাসে এই যুগটাকে আমরা শাসকের নামে ব্রিটিশযুগ বলি। সংস্কৃতির ইতিহাসে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় ভাবধারার ঘাতপ্রতিঘাতের ও সমন্বয়ের যুগ বলা যেতে পারে।

১৬৯০ থেকে ১৬৯৯ সালের মধ্যে কলকাতা শহরের প্রাথমিক পত্তন হয়। ১৬৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য ও বসতি মাদ্রাজের ফোর্টের অধীনে ছিল। ১৭০০ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী করা হয়। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের জামাতা চার্লস আয়ার তার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। এইজন্যই অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আধুনিক যুগের সীমারেখা টানা যায় বলেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কতকগুলি ঘটনা ঘটে, এদেশে ও বিদেশে, যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীর। ১৭০৭ সালে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়। তার পঞ্চাশ বছর পরে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয় হয় ইংরেজদের। ১৭৭৪ সালে বাংলার গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল হন এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই তাঁর অধীনে আসে। আধুনিক যুগের বাংলার সর্বভারতীয় ভূমিকার রাজনৈতিক স্বীকৃতিরূপে একে গণ্য করা যায়। এই সময় এযুগের ভারতপথিক রামমোহন রায় বাংলাদেশের রাধানগর গ্রামে (হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়) জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বের রঙ্গমঞ্চের বড় বড় দুটি বিপ্লবও এই সময় ঘটে যায়। ১৭৭৫ সালে আমেরিকায় বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং সেই বিপ্লবের বিক্ষোভ শান্ত হতে না হতে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয় ইয়োরোপে। ১৭৮৯ সালে বাস্তিলের পতন হয়। আধুনিক যুগের তিনটি শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের মধ্যে (মার্কিন বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব

ও রুশ বিপ্লব), দুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেই ঘটে যায়। তাছাড়া, এযুগের মৌলিক বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলিও অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং তার ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শিল্পবিপ্লব হতে থাকে।

আধুনিক যুগের যুগান্তকারী আবিষ্কার হল মুদ্রণযন্ত্র ও বাষ্পীয় শক্তি। মার্কিন বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের দান হল মানুষের বন্ধনমুক্তির আদর্শের প্রচার। দাসত্বের বন্ধন, অজ্ঞতার বন্ধন, কুসংস্কারের বন্ধন, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তির আদর্শ, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ, যুক্তি ও বুদ্ধির আদর্শ কোন-টাই বাস্তবে আংশিক রূপায়িত করাও সম্ভব হত না, যদি না ভাববিপ্লবের সঙ্গে যন্ত্রবিপ্লব ঘটত। যেমন মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত না হলে, পুস্তকপুস্তিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই আদর্শ জনসমাজে প্রচার করা সম্ভব হত না। বাষ্পীয়শক্তি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত না হলে, প্রকৃতির দাস হয়ে থাকত মানুষ। তার সামাজিক দাসত্বও ঘুচত না, নিজের শক্তির উপর আস্থা বাড়ত না এবং দৈব, দেবতা ও তাদের পার্থিব 'এজেন্ট' যাজক ও পুরোহিতদের মধ্যযুগীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকত।

বাংলাদেশেও আধুনিক যুগের আবির্ভাব হয় ইয়োরোপের এই যন্ত্রবিপ্লব ও ভাববিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই সংস্কৃতিক্ষেত্রের এইসব নতুন উপকরণ, Ideological ও Technological দুই-ই, বাংলাদেশে আমদানি হতে থাকে। কিভাবে হতে থাকে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

গঙ্গাতীরে কল বসেছে। ১৮২৯-৩০ সালের কথা। ধান-ভাঙার কল, গমপেষাইয়ের কল, তেলের কল। আজকের কলকারখানার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু তখনকার সংবাদপত্রে সংবাদটি পরিবেশন করা হচ্ছে এই বলে—"এই কলের দ্বারা গম পেষা যাইবে ও ধান ভাঙা যাইবে ও মর্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে' এবং এই সকল কার্যে ত্রিশ অশ্বের বলধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনাদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।"

সুতো ও কাপড় তৈরির কল এসেছে। তাই দেখে কয়েক ব্যক্তি সংবাদ-পত্রে লিখছেন—"এইক্ষণে ইংলণ্ড হইতে সুতা ও নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তদ্রূপ এক নূতন যন্ত্র যাহা এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি যন্ত্র অপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক—আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া কল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম, যেহেতু এমন কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

বাষ্পীয় জাহাজ ও নৌকা এসেছে, ইংলণ্ড থেকে, ১৮২৫ সালে। আসতে তিনমাস বাইশ দিন সময় লেগেছে। বিলম্বের কথা উল্লেখ করে পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"এই জাহাজ তিনমাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয়, যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন, যে কোন কর্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।"

মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলে পুস্তকপুস্তিকা সংবাদপত্র ছাপা সম্ভব হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিদ্যার চর্চা বাড়ছে। ১৮২৫ সালে এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে: "গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্বত্র লোকেদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে লোকেদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক।"

টাকশালেও বাষ্পীয় কল এসেছে, ১৮৩৪ সালে। পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব এবং এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল, এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে তিনলক্ষ খানা রূপা মুদ্রিত হইতে পারে।" অবশেষে Money Economy বা মুদ্রাসর্বস্ব অর্থনীতিরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়, বাষ্পীয় কলে তৈরি টাকশালের মুদ্রায়।

যন্ত্রপাতির সঙ্গে নবযুগের দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলীও আমদানি হতে থাকে। বেকন হিউম লক রুশো ভল্টেয়ার টম্ পেইনের বই ইয়ংবেঙ্গলের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। বাংলার বিদ্বৎ-সভার বৈঠকে এই সব চিন্তানায়কদের রচনা উদ্ধৃত করে তাঁরা আলোচনা করতে থাকেন। কিভাবে এইসব যুগমনীষীরা শিক্ষিত বাঙালীর প্রিয়

হয়ে ওঠেন, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। টম্ পেইন ছিলেন মার্কিন স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণাদাতা। তাঁর লেখনী নিয়ে তিনি সেই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা Age of Reason এবং Rights of Man সারা পৃথিবীর মানুষকে সে-সময় যে প্রেরণা দিয়েছিল, পরবর্তীকালে একমাত্র কার্ল মার্ক্সের রচনাবলীর সঙ্গে ছাড়া আর কোন মনীষীর রচনার সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না। সত্যিই Age of Reason এর শ্রেষ্ঠ চারণ ছিলেন তিনি এবং Rights of Man এর নির্ভীক চ্যাম্পিয়ন। কলকাতা শহরে জাহাজ বোঝাই করে টম্ পেইনের বই কিভাবে আমদানি হত, সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী পাদ্রি ডাফ সাহেব লিখে গেছেন : "From one ship a thousand copies (Age of Reason) were landed and at first were sold at the cheap rate of one rupee per copy; but such was the demand that the price soon rose··· Besides the separate copies of the Age of Reason there was also a cheap edition of all Paine's work including the Rights of Man, and other minor pieces, political & theological." ডাফ সাহেব, ১৮৩০-৩১ সালে, কলকাতা শহরে ইয়ংবেঙ্গল দলের আদর্শবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে এই কথা লিখেছেন।

বাষ্পীয় কল, মুদ্রণযন্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে মনীষীদের রচনাবলীও জাহাজ-বোঝাই কলকাতার বন্দরে আমদানি হচ্ছিল। নতুন যন্ত্র ও নতুন আদর্শের মুখপাত্র ইয়ংবেঙ্গল দল যুগসঞ্চিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামির স্তূপটিতে তাই দিয়ে ডিনামাইট সংযোগ করলেন। বিস্ফোরণে বাংলার কূপমণ্ডুক সমাজ কেঁপে উঠল। হয়তো তাঁরা বাড়াবাড়ি করেছিলেন, পদক্ষেপে মধ্যে মধ্যে ভুলও হয়েছিল। কিন্তু যে-আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কেবল বাংলার বা ভারতের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তা নতুন। তাঁদের এই আদর্শ সেদিন Enquirer ও 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে তাঁদের দুখানি পত্রিকার motto-র মধ্যে ফুটে উঠেছিল। প্রথম সংখ্যায় 'Enquirer' লিখেছিলেন—"Having thus launched our bark under the 'denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness." জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার নীতি তার কণ্ঠেই শোভা পেত—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞান তিমিরংহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর ॥

—জ্ঞান, তুমি এস! মানুষের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হরণ কর, দয়া ও সত্যকে স্থাপন কর। শঠতাকে সংহার কর।

এই যে আদর্শ, এর প্রচারক ও বাহক ছিলেন তখন শহরের নব্যশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী ও নগরবাসীই বাংলার রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রবর্তক এবং সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি আধুনিক সংস্কৃতির অন্যান্য দিকেরও পথপ্রদর্শক।

আধুনিক বাংলার সংস্কৃতিধারার যদি একটা গ্র্যাফ্ বা রেখাচিত্র আঁকা যায় তাহলে দেখা যাবে, সে-রেখা তরঙ্গায়িত রেখা, তার উত্থান-পতন আছে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধারাটিকে আমরা বিভিন্ন যুগে ভাগ করতে পারি—যেমন রামমোহন-ডিরোজিওর যুগ, ইয়ংবেঙ্গলের যুগ, বিদ্যাসাগরের যুগ, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের যুগ, রবীন্দ্রযুগ। ইয়ংবেঙ্গলের যুগ পর্যন্ত প্রথম পর্বটিকে প্রস্তুতি ও আলোড়ন, বপন ও রোপণের পর্ব বলতে পারি—বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বটিকে ফসল উৎসবের যুগ বলা যায়। আধুনিক সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হয় দ্বিতীয় পর্বে। সংস্কৃতির ইতিহাসে এই কীর্তিগুলিকে যুগান্তকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল—আধুনিক বাংলা গদ্য ভাষা এবং আধুনিক বাংলা উপন্যাস, কথা-সাহিত্য ও কাব্য। এছাড়া বাংলা নাটক, বাংলা সাংবাদিকতা, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় এবং বাংলা শিল্পকলাও আধুনিক যুগের অন্যতম সাংস্কৃতিক কীর্তি। আমাদের যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতাবোধ তারও উন্মেষ হয় প্রথম পর্বে, প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় দ্বিতীয় পর্বে। ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশই হয় তার অন্যতম প্রকাশকেন্দ্র এবং বাঙালীর কণ্ঠে যে জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে, সারা ভারতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

এতক্ষণ আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির উজ্জ্বল আলোকিত দিকের কথা আমরা আলোচনা করলাম। অন্ধকার দিকের কথা কিছু বলিনি। তা না বললে, সাম্প্রতিক সংস্কৃতি-সমস্যার স্বরূপ ঠিক বোঝা যাবে বলে মনে হয় না। প্রথমেই বলেছি, আধুনিক সংস্কৃতি নগরকেন্দ্রিক। গ্রাম-নগরের ভারসাম্য নষ্ট করে

আধুনিক যুগে মানুষের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য-সমাজের জীর্ণ কঙ্কালের উপর একালের মহানগরের সৌধ গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির যাঁরা পোষকতা করতেন, তাঁরা অধিকাংশই শহরবাসী হয়েছেন, বাকি জনসমাজ শহরের শোষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়ে পোষণশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। গ্রাম যথাসর্বস্ব দান করে শহরকে সমৃদ্ধ করেছে, সাধারণ শোষিত মানুষ যেমন সর্বস্ব দান করে মুষ্টিমেয় ধনিকদের মেদবৃদ্ধি করেন তেমনি। এত বড় ঐতিহাসিক মহানগর কলকাতা—যেখানে নবযুগের সংস্কৃতির পত্তন ও বিকাশ হয়েছে— তার পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে এমন শত শত গ্রাম আছে, যেখানকার শতকরা একজন লোকও আজ পর্যন্ত কলকাতা শহর চোখে দেখেছেন কি-না সন্দেহ, কেবল রূপকথার দৈত্যের মতন তার গল্প শুনেছেন। আধুনিক সংস্কৃতির কোন সম্পদ তাঁদের সমৃদ্ধ করেনি। আমাদের সংস্কৃতির এই দিকটাতেই কেবল সবচেয়ে গাঢ় নয়, ভয়াবহ অন্ধকার। যে-সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে এত অসমতা, এত বৈষম্য, একদিন যে সমগ্র জনসমাজের পুঞ্জীভূত ধিক্কারে তার মূল পর্যন্ত নড়ে উঠবে, যেমন আজ উঠেছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

দ্বিতীয় অন্ধকার দিক হল—সংস্কৃতির 'material' বা বাস্তব দিক এবং ideological বা আদর্শগত দিকের অসম বিকাশ। বাস্তব দিকের, অর্থাৎ টেক্‌নিক ও অর্থনীতির, সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি। বিদেশী শাসনের ও শোষণের স্বার্থে সেই বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। তার ফলে, আধুনিক যুগে যে আদর্শ ও ভাবধারার বিকাশ হয়েছিল, ক্রমে তার অবনতি ও চরম বিকৃতি ঘটেছে। যুক্তি, বিচারবুদ্ধি, সংস্কারমুক্তি, উদারতা, মানবমর্যাদা প্রভৃতি মহান আদর্শ, মনে হয় যেন, কিছুকালের জন্য ঝলমলে আতসবাজির মতন বাংলার আকাশে আলোর খেলা দেখিয়ে নিভে গেছে।

এই সব অন্ধকার দিকের কৃষ্ণচ্ছায়া ক্রমেই যেন দীর্ঘতর হয়ে বাংলার সংস্কৃতির আলোকবর্তিকাটিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, জাতীয় জীবনে ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমরা এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি।

যুগে যুগে যখন এই রকম সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তখন দেখা যায়, ইতিহাসের গতি বদলায়, সংস্কৃতিধারা নতুন বাঁক ফেরে। আজকের নৈরাশ্যের মধ্যে সেই পরিবর্তনের সম্ভাবনাটাই একমাত্র আশার কথা।*

* বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৫৬) পঠিত।

উপন্যাসের উপসংহার

সরোজ আচার্য

সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যের যুগ মাঝে মাঝে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যেতে দেখা গেছে, নাটক—অন্ততপক্ষে অভিনয়ের উপযুক্ত নাটকের অজন্মা হয়েছে; গল্প-উপন্যাসের চাহিদা এবং যোগান বড় একটা কমতে দেখা যায় নি গত তিন শতাব্দীর মধ্যে। আর এই বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে গত পঞ্চাশ অথবা একশ বছরের সাহিত্যিক প্রয়াসের হিসাব নিতে গেলে দেখা যাবে, উপন্যাসের চাহিদা এবং চলন বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রায় সমান তাল রেখে। সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস অপেক্ষাকৃত নবাগত একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধজাতক, ঈশপের গল্প অথবা আরব্যরজনীর কাহিনী-মালার বয়স কম না হলেও, গদ্যে গল্প বলার রীতি সাহিত্যের জাত-বিচারে কুলীন পদবাচ্য নয়। এখন অবশ্য তার কৌলীন্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়েছে, সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে, জনপ্রিয়তায় উপন্যাসের প্রতিপত্তি এখন কবিতা ও নাটককে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। কবিতার ফসল যেন সব ঋতুর উপযোগী নয়, নাটক তো তার চেয়েও বেশি আবহাওয়া-নির্ভর। একমাত্র গল্প-উপন্যাসই বারোমাসের ফসল এবং বারো হাজার রকমের রুচিকে তৃপ্তি দেবার মতো তার উপকরণ ও আয়োজন।

প্রথমে গল্প তারপর উপন্যাস, ছোটো থেকে বড়ো, কিন্তু ছোটকে টেনে-বুনে বড়ো করে উপন্যাস তৈরী হয় নি। এক হিসেবে উপন্যাসই ছোটো

গল্পের অগ্রজ। উপন্যাসের সঙ্গে মিল হল এপিকের; ছোটো গল্পের সঙ্গে কাব্যগাথার, "ব্যালাড" ও এপিকের ভগ্নাংশের। মিলটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়। টলস্টয়ের "ওয়র অ্যাণ্ড পীস"কে হোমারের ইলিয়াডের পাশে দাঁড় করালে একেবারে বেমানান হয় না বটে, তবে দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হল কেবল বিস্তৃতির, বিরাট চিত্রপটের; বৃহৎ এবং মহৎ উপন্যাসের কিছু কিছু এপিক লক্ষণ সুস্পষ্ট হলেও, উপন্যাস উপন্যাসই; তার কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, বর্ণনা ও বিশ্লেষণে জীবনস্রোতের গতি এপিকের চেয়ে আরও বেশি তীব্র, আরও বেশি আবেগসঞ্চারী। এসব অবশ্য পুরানো কথা। কোনো লক্ষণ দিয়েই এখন আর উপন্যাসকে চিহ্নিত করা যায় না। গত একশ বছরে উপন্যাসের উপাদানসংগ্রহে ও শিল্পকৌশলে এত বহু রকমের পরিবর্তন হয়েছে যে এখন বলাই যায় না উপন্যাসের মৌলিক প্রকৃতিটা কী। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব,—মানুষের মনে ও জীবনে যা কিছু কোনো না কোনো রকমে স্থির অথবা অস্থির, লঘু কিংবা গুরু অনুভবের বৃত্ত রচনা করেছে তা সবই উপন্যাসের উপজীব্য। একদিক দিয়ে বলতে গেলে, উপন্যাসও কাব্যলক্ষণাক্রান্ত, তার কারণ সুদূর অতীত এবং সুদূরতম ভাবীকাল, খুব কাছের এবং খুব দূরের সবই উপন্যাসের আয়ত্তে আনা যায়। আবার আর এক দিক দিয়ে, আধুনিক কালের উপন্যাস বিজ্ঞানের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করেছে এবং কখনও কখনও সফল হয়েছে। উপন্যাস হল মানুষকে, জীবনকে, পৃথিবীকে উল্টে পাল্টে, ভিতর থেকে, বাইরে থেকে অজস্র রকমে দেখবার ও দেখাবার উপায়।

বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না, উপন্যাসের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। অন্তত বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই। তবুও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে উপন্যাসের দিন ফুরিয়ে এসেছে, তার অন্তিমকাল আসন্ন। মানুষ যখন ফুরিয়ে আসে নি, এমনকি পরমাণবিক অপমৃত্যুর বিভীষিকা সত্ত্বেও, তখন উপন্যাসের উপসংহার কল্পনা করা সহজ নয়। তবু প্রশ্ন উঠেছে। নিছক সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে উপন্যাস সৃষ্টির প্রাচুর্যের অভাব ঘটে নি, এই প্রাচুর্যে ভেজাল আছে নিশ্চয়ই। রীতিমত বিচারে ভালো উপন্যাসের সংখ্যা সম্ভবত হাতে গোনা যায়। সিরিল কনোলী শ্লেষের মাত্রা একটু বাড়িয়ে বলেছেন, সামান্য সংখ্যক ভালো উপন্যাস বাদ দিলে যা থাকে সে

হচ্ছে ইংরেজী এবং আমেরিকান উপন্যাস। কুশলী ইংরেজ এবং আমেরিকান কথাশিল্পীর কিন্তু অভাব ঘটে নি, তাঁদের সাময়িক সাফল্যও কম নয়। বেশ কিছুদিন আগের ইংরেজী হিসাবে প্রত্যেক একশ খানা বইএর ষাটখানা হল উপন্যাস, এর মধ্যে হয়তো কমপক্ষে ত্রিশখানাই রহস্য রোমাঞ্চের জনপ্রিয় কাহিনী। তবু সম্প্রতি কোন কোন ইংরেজ প্রকাশক আশঙ্কা করেছেন যে, উপন্যাসের চাহিদা কমছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা অল্প হলেও উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কমেছে বলে মনে হয় না।

"সাহিত্যে সংকট"কার অবশ্য বলেছেন, উপন্যাসের উপাদান পর্বতপ্রমাণ স্তূপাকার হয়ে উঠেছে কিন্তু উপন্যাস হচ্ছে না। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সংকট যদি দেখা দেয় তবে সেটা উপাদানের অনটনের জন্য নয়, উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কমবার সম্ভাবনাও এখানে কম। আমাদের কথাশিল্পীদের যাত্রা সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুল পর্যন্ত একটি পর্বে বাংলা উপন্যাসের বিস্তার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

এরপর যাঁরা এসেছেন তাঁদেরও অনেকের কল্পনা, কৌতূহল এবং শিল্প-কৌশলে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারী দাক্ষিণ্যের অথবা ছায়াচিত্রের নগদ লাভের প্রত্যাশায় উপন্যাসের ভবিষ্যৎ এখানেও সংকটাপন্ন হওয়ার কিছু কিছু আশঙ্কাজনক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে এ সংকট প্রতিরোধ করার উপায় আছে। উপন্যাসের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে পাঠক সাধারণের রুচিপ্রকৃতির উপরে। নিতান্ত অবসর-বিনোদনের হাল্কা ঘুমপাড়ানী কথা-সাহিত্য কিছু পরিমাণে জনপ্রিয় থাকবে সবদেশেই। তাই বলে উপন্যাসের উৎকর্ষ, তার শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ কেবলমাত্র সাময়িক জনপ্রিয়তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না, তা কোনো দিন হয় নি। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথ, টমাস হার্ডি অথবা টমাস মান খুব বেশিদূর উঠতে পারেন নি। তাঁদের জনপ্রিয়তার সংখ্যাগত হিসাব দিয়ে উপন্যাসের ভাগ্য বিচার করলে বলতে হত উপন্যাসের মৃত্যু বহুদিন আগেই ঘটেছে।

উপন্যাসের জীবন-সংকট নিয়ে যে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে তার কারণ শুধু উপন্যাসের কাটতির কম-বেশি নয়। ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক বলেছেন, "স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা উপন্যাসের বদলে সংবাদ সংকলন

করছি, জীবনকে শিল্পীরূপ দিচ্ছি সাংবাদিকের মত টুকরো টুকরো খবর সাজিয়ে। তার কারণ সত্যিই আমাদের সৃজনক্ষমতা স্তিমিত, দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

উপন্যাসের সংকট বাইরের নয়, শিল্পীর সঙ্গে সমসাময়িক জীবনের যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে নানা কারণে। কোনো কোনো লেখক তাই অতীতের ঐতিহাসিক স্মৃতি আহরণ করে কল্পনার সৌধ রচনা করেছেন। সম্প্রতি যে ধরনের "পিরিয়ড নভেল" রচনায় উৎসাহ দেখা গেছে তার মধ্যে জীবন-বোধের চাইতে কল্পনা-বিলাসের ঝোঁকই বেশি। শিল্পকৌশলের নিদর্শন হয়তো কিছু কিছু আছে, কিন্তু যে পরিমাণ ধৈর্য এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকলে অতীত ইতিহাসের কঙ্কালে জীবনপ্রতিষ্ঠা করা যায় তার অভাব সুস্পষ্ট।

উপন্যাস যদি সামান্য উপকরণ নিয়ে তার উপর কাব্যের, ভাবোচ্ছ্বাসের মোহ বিস্তার করে সুলভ জনপ্রিয়তা পেতে চেষ্টা করে তাহলে হয়তো উপন্যাসের বিপর্যয় রোধ করা যাবে না। সিনেমা এবং টেলিভিশনের প্রসারে অনেক দেশে উপন্যাস-পাঠকের সংখ্যা কমেছে। আমাদের এই ব্যস্ত-সমস্ত সমস্যাসংকুল যুগে দীর্ঘ পুরাপ্রস্থ উপন্যাস পড়ার প্রয়াস অনেকের কাছে কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে। সিনেমার চোখঝলসানো মনমাতানো কাহিনী অল্প সময়ে যে আনন্দের শিহরণ দেয় তা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। তবে অনেকের কাছেই আজ মনে হচ্ছে ক্ষণভঙ্গুর জটিল পরিবেশ, অতএব মুহূর্তের মাদকতা যে আনন্দ দেয় তাই-ই যথেষ্ট। তা ছাড়া কথাশিল্পের আঙ্গিক নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা উপন্যাসের দৃঢ়ভিত্তিকে দুর্বল করেছে, পাঠক বিভ্রান্ত, বিরক্ত হয়েছে কাহিনী এবং চরিত্রের অস্পষ্ট, অর্থহীন অথবা দুরূহ জটের মধ্যে পথ হারিয়ে। কোনো কোনো সমালোচক বলছেন, ইংরেজী উপন্যাসের সাম্প্রতিক দৈন্যদশার কারণ হল, কোনো কথাশিল্পীই যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যা-সংকুল জীবনকে শিল্পরূপ দিতে অগ্রসর হন নি। তবুও উপন্যাসের অন্তিমকাল আসন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। সিনেমা-টেলিভিশনের অনুরাগীদের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, ছায়াছবির ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধ আবেগ কখনও উপন্যাসের বিচিত্র, জটিল এবং বহুবিস্তৃত কল্পনা ও ভাবনার দৃঢ়স্থায়ী আনন্দের আস্বাদ দিতে পারবে না।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রদর্শনী

গোপাল হালদার

"রবীন্দ্রভারতী"কে কৃতজ্ঞতা জানাই। গত ৭ই এপ্রিল থেকে পক্ষকাল ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে অবনীন্দ্রনাথের যে বিরাট শিল্প-প্রদর্শনীর তাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে বহু গুণমুগ্ধ দর্শক অবনীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ-শতাব্দীতে বাঙলা দেশে জন্মে রবীন্দ্রনাথকে না জানলে যেমন জন্ম ব্যর্থ, অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে পরিচয় না হলেও তেমনি সেই জানা শেষ হয় না। একথা শুধু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পাদির কথা ভেবেই বলছি না, 'বাঙলা গদ্যের অতুলনীয় এই শিল্পীর কৃতিত্বের কথা মনে রেখেও বলছি। আনন্দের কথা, রবীন্দ্রভারতীও সে-কথা বিস্মৃত হন নি। নিজেদের সংগ্রহের ২৯০ খানা শিল্পনিদর্শন ও অন্যদের সংগ্রহ থেকে আহরিত আরও খান ৪০ নিদর্শনের সঙ্গে তাঁরা প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যেরও নিদর্শন উপস্থিত করেছিলেন। সমগ্রভাবে অবনীন্দ্র-প্রতিভাকে দেখবার সুযোগ তাই দর্শকের হয়েছে, অথচ রবীন্দ্র-ভারতীর নির্বাচন-নৈপুণ্যে অবনীন্দ্রনাথের বহুমুখিতায় ও বৈচিত্র্য-বাহুল্যে বিভ্রান্ত হতে হয় নি; প্রদর্শনীসজ্জার কুশলতার ফলে শ্রান্তিবোধও করতে হয় নি। সমগ্রভাবে অবনীন্দ্রনাথকে নতুন করে বুঝবারই সুযোগ লাভ করা গিয়েছে।

'পরিচয়'এর পাঠকগণ ১৩৫৮ সালের পৌষ-সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের

বিয়োগের পরে শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক প্রবন্ধটি যদি স্মরণ করেন, তাহলে ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের স্থান ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-জীবনের ক্রমস্বীকৃতির কথা জানতে পারবেন। এই পরিচয় আজকের শিক্ষিত বাঙালীর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে না থাকলেই নয়। তার সঙ্গে যদি বর্তমান প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত নিদর্শনসমূহকে একসঙ্গে দেখবার সুযোগ ঘটে তাহলে এ-পরিচয় আরও বাস্তব এবং তাই কতকাংশে নবায়িত না হয়ে পারে না। প্রদর্শনীর 'নিদর্শনীপঞ্জি'তে প্রকাশিত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুটির সেদিক দিয়ে যথোচিত উপযোগিতা আছে। 'বিশেষ করে আঙ্গিক ও শিল্প-রীতি (স্টাইল) আলোচনায় বিনোদবিহারীবাবু শিল্পীর দৃষ্টি ও শিল্পের জ্ঞান নিয়ে 'অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ্' সম্বন্ধে যা বিবৃত করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

সাধারণভাবে আমরা জানি — অবনীন্দ্রনাথ 'নব্যভারতীয় চিত্রকলা'র শিল্পগুরু। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু 'নব্যভারতীয় চিত্রকলা' বলতে আমরা ধরে নিই ভারতীয় প্রাচীন শিল্পরীতির পুনরুজ্জীবন। আধুনিককালীন বিকাশ অপেক্ষা আমরা প্রাচীনের পুনঃপ্রকাশ বলেই তাকে ধারণা করি। ধরে নিই অবনীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিতে বিশেষ করে পুনরায়ত্ত করতে চেয়েছেন মুঘল ও রাজপুত শৈলীকে। আর তাঁর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নন্দলাল বসু প্রমুখ কৃতী শিষ্যেরা পুনঃপ্রবর্তিত করতে চেয়েছেন প্রাচীনতর (হিন্দু বৌদ্ধ) শিল্পধারাকে। এই সাধারণ ধারণা অকারণ না হলেও অযথার্থ, এতে অবনী-প্রতিভার বা তাঁর প্রেরণার প্রকৃতি-পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাই দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন যে, অবনীন্দ্রনাথ শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ করেন নি, পাশ্চাত্ত্য, মুঘল ও জাপানী শিল্প-ঐতিহ্য থেকে তিনি তাঁর উপাদান আহরণ করে স্বকীয় রীতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর কর্ম অপূর্ব, কিন্তু তা বিশুদ্ধ ভারতীয় রীতিতে নয়। ভারতীয় পুরাণকাহিনী ও ভারতীয় শিল্পসমৃদ্ধির দিকে হ্যাভেল, কুমারস্বামী, নিবেদিতা আমাদের শিল্পীদের চোখ ফিরিয়ে ছিলেন সেই স্বদেশীর যুগে। তাঁদের সহযোগীরূপে অবনীন্দ্রনাথও তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় বহুভাবে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পদৃষ্টিকে আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু নিজের

সৃষ্টিতে তিনি ভারতীয় কোনো প্রাচীন ধারার মধ্যে বাঁধা পড়েন নি এবং তাঁর শিষ্যদেরও বাঁধা পড়তে দেন নি। অবশ্য তখনকার আর্ট স্কুলে প্রচলিত ইংরেজি অ্যাকাডেমিক আর্টের সমস্ত প্রভাবই তাঁরা অস্বীকার করে আর্টের পথ প্রস্তুত করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাঁরা হয়েছেন আধুনিক—প্রাচীনের অনুবর্তী নন।— 'নব্য ভারতীয় শিল্পকলা'র প্রধান কথাটা নবীনতা, শিল্পচেতনার নবোন্মেষ, কিন্তু ঐতিহ্যের আবর্তন নয়। অবনীন্দ্রনাথ এই নতুন ধারারই শিল্পগুরু।

প্রদর্শনীর নিদর্শনসমূহে অনেকটা এই পথ-আবিষ্কারের ও পথ-নির্মাণের ইতিহাস স্পষ্ট হয়েছে। 'কৃষ্ণলীলা' চিত্রমালার (১৮৯৫-৯৭) ইউরোপীয় প্রভাব কাটিয়ে অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগের সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতমাতা' (২৩ নং) চিত্রে গ্রহণ করেছেন তাইকোয়ান ও হিসিদার সাহচর্যে জাপানি শিল্পের শিক্ষা (১৯০১-২)। 'ওমর খৈয়াম'-এ (১৯০৫-১১) তাঁর স্বকীয় শিল্পরীতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর অজস্র ধারায় তাঁর সৃষ্টি এগিয়ে যায়। দৃশ্যচিত্রে পুরীর দৃশ্যাবলী এল, তারপরে মুসৌরি, দারজিলিং, দেওঘর, রাঁচি, শাজাদপুর —প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। পশুপাখির চিত্রাবলী চীন-জাপান-মুঘল শিল্পীদের কৃতিত্ব মনে করিয়ে দেয় কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব রীতিতে। 'মুখোস' আর এক নতুন কীর্তি। 'আরব্যোপন্যাস'-এর চিত্রমালার প্রায় প্রত্যেকটিই তাঁর নিজস্ব রূপকল্পনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, দেখে দেখে অতৃপ্তি হয় না। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র চিত্রাবলী, 'কৃষ্ণমঙ্গল'-এর চিত্রাবলী ও 'হিতোপদেশ'-এর যে সংগ্রহ রয়েছে পরিণত শিল্পীর (১৯৩৮-৩৯) স্বচ্ছন্দ কৌতূহলী মনের তা এক সরস উদাহরণ। এ-সবে দেখতে পাই 'অবনপটুয়া'কে। 'কাটুম-কাটুম'-এর খেলনা নিয়ে এর পরেই তিনি মেতে যান। এই খেলনার নেশাই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে, সাহিত্যে, এমনকি অভিনয়ে পর্যন্ত বরাবর প্রকাশিত হয়েছে। যে-হিসাবে শিল্পী বিশ্ব-খেলাঘরের একই কালে শিশু ও রসিক, সে হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ চিরদিনই ছিলেন 'অবনপটুয়া'। বিশেষ করে তাঁকে মনে হয় কবিত্বে, রসে, সকৌতুক সরসতায় ভরপুর মানুষ। কোনো-কোনোদিকে তাঁর লেখার বর্ণবাহুল্য, তাঁর ছবির অসম্পূর্ণতা, তাঁর শিশুসুলভ খেয়ালিপনা অবশ্য চোখে পড়বেই। কিন্তু তাঁর সরস চিত্তের ও রূপরসিক প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় সর্বত্রই।

গ্রন্থাগার সম্মেলন

শান্তি দেবী

গত ৭ই এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতায় সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (Indian Library Association, ILA) একাদশ সম্মেলন ও নব-প্রতিষ্ঠিত বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের (Indian Association of Special Libraries and Information Centres—IASLIC) প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এবং বহু আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ৭ই এপ্রিল অপরাহ্নে হিন্দী হাইস্কুলে ডক্টর হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই যুগ্ম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

মূল সভাপতি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, জনাব বসিরুদ্দীন, তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমান যুগে সার্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা বিষয়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদেরই উচিত অগ্রণী হয়ে এই কাজ হাতে নেওয়া।

আজকের দিনে গ্রন্থাগারিক শুধু পুস্তক-সংরক্ষক নন—আজ তাঁর কর্তব্য আরও সুদূরপ্রসারী : দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিভাবে সংগৃহীত পুস্তকগুলি কাজে লাগানো যায়—কিভাবে ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন পাঠকমণ্ডলীকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করে তোলা যায় এবং পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক পরিবেশন করা যায়—সে বিষয়ে সম্যক অবহিত থাকা প্রয়োজন।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের ভাষণের মধ্যেও একটি সুষ্ঠু জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হয়।

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে বেল্‌ভিডিয়ারে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পুরাতন পুঁথি, মুদ্রণশিল্পের ক্রমবিবর্তন ও সেই-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীহুমায়ুন কবীর।

পাঁচদিনব্যাপী অধিবেশনে — গ্রন্থাগার-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়—যেমন ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলন সমস্যা, বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যা এবং লাইব্রেরিপদ্ধতি শিক্ষণ প্রভৃতি ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু।

'ভারতবর্ষে পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা' বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরির ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ডি আর কালিয়া বলেন—সুষ্ঠ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্তভাবে কার্যনির্বাহ করা, প্রয়োজনানুযায়ী অর্থসঙ্গতি এবং সম্যকভাবে শিক্ষিত কর্মীবৃন্দ। সেজন্য জনসমাজকে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে স্থায়ী আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

আগ্রা ইউনিভার্সিটির সহগ্রন্থাগারিক যুক্তপ্রদেশের লাইব্রেরি আন্দোলন পরিকল্পনা সম্পর্কে এবং শ্রীধনপৎ রায় বিজ্ঞান ও শিল্পব্যবস্থা ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিদ্যালয়গুলির এবং শিশুদের লাইব্রেরি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে—দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরির শিশু বিভাগের কর্ত্রী শ্রীমতী বোগা ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে আমাদের দেশে এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলির একেবারেই অভাব—এবং শুধু তাই নয়— এর কোনো পরিকল্পনাও এখন পর্যন্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই ধরনের লাইব্রেরি স্থাপন করতে গেলে প্রয়োজন উপযুক্ত সংখ্যক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং এর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন প্রদেশগত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা—যার দায়িত্ব হবে বিভিন্ন-বিষয়ক পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় এবং বিভিন্ন শিক্ষালয়ে সেগুলি বিতরণ এবং যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি লাইব্রেরিতে এই বইগুলি যাবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকটি, বই পড়তে পাবে।

এছাড়া শিশু লাইব্রেরিগুলিতে শিশুদের জন্য পাঠচক্র, নাটক অভিনয়, চিত্রপ্রদর্শনী, গানের জলসা প্রভৃতি বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে

শিশুদের মনে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন ভাব ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন।

সর্ব-গ্রন্থাগার পরিষদের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়, বিশেষ লাইব্রেরি পরিষদের সম্মেলন।

এই সম্মেলনের মূল সভাপতি বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁর ভাষণে দৃঢ়ভাবে বলেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করছেন—তাদের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পরিবেশন ক্ষেত্রে বিশেষ লাইব্রেরিগুলিই প্রধান সহায়ক।

প্রকৃত তথ্যের অভাবে গবেষকদের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ব্যাহত হয়, অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং তাঁদের কাজের জন্য প্রকৃত তথ্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করে জোগান দেওয়ার কাজ এই স্পেশাল লাইব্রেরির।

এই কাজকে একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় আনতে গেলে প্রয়োজন গ্রন্থাগার কেন্দ্রীকরণ—যার উদ্যোগে তৈরি হবে সংযুক্ত পুস্তক তালিকা (Union catalouge) এবং অন্যান্য প্রকাশিত তথ্যের মাইক্রোফিল্‌ম এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক লাইব্রেরিগুলির মধ্যে যোগাযোগ—যাতে বিভিন্ন দেশের তথ্য-সংগ্রহ সম্ভবপর হয়।

বিশেষ লাইব্রেরি পরিষদের দুদিন-ব্যাপী আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল গ্রন্থাগারে পুস্তক পরিবেশন ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার (Mechanization of Library Service) এবং ভারতে ডকুমেন্‌টেশন-সংক্রান্ত সমস্যাবলী (Documentation Problems in India)।

এই দুইটি বিষয়েই বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং আলোচনা-পত্র পাঠ হয়। সুদূর সুইজারল্যাণ্ড থেকে আলোচনা-পত্র পাঠিয়েছিলেন প্রবীণ গ্রন্থাগারিক শ্রী এস্ আর, রঙ্গনাথন্। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর অবদান সকলের কাছেই সুবিদিত।

সম্মেলনে অধিবেশনের বিরতির অবকাশে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হলো বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে।

গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আজও আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হই নাই। কিন্তু এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে যেসব সুধীজনের বক্তৃতা

ও উদ্দীপনাময় আলোচনা শুনবার সুযোগ পেলাম—তাতে মনে অনেকটাই আশা নিয়ে ফিরলাম যে অদূর ভবিষ্যতে এই আলোচনা সত্যিকারের রূপ পাবে এবং সমস্ত শিক্ষিতগোষ্ঠী সচেতন হবেন, অনুভব করবেন গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা, এবং দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারকে আরও ব্যাপক-ভাবে ব্যবহার করতে শিখবেন।
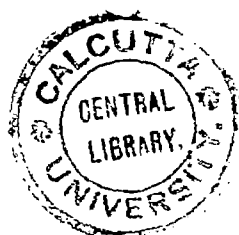
আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গোপাল হালদার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে একটা নতুন ঘটনা—বাঁকুড়া গিয়ে বিশেষ এক সমাবর্তন উৎসবে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে সাহিত্যাচার্য বা 'ডি-লিট্' উপাধিতে ভূষিত করা। বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বেও স্বদেশীয় মনস্বীদের সম্মান করেছেন ; যেমন জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও এ তালিকায় আছেন। কিন্তু বিদেশীয়রা মনীষী না হলেও এ সম্মান পেতেন রাজনৈতিক দাপটে, এবং অনুরূপ স্বদেশীয়রাও কৌশলে এ সম্মান আদায় না করেছেন, তা নয় ; সম্প্রতিকার তালিকা দেখলেও তা বোঝা যাবে। বিদ্যানিধি মহাশয় কলকাতায় অধ্যাপনা বা গবেষণা ব্যপদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নি। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বাঙালী শিক্ষিত পাঠকদের ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের। তাই হয়তো এই ৯৭ বৎসরের আচার্যকে সম্মানদানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলম্ব ঘটেছে। এরূপ বিলম্ব আরও না ঘটছে তা নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনাথ সরকার, বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রভৃতি কয়জন পণ্ডিত বা শিশিরকুমার ভাদুড়ী, যামিনী রায় প্রভৃতি কয়জন শিল্পী এখন পর্যন্ত সমাদর লাভ করেছেন? বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রস্তাবটিও দু বছর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপিত হলেও নানা বাধায় তা কার্যে পরিণত করতে বিলম্ব হয়েছে। তদবসরে কটকের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের পূর্বতন

অধ্যাপককে তাড়াতাড়ি সম্মানিত করে সে সুনাম অর্জন করেছেন। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন গজেন্দ্রগমনে চলে উদ্যোগী হলেন তখন এই সম্মান তাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রায় একশত বৎসরের ইতিহাসে এক নতুন পর্ব সৃষ্টি করে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলায়তনে হয়তো নতুনের হাওয়া লাগছে। কলকাতা ছাড়া বাইরে গিয়ে বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠান শুধু নতুন নয়, একটা দুঃসাধ্য ব্যতিক্রম।

অবশ্য আচার্য যোগেশচন্দ্র নিজেও বাঙালী জীবনে একটি ব্যতিক্রম। ৯৭ বৎসরে যে বাঙালী বেঁচে আছেন, তিনিই একদিক থেকে এই স্বল্পায়ুর দেশে দৃষ্টান্তস্থল। সে বয়সে যিনি দেহে সুস্থ, মনে সচল, জিজ্ঞাসায় উন্মুখ, জ্ঞানতপস্যায় অক্লান্ত,—দৃষ্টিশক্তি শ্রুতিশক্তি ক্ষীণ হলেও এখনো স্বাস্থ্যবান্—তাঁকে দেশের আক্ষুদ্র সকলে প্রণাম নিবেদন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় তা না করতে পারলে তাঁর ও জাতির আশীর্বাদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ই বঞ্চিত থাকতেন।

আজকের যুবকদের নিকটেও আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নাম অজ্ঞাত নয়। বৎসর দুই-তিন পূর্বে 'লোক-শিক্ষা-গ্রন্থমালার' সুবিদিত ধারায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'পূজা-পার্বণ', তারপরে 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল।' তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাবলী আমরা লাভ করেছি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের 'শিক্ষা প্রকল্পে' আর মাত্র মাস তিনেক পূর্বে আমরা সাময়িক পত্রে দেখেছি তাঁর অভিনব ভূতের গল্প। হয়তো তাছাড়াও সাহিত্য পরিষদ পত্রে বা এদিকে সেদিকে এ যুগের যুবকগণ তাঁর নামের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু যুবক কেন, যাঁরা তাঁর পুত্রকল্প তাঁরাও আজ বৃদ্ধ—তাঁদেরও কারও পক্ষে 'বিদ্যানিধি মহাশয়ের' সমগ্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের বা গবেষণার সন্ধান দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। হয়তো শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল বা ওরূপ কোনো তথ্যান্বেষী গবেষক বিদ্যানিধি মহাশয়ের লেখমালার (বিবলিওগ্রাফির) তালিকা প্রস্তুত করলে তা জানা যাবে। তাঁর অনেক লেখা তথাপি দুষ্প্রাপ্য থাকতে বাধ্য।

বর্তমান উপাধি-দান উপলক্ষে একালের পাঠক হয়তো যোগেশচন্দ্রের জীবনের কীর্তির কিছু কিছু পরিচয় সাময়িক পত্রাদি থেকে লাভ করেছেন। তাঁর ৩৬ বৎসর কালের অধ্যাপনার অধিকাংশ কালই কাটে কটকে। তিনি

ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তখনো বিজ্ঞানের অধ্যাপনা আমাদের দেশে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এরূপ অজস্রপাদ অজস্রবাহু বটবৃক্ষে পরিণত হতে আরম্ভ করে নি। অন্তত যোগেশচন্দ্র পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন থেকে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান পর্যন্ত সর্বশাস্ত্রই অধ্যাপনা করতেন। সেই মূল ও কাণ্ড ছাড়িয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা জ্যোতির্বিদ্যায় প্রসারিত হয়। আমাদের দেশীয় জ্যোতির্বিদ্যা ও কলা চর্চায় তিনি দুরূহ বিদ্যাবত্তার ও গবেষণার নিদর্শন রেখে গিয়েছেন 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' প্রভৃতি গ্রন্থে ও জ্যোতিষ-বিষয়ক বহু আলোচনায়। এই দিকে কটক বাসকালে তার সংযোগ ঘটে উড়িষ্যার অসাধারণ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্তের সঙ্গে। উড়িষ্যার সাধারণ মহলে সিংহ সামন্ত মহাশয় 'পবানী সান্ত' বলে পরিচিত ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর সঙ্গে একযোগে 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' সম্পাদন করেন ও মুখবন্ধে ইংরেজিতে 'পবানী সান্তের' জীবনী পরিচয় দান করেন। পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁকে এজন্য 'পবানী সান্তের' আবিষ্কর্তা বলে গণ্য করতেন এবং তাঁরাই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্রকে বিদ্যানিধি উপাধিতে ভূষিত করেন। বাঙালীর কাছেও সেই অবধি তাঁর সাধারণ পরিচয় বিদ্যানিধি মহাশয় বলেই।

বেদ, ধর্মশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ছাড়াও বাঙালী জীবনের এমন কোনো বিভাগই প্রায় নেই যা বিদ্যানিধি মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয় হয় নি। আমরা তাঁকে গুড় নিয়ে গবেষণা করতে দেখেছি প্রবাসীর পৃষ্ঠায়, চরকা ও নলকূপ নিয়ে ভাবতে দেখেছি নিজস্ব বিচারে, বেদ-বেদান্ত ও পূজা-পার্বণ নিয়ে অক্লান্ত আলোচনা করতে দেখেছি নানা গবেষণা-পত্রে, শিক্ষা ও শিক্ষা-সংস্কার নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও ধারণা জ্ঞাপন করতে দেখেছি সম্প্রতি কালে। কিন্তু সাধারণভাবে যে কয়টি বিষয় বাঙালী শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত জনের স্মরণ না রাখলেই নয় তা হচ্ছে—তাঁর 'বাঙলা ভাষা' ও 'বাঙলা শব্দকোষ' সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ, তাঁর বাঙলা বানান সংশোধনের প্রয়াস, তাঁর জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ এবং সর্বশেষ ছাতনার চণ্ডীদাস সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ও আলোচনা। (নান্নুরের সমস্ত ঐতিহ্য সত্ত্বেও বলতে হবে ছাতনার দাবি অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। বিশেষত ছাতনায় সম্প্রতি বিশালাক্ষীর মন্দিরসম্মুখস্থ পুষ্করিণীর সম্মুখে খনন-ফলে যে গৃহ বা অলিন্দ-শ্রেণী

আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা পরীক্ষণীয়।) বলা বাহুল্য, এসব প্রবন্ধ বা গবেষণা সুখপাঠ্য 'রম্যরচনা' নয় কিন্তু তাতে যোগেশচন্দ্রের প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার প্রতি অনুরাগের সঙ্গে কৌতুকের রেশ পাওয়া যায়। তবে এ লেখার প্রধান ধর্ম হচ্ছে জ্ঞানচর্চা, বিচার ও বুদ্ধিনিষ্ঠা; যে কোনো ভাষার গদ্যের প্রধান অত্যাজ্য ধর্ম হল এই যুক্তিযুক্ততা।

একথা বিশেষ করে বলবার কারণ এই—১৮৫৯ সালে যখন যোগেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, বাঙলা সাহিত্যে ঠিক তখন সৃষ্টির বান ডাকছে। সেই বানডাকা সাহিত্যের যুগে যোগেশচন্দ্র মানুষ। রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তিনি রবীন্দ্রযুগের বাঙালী সাহিত্যিক। অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাহিত্য-সৃষ্টির এমন যুগ, কল্পনার এমন দুকূল-প্লাবী স্রোত আর কোনোদিন কোনো প্রদেশে প্রবাহিত হয় নি তা জানি। ইতিহাসের সেই পর্ব যখন আজ নিঃশেষ, তখন একবার যেন এই পর্বান্তের যুবকচিত্ত স্মরণ করে মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগ শুধু কল্পনার স্রোতে হৃদয়াবেগের পাল তুলেই সাহিত্যের প্রবালদ্বীপের দিকে আপনার ডিঙা ভাসিয়ে দেয়নি। বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো মনীষীরা শুভ্র বুদ্ধির ও যুক্তি-বিদ্যার হাল সুদৃঢ় হস্তে চেপে ধরেই সেদিন জীবন্ত পৃথিবীর জ্ঞানলোকের দিকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যুগ শুধু কাব্যকাকলির যুগ নয় যে একালের মিষ্টি কথায় ও সাজানো বুলিতে তাকে আমরা উত্তীর্ণ করে দিয়েই খালাস! আমাদের গদ্য লাভ করেছে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অপূর্ব দান, পেয়েছে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে আরম্ভ করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতো বৈজ্ঞানিক-চেতনা-সম্পন্ন মনস্বীদের সম্পদ। তাই বাঙলা সাহিত্য বাঙলা সাহিত্য। এ কথা আমরা বিশ্বাস করি—বাঙালী মনস্বী সেই ঐতিহ্য পূর্ণতর করবেন আর তজ্জন্যই আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতো কীর্তিমানদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার কালে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভবুদ্ধিকে প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে একালের যুবক জিজ্ঞাসুদের জানাতে চাই—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
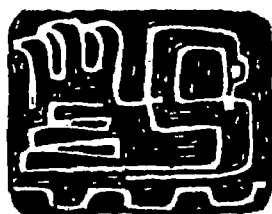
কবিতা

দ্বৈত

সিদ্ধেশ্বর সেন

আমি চলে যাই শিকড়ে
তুমি থেক আলোর শাখায়, ব্রততী,
আমি নেমে যাই আঁধারমূলে

আমি চলে যাই অন্তচেনায়
তুমি রয়ে যাবে চেনায়জানায় বাহিরমিলে
আমি দিই স্মৃতি, ভেঙো নাকো তার নিভৃতি

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে

তুমি চেয়ে আছ আকাশের চাওয়া নিজেকে হারিয়ে
নিজেকে খুঁজতে আমি ফিরে নিই পৃথিবীর ঘ্রাণ

তোমায় আমায় মিলন কোথায় পাবে

তুমি নিও দোল কালের হাওয়ায়, ব্রততী,
আমি রয়ে যাব নিত্যকালে মুখ ডুবিয়ে ॥

এলুয়ারের স্মৃতি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

১ প্রকাণ্ড সূর্য এক জানালার খড়খড়ি বন্ধ

আকাশে আগুন সূর্য সমুদ্রের উত্তাল বর্ণনা
ভগ্নপ্রাণ অন্ধকার, নদী তার কানে কানে বলে
আকাশে আগুন নেভে সমুদ্রও সহসা গম্ভীর
মেঘের বারুদ-তোপ, সে-আকাশদুর্গ টলমল

২ মৃদুগাঢ় বিশাল কথারা ঝরে

মুখে তার কথা ফোটে, নদী বলে কথা আর কথা
মুখে তার ঢেউ-ফেনা, তখন আমরা কথা বলি
অরণ্যের গন্ধে রঙে জীবনের বর্ণ-বিস্ফোরণ
অভ্র্রা উত্তপ্ত মাটি যূথবদ্ধ জীবনের আয়ু

৩ জলস্রোতে বিপুল তরণী এক

শিশিরের পদশব্দে সুন্দরীর উদ্বেল বাসনা
ভোর-রঙা ও-গুণ্ঠন রক্ত-রাঙা, কাঁটা-ঝোপে হাত
সে-চোখে দিগন্ত-রেখা শব্দহীন তাপলেশ ছোঁয়া
সে-চোখে আকাশ, সূর্য, শব্দ, তাপ, আর শুধু হাত

৪ তার পাল কেটে চলে বাতাস, বাতাস

একটি তরণী আসে স্মরণ-সমুদ্রে ঢেউ তুলে
একটি আলোকে স্মৃতি যন্ত্রণার রক্ত-লাল মুখ
একটি মুঠোয় জমে জীবনের সকল উত্তাপ
তখন গভীর কথা নিঃশব্দ এ-রাতের শিশির

১, ২, ৩, ৪ চিহ্নিত লাইনগুলি এলুয়ারের ॥

মাটি নদী আকাশের কাছে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

যে আকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হই,
যে মাটিতে পা রেখে দাঁড়ালে
আমার সমস্ত সাধ, স্বপ্ন, প্রেম, পবিত্র প্রার্থনা
একটি ফুলের মতো প্রকৃতির সৌন্দর্যে, সৌরভে
আমাকে মাতাল করে তোলে ;
কলরোলে কল্লোলিনী যে নদী আমাকে
সহজ স্রোতের মুখে টেনে নেয়, নিয়ে যায়
উত্তাল ঘূর্ণির ঘরে ঃ যৌবনের তরঙ্গে, তৃষ্ণায়
আমি সেই নিতল নদীকে
নারীর উপমা দিই। চোখে তার দুহাতে ছড়াই
ভোরের সূর্যের রঙ, পাখি-পাখালির ডাক, হাওয়া ;
হাওয়ার হাতের স্পর্শ, স্পর্শাতীত স্বপ্নের কুয়াশা,
মেদুর মাটির গন্ধ, দিগন্তের ঘননীল রেখা, আর
অরণ্যের সবুজ সুষমা।

আর এই নদী মাটি আকাশের বিচিত্র বর্ণনা
যে আমাকে শোনায়, দেখায়
আমি তার কথা ভেবে প্রতিটি দিনের বৃত্তপথে
হাঁটি। দেখি, ঘরে ঘরে দুঃখের সংসার
ভোরের ভালোবাসায় মুহূর্তের জন্য জেগে উঠে—নিভে যায়।
উঠোনের ঠাণ্ডা ছায়া ছড়ায় যন্ত্রণা ;

রোদের সান্ত্বনা নেই, সারাদিন, সারাদিনমান
ধোঁয়া আর ধুলো ওড়ে,
সমস্ত সংসার জুড়ে ছুচোখের বৃষ্টি পড়ে ;
শুকনো মুখ, ঝাপসা চোখে প্রায়ান্ধ জননী
মৃত্যুর দর্পণে দেখে সন্তানের মুখ।

স্বামী-সন্তানের কাছে যে নারী আশ্রয়,
একটি ইচ্ছার স্রোতে যে আজো নদীর মতো একাকিনী—
আমি তার কাছে আসি।
রূপকথার গল্প নয়; জীবনের নির্মম কাহিনী
সে আজ শোনায়, আমি শুনি। আমি শুনি,
কোথায় ভেঙেছে ঘর, সংসারের চিহ্ন নেই ; দেশ
মুষ্টিমেয় দশের কবলে
হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে।
কোথায় কী করে আজ যৌবনের অপমৃত্যু হয়
আমি দেখি।
আমি দেখি, পথে পথে, জনপদে উদ্‌ভ্রান্ত জীবন
ধোঁয়ায় ধুলোয় বাঁধে কান্নার কুটির।

যে চোখে আকাশ দেখে আমি জেগে উঠি,
নরম মাটির কোলে কল্পনার কুঁড়ি ফোটে,
নদীকে নারীর উপমায়
সাজাই, সে চোখ আজো কেন অন্ধ নয়,
কেন এই কান্নাকীর্ণ অন্ধকার দেশে
ছুটি চোখে এতো আলো, এতো তীব্র সূর্যের সাধনা!
আমার সমস্ত সত্তা যার হাতে হাত রেখে হাঁটে,
সে বলে, সবার প্রেমে পৌরুষের দুর্জয় আগুন

জ্বলে উঠলে, সকলের সাধের সংসার
আকাশের আলো নিয়ে হেসে উঠবে উজ্জ্বল উষায়।
সে বলে, স্বপ্নের পাশে যন্ত্রণাও জাগুক, জ্বলুক ;—
না হলে পৌরুষ মিথ্যা, আশাবাদ—শুধু মিথ্যাচার।

আজ তাই মাটি নদী আকাশের কাছে
মেলে ধরি আমাদের চোখের যন্ত্রণা
আর
যন্ত্রণার উত্তর অধ্যায় !

হে মহাজীবন

তরুণ সান্যাল

ছুটির পাখিরা ভাসল হাওয়ায়,
দুমুঠো ধুলোর স্বর্ণে
ছুঁড়ে দিলে তুমি চাওয়া না-পাওয়ায়
কাচ কাঞ্চনবর্ণে।

অথচ জেনেছি শিল্পের পথ ঘোরালো
মূল্য জীবনমরণ পরমার্থিক পুণ্যে
যে-জীবন আমি চিনি নি, দুহাত বাড়াল
খুলল সেই তো দেউড়ি প্রলয়পয়োধি শূন্যে।
তব জাগরণে স্বপ্নতরণী বাওয়ায়
ধূ-ধূ দুপুরের পর্ণে

ছুঁড়ে দেবে তুমি ধুলোয় হাওয়ায় হাওয়ায়
কাচ মরকতবর্ণে ?

তবু কি আত্মগ্লানির আঁধার
জড়ানো মনের দৈন্যে
এ-ওকে আমরা দেব উপহার
দুই শিবিরের সৈন্যে !
মনের গভীর যদি পৃথিবীর নিশানা
সূক্ষ্ম রঙে রঙে আঁকে কড়ি ও কোমলে আর্তি
প্রতিটি জ্বালার তীব্র শিখায় কি জানা
দুঃখ অজানায় হবে শিল্পমূল্যে প্রার্থী !
কঠিন সে-প্রেমে পাথরে বন্ধ দুয়ার
সে-বাধা সইনে সইনে
তবু কি জানব ভাঙি পাথরের ধার
শিবিরাশ্রয়ী দৈন্যে !

গান তো গৌণ, কিচিমিচি ডালে
ভোর না হতেই নিত্য।
তবে কি জানব ছন্দমিলের তালে
এ-হৃদয় নির্বিত্ত।
দুচোখের কোণে হাসির হরিত লাস্যে
দেখব প্রেমের স্পর্শমণির ছোঁয়াও মৌন
দাহ্য দেহের সিঁড়িতে অপ্রকাশ্যে
দেখব একাকী জীবন জীবনায়নেই গৌণ ?
এ কি ফুলফোটা, না-ফোটা করুণ ডালে
তরুণী কুঁড়িরা রিক্ত

শুধু পরাগের ঝরানো ইন্দ্রজালে
সমারোহ নির্বিত্ত ॥

ছুটির পাখিরা হাওয়ায় উদার
মুক্ত প্রেমের পুণ্যে
আঁকে সসাগরা বসুন্ধরার
ছবি – বিমূর্ত শূন্যে ।

কাচের এদেহে কী এমন আছে দেব যা
আর্তি　　যা নেই তা-ও কি ঝরাব ধুলোর পণ্যে
কী করে জানব তবু গাছে গাছে না-খোঁজা
প্রার্থী　　ফুলেরা বাড়ায় বাহু আমাদেরি জন্যে ।
সমাপ্তি আয়ু হাওয়ায় গুনবে ধিক্কার
শিল্পের বৈগুণ্যে
তখন চিনব নিজেকে করুণা ভিক্ষার
অসম্মানের শূন্যে ?

রামধনুর উপসাগরে

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ যাবে রামধনুর উপসাগরে ;—পূর্ণ হবে তার অনেক দিনের আশা।

তখনও টেলিস্কোপের আবিষ্কার হয় নি, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন রাতের পর রাত, এই অনন্ত মহাশূন্যের শেষ কোথায়, কী আছে চন্দ্রলোকে, অন্যান্য গ্রহে এবং উপগ্রহে ?

চাঁদের দেহে কালো দাগের চিহ্ন দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের সম্বল একমাত্র কল্পনা, তাঁরা স্থির করলেন নিশ্চয়ই ওগুলো সমুদ্র, গভীর অতল, তাই দেখাচ্ছে কালো। এই সাগর-উপসাগরের নামকরণ হতে দেরি হল না, কেউবা হল প্রশান্তির সাগর আবার কেউবা রামধনুর উপসাগর।

অপরূপ মায়াঘেরা এই রাজ্য মানুষের স্বপ্নের জগতেই এতদিন বিরাজ করেছে,—এইবার মানুষ নিজে যাবে রামধনুর উপসাগরে।

সমগ্র পৃথিবীতেই শুরু হয়েছে শূন্যজয়ের পরিকল্পনা। প্রথমে পৃথিবীর বুক থেকে তিন শ মাইল উঁচুতে নির্মাণ করা হবে কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য। তারপর প্রথম অভিযাত্রী দল যাত্রা করবেন চন্দ্রলোকে—সাতরঙা ঐ উপসাগরে।

মানুষের পরিকল্পনা কিন্তু এখানেই থেমে যায় নি, আরও উঁচুতে স্পেস্ স্টেশন নির্মাণ করে মহাশূন্য পর্যবেক্ষণ এবং তার সঙ্গে প্রতিবেশী গ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের চিন্তাও তার মনে বিরাজ করছে। মানুষ আজ সাম্রাজ্য

স্থাপন করতে চায় অন্তরীক্ষে। উড়োজাহাজে চন্দ্রলোকে যাওয়া যাবে না, কারণ উড়োজাহাজ ভেসে বেড়ায় বাতাসে ভর দিয়ে। অনন্তশূন্যের যানকে চলতে হবে আপন শক্তিতে ; তাই প্রয়োজন রকেটের।

ঊর্ধ্বগামী রকেটে মানুষ যাত্রা করবে, শক্তি জোগাবে অ্যালকোহল, হাইড্রাজিন অথবা আণবিক বিস্ফোরণ। এক বিরাট ধাক্কায় একে ছুঁড়ে দেওয়া হবে আকাশে, রকেট চলবে আপন পথে প্রচণ্ড গতিতে। গতিবৃদ্ধি এবং দিক পরিবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে ঐ মহাশূন্যেই ঘটানো হবে বিস্ফোরণ। অবস্থা বুঝে করতে হয় ব্যবস্থা, তাই মহাকাশের যাত্রীরা প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহে যাবার পথে যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

শূন্য-ভ্রমণে সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে হবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। নিউটনের নিয়ম অনুসারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি বস্তু অপরকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীও আমাদের সর্বদাই করছে আকর্ষণ। ধরিত্রী মায়ের এই ভালোবাসার টান ছিঁড়ে ফেলে চন্দ্রের দিকে করলেন যাত্রা,—পথে পৃথিবী টানছে, কিন্তু রকেটের গতিশক্তি আকর্ষণী শক্তিকে টাগ অফ ওয়ারে হারিয়ে দিয়ে ক্রমেই সরে যাবে দূরে ! এখন এতে অসুবিধা কি হবে ? প্রথম অসুবিধা হল আপনি অনুভব করবেন ওজনবিহীনতা, হয়ে পড়বেন অসহায়। একটু খুলেই বলি, আপনার আমার দেহের যে ওজন আছে তা অনুভব করি প্রতিবন্ধকের মাপ দিয়ে। পৃথিবী আমাদের টানছে নিজের কেন্দ্রের দিকে। কিন্তু ঘরের মেঝে ফুঁড়ে নেবে যেতে পারছি না বলেই সেই প্রতিবন্ধকে অনুভব করছি আমাদের ওজন। আপনি অফিসের লিফটে তেতলায় দাঁড়িয়ে নিজের ওজন বেশ অনুভব করতে পারছেন,—হঠাৎ লিফটের তারগুলো গেল ছিঁড়ে, সোজা নেমে এলেন পৃথিবীর দিকে প্রচণ্ড গতিতে। মাত্র পতনের সময়টুকু আপনি ওজনবিহীনতা অনুভব করতে পারবেন।

শূন্যযানে, রকেটের গতির এক অংশের সঙ্গে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির কাটাকুটি হয়ে যাওয়ায় আপনার ওজনের কোনোই অনুভূতি থাকবে না। অবস্থাটা কি সাংঘাতিক তা একবার কল্পনা করে দেখুন। পুজোর একমাস ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন চন্দ্রে, এই আকাশযানে নড়েচড়ে বসতে গিয়ে ঘটল বিষম বিপদ ! ওজন নেই, অতএব সোজা ওপরে উঠে গিয়ে কামরার

ছাদে খটাস করে আটকে গেলেন—আর নামবার নাম মাত্র নেই! বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাঝে মাঝে আপনার শূন্যযানে যখন গতি সঞ্চারিত করা হবে তখনকার ঝাঁকানিতে কেবলমাত্র সেই সময়টুকুর জন্যই আপনি ওজন অনুভব করতে পারবেন।

এই ওজনবিহীনতার প্রশ্নই মহাকাশ পরিভ্রমণের প্রধানতম সমস্যা। মানুষের দেহ পৃথিবীর একটা বিশেষ পরিবেশে বৃদ্ধিলাভ করেছে, সে কি এই অস্বাভাবিক পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? যে খাদ্য, বা জল আমরা গ্রহণ করি তা পাকস্থলিতে প্রবেশ করে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যেই,—অবশ্য পেশীর সঙ্কোচনও এর অন্যতম প্রধান সহায়। ওজনবিহীনতার রাজত্বে খাদ্য গ্রহণের কি উপায় হবে? খাদ্য আপনি গ্রহণ করলেন, তা গলাতেই আটকে রইল, পেটে আর কিছুতেই নামে না! অবশ্য এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন না হবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ অনেক অসুস্থ লোক যাঁরা বছরের পর বছর বিছানায় শুয়ে থেকে খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করছেন তাঁদেরও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খাদ্য পাকস্থলিতে যাবার জন্য খুব বেশি সাহায্য করে না। যাই হোক ওজনবিহীনতার ফলে মানুষ কিরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এবং তার সমাধান করবে কিভাবে তা সমস্যা এবং যুক্তির সীমানায় অবস্থান করছে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, তার বাংলা অর্থ হল 'চোখের বাইরে, মনের বাইরে', অর্থাৎ কোনো লোক চোখের বাইরে চলে গেলেই তার ওপর মানুষের টান যায় কমে। প্রকৃতির রাজত্বেও এই প্রবাদ খাটে, যতই দূরে আপনি চলে যাবেন পৃথিবীর আকর্ষণও ততই কমে যাবে। এখন চাঁদের দিকে যেতে যেতে এমন একটি স্থানে এসে উপস্থিত হবেন যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির সঙ্গে চাঁদের আকর্ষণী শক্তি কাটাকুটি হয়ে গিয়ে এক নিরপেক্ষ অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। এখানে অবতরণ করলে কেউই আপনাকে আকর্ষণ করবে না—অসহায়ভাবে ভাসতে থাকবেন মহাশূন্যে। এই নিরপেক্ষ অঞ্চল নিয়ে অনেক লেখকই অনেক কাল্পনিক গল্পই রচনা করেছেন—বর্ণনা দিয়েছেন এই অঞ্চলের বহুবিধ অসুবিধার। কিন্তু রকেটের মধ্যে আপনি ওজন-বিহীন হয়ে থাকায় কখন যে নিরপেক্ষ অঞ্চল পার হবেন তা অনুভবই করতে পারবেন না।

এইবার আসল সমস্যায় আসা যাক— মোদ্দা কথা খাব কি? মনুষ্যজন্ম যখন পরিগ্রহ করেছি তখন যেখানেই থাকি না কেন আমাদের খাদ্য চাই, জল চাই, চাই অক্সিজেন, অতএব এসব নিশ্চয়ই সঙ্গে নিতে হবে। অক্সিজেন সঙ্গে যাবে তরল অবস্থায় অথবা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড রূপে। হাইড্রোজেন পারঅকসাইড—অক্সিজেন, তাপ এবং জল এই তিনটিই আমাদের সরবরাহ করতে পারবে একসঙ্গে। মনে হয় কম এবং শূন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিবেশে মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালরির পরিমাণ অনেক কমে যাবে, সুতরাং পৃথিবীর মতো ভীমসেনী আহার নিশ্চয়ই তার লাগবে না। প্রতিটি নাবিকের অথবা যাত্রীর একবছর মহাশূন্যে অবস্থানের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য, জল এবং অক্সিজেন লাগবে তার সমবেত ওজন হবে কমবেশি প্রায় এক টন। আবার অনেকেই মনে করেন এই ওজন যাবে আরও কমে, কারণ মহাকাশে দূষিত জলকে ঊর্ধ্বপাতন এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করে আবার গ্রহণ করা যাবে।

খাদ্যের সংস্কারকে পরিবর্তন করে কেবলমাত্র সারাংশের ছোট ছোট বড়ির দ্বারা যদি শরীর বাঁচানো যায় তাহলে মহাশূন্য ভ্রমণের সুবিধা যাবে অনেক বেড়ে। এই ধরনের খাবার প্রচলনের আশা অনেকেই করছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে এর সাফল্য কিভাবে আসবে তা বলা খুবই কঠিন, শরীরের সাধারণ নিয়মাবলী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য খাদ্যের পরিমাণের কিছু প্রয়োজন আছে।

নিউমোনিয়াতে কে প্রাণ হারাতে চায় বলুন; তাই দার্জিলিঙে যাবার আগে আপনি বেশি করে গরম জামা-কাপড় সঙ্গে নিয়ে নেন। মহাকাশের কত উত্তাপ তা শুনলে আপনার চোখ কপালে উঠবে,—অনেকেই বলেন এই উত্তাপ বরফের চেয়ে প্রায় ২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম! ঘাবড়ে যাবেন না—মহাকাশের কোনো উত্তাপ নেই। কোনো একটা পদার্থের মধ্যে সন্নিহিত তাপের পরিমাণকে আমরা থার্মোমিটার দিয়ে মাপতে পারি। কিন্তু শূন্য একটা পদার্থই নয়, তাই সেখানে উত্তাপের কোনো চিন্তা বা ধারণা আসতে পারে না। কোনো বস্তু যদি শূন্যের মধ্যে যায় তাহলে পরিবেশ অনুসারে তার উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই বস্তুর ওপর সূর্যের আলো পড়লে তার গ্রহণের ক্ষমতা অনুযায়ী উত্তাপ যাবে বেড়ে; আবার আলো না পড়লে নিজস্ব তাপ মহাশূন্যে হারিয়ে সে হয়ে পড়বে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সুতরাং এই পরিবেশে তাপ-নিয়ামক

ব্যবস্থার মাধ্যমে শূন্যযানে মানুষের প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করতেই হবে।

এইবার চাপের কথায় আসা যাক। পৃথিবীতে বাতাস আমাদের শরীরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড চাপ দিচ্ছে। দেহমধ্যস্থ এই চাপ বাইরের প্রচণ্ড চাপের সঙ্গে সমতাসম্পন্ন হওয়ায় আমরা স্বচ্ছন্দে এই পৃথিবীতে বাস করতে পারছি। মহাশূন্যে পরিভ্রমণের সময় বাইরের এই চাপ থাকবে না, অতএব ভিতরের রক্তচাপ অত্যধিক বৃদ্ধিলাভ করে বেরিয়ে আসবে নাক, কান আর মুখ দিয়ে। কি সর্বনাশের কথা ভেবে দেখুন দিকি! এর পরে কি আপনি পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াতে পৃথিবীর বাইরে যাবেন? শূন্যযানে অকসিজেনের আবহাওয়ায় কষ্টেসৃষ্টে চলেছেন, হঠাৎ যানটি একটি উল্কার আঘাতে ফুটো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চাপ গেল কমে,—ফলে আপনিও ফেটে-ফুটে উড়ে গেলেন! শূন্যযানে চাপ কম হলেও মোটামুটি একটা সাম্য থাকবে, কিন্তু বাইরে তো তা নেই।

বিজ্ঞানীরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য বহুবিধ পরীক্ষা করে স্থির করেছেন এই অবস্থাতেও মানুষ ফেটে উড়ে যাবে না। পৃথিবীতে তাঁরা মানবদেহে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে সাত পাউণ্ড চাপ মাত্র আধ সেকেণ্ডের মধ্যে কমিয়ে নিয়ে দেখেছেন এতে মানুষের কোনোই ক্ষতি হয় না এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কেবলমাত্র কানটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রাণের ভয় নেই। কালাদের কিন্তু ভারী মজা। এখন শূন্যযান ভেঙে যাওয়ায় অক্সিজেনের আবহাওয়া থেকে মহাকাশের অতল গর্ভে চাপের যে পতন হবে তা পরীক্ষিত চাপ পরিবর্তনের অর্ধেক, সুতরাং আশা করা যায় মানুষ এই পরিবর্তন সহ্য করতে পারবে এবং মারা যাবে অক্সিজেনের অভাবে। যে-দিক থেকেই হোক এটা খুব সুখবর হল না।

অক্সিজেনের আবহাওয়া কথাটা শুনে আপনারা বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারছি। যদিও পৃথিবীতে অক্সিজেনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তবু পরিবেশ যদি কেবলমাত্র অক্সিজেনের হত তাহলে আমরা দেহমধ্যস্থ অত্যধিক দহনক্রিয়ার ফলে মারা যেতাম। বাতাসের মধ্যে নাইট্রোজেন এনেছে সমতা এবং তারই উপস্থিতির কৃপায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করতে পারি। প্রতি ইঞ্চিতে বাতাসের ১৫ পাউণ্ড চাপের মধ্যে অক্সিজেনের দান মাত্র ৩ পাউণ্ড, সুতরাং শূন্যযানে যদি এমন

আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় যার চাপ প্রতি ইঞ্চিতে ৩ পাউণ্ড তাহলে ধরাপৃষ্ঠের মতোই অক্সিজেন গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রশ্ন, পৃথিবীতে প্রতি ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড চাপের স্থলে মাত্র ৩ পাউণ্ড চাপের আবহাওয়ায় আমরা বাঁচব কিনা? চিরকাল সম্ভব না হলেও—দেখা গিয়েছে বেশ কিছুদিনের জন্য আমরা এই আবহাওয়ায় অক্লেশে থাকতে পারি।

নিশ্বাসে সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের গতি কি হবে? অনেকেই বলেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালকালির সাহায্যে একে অপসারিত করা হবে। কিন্তু তাতেও হাঙ্গামা কম নয়। সবচেয়ে সুবিধা হয় যদি কোনো রকমে এই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ভেঙে অক্সিজেনকে আবার কাজে লাগাতে পারি। সে তো গাছপালা না হলে হবে না— শূন্যযানে সাজানো বাগান আপনি কোথায় পাবেন। নিজের প্রাণ বাঁচাতেই মানুষ পাগল আবার উদ্ভিদের পরিচর্যা,— অতএব এসব চিন্তা মাথায় না আনাই ভালো।

সম্প্রতি কোনো একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিষয়ক কাগজে দেখেছিলাম কোনো একজন বিজ্ঞানী প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকে রসায়নাগারে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত করতে সমর্থ হয়েছেন। উদ্ভিদজগত থেকে তিনি ক্লোরোফিল বার করে নিয়ে তার সাহায্যে গবেষণাগারেই প্রস্তুত করেছেন শর্করাজাতীয় পদার্থ। এই ধরনের গবেষণা আরও সাফল্যমণ্ডিত হলে আশা করা যায়। ঠিক উদ্ভিদজগতের মতো কেবলমাত্র ক্লোরোফিল বহন করেই শূন্যযানে অক্সিজেন উদ্ধার এবং পুনরায় তার ব্যবহার সম্ভব হবে। অবশ্য বর্তমানে অনেকেরই মতে সোডিয়াম পারঅক্সাইড দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ করা হবে; এবং এতে কেবলমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইডের হাত থেকেই আমরা রেহাই পাব না, উপরন্তু এই প্রক্রিয়া শূন্যযানে অক্সিজেনও সরবরাহ করবে।

ওজনবিহীনতা, তাপ, চাপ, খাদ্য, পানীয় এবং অক্সিজেনের কথা বললাম। এইবার মহাকাশের দিক থেকে মানুষ কি কি বিপদের আশঙ্কা করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথম হল উল্কাপিণ্ড। এদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে শূন্যযানের জীবন সহজেই বিপন্ন হতে পারে। বড় উল্কা যার এক আঘাতেই শূন্যযান নীরব হয়ে যাবে তা খুবই বিরল। যেসব উল্কার ব্যাস কমবেশি আধইঞ্চি সাধারণভাবে তাদের সঙ্গেই হবে মোলাকাত,—একটা ছুঁয়েই আমাদের সেই পরিবেশের একমাত্র আশ্রয়কে ছেঁদা করে দেওয়া

তাদের পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। পার্ক স্ট্রীটের ওপর হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় আপনার মোটর গাড়ির টায়ার ছেঁদা হয়ে গেলে লোকজন ভাড়া করে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে গ্যারাজে নিয়ে যান। কিন্তু ঐ উর্ধ্বলোকে সেরকম কোনো সুবিধাই পাবেন না। অতএব একটা কিছু ব্যবস্থা আপনাকে এই পৃথিবী থেকেই করে যেতে হবে। পরিকল্পনা করা হচ্ছে শূন্যযানের সর্বাঙ্গ আরেকটি ধাতুর পাতের সাহায্যে মোড়া হবে এবং এই পাত ও যানের দেহের মধ্যে থাকবে অত্যন্ত উচ্চ-চাপ-সমন্বিত বাতাস। উল্কা এসে মারল ধাক্কা, পাতের তলাকার বাতাস চাপে আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। প্রথম আঘাত সরে যাবার পরই ভিতরের বাতাসের চাপে পাতটি স্বস্থানে ফিরে এলো এবং আঘাত-কারী পড়ল ছিটকে। মাঝে মাঝে এই ধাক্কাতে পাতটিও ফুটো হয়ে যাবে, কিন্তু বেশি বাতাস বেরিয়ে যাবার আগেই তৎক্ষণাৎ তাকে মেরামত করা হবে ঐ শূন্যযানে বসেই।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পরীক্ষিত সত্য না হলে মানুষ কিছুই বিশ্বাস করে না। তাই উল্কা যে আমাদের ঠিক কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে তা এই পৃথিবীতে বসে বলা খুব মুশকিল। অতএব, নানান মুনির নানান মত। মোদ্দা কথা কি,—মহাশূন্যে আমাদের করতে হবে বুদ্ধির লড়াই, বিপাকে পড়লে অতিক্ষুদ্র উল্কাও ছেড়ে কথা কইবে না।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহাকাশ ভ্রমণের অন্যতম আতঙ্ক ছিল মহাজাগতিক রশ্মি। জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক যেসব রশ্মি সারা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে আছে তারা বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে আসতে পারে না। কিন্তু আকাশে এই সব রশ্মির সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। শূন্যযানের সর্বাঙ্গে ধাতুর আচ্ছাদন এই সব ক্ষতিকারক রশ্মিকে প্রতিহত করবে। কয়েক শ্রেণীর কাচও আছে যারা অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মিকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু বিপদ কেবল মহাজাগতিক রশ্মিকে নিয়ে। বায়ুমণ্ডল মহাজাগতিক রশ্মির এক প্রধান অংশকে পৃথিবী বক্ষে আসতে বাধা দেয়,—ঠিক সেইরকম একটি বাধার সৃষ্টির জন্য আমাদের শূন্যযানে প্রায় এক গজেরও বেশি চওড়া সীসার পাতের আচ্ছাদন নির্মাণ করতে হবে।

পৃথিবী থেকে ১২ মাইল উর্ধ্বে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ ধরাপৃষ্ঠের প্রায় ৫০ গুণ বেশি, কিন্তু আরও উর্ধ্বে এই পরিমাণ কমে গিয়ে ১৫ গুণ

দাঁড়ায়। কারণ কি জানেন, বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ পথে মহাজাগতিক রশ্মি বহু গৌণ বিকিরণ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে নিজেকে বাড়িয়ে তোলে। ১৯৩৫ সালে ষ্টিভেনস্ এবং অ্যানডারসন নামক দুজন ভদ্রলোক বেলুনে চড়ে মহাজাগতিক রশ্মি যেখানে শূন্যের চেয়ে অনেক বেশি, সেখানে কয়েকঘণ্টা বেশ খোশ-মেজাজে গল্পগুজব করে অক্ষত দেহে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি মহাশূন্যের মাত্র ১৫ গুণ বেশি মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের বিশেষ একটা কিছু ক্ষতি করবে না। যাই হোক ঐ পরিমাণ রশ্মি বহুদিন ধরে মানবদেহ সহ্য করতে পারবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

এত গণ্ডগোলের জন্যই অনেক বিজ্ঞানী চিন্তা করছেন, যারা যাত্রী বা গ্রহান্তরের কর্মী তাদের কোনো ওষুধের সাহায্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে নিয়ে যাওয়াই ভালো। পথের কষ্ট এতে অনেক লাঘব হবে এবং অন্য গ্রহে, উপগ্রহে অথবা মহাশূন্যে নির্মিত কৃত্রিম অঞ্চলে তাঁরা সতেজ দেহ ও মন নিয়ে কাজ করতে পারবেন। পথে আরও অনেক অজানা বিপদ ঘটতে পারে তা পৃথিবী থেকে আমরা কল্পনা করতে পারছি না, যে বন্ধু সেও হতে পারে শত্রু! কলম্বাস ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য যে নাবিকদের সহায়তা গ্রহণ করে সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিলেন তারাই তাঁর বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল বিদ্রোহ, মহাশূন্য পরিভ্রমণে মানুষের ভাগ্যে কি আছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন প্রথম অভিযাত্রী দল।

পথের খবর এইখানেই শেষ হল, রামধনুর উপসাগরে গিয়ে কি অবস্থায় আমরা পড়ব, আসুন তাই কল্পনা করি। অন্য গ্রহে যাবার চিন্তাটা বর্তমানে ছাড়ুন—সে বোধহয় আমাদের জীবনে হবে না। অবশ্য চাঁদে যাওয়াও হবে কিনা ঠিক নেই, কারণ বিজ্ঞানীরা বলছেন রাস্তা তৈরি করতে লাগবে আরও পঞ্চাশ বছর!

ভাবছেন চাঁদে গিয়ে প্রথমেই রামধনুর নৌকায় চড়ে দেশটা একবার ঘুরে দেখবেন, কেমন? সে স্বপ্ন আপনার বুদবুদের মতো মিলিয়ে যাবে,—জলই নেই তো সাগর আর উপসাগর! দুরন্ত ঠাণ্ডা দেশ, কলকাতা-চন্দ্রলোক কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে কি ঠকানটাই না ঠকেছেন!

টাইটা শক্ত করে বেঁধে নাচতে গেলেন, তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিয়ে দেওয়া হল বিশ্রী একটা পোশাক—অনেকটা ডুবুরীদের মতো! পিঠে

অক্সিজেনের পাত্র আর তার সঙ্গে রেডিও-সেট। কথা বলতে হলেই ঐ বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে জানাতে হবে। চাঁদে বাতাস নেই, পোশাকটা শূন্যতা আর ঠাণ্ডা সহ্য করবার জন্য ঠিক সেইভাবেই নির্মিত হয়েছে। দেখবার জন্য চোখের কাছেও কিছুটা স্থান থাকবে স্বচ্ছ। মহাশূন্যের এই পোশাকটা নির্মাণ করতে শূন্যযান নির্মাণের চেয়ে কম মাথা খাটাতে হয় নি।

এইবার আপনি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করলেন। বাব্বা, যানটাকে নামাতে কি কম কষ্ট হয়েছে। একে যানের প্রচণ্ড গতি, তার ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ চাঁদের বুকের ওপর আছড়ে ফেলে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল আর কি? গতি কমিয়ে দিয়ে, আকর্ষণকে বিস্ফোরণের সাহায্যে বাধা দিয়ে তবে কোনো রকমে শূন্যযানকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো হয়েছে। চাঁদে বাতাসও নেই, আর রকেট এরোপ্লেনও নয় যে আস্তে আস্তে নামবে। এই অবতরণ আর একটা মস্ত বড় সমস্যা।

কি দেখছেন চাঁদে?—চারিদিকে কেবল গর্ত,- হয় ওগুলো আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর অথবা উল্কাপাতের চিহ্ন। যাই হোক ভয়ের কিছু নেই, এককালে তো চাঁদ পৃথিবীর বুকেই মানুষ হয়েছে, তাই আশা করা যায় পৃথিবীর সব যৌলিক পদার্থই চাঁদে বর্তমান। ওগুলোকে মাথা খাটিয়ে হয় ভেঙে নয় জুড়ে যাহোক একটা কিছু করে নেওয়া যাবে। হাঁটাহাঁটি সাবধানে করবেন, চাঁদ পৃথিবীর স্থলভাগের পাঁচ ভাগের মাত্র এক ভাগ, তাই তার আকর্ষণ পৃথিবীর ছভাগের এক ভাগ; গর্ত পার হতে গিয়ে আস্তে একটা লাফ মারলেন, উঠে গেলেন শূন্যে—একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড!

মানুষকে চাঁদে গিয়েই নির্মাণকার্য শুরু করতে হবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। চাঁদের উপনিবেশ থেকে আরও দূরে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আবার অন্য গ্রহে যাবার চেষ্টা করতে হবে। অন্য গ্রহে কোনো প্রাণী থাকলে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবে; আর আমরা আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড শান্তি এবং মৈত্রীর প্রচারকার্য চালাব।

সম্পদ

মিহির সেন

যে কোণটাকে রোজ কাজে লাগায় ও, আজ আবার সংসার বসেছে সেখানে। কাল রাতে আসা নতুন উদ্বাস্তুদের সংসার। বিরক্ত হয়ে ফিরে আসে ভানা। এবার কোথায় যাওয়া যায়? অথচ বেলাও বাড়ছে। রোদ প্রায় ছড়িয়ে এল বলে। ঘুরতে ঘুরতে একোণে ওকোণে চোখ বুলোতে বুলোতে অনেকদূর চলে এল ভানা, কিন্তু জুতসই জায়গা আর চোখে পড়ে না। লোকজন নেই এমন নির্জন কোনো আশ্রয়।

হ্যাঁ, পেয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়ে ভানার প্লাটফর্মের প্রায় শেষ সীমায় একগাদা লোহালক্কড় আর মালপত্তর বোঝাই একটা নোংরা জায়গা। লোকজনের বালাই নেই। প্রায় নির্জন।

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। এ শহরের সব কিছুই নতুন ভানার কাছে। কাউকে চেনে না সে; কারো মনের কোনো হদিশ পায় না। কে যে কোথায় গেলে কখন ভাগ-ভাগ করে ধমকে উঠবে ঠিক বোঝে না। তিনচার দিন না খেয়ে শুকিয়ে পড়ে থাকলেও কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করে না, আহা, কার ছেলে গো।

কিন্তু বাধা দিল না কেউ। পায়ে পায়ে একেবারে ভেতরে ঢুকে গেল ভানা। প্রায় তলিয়ে গেল মালপত্তরগুলোর আড়ালে। তারপর একবার চার পাশে সন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ ঘনঘন উঠবোস শুরু করল।

গোটা ত্রিশেক দেবার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। পায়ের গুলি-দুটো ডলে ডলে ম্যাসেজ করে নিল কিছুক্ষণ। তারপর গোটা দুয়েক ইট জোগাড় করে কিছুক্ষণ ভোঁস ভোঁস বুকডনের পালা। কিন্তু গোটা দশেক দিয়েছে কি দেয়নি, আচমকা কোত্থেকে এক নির্ভীক ধেড়ে ইঁদুর পরম নির্লিপ্ত ভাবে ওর বুকের তল দিয়ে ওপারে চলে গেল। আঁতকে উঠে ইটসুদ্ধ হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ল ভানা মাটিতে।

আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পেছন থেকে হো হো করে হেসে উঠল। চমকে পিছন ফিরল ভানা। সেই একহাতকাটা ঠুঁটো জগন্নাথ ভিখিরী ছেলেটা, ওকে দেখলেই দূর থেকে যে পালোয়ান পাগলা বলে খেপায় ওকে। কোমরে এক-হাত রেখে হো হো করে হাসছে। ভানা দুপা এগিয়ে আসতেই পেছন ফিরে ছেলেটা ভোঁ দৌড়। অনেকটা দূরে গিয়ে থামল সে। তারপর ভালো হাতটা বাঁকিয়ে মাসল তোলার ভঙ্গি করে সমানে চেঁচাতে লাগল, লু-লু পালোয়ান পাগলা, লু-লু।

মুখ ভার করে আর এক কোণ দিয়ে বেরিয়ে গেল ভানা। রাগে রি রি করতে লাগল শরীর। কিন্তু একটু গিয়েই মনে হল মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। মনে পড়ল, কাল থেকে কিছু খায়নি ও। বাসি রুটি একটা পেয়েছিল অবশ্য, কিন্তু খায়নি। খায় কি করে, বাসি জিনিস খেলে যে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। শরীর নষ্ট হয়ে যায়।

নিজের হাতদুটোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল ও। তারপর চোয়ালটা নিচু করে প্রায় গলার সঙ্গে লাগিয়ে ঝুঁকে নিজের বুকটা দেখল। শুকিয়ে গেছে, অনেকটা শুকিয়ে গেছে। চোখদুটো ছলছলিয়ে এল ভানার।

স্টেশন-মুখে বাস স্টপেজ। বাস স্টপেজের সামনে লাইট পোস্টটা ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভানা। সামনে সমানে তারস্বরে চেঁচিয়ে ভিক্ষে করে চলেছে একপাল ছেলেমেয়ে, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট ভানার। কিন্তু কিছুতেই ওদের দলে গিয়ে ভিড়তে মন সরছে না। পেটের জ্বালায় এর আগেও যে দু-চারজনের কাছে হাত না পেতেছে তা নয়, কিন্তু সে নির্জনে চুপেচুপে, এমন সবার সামনে নয়। ভাবতেও কেমন লাগে, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করবে ভানা, যদু মণ্ডলের ছেলে ভানা!

আস্তে সরে ক্রমে চুপচাপ বসে পড়ে ভানা অল্প দূরের একটা লাইটপোস্টের তলে। পাশে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন বোধহয় রাস্তা পার হবার জন্য। একবার ফিরে তাকালেন তিনি ভানার দিকে। তারপর, ওকে দেবার জন্যই কিনা কে জানে, রুমালের খুট খুলে চারটে পয়সা বের করলেন। আড়চোখে চেয়ে আশ্রায় চকচক করে উঠল ভানার চোখদুটো। কিন্তু আচমকা যেন উড়ে এসে পড়ল কোত্থেকে হাত-কাটা সেই ছেলেটা। পাটকাঠির মতো লিকলিকে চেহারা। কালো চামড়ায় ঢাকা একটা কঙ্কাল যেন। কাটা হাতটা সামনে তুলে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল ছেলেটা, তিনদিন খাই না মা। একটা পয়সা, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন মা —।

ভদ্রমহিলার চোখদুটো সহানুভূতিতে স্তিমিত হল। পয়সা চারটে ওর হাতে দিয়ে রাস্তাটা পেরিয়ে চলে গেলেন তিনি। আনিটা আঙুলে বাজিয়ে শিস দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভালো হাতটায় পড়ল প্রচণ্ড হ্যাঁচকা একটা টান। কোনো রকমে টাল সামলে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা। ফিরে দেখল, বজ্রমুঠিতে ওর কব্জি চেপে ধরে আছে পালোয়ান পাগলা। যন্ত্রণায় টনটন করে উঠল হাতটা।

হাতটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভানা, আমার লোক ভাগিয়ে নিলি কেন তুই মিথ্যে কথা বলে ? তিনদিন খাস না তুই ? কাল রাতে যে চুরি করে আনা আস্ত রুটিটা গিললি, দেখিনি আমি, না।

অনেক চেষ্টা করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল ছেলেটা। বলল, তোর কি ? তুই বল না তিনদিন না খেয়ে আছিস।

তুইও বল না! ভেংচি কেটে ওঠে ভানা, তোর মতো মিথ্যে কথা বলব ? মিথ্যুক।

তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল ভানা।

ছেলেটা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে গজরাতে লাগল, ওঃ, মিথ্যে বলবে না। ঐ ষাঁড়ের মতো চেহারা দেখে কে ভিক্ষে দেয় দেখ না!

যেতে যেতে শুনল ভানা। ফিরে তাকাল একবার। তারপর আবার চলে গেল নিজের মনে।

কিন্তু অবাক হল ছেলেটা। বাউণ্ডুলে, ভিক্ষে করে চরে বেড়ানো ছেলের মিথ্যে কথায় আপত্তি, ওর জীবনে এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

ষাঁড়ের মতো চেহারা ! হ্যাঁ, এত গর্বের ষাঁড়ের মতো চেহারাটা যে ওর এত বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবে কোনোদিন চিন্তা করতে পারেনি ভানা। নিজের চেহারাটার উপর এবার রাগ হতে শুরু করে ওর। সেই চেহারার জন্যই কেউ ভিক্ষে দেয় না ওকে। মিথ্যে বলতে পারে না ভানা। কোথায় যেন খচখচ করে বেঁধে। কিন্তু সত্যি বললেও কেউ ভিক্ষে দেয় না। বিশ্বাসই করে না যে না খেয়ে আছে ও। এমনই চেহারা ওর যে, দু-তিনদিন না খেয়ে থাকলেও তার কোনো ছাপ পড়ে না চেহারায়। অথচ ভিক্ষে করতে ও চায় না। খাটতে ও গররাজী নয়। কিন্তু কাজ দেবে কে ? সারাদিন টোটো করে ঘুরে বিকেলের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ভানা। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। প্লাটফর্মের কোণায় এসে বসে পড়ল ও।

মনে পড়ল, এই কোণাতেই সেদিন আলাপ হয়েছিল সেই বাবুর সঙ্গে। ভিক্ষে চাইতেই যে বাবু ধমক দিয়েছিলেন, এমন অসুরের মতো চেহারা নিয়ে ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না ? খেটে খেতে পারিস না ?

আশায় জ্বলজ্বল করে উঠেছিল ভানার চোখ, দিন না বাবু একটা কাজ। আমি ভীষণ খাটতে পারি। গাঁয়ের সব লোক আমাকে ভীম বলে ডাকত।

প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন বাবু ভানার এ আচমকা সম্মতিতে। তারপর কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে, কি মনে করে কে জানে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। বউকে ডেকে বলেছিলেন, লোক খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিলে, দেখ লোক খুঁজে নিয়ে এসেছি।

কিন্তু বাবুর বউ ভানাকে দেখেই আঁতকে উঠলেন যেন, ওরে বাবা, এমন, ডাকাতের মতো ছেলে নিয়ে মরে গেলেও আমি সারা দুপুর একা বাড়িতে থাকতে পারব না। যেমন চোর-ছ্যাচড়ের হিড়িক পড়েছে আজকাল।

বাবু বোঝাবার চেষ্টা করেও পারলেন না তবু ভানাকে ট্রামলাইন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন বাবু। চারটে পয়সা হাতে দিয়ে ট্রামে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, যে কোন লোককে বল, শিয়ালদায় নামিয়ে দেবে।

ট্রামে উঠে হাতের ভাঁজে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল ভানা। চেহারার জন্য চোর বদনাম জীবনে এই প্রথম।

ঘটনাটা মনে পড়ায় চারদিন পরও আবার চোখে জল এল ভানার।

নিজের চেহারাটার উপর রীতিমতো রাগ হতে শুরু হল ওর। শরীরই সম্পদ না ছাই, এর চেয়ে হাড্ডিসার হলেও যেন অনেক ভালো ছিল।

খিদেয় ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজেই জানে না ভানা। ছোট ক'টা ধাক্কায় চোখ খুলে দেখে অবাক হল, অনেক রাত হয়ে গেছে। সামনে বসে ঠেলছে ওকে হাতকাটা ছেলেটা। এতক্ষণে খেয়াল হল ওর, ছেলেটার শোবার জায়গায় শুয়ে আছে বলে। এর আগেও একবার ঝগড়া হয়েছিল জায়গাটা নিয়ে, যখন জানত না ও যে, এই ট্রেনের প্রায় সমস্ত কোণা-কানচি-গুলোই কারো না কারো নিজস্ব জায়গা।

চোখ ডলে উঠে বসল ভানা! যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

কাটা হাতটা সামনে তুলে থামাল ওকে ছেলেটা। চোখে ওর মিতালির চাউনি। ছেলেটা বুঝেছে এতদিনে, পাগলটা ঠিক ওদের মতো জাত-ভিখিরি নয়। কোথায় যেন ছোট্ট একটা তফাত আছে। না হলে মিথ্যে বলতে আপত্তি এত! আর এমন চেহারা থাকতে সকলে একা পেয়েও না পিটিয়ে ছেড়ে দেয় ওকে।

ভানা দাঁড়িয়ে যায়।

আস্তে ছেলেটা বলে, বস না।

একটু অবাক হল ভানা। তবু বসল।

ছেলেটা একবার তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, এখানে শুবি? আচ্ছা যা, শুস আজ থেকে এখানে, খেয়েছিস কিছু?

মাথা নাড়ে ভানা।

একটা কাগজের মোড়ক থেকে দুটো রুটি বের করে দিল ছেলেটা। ভানা অনেক সঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে নিল। চোখদুটো লোভার্ত হয়ে এল ওর। কিন্তু একটু নেড়েচেড়ে গন্ধ শুঁকে স্তিমিত হয়ে এল চোখদুটো। ফিরিয়ে দিয়ে বলল, বাসি; খাব না। শরীল খারাপ হবে।

ছেলেটা চটে গেল এবার। মুখ বাঁকিয়ে বলল, শালা নবাব, খেতে পায় না তার শরীল। বুরবক।

কোনো উত্তর দিল না ভানা। কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবল ছেলেটা।

তারপর উঠে গিয়ে, কোত্থেকে কে জানে, এক ঠোঙা মুড়ি নিয়ে এল। ভানার দিকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নে, খা শালা বাদশার ব্যাটা।

তারপর ঘণ্টাখানেকের ভেতরই কি করে যে নতুন পরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, টেরও পেল না ওরা। দুজনই দুজনার কাছে বিস্ময় যেন। এত কাছে বসে হেসে কথা বলে ছুঁয়েও যেন চিনতে পারছে না কেউ কাউকে।

ভানা জিজ্ঞেস করল ছেলেটাকে নাম কি ওর, মা বাবা কোথায়, বাড়ি কোনখানে, এখানে এল কি করে।

উত্তরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু ছেলেটা। বোকা বোকা চোখ ক্লাশে পড়া না জানা ছাত্রের মতো। এসব কথা কোনোদিন মনে হয়নি ওর এর আগে। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে মনে করার চেষ্টা করল ছেলেটা। কিন্তু বৃথা। বিগত জীবনের একটি কথাও মনে পড়ল না ওর। অনেকক্ষণ পরে ফিসফিস করে বলল শুধু, জানি না। তোর?

এই সুযোগই খুঁজছিল ভানা। গড়গড় করে বলে চলল এবার ওর আত্ম-পরিচয়। জমিদারবাড়ির পাইক, বিরাট দৈত্যের মতো বাবার চেহারার গল্প করল। মা-মরা ওর উপর দিদিমার আদরের কাহিনী বলল। কি মজাতে, কি আরামে ছিল গ্রামে ডাণ্ডগুলি, পুকুর-পাড় আর শালিকের বাচ্চা নিয়ে তা-ও জানাল। আর বলল ওর নিজের চেহারার গল্প। গ্রামের সবাই যে চেহারা দেখে তারিফ করে বলত, হ্যাঁ একখানা চেহারা বটে!

ছেলেবেলা থেকেই চেহারাটা ভালো ছিল ভানার। আরো ভালো হল জমিদারবাড়ির ছোট দাদাবাবুর নজরে পড়ার পর থেকে। বাবার সঙ্গে জমিদারবাড়ি গিয়েছিল ভানা। হঠাৎ কলকাতা থেকে ছুটিতে আসা ছোট দাদাবাবুর সামনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ভানার দিকে তাকিয়ে থেকে বাবাকে বলেছিলেন দাদাবাবু, তোমার ছেলে, মণ্ডল? চমৎকার চেহারার গড়ন তো। ঠিকমতো নজর দিলে সুন্দর শরীর হবে ওর। ঠিক আছে, আজ থেকে বিকেলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমার সঙ্গে ব্যায়াম করুক কিছুদিন।

প্রথম দিন ভয়ে, সঙ্কোচে, কৌতূহলে; তারপর থেকে সহজভাবেই যেতে আরম্ভ করল ভানা দাদাবাবুর আখড়ায়। কলেজের ছুটিতে এসেছিলেন,

তাই সমস্ত যন্ত্রপাতি নাকি আনতে পারেননি। তবু যা আনতে পেরেছিলেন, তা দেখেই অবাক ভানা। কদিনের ভেতরই রীতিমতো শিষ্য হয়ে উঠল সে দাদাবাবুর। একসঙ্গে ব্যায়াম করত। তারপর গা হাতপা ডলাইমলাই। বাদাম, পেস্তা, দুধ। কদিনের ভেতরই শরীর যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে মনে হল ভানার। অবসর সময়ে দাদাবাবু এ-বই ও-বই থেকে নানা দেশের ব্যায়ামবীরদের ছবি দেখাতেন। তাদের গল্প বলতেন। বোঝাতেন ভানাকে, স্বাস্থ্যই সব। দাদাবাবুই বারে বারে বলে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন ওকে, স্বাস্থ্যই সম্পদ। এর ইংরেজিও কি যেন বলতেন একটা, বুঝত না ভানা।

শুনতে শুনতে অবাক হল ছেলেটা। বলল, স্বাস্থ্য কি ?

একটু আমতা আমতা করল ভানা। তারপর বলল, মানে এই শরীর আর কি ?

ও, তাহলে সম্পদ না কি ওটা কি ?

ওটা, মানে,—এবার আর কিছুতেই হাতড়ে পায় না ভানা মানেটা। তবু ভেবেচিন্তে বলে, মানে, সব কিছু আর কি। শরীলটা ঠিক না থাকলে বেঁচে থেকেও কোনো লাভ নেই। এটাই সব।

ছেলেটা কি বোঝে কে জানে। কিছুক্ষণ তবু বোঝার চেষ্টা করে। তারপর বলে, তা তোরা চলে এলি কেন দেশ ছেড়ে ?

এবার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ভানা। দাঁত দিয়ে কেঁপে-ওঠা ঠোঁটদুটো চেপে চেপে ধরল দু-একবার। তারপর সে ভয়াবহ ইতিহাস বলে চলল মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

আর রূপকথা শোনার মতো অবাক হয়ে শুনতে লাগল ছেলেটা কি করে ভানা বাবা, দিদিমা, বাড়িঘর সব হারিয়ে ভিড়ের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে এই শেয়ালদায় এসে ঠেকেছে সে কাহিনী।

টেরও পেলনা ও; ওর কাটা হাতটা কখন ওর অজান্তেই উঠে এসেছে ভানার কোলের উপর।

পরদিন ভোরে উঠে ছেলেটা দেখল পাশে ভানা নেই। হাই তুলে উঠে বসল ও। তারপর উঠে ঘুম-জড়ানো পায়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু হঠাৎ

থেমে গেল সেই কোণটার কাছে এসে। একমনে উঠবোস করছে সেখানে ভানা। আজ আর হাসল না ছেলেটা। বরং মায়া হল দেখে। না খেয়ে মরতে বসেছে অথচ শরীরের মায়া গেল না এখনও! নিঃশব্দে সরে গেল তাই।

কিছুক্ষণ পর বুকডন সেরে বেরিয়ে এল ভানাও। কাল রাতের মুড়িতে বেশ কাজ হয়েছে। আজ আর ব্যায়ামের পর মাথাটা ঝিমঝিম করছে না যেন।

কিন্তু গত রাতের মুড়ি আর কতক্ষণ তাজা রাখবে। দুপুরের দিকে আবার খিদেয় পেট জ্বলতে শুরু করল। হাতে একটা ফুটো পয়সাও নেই। ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে। অথচ ব্যায়াম-করা চেহারার অসুরের মতো খিদে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কে কখন যে প্লাটফর্মের ভেতর ঢুকে পড়েছে খেয়ালও করেনি ভানা। গেটের বাবুরা গল্প করছিলেন, বাধা দেয় নি তাই কেউ। প্লাটফর্মের শেষ সীমায় এসে লাইনের পাশে পা ঝুলিয়ে বসল ভানা।

তিনটে লাইন পেরিয়ে দূরে চতুর্থ লাইনটায় ট্রেন আসছে একটা। কুলিরা হৈচৈ করে দৌড়ে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াল প্লাটফর্মে। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ল ভানার সেদিনের এক বাবুর কথা। ভিক্ষে চাইতে একটা পয়সা দিয়েছিলেন অবশ্য, কিন্তু উপদেশও দিয়েছিলেন, এমন চেহারা থাকতে ভিক্ষে করো কেন। কুলিগিরি করেও তো খেতে পার।

কথাটা বারে বারে খোঁচা দিয়ে চলল ভানার মনে। তারপর, কি মনে করে যেন, চার নম্বর প্লাটফর্মের দিকে পা বাড়াল। গিয়ে একেবারে শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল যাত্রীদের ওঠানামা।

সব শেষের কামরা থেকে এক ভদ্রলোক দুটো স্যুটকেস নিয়ে নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, বোধহয় কুলির আশাতেই। ভানা এগিয়ে গেল, বাবু, কুলি লাগবে?

স্যুটকেসদুটো ওর মাথায় চাপিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, নে, চল।

কিন্তু পা বাড়ানোর আগেই কে যেন টান মেরে স্যুটকেসদুটো নামিয়ে নিল ভানার মাথা থেকে। আচমকা একটা ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ভানা এক

পাশে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গালাগাল কানে এল, শালা হারামী, আমাদের ভাত মারবি ? কুলি লাইসেন্ কৈ, নিকলা শালা।

তাকিয়ে দেখল ভানা, ওর ডবল চেহারার একটা কুলি এগিয়ে আসছে ওর দিকে হাত মুঠ করে। তবু কপাল ভালো, বাবু ধমকে থামালেন কুলিটাকে। ছোটখাট একটা ভিড় জমে গিয়েছিল চার পাশে। বাবুই মিটমাট করিয়ে মাল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভাঙা ভিড় থেকে একটা কাটা মন্তব্য কানে এল ভানার, শালার চেহারা দেখেছেন, পকেটমার-টার হবে আরকি।

এমন আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা যে, বোকার মতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভানা প্লাটফর্মের উপর। ভিড় ভাঙার পরও। কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না ও, কাঁদতে পারল না পর্যন্ত।

কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ল হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতে। দুহাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়াল হঠাৎ, না এখানে থাকবে না। এখানে আর পড়ে থাকবে না ভানা। মিথ্যেই সব ট্রেন এলে ও খুঁজে মরে বাবা-ঠাকুরমাকে। কেউ আসবে না ; চেনা আর কেউ আসবে না ওর জীবনে। এখানে প্রাণ নেই কারো। মানুষ এখানে মানুষ না। এর চেয়ে দুচোখ যেদিকে যায় বেরিয়ে পড়বে ও। এত বড় শহরে খেটে খেয়ে বাঁচতে পারবে না ? নিশ্চয়ই পারবে ! তিল তিল করে শরীরটা মাটি করবে না আর। যেমন করে হোক, পুরো খেয়ে স্বাস্থ্যটা রক্ষা করতেই হবে।

দ্রুত পায়ে অচেনা শহরের ভিড়ে মিশে যায় ভানা সাত দিনের পরিচিত শিয়ালদার গেট পেরিয়ে।

হাতকাটা ছেলেটা এরপর অনেক খুঁজল ভানাকে। কিন্তু প্লাটফর্মের কোনোখানে খুঁজে পেল না ওকে। বাইরেও নয়। প্রথম প্রথম একটু মন খারাপ হল ওর। কিন্তু দুদিনের ভেতরই বিলকুল ভুলে গেল ভানাকে।

অনেক দিন কেটে গেল তারপর। বছর দুয়েকের কম নয়। একদিন বড়লোক এক শ্রাদ্ধবাড়ির খোঁজ পেয়ে মানিকতলার দিকে যাচ্ছিল ছেলেটা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কার ডাক শুনে। ওর নাম ধরে ডাকল যেন কে।

ফিরে তাকাল, কিন্তু ঠিক চিনল না যে ডাকছে তাকে। টিনটিন করছে হাত-পা। মাথার চুলগুলো সব কি অসুখে যেন উঠে গিয়েছে। চোখ-দুটো বসে গিয়েছে কালো খাদে। দুই হাটুর খাঁজে ঝুঁকে পড়েছে মাথাটা। টিনটিনে গলাটা যেন আর বইতে পারছে না ভারী মাথাটাকে।

অনেক কষ্টে মাথাটা তুলে একটু হাসার চেষ্টা করল ও, কিরে চিনতে পারলি না। আমি ভানা। পালোয়ান পাগলা।

ভানা! বিস্ময়ে ওর পাশে বসে পড়ল হাতকাটা ছেলেটা, একি হাল হয়েছে তোর?

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ভানা, জোর ব্যারাম হয়েছিল। কোনো রকমে বেঁচে গেছি।—তারপর একটু বিষণ্ণ হেসে বলল, এখন কিন্তু বেশ ভিক্ষে পাই, জানিস! তোর চেয়েও বেশি।

চোখ ছলছল করে এল ছেলেটার। কাটা হাতটা ওর হাঁটুর উপর রাখল ও। বলল, দুঃখু করিস না। দেখিস আবার ভালো হয়ে যাবে তোর শরীল। দুদিন খেতে পারলেই আবার তাগড়াই হয়ে উঠবি আগের মতো।

টিনটিনে হাতটা তুলে ওর মুখে হাত চাপা দিল ভানা, না ভাই এই ভালো আছি। ভগবানকে বল, যেন এর চেয়ে ভালো না হই। আগের মতো ভালো হলেই আবার না খেয়ে মরতে হবে। এখন বেশ খেতে পাই, পয়সা পাই।

বলতে বলতে হঠাৎ কাশি শুরু হল। হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে পড়ল ভানা পথের উপর। ছলছলে চোখে ছেলেটা কোলের উপর তুলে নিল ভানার মাথা। হাত বুলোতে লাগল ওর কঙ্কাল বুকে। চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল ভানা।

টং করে সামনে একটা দুআনি পড়ল হঠাৎ। পাশ দিয়ে চলে গেলেন এক ভদ্রমহিলা। টিনটিনে হাতটা বাড়িয়ে হাতড়িয়ে দুআনিটা তুলে নিল ভানা। তারপর চোখ মেলে তুলে ধরল সেটা ছেলেটার চোখের সামনে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, দেখলি কেমন পয়সা পাই, কত পাই আজকাল।

দুআনিটা নয়, ভানার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ছেলেটা, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ও, ভানা হাসছে না কাঁদছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত

(পূর্বানুবৃত্তি)

রণজিৎ গুহ

॥ ৪ ॥ রাজস্ব ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

ফরাসীদেশে এক তীব্র কৃষিসংকটের মধ্যেই প্রাকৃতধনবাদী তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছিল। অভিজাত ভূস্বামীশ্রেণীর শোষণ ও তাদের পৃষ্ঠপোষক বুরবঁ রাজতন্ত্রের উদ্যোগে আদায়ী রাজস্ব ও করের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যাবার নীতি কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে। আলবেয়ার সোবুল ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে বলেছেন যে এক আঠারো শতকেই রাজস্ব ও করের ভার কৃষকদের উপরে প্রায় দ্বিগুণ করে চাপানো হয়।[১] প্রাকৃত-ধনবাদের প্রথম প্রবক্তারা তাই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে আঁসিয়েঁ রেজিমের রাষ্ট্রই যখন সামন্তস্বার্থে পরিচালিত হয়ে রাজস্বনীতি ও শুল্কনীতির দ্বারা কৃষিজ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তখন আর সন্দেহ কি যে কৃষিবিষয়ে রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ হলেই সর্বনাশ, তাই রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপের কুফল বর্ণনা ও তা অপসারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের রচনায় বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

রাজস্ব ও বাণিজ্য প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের বক্তব্যও এই প্রাকৃতধনবাদী মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

কোম্পানির রাজস্বনীতির সমালোচনা

কোম্পানির রাজস্বক্ষুধাই যে বাঙলা দেশের সর্বনাশ করেছে সেকথা ফ্রান্সিস গোড়া থেকেই বলেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনার ভূমিকা হিসাবে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনব্যবস্থার যে আটটি প্রধান দোষের কথা তাঁর ২২শে জানুয়ারী ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, তার মধ্যে পয়লা নম্বর নালিশটিই রাজস্বনীতি সম্পর্কে :

"একথা আমার মনে হয় এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবৃত্তিকে অচল অটলভাবে অনুসরণ করার ফলেই এদেশের সর্বনাশ ঘটেছে, এবং সত্যিই যে কোন অর্থনৈতিক লাভ এতে হয় না সেকথাও অদূর ভবিষ্যতে বোঝা যাবে।"

হেস্টিংসের প্রস্তাবিত আমিনী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও তিনি একই যুক্তি উত্থাপন করে বলেন যে ঐ প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে "দেশের সমস্ত খাজনা আত্মসাৎ করা।"[২]

খাজনার হার খুব চড়া ধরে তার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাবার নীতি বর্জন করে তার বদলে স্বল্প হারে খাজনার পরিমাণ একেবারেই অপরিবর্তনীয় ভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত—এই ছিল ফ্রান্সিসের প্রস্তাব। ১৭৭৫ সালের ২৩শে নভেম্বর স্ট্র্যাচির কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে "প্রভূত পরিমাণ রাজস্ব-সংকোচই" হবে যে কোনও নতুন বন্দোবস্তের মৌলিক নীতি।[৩] কয়েক মাস পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে তিনি এই নীতিকে একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পরিণত করতে চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত যে সরাসরি মঁতাস্ক্যুর কাছে ঋণী তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ক্লেভারিং-এর কাছে এক চিঠিতে তিনি লেখেন (২২ জানুয়ারী ১৭৭৬):

"রাজস্ব সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ও সরল নীতিটি আমি মঁতাস্ক্যুর এই সূত্রের ভিত্তিতে রচনা করেছি: 'জনসাধারণ কতখানি দিতে **পারে** তা নয়, কতটা তাদের দেওয়া **উচিত**, তারই ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ স্থির করা কর্তব্য',—অর্থাৎ কতটা দিতে **পারছে** তা নয়, কতটা তারা **সর্বদাই** দিয়ে যেতে পারে তারই ভিত্তিতে।"[৪]

এক কথায় "সরকারের মূল শাসনব্যবস্থাটিকে চালু রাখার জন্য যতটুকু না হলে নয় তারই ভিত্তিতে হিসাব করে"[৫] রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা উচিত।

তাঁর নিজের হিসাব অনুযায়ী সরকারী ব্যয় কিছুতেই ৩৭,১১,৫৪৭ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়, এবং কোম্পানির রাজস্বদাবিকে তাই ঐ অঙ্কেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। (ফারমিংগার বলেছেন যে ফ্রান্সিসের এই অনুমান "মারাত্মক রকমের ভুল হিসাব", কারণ কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানির ব্যয়ের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। ১৭৮৪ সালের ১৬ই জুন ফ্রান্সিস পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করেন তাতেই প্রকাশ যে বাঙলা সরকারের বাৎসরিক ব্যয় ২২ লাখ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যদি ফ্রান্সিসের পরামর্শমতো রাজস্বের মাত্রা ঐভাবে তখন বেঁধে দিতেন, তাহলে পরবর্তী কালে যুদ্ধবিগ্রহের খরচ জোগাড় করা তাদের পক্ষে সত্যই অসম্ভব হত বোধহয়।)

রাজস্ব-হ্রাসের প্রসঙ্গেও ফিলিপ ফ্রান্সিস মোগল আমলের নজির টেনে নিজের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। মঁতাস্ক্যু বলেছিলেন যে মুসলমানেরা বিজিত দেশের রাজস্বের হার ও পরিমাণ অনড়ভাবে বেঁধে দিত বলেই তাদের শাসন এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছিল। ২২শে জানুয়ারী ১৭৭৬ তারিখের পরিকল্পনায় ফ্রান্সিস এই মত উল্লেখ করে বলেন: "মুসলমান বিজেতারা সুপরিমিত রাজস্ব আদায় করতেন, এবং আদায়ের ব্যবস্থার মধ্যেও কোনও জটিলতা ছিল না; এই কারণে তারা অতি সহজেই আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য কায়েম রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

করের বদলে খাজনা

রাজস্বের হার সুনির্দিষ্টভাবে বাঁধা না থাকলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ভয় থাকে, তাই ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেছিলেন। এই একই ধারণার সূত্র ধরে তিনি জমির উপর সমস্ত কর রদ করে শুধু খাজনাকেই একমাত্র প্রাপ্য বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব করেন। এবিষয়েও তার মত প্রাকৃতধনবাদী তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আঁসিয়ে রেজিমের যুগে ফ্রান্সের কৃষকদের বেগার খাটানো হত জমিদারদের স্বার্থে, এবং দিম্ (dime), তাই (taille) ইত্যাদি নানাবিধ কর চাপিয়ে তাদের শোষণ করা হত। এই প্রকার কর কৃষিস্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রাকৃতধনবাদীরা প্রস্তাব করেছিলেন যে এইসব হানিকর আদায় বন্ধ

করে দিয়ে মোট প্রাপ্যটা শতকরা হিসাবে খাজনার সঙ্গে যোগ করা হোক, অর্থাৎ করভার কৃষকদের উপর থেকে তুলে নিয়ে জমির স্বত্বাধিকারীদের উপর ন্যস্ত করা হোক, যাতে মৌল উৎপাদকেরা নির্বিঘ্নে তাদের কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে পারে।[৬] এদিক থেকে প্রাকৃতধনবাদীরা রিকারডোর মতামতেরই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন বলা যায়। কৃষকদের দিয়ে রাস্তা বাঁধার কাজে বেগার খাটানোর (Corvee) প্রথা তুর্গো নিজেই রহিত করেছিলেন, এবং তাঁরই মন্ত্রিত্বকালে প্রাক্তন সব কর তুলে দিয়ে জমির খাজনার উপর একটা একক মাশুল (impot unique) প্রবর্তনের চেষ্টা হয়।

প্রাকৃতধনবাদীদের মতো ফিলিপ ফ্রান্সিসও মনে করতেন যে জমির উপর এই প্রকার কর চাপালে সাধারণভাবে জিনিসের দর ও তারই সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার ব্যয় বেড়ে যায়, কারণ কৃষিজ পণ্যের দরকে ভিত্তি করেই অকৃষিজ পণ্যাদির দর স্থির করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল পরিকল্পনাটিতে তিনি তাই সবরকম আবওয়াব ও মাথটের উচ্ছেদ করার প্রস্তাব করেন। ১৭৭৬ সালের ২২শে জানুয়ারীর বিবৃতিটির নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"দেশের লোক এত গরিব হয়ে পড়েছে এবং আগের তুলনায় এত কম জমিতে এখন চাষের কাজ হয় যে স্বভাবতই বাকি যেটুকু জমিতে চাষের কাজ চালু থাকে তার উপরে করের ভার ক্রমেই বেড়ে যায় ; ফলে, অনিবার্যভাবে উৎপন্ন জিনিসের দর, জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দর এবং শিল্পের জন্য আবশ্যক কাঁচামালের দর বৃদ্ধি পায়।... একথা তো সবাই জানে যে সোনারূপা এদেশে যখন যথেষ্ট ছিল, তার চেয়ে শিল্পজ পণ্য ও অন্যান্য সব জিনিসের দাম আজকাল অনেক বেশি। অথচ সাধারণ অবস্থায় ঠিক এর উল্টোটাই হওয়া উচিত। বাঙলা দেশে তা হয় না, কারণ সরকারী আদায়ের চাপ এত বেশি যে কৃষকেরা বাধ্য হয় তাদের উৎপন্ন বস্তুর দাম বাড়াতে, শিল্পীদেরও বাড়িয়ে চলতে হয় তাদের শ্রমজ পণ্যের মূল্য, এবং তাদের মান অনুযায়ী অন্যান্য শ্রেণীর জীবিকার ব্যয় নির্ধারিত হয়ে থাকে।"

ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসঙ্গে

ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ে ফ্রান্সিসের ধারণা তাঁর কৃষিতত্ত্বের সঙ্গেই একান্তভাবে যুক্ত। কারণ প্রাকৃতধনবাদীদের মতো তিনিও মনে করতেন যে কৃষি ও বাণিজ্য পরস্পরের পরিপূরক এবং দুটি মিলিয়েই সামগ্রিক অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার পরিকল্পনা হয়। লাট কাউন্সিলে পেশ-করা তাঁর অনেক বিবৃতিতে ও তাঁর চিঠিপত্রে—বিশেষত লর্ড নর্থের কাছে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৭৭ তারিখের চিঠিতে—এই বিষয়ে তাঁর মতামতের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ফ্রান্সিসের বক্তব্য যে সুবিদিত নয় তার একমাত্র কারণ প্রচলিত ঐতিহাসিক রচনার একদেশদর্শিতা; ফ্রান্সিসের ভাবাদর্শের উৎসকে বাস্তবভাবে বিশ্লেষণ না করে এই সব রচনায় ১৭৭৬ সালের কৃষিবিষয়ক পরিকল্পনাটিকে তাঁর সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাকৃতধনবাদীরা উৎপাদন-ব্যবস্থায় শিল্পের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করতেন না, তাঁদের মতে শিল্প শুধু কৃষিজ মূল্যগুলিকে রূপান্তরিত করার একটা প্রক্রিয়া মাত্র। সুতরাং, 'রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটি নির্বিঘ্নে ও ন্যূনতম ব্যয়ে সম্পন্ন করা উচিত; শুধু অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যেই তা সম্ভব হতে পারে, কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সেই অবস্থায় একান্তভাবে নিজের মতো করে চলে।"[৭] অবাধ প্রতিযোগিতার এই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চাই—প্রথমত, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে কৃষিজ পণ্যের চলাচলকে সবরকম ঘাট-তোলা, পথ-তোলা বা অন্যান্য নিষেধক আদায়ের আপদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা; দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার—বিশেষত সরকারী বা সরকার-সমর্থিত একচেটিয়া ব্যবসায়-স্বার্থকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার-দরের সমীকরণ; তৃতীয়ত, দেশ থেকে কৃষিজ পণ্য রপ্তানির স্বাধীনতা ও দেশের বাজারে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য করার অনর্গল অধিকার প্রদান।[৮] কৃষির স্বার্থে ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাকৃতধনবাদীরা এই যে তিনটি শর্ত নির্দেশ করেছিলেন, ফিলিপ ফ্রান্সিস তার প্রত্যেকটিকেই বাঙলা দেশের অর্থনীতিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন।

শুল্কনীতি

কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শুল্কব্যবস্থাকে ফ্রান্সিস বাঙলা দেশের কৃষি, শিল্প ও বহির্বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিকর সরকারী হস্তক্ষেপ বলে মনে করতেন। তিনি তাই প্রস্তাব করেন যে সবরকম আভ্যন্তরীণ শুল্কের উচ্ছেদ করে ভূসম্পত্তির উপর একটিমাত্র কর বসিয়ে খাজনার সঙ্গে মিলিয়ে আদায় করা হোক। শুল্কঘরগুলিকেও (কাস্টম হাউস) তিনি এই অন্যায় শুল্কনীতিরই প্রতীক বলে মনে করতেন, এবং তাঁর মতে এগুলিকে হয় একেবারেই তুলে দেওয়া, কিংবা অন্তত একেবারে নতুন করে সংগঠন করা উচিত। তিনি বলেন: "জমিই এদেশের অর্থের ভাণ্ডার। আর কোন কিছুরই উপর তাই কর বসানো উচিত নয়। শুল্কঘর একটিও রাখার দরকার নাই"। (বিবৃতি, ডিসেম্বর ১৭৭৬)। ১৭ই সেপটেম্বর ১৭৭৭ তারিখের চিঠিতে তিনি লর্ড নর্থকে লিখেছিলেন: "শিল্পে ব্যবহার্য সামান্য কিছু কাঁচামাল ও ইউরোপীয়ানদের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি কিছু নিত্যব্যবহার্য জিনিস ছাড়া যে-দেশ বাইরে থেকে কিছুই **কেনে না**, অথচ সারা দুনিয়ারই কাছে যারা শুধু পণ্য **বিক্রি** করে, এই (শুল্কঘর) গুলি থাকার ফলে তার বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে। এতদ্দেশীয়দের শিল্পের সব শাখা-প্রশাখাই আভ্যন্তরীণ শুল্কের ফলে অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে থাকে।"

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রান্সিস যে প্রস্তাব করেন তাতে প্রাকৃত-ধনবাদী প্রত্যয়ের ছাপ নির্ভুল চেনা যায়। উক্ত চিঠিতেই তিনি লিখেছিলেন:

> "এই সব প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ শুল্কঘরগুলির) মারফত যে রাজস্বটুকু আদায় হয়, সরকারের পক্ষে হয় তার কোনও মূল্যই নাই—বিশেষত যখন তার ফলে জনসাধারণ উৎপীড়িত হয় ও বহির্বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটে, কিংবা সরকারের পক্ষে সেটুকুরও যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে সেই টাকাটা সরাসরি জমি থেকে তুলে নিলে অসুবিধা কম হয়।"

শেষ কথা কটি যে প্রাকৃতধনবাদীদের "একক মাশুল" প্রস্তাবেরই প্রতিধ্বনি তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। এতে লাভ কি হবে?

ফ্রান্সিসের মতেঃ "এই ব্যবস্থায় ভূস্বামীরা কার্যত রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণীর উপর কর বসিয়ে রাজকোষে একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জোগান দিতে পারে; মোট পরিমাণে বেশি হলেও যাদের কাছ থেকে সেই টাকাটা তোলা হবে তাদের পক্ষে তা দেওয়া যেমন সহজ হবে, আদায়ও তেমনি সহজসাধ্য হবে; এর চেয়ে সহজতর আর কোনও উপায় হতে পারে না।" (বিবৃতি, ডিসেম্বর ১৭৭৬)। এক কথায় অর্থনীতিবিদ্যায় তাঁর ফরাসী মন্ত্রগুরুদের মতো ফ্রান্সিসও যেন বিশ্বাস করতেন যে জমির খাজনাতেই যেহেতু বাড়তি মূল্যের একমাত্র প্রকাশ, তাই অন্যবিধ আয়ের উপর কর বসালে তার চাপটা শেষ পর্যন্ত ভূসম্পত্তির উপরেই পড়ে, এবং সেটা অপ্রত্যক্ষ চাপ বলে তাতে অর্থনৈতিক হানি ঘটে, উৎপাদন ব্যাহত হয়। সুতরাং, আদায়ী করের পরিমাণটা খাজনার সঙ্গে মিলিয়ে ধার্য করাই উচিত, তাহলে আর শিল্পে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ থাকে না।[৯]

কোম্পানির মনোপলি

প্রাকৃতধনবাদীদের "লেসে ফেয়ার লেসেজালে" পলিসি এরই সঙ্গে যুক্ত; কার্যত এই নীতির অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের এবং রাষ্ট্রায়ত্ত একাধিকারের পরিবর্তে বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার প্রবর্তন। কারণ, শুধু অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যেই শিল্পের পক্ষে কৃষিজ মূল্যগুলিকে সহজে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতধনবাদী যুগে অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ প্রতিযোগিতা তখনও আডাম স্মিথের আমলের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করেনি। অবাধ বাণিজ্য বলতে তাঁরা শুধু বুঝতেন কৃষিজ পণ্যের ব্যবসায়ে অব্যাহত অধিকার। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ অর্থে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের দাবি যে প্রাকৃতধনবাদী অর্থনৈতিক আদর্শের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেকথা মনে না রাখলে ভুল হবে। অবাধ প্রতিযোগিতার সঙ্গে প্রাকৃতধনবাদের যোগ একান্তই আকস্মিক বলে দেখানো হয়েছে বলে মার্কস তৎকালীন কোন কোন লেখকের সমালোচনা করেছিলেন।[১০]

জমিতে ব্যক্তিস্বত্ব ও অবাধ বাণিজ্যের অধিকার এই দুটি ধারণা ফিলিপ ফ্রান্সিসের চিন্তায় প্রথম থেকেই এবং পাশাপাশি বর্তমান ছিল। কারণ তাঁর

কাছে এই দুটি পরস্পরের পরিপূরক। তাই কোম্পানির রাজস্ব সংকটের সমাধানের জন্য তিনি সংকীর্ণ অর্থে কৃষিসংস্কারের কথাই বলেননি, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক স্বাধীনতার কথাও উত্থাপন করেছেন। চিরস্থায়ী পরিকল্পনার মূল প্রস্তাবটি পেশ করার প্রায় দুমাস আগেই তিনি লর্ড নর্থকে লিখেছিলেন, "সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা ও অবাধ বাণিজ্যই এই ত্রুটি মোচনের ধ্রুব উপায়।"[১১]

ফ্রান্সিস স্পষ্টই বলেছিলেন যে বাঙলাদেশের অন্তর্বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একাধিকার এদেশের বাণিজ্যিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। ১৭ই সেপটেম্বর ১৭৭৭ তারিখে লর্ড নর্থকে তিনি যে সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন তাতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। চিঠিখানি তিনি পুস্তিকা আকারে প্রকাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১২] তাই মনে হয় যে এই প্রসঙ্গটিকে তিনি ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যের অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মনে করতেন।

এই চিঠিতে ফ্রান্সিস অভিযোগ করেছেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের রাজশক্তির অপব্যবহার করে "নিজ ব্যবসায় স্বার্থে এদেশের পণ্য ও শ্রমশক্তির উপর একচেটিয়া দখল কায়েম করেছে।" কোম্পানির কর্মচারীদের অনেকেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই এবিষয়ে কোনও সংস্কারের চেষ্টা হলেই তারা প্রতিবাদ জানাবে। "কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির একাধিকার থেকে এত রকম সুবিধা পেয়ে থাকে যে সরাসরি বাণিজ্যিক স্বাধীনতা কায়েম করে সাধারণভাবে অন্য সকলকেই তাতে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেবার ইচ্ছা তাদের মোটেই নাই।" বাঙলার বাণিজ্যে একাধিকারের কুফল এই চিঠিতে ফিলিপ ফ্রান্সিস যে-ভাষায় বর্ণনা করেন তা বোল্‌ট্‌সের স্পষ্টবাদিতার কথাই মনে করিয়ে দেয়:

> "কোম্পানির বড়কর্তারা, রাজস্ব-কর্মচারীরা ও বানিয়ারা রাজধানী থেকে দূরে মফস্বলে বসে কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থের নামে স্বৈরক্ষমতা ব্যবহার করে এদেশের বাজার দখল করেছে, সমস্ত প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ করে তারা দেশী কারিকরদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, এবং এভাবে যেসব পণ্য তাদের হস্তগত হয় সেগুলি তারা অনেক চড়া দরে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের খরিদ করতে বাধ্য করছে; সরকারী চালানের জন্য

দরকার এই অজুহাতে কোথাও কোথাও তারা একেবারে তাঁতের উপরেই কোম্পানির সীলমোহর বসিয়ে দিয়ে আসছে।”

এই সমস্যার সমাধান হিসাবে তিনি দুটি প্রস্তাব করেন। প্রথমত, বাঙলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠা করা হোক, মানে কোম্পানি রাজশক্তির সাহায্য ছাড়াই কেবলমাত্র টাকার জোরে (by the superior weight of its purse) সেই প্রতিযোগিতায় নামে, এবং শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা যাতে দেশী ব্যবসায়ীদের চেয়ে কোনরকম অতিরিক্ত সুবিধার ভাগী না হয়। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির চালানী পণ্য জোগানের (investment) জন্য খোলা টেণ্ডারে কোনরকম বৈষম্য না রেখে সমস্ত দেশী ব্যবসায়ীকেই কন্‌ট্রাক্ট নেবার সুযোগ দেওয়া হোক। তাঁর মতে “এর ফলে কলকাতায় বিক্রেতাদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা গড়ে উঠবে তা কোম্পানির পক্ষেই লাভের হবে, আবার প্রতিটি আড়ত-এ খরিদ্দারের মধ্যে যে-প্রতিযোগিতা হবে তাতে লাভ কারিকরদেরই।”

অবাধ বাণিজ্যের প্রশস্তি

বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রান্সিস কোম্পানির প্রচলিত নীতির সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতার তুলনা করেন। এই অনুচ্ছেদটি আডাম স্মিথের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্যের একটি চমৎকার নমুনা ঃ

> “সরকারী তহবিল থেকে টাকা অগ্রিম দিয়েই [কোম্পানির জন্য] পণ্য জোগানের ব্যবস্থা করা হয়।···
>
> ···ভবিষ্যৎ উৎপাদনের পরিমাণ থেকে এই টাকাটা শোধ করতে হয়, তাই কে সেই অগ্রিম দিচ্ছে, সরকার না ব্যক্তিবিশেষ, তার উপর দেশের অনেকখানি নির্ভর করে। সরকার দিলে ফল হয় এই যে বাণিজ্যের যতটা সরকারী কব্‌জায় থাকে তার থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়, নিজেদের সঙ্গতি ও পুঁজিটুকু তারা তখন আর তেমন লাভজনকভাবে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনিয়োগের সুযোগ অনেকটা নষ্ট হয়, এবং তার মালিকেরা বাধ্য হয় সঞ্চিত পুঁজি আগলে কোনমতে দিন কাটাতে।···
>
> পক্ষান্তরে, অবাধ বাণিজ্য হলে বহু লোকেই তাতে অংশ গ্রহণের সুযোগ

পায়। সাধারণ প্রতিযোগিতার সামনে পড়ে শুধু ন্যায্য উপায়ে কারবার চালানো এবং আরো বেশি বেশি মেহনত করাই তখন তাদের পক্ষে সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়; তাদের সম্পদ তাই তখন নানা ছোট ছোট খাতে বয়ে দেশের দূরদূরান্ত কোণ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে এবং সবচেয়ে নিচের তলার মানুষকেও শ্রমে উৎসাহিত করতে সমর্থ হয়।"

এই অবাধ বাণিজ্য তত্ত্বের যুক্তিযুক্ত পরিণতি আভ্যন্তরীণ বাজারে দেশীয় ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়াই শুধু নয়, বিদেশী বণিকদেরও অবাধে স্বাগতম জানানো। ভ্যুলেসে´ বলেছেন যে অতিরিক্ত কড়াকড়ির দ্বারা ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা থেকে বিদেশী উৎপাদকদের বঞ্চিত রেখে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ করার নীতি প্রাকৃতধনবাদীরা আদৌ সমর্থন করতেন না। ফ্রান্সিসেরই সেই মত; তিনি বলতেন যে অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে যদি বিদেশীদেরও টানা যায় তাতে দেশীয় শিল্পেরই লাভ: "বিদেশীদের বাণিজ্য করার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে দরজা যদি একেবারেই অনর্গল খুলে দেওয়া হয়, তাতে দেশীয় উৎপাদনই গরিষ্ঠ মূল্য অর্জনের সুযোগ পাবে।" (বিবৃতি, ডিসেম্বর ১৭৭৬)। এবিষয়েও তিনি মোগল আমলের নজির টেনে বলেন যে সে-আমলেও নাকি বাদশাহেরা বিদেশীদের অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ দিতেন, "নইলে তাঁরা আমদানি-রপ্তানির উপর থেকে শুল্ক তুলে নিয়ে প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতিকেই তাঁদের বন্দরগুলিতে সহজে যাতায়াতের সুযোগ দিতেন কেন।" (ঐ)

[ক্রমশ

(১) সোবুল: "লা রেভোলুসিয় ফ্রঁসেজ (১৭৮৯-১৭৯৯)" ৩১ ॥ (২) ফ্রা-পা, ৩৬ নং ॥ (৩) ঐ, ৪৯ নং ॥ (৪) ঐ ॥ (৫) ২২ জানুয়ারী ১৭৭৬ তারিখের বিবৃতি; ফ্রা-পা ৩৬নং দ্রষ্টব্য (৬) মার্ক্স: থিওরিজ অব্ সারপ্লাস ভ্যালু, ৫৩; ভ্যুলেসে´র প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য ॥ (৭) মার্ক্স: ঐ ৫৩ ॥ (৮) ভ্যুলেসে´, ঐ ॥ (৯) মার্ক্স ঐ, ৫৩ ॥ (১০) মার্ক্স: ঐ ৫৪ ॥ (১১) ফ্রা-পা, ৩৬ নং (১২) লেটার ফ্রম মিঃ ফ্রান্সিস টু লর্ড নর্থ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৭৭; অচিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলি সবই এই পুস্তিকা থেকে গৃহীত ॥

[পূর্বানুবৃত্তি]

জে. বি. প্রিস্টলির
'ইন্সপেকটর কল্‌স্‌'
অবলম্বনে

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

(প্রথম অঙ্কের শেষই দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ। ঘরের ভিতর শীলা ও অমিয়। দরজার নিকট তিনকড়িবাবু।)

তিনকড়ি। (শীলা ও অমিয়র মুখের উপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, দরজা খোলা রাখিয়া অমিয়র দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে আসিতে) তারপর, মিস্টার বোস?

শীলা। (বিকারগ্রস্তের ন্যায় হাসিয়া উঠিয়া) দেখেছ অমিয়? আমি ঠিক বলেছি—

তিনকড়ি। (শীলাকে) কিছু বলেছেন বুঝি ওঁকে? কি বলেছেন বলুন তো?

অমিয়। দেখুন তিনকড়িবাবু—মানে, আমি বলছিলাম কি, (বেশ চেষ্টা করিয়া নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া) আমি বলছিলাম কি, মিস নকে এসবের মধ্যে টেনে আনাটা আর উচিত হবে না।

আপনাকে ওঁর যা বলবার ছিল, তা তো উনি বলেই দিয়েছেন। আজ সারাদিন ওঁর ঘোরাঘুরিও বড় কম হয় নি। তার ওপর সন্ধেবেলা আজ এখানে একটা পার্টি গোছের ছিল। এর চেয়ে বেশি স্ট্রেন্ ওঁর নার্ভে সইবে বলে আমার তো মনে হয় না। আর আপনিও তো দেখছেন—মানে ধরুন যদি—

শীলা। (হাসিয়া) মানে, উনি বলছেন আমি যদি অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাই—

তিনকড়ি। হবেন বলে মনে হচ্ছে নাকি ?

শীলা। ঠিক বলতে পারছি না। হলেও হতে পারি !

তিনকড়ি। তাহলে আপনি যেতে পারেন। আমার আর আপনাকে কোনো প্রয়োজন নেই।

শীলা। কিন্তু আপনার এন্‌কোয়ারি তো এখনও শেষ হয় নি ?

তিনকড়ি। না।

শীলা। (অমিয়কে) দেখেছ, আমি বলেছিলাম। (তিনকড়িকে) কিন্তু তাহলে তো আমি যাব না—আমি এখানেই থাকব।

অমিয়। কিন্তু কেন ? এসব unpleasant ব্যাপারের মধ্যে থেকে লাভটা কি ?

তিনকড়ি। ও, আপনিও তাহলে এই কথাই বলেন ? মেয়েদের এসব unpleasant ব্যাপার থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই ভালো ?

অমিয়। যদি সম্ভব হয় নিশ্চয় ভালো।

তিনকড়ি। আমরা সবাই কিন্তু একটি মেয়েকে জানি—যাকে খুবই unpleasant কতকগুলো ব্যাপার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি।

অমিয়। এটা বোধহয় আমার পাওনা ছিল, কি বলেন তিনকড়িবাবু ?

শীলা। কিন্তু সাবধান অমিয়—এর পরের পাওনাটা হয়তো আর সহ্য করতে পারবে না।

অমিয়। কিন্তু শীলা—আমি বলছিলাম—এখানে থেকে সত্যিই তোমার কোনো লাভ হবে না। এখন তো খারাপ লাগছেই—পরে আরও খারাপ লাগবে।

শীলা। কিন্তু যা হয়েছে—তার থেকে আর খারাপ কি হবে? বরং এখানে থাকলে হয়তো একটু ভালো হলেও হতে পারে।

অমিয়। (তিক্ত স্বরে) ও বুঝেছি—

শীলা। কি বুঝলে?

অমিয়। তোমার নিজের এন্‌কোয়ারি হয়ে গেছে, এখন তুমি দেখতে চাও আমার অবস্থাটা কি হয়!

শীলা। (তিক্ত স্বরে) ও, আমার সম্বন্ধে তাহলে তোমার এই ধারণা! যাক —ভালোই হল—সময় থাকতে জানিয়ে দিয়ে ভালোই করলে।

অমিয়। না না, আমি ওকথা মীন করি নি—

শীলা। (বাধা দিয়ে) মীন করো নি মানে? নিশ্চয় মীন করেছ! যদি তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসতে, তাহলে বলতে পারতে ওকথা? কথ্‌খনো বলতে পারতে না! বেশ একটা মজার গল্প শুনেছ—শুনেছ যে আমি একটা মেয়ের চাকরি খেয়েছি! এখন আমাকে কত কি বলে মনে হবে! মনে হবে আমি একটা ইতর—আমি একটা ছোটলোক—আমি একটা স্বার্থপর!

অমিয়। কথ্‌খনো না, ওসব কথা আমার মনেই হয় নি।

শীলা। নিশ্চয় হয়েছিল! তাই যদি না হবে, তবে কেন ওকথা বললে? আমার হয়ে গেছে বলে আমি তোমার অবস্থা দেখে মজা পাব?

অমিয়। বেশ ভালো কথা! I am sorry!

শীলা। হ্যাঁ সরি ঠিকই—কিন্তু ঐ সরি পর্যন্তই। আমার কথা তুমি মোটেই বিশ্বাস করো নি—

তিনকড়ি। (গম্ভীর স্বরে) মিস সেন! (শীলাকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া, অমিয়কে) আমি আপনাকে বলতে পারি কেন উনি এখানে থাকতে চেয়েছেন—আর কেনই বা উনি বললেন, এখানে থাকলে হয়তো ওঁর মনটা একটু ভালো হলেও হতে পারে। একটি মেয়ে আজ একটু আগে মারা গেছে। সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে—কারো এতটুকু ক্ষতি সে কোনোদিন করে নি। কিন্তু তবু তাকে মরতে হল যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে। ঘেন্নায়, লজ্জায় নিজেকে শেষ করে দিতে হল।

শীলা। (কাতর স্বরে) দোহাই আপনার — আর বলবেন না। আমি এমনিতেই ভুলতে পারছি না!

তিনকড়ি। (শীলার কথা গ্রাহ্য না করিয়া) কিন্তু একটু আগে—মিস সেন জানতে পেরেছেন, এই আত্মহত্যার খানিকটা দায়িত্ব তাঁর ওপরও গিয়ে পড়েছে। এখন যদি তিনি এঘরে না থাকেন, যদি আমার এন্‌কোয়ারির বাকিটা না শোনেন, তাহলে তাঁর মনে হবে হয়তো সমস্ত দোষটা তাঁরই। এ শুধু আজ বলে নয়—দিনের পর দিন যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন—ততদিন এই দায়িত্বের গুরুভার তাঁকেই বয়ে বেড়াতে হবে।

শীলা। (ব্যাকুল স্বরে) হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন! আমি জানি দোষ আমারও আছে—কিন্তু তাই বলে সবটা নয়! মেয়েটির আত্মহত্যার জন্যে আমিও দায়ী। কিন্তু দায়িত্বটা কি শুধু আমার একারই? কথখনো না—এ আমি বিশ্বাস করি না!

তিনকড়ি। (দুজনকেই কঠোরভাবে) এখন বুঝতে পারছেন—'আমি একা' বলে কিছু নেই—আমরা সবাই সবায়ের ভাগীদার? ভাগ করার যদি কিছুও না থাকে, তাহলে অন্তত অপরাধের দায়-দায়িত্বটাও ভাগ করে নিতে হয়!

শীলা। (একদৃষ্টিতে সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টরকে দেখিতে দেখিতে) হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কিন্তু দেখুন—আমি আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—

তিনকড়ি। অকারণ আমাকেই বা বুঝতে যাবেন কেন? (তিনকড়ি বাবুর শান্ত দৃষ্টি গিয়া পড়িল শীলার মুখের উপর। শীলার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময় ও সন্দেহ। ঠিক এমন সময় রমা সেনের প্রবেশ। তাঁহার মুখে চোখে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। যে ঘটনা এখানে ঘটিতেছে তাহার পটভূমিকায় তাঁহাকে যে একেবারেই মানাইতেছে না ইহা বুঝিতে শীলার বিশেষ দেরি হইল না।)

রমা। (মুখে হাসি ফুটাইয়া) ও, আপনিই এসেছেন থানা থেকে? নমস্কার।

তিনকড়ি। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ। পদ্মপুকুর থানা থেকে আসছি—নাম তিনকড়ি হালদার—সাব-ইন্‌স্‌পেকটর।

রমা। দেখুন তিনকড়িবাবু—আমার স্বামী—মানে মিস্টার সেনের কাছ থেকে আমি সব ব্যাপারটা শুনলাম। অবিশ্যি আপনাকে সাহায্য করতে

পারলে আমি নিশ্চয়ই করতুম—কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বরবার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

শীলা। (শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে) মা!

রমা। (অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছেন এইরূপ ভান করিয়া) কি রে, কি হল?

শীলা। (ইতস্তত করিতে করিতে) না—মানে—

রমা। মানে? মানে কিসের।

শীলা। মানে আর কি? একেবারে গোড়াতেই তুমি ভুল করছ কিনা তাই বলছি! শেষকালে হুমদাম করে কোথায় কি বলে বসবে—পরে যখন হুঁশ হবে, তখন দেখবে আর হায় হায় করেও কোনো কূল পাচ্ছ না!

রমা। (শীলাকে) কি সব আবোল-তাবোল বকছিস বল তো?

শীলা। আমরাও ঠিক ঐ ভুলটাই করেছিলাম মা। ভেবেছিলাম, কোথায় কি হল না হল তাতে আমাদের কি! কিন্তু যেই উনি মুখ খুললেন—সব বদলে গেল!

রমা। (তিনকড়িবাবুকে) আপনি দেখছি আমার মেয়ের মনে বেশ একটা ছাপ রেখে দিয়েছেন!

তিনকড়ি। ওটা কিন্তু আপনার মেয়ে বলে নয়—ঐ বয়সী প্রায় মেয়েদের বেলাই হয়। ওঁদের তো ছাপ নেবারই বয়স। (দেখা গেল, তিনকড়ি বাবুর ও মিসেস সেনের দৃষ্টি পরস্পরের মুখের উপর নিবদ্ধ কিন্তু সে বোধ-হয় এক মুহূর্তের জন্য।)

রমা। (শীলাকে) আচ্ছা, এখন এসব আবোলতাবোল কথা ছেড়ে শুতে যা দেখি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে—

শীলা। না মা, তা হয় না। একটু আগে তিনকড়িবাবুও আমাকে এঘর থেকে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি যাইনি। কেন মেয়েটিকে মরতে হল তা আমায় জানতেই হবে। না জেনে, এঘর থেকে যাওয়া আমার হতেই পারে না!

রমা। আশ্চর্য! এই বাজে কৌতূহলের কোনো মানে হয়!

শীলা। না মা, এটা মোটেই বাজে কৌতূহল নয়—

রমা। মুখের ওপর চোপা করিস না শীলা! আমি বলছি, তোর এঘরে থাকার কোনো মানেই হয় না! আর তাছাড়া, মেয়েটা কেন অ্যাসিড খেয়েছে, তা আমরা কি করে জানব? ওসব মেয়েদের আবার—

শীলা। (বাধা দিয়া) তুমি কি কিছুতেই শুনবে না মা? কেন তুমি এইসব কথাবার্তা বলছ?

রমা। (বিরক্ত হইয়া) কি সব কথাবার্তা বলছি? দেখ শীলা—!

শীলা। তুমি ভাবছ—আমরা আলাদা আর মেয়েটি আলাদা। কিন্তু তা হচ্ছে না মা! তোমার ও দেয়ালের আড়াল বেশিক্ষণ থাকছে না! তিনকড়িবাবুর একটি কথায় এক্ষুনি চুরমার হয়ে যাবে!

রমা। কি বলছিস তুই? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। (তিনকড়ি বাবুকে) আপনি পারছেন?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ—উনি ঠিক কথাই বলেছেন।

রমা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তার মানে?

তিনকড়ি। মানে—আমি ওঁর কথা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। উনি ঠিক কথাই বলেছেন।

রমা। দেখুন—যদি কিছু মনে না করেন—আপনার কথাবার্তার ধরনটা আমার কিন্তু একটু বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছে। (শীলা হাসিয়া উঠিলে) হেসে উঠলি যে বড়—হাসির কথাটা কি হল শুনি?

শীলা। কি জানি মা তোমার ঐ বেয়াড়া কথাটা বড় বেখাপ্পা শোনাল—তাই হেসে ফেললুম—

রমা। অবিশ্যি উনি যদি কিছু মনে করেন—তাহলে—

তিনকড়ি। (শান্ত কণ্ঠস্বরে) আজ্ঞে না। মনে করাটা আমার ডিউটির বাইরে।

রমা। অবিশ্যি মনে করার কথা আমাদেরই।

তিনকড়ি। দেখুন—ও মনে করা-করির ব্যাপারটা বাদ দিলে হয় না?

অমিয়। আমিও তাই বলি—

রমা। না—মানে—

শীলা। থাক না মা ও কথা—

রমা। আচ্ছা কথা হচ্ছে ওঁতে আমাতে—তোরা কেন কথা বলছিস বল

তো? দেখুন, আপনি বললেন, আপনি এখানে এসেছেন একটা এন্‌কোয়ারি করতে। কিন্তু যা শুনলাম, আর যা দেখছি—তাতে আপনার এন্‌কোয়ারির ধরনটা খুবই বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছে। আপনি বোধহয় আমার স্বামীকে—মানে—মিস্টার সেনকে খুব ভালো করে জানেন না। এমনিতে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি তো যথেষ্ট আছেই, তার ওপর আবার হয়তো দু-পাঁচ মাসের মধ্যে মিনিস্টার-টিনিস্টারও হয়ে যেতে পারেন—অন্তত এম এল. এ. যে হবেন, তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই! আর রমেশ—রমেশকে তো জানেনই—সে আবার আমাদের—ভাগনে—

শীলা। (শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে) কি পাগলের মতো যা তা বকছ মা! দোহাই তোমার, একটু চুপ করো—

তিনকড়ি। (মিসেস সেনকে) আপনি যা যা বললেন—সবই আমি জানি। এখন মিস্টার সেনকে যদি একটু খবর পাঠান, তাহলে বড় ভালো হয়।

রমা। তিনি এক্ষুনি আসছেন। আমার ছেলে—মানে তাপস—মানে—

(থামিয়া গেলেন)

তিনকড়ি। হ্যাঁ বলুন—কি হয়েছে তাঁর?

রমা। না, মানে হয় নি কিছু—সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে—তার ওপর সন্ধেবেলায় বাড়িতে একটা ছোটখাট পার্টি গোছের ছিল, তাই—

তিনকড়ি। (বাধা দিয়া) আচ্ছা—তাপসবাবু মদ খান তো?

রমা। মদ? তাপস? কি বলছেন আপনি? ঐটুকু বাচ্চা ছেলে মদ খাবে কি?

তিনকড়ি। আজ্ঞে না, বাচ্চা তো নয়। বছর পঁচিশেক বয়স হবে। ও বয়সের অনেক ছেলেকে আমি বোতল-বোতল মদ খেতে দেখেছি!

শীলা। ছোড়দা তাদেরই মধ্যে একজন তিনকড়িবাবু।

রমা। শীলা!

শীলা। আচ্ছা মা, এ না জানার ভান করে লাভটা কি? এটা কি তোমার মিসেস তলাপাত্রর বাড়ির পার্টি—যে রেখে-ঢেকে কথা বলছ? এখানে যত ঢাকবে, বিপদ তত বাড়বে। আর একটু পরেই হয়তো দেখবে ছোড়দা এমন জালে জড়িয়ে আছে যার বিন্দু-বিসর্গও আমরা কেউ জানি না। (তিনকড়িকে) না তিনকড়িবাবু—ছোড়দা আজ বছর ছয়েক

ধরে ড্রিঙ্ক করছে আর বেশ রীতিমতো ভাবেই করছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে এক-একদিন রাতে বেশ মাতাল হয়েই বাড়ি ফেরে। আমি দরজা খুলে দিই-কিনা।

রমা। কখ্খনো না—মিথ্যে কথা! আচ্ছা তুমিই বলো অমিয়—তাপস মদ খায়?

অমিয়। দেখুন সত্যি কথা বলতে কি—আমার চোখে বড় একটা পড়ে নি। তবে বাইরে যা শুনি—তাতে তো মনে হয় আজকাল ড্রিঙ্কের মাত্রাটা খুবই বাড়িয়েছে।

রমা। (তিক্ত স্বরে) এ কথাটা কি এখানে না বললে চলত না বাবা?

শীলা। না মা, না বললে সত্যিই চলত না! এ কথাটা বলার এইটাই তো ঠিক সময়! এইজন্যেই তো তোমাকে বলেছিলাম, দেয়াল তোলবার চেষ্টা কোরো না—ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—

রমা। কিন্তু চুরমারটা তো উনি করছেন না—সেটা তো করছিস তুই!

শীলা। হ্যাঁ। কিন্তু বুঝতে পারছ না—উনি তো এখনও আরম্ভই করেন নি!

রমা। (নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া) আরম্ভ করলে হবেটা কি শুনি? করুন না ওঁর যা জিজ্ঞেস করবার আছে—আমি তো তৈরি হয়েই আছি। আর কি জিজ্ঞেসটা করবেন উনি আমাকে? আমি জানি কিছু যে বলব?

তিনকড়ি। (গম্ভীরভাবে) হয়তো কিছু জানেন। তার হিসেবটা আপনার টার্ন এলেই নেব।

রমা। (বিস্মিত ও হতভম্ব অবস্থায়) ও তাই নাকি—(মিস্টার সেন প্রবেশ করিয়া দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিলেন।)

চন্দ্রমাধব। (কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস) তাপসটাকে পঞ্চাশবার বললাম শুতে যা, কিছুতে গেল না! বলে, আপনি নাকি তাকে জেগে থাকতে বলেছেন?

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দ্রমাধব। কারণটা জানতে পারি কি?

তিনকড়ি। নিশ্চয় পারেন। তাঁকে আমার দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।

চন্দ্রমাধব। তাপসকেও আপনার কথা জিজ্ঞেস করবার আছে? আশ্চর্য। আমার তো মাথাতেই আসছে না, তাপসের সঙ্গে আপনার কি কথা থাকতে পারে।

তিনকড়ি। আপনার মাথাতে তো আসবে না। জিজ্ঞেস করব তো আমি।

চন্দ্রমাধব। (গরম স্বরে) তাহলে দয়া করে সেটা এখন করে নিন—করে ছেলেটাকে ছেড়ে দিন।

তিনকড়ি। কিন্তু এখন তো নয়। I am sorry—তাঁকে ওয়েট করতে হবে।

চন্দ্রমাধব। দেখুন তিনকড়িবাবু—

তিনকড়ি। আমি তো বলে দিয়েছি—তাঁর টার্ন না এলে নয়।

শীলা। (মিসেস সেনকে) দেখলে তো মা?

রমা। না, আমি কিচ্ছু দেখি নি! তুই থামবি!

চন্দ্রমাধব। দেখুন তিনকড়িবাবু, আমি আগেও আপনাকে বলেছি, এখনও বলছি, কি আপনার কথাবার্তা, কি আপনার এন্‌কোয়ারি, কোনোটাই আমার পছন্দ নয়। আমি এতক্ষণ আপনাকে চান্স দিয়েছি কিন্তু আর নয়।

শীলা। (কিছুটা অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় হাসিয়া উঠিয়া) তুমি ভুল করলে বাবা, চান্স তো উনিই আমাদের দিচ্ছেন! আমাদের লজ্জা পাবার কোনো চান্সই তো কোনোদিন ছিল না—সেটা তো উনিই করে দিচ্ছেন!

চন্দ্রমাধব। শীলার কি হয়েছে বলো তো?

রমা। হবে আবার কি? মাথা গরমের ধাত! ও তো বরাবরই ঐরকম কোথাও একটু কিছু শুনল তো মেয়ের একেবারে ধাত ছেড়ে গেল। বলছি তখন থেকে—ওরে শুতে যা, তো কে কার কথা শোনে! (হঠাৎ তিনকড়িবাবুর দিকে ফিরিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে) আপনি চুপ করে শুনছেন কি? বলুন, আপনার কি জানবার আছে?

তিনকড়ি। (গম্ভীরভাবে এতটুকু বিচলিত না হইয়া) গেল বছর জানুয়ারির শেষে এই সন্ধ্যা চক্রবর্তীর আবার চাকরি যায়। কেন? না, মিস সেন নিজের ওপর একটু বিরক্ত হয়েছিলেন বলে। এর পরেও এধার ওধার চাকরির চেষ্টা সে করেছিল কিন্তু পায় নি। তখন ঠিক করলে নামটা

বদলে একটু রকমফের করে দেখবে। (হঠাৎ অমিয়র দিকে ফিরিয়া) সন্ধ্যা চক্রবর্তী নাম বদলে হল—

অমিয়। (ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল) ঝরনা রায়। (শীলা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, অমিয়র থতমত অবস্থা।)

তিনকড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন বলুন তো মিস্টার বোস এই ঝরনা রায়ের সঙ্গে কবে আপনার প্রথম দেখা হয়েছিল ?

অমিয়। (নিজেকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিয়া) না মানে—

শীলা। মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই অমিয়—

অমিয়। বেশ তাহলে শুনুন। ঝরনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় গেল বছর মার্চ মাসে প্যালেস ম্যাসেজ ক্লিনিকে—মানে পার্ক স্ট্রীটের ঐ ম্যাসেজ ক্লিনিকটা---

শীলা। ওটা যে পার্ক স্ট্রীটে, শ্যামবাজারে নয় তা বোধহয় উনি জানেন অমিয়—

অমিয়। থ্যাঙ্ক্‌স্ শীলা। (হঠাৎ চটিয়া উঠিল) আচ্ছা শীলা, তোমার যা বলার ছিল, তা তো বলা হয়ে গেছে। এখন এখানে থেকে লাভটা কি ? এসব কথা তোমার খুব ভালোও লাগবে না—

শীলা। ভালো না লাগলেও আমাকে এখানে থাকতে হবে অমিয়।

অমিয়। (অসহিষ্ণু হইয়া) কিন্তু কেন ?

শীলা। বাঃ, খুব কাজ ছিল বলে, গেল বছর মে-জুন-জুলাই তুমি একেবারে এদিক মাড়াও নি ! এরপর যখন এ রকম হবে, তখন অন্তত বুঝব তোমার একটা কাজ আছে, আর সেকাজটাও যে কিরকম তারও একটা আন্দাজ পাব।

[ক্রমশ

মুহূর্ত

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুটি ?

নাঃ, দুটো অনার্স ক্লাস এখনো।

হেসে ফেলল অমল ঃ তাহলে ?

পুষ্পও ঠোঁট টিপে জবাব দিল ঃ তাই তো ভাবছি !

আচ্ছা ? আপনি না বলতেন জীবন মন-নির্ভর ? অর্থাৎ কিনা, মনের ওপর তাবত বস্তুর ভালো-মন্দ নির্ভর করে ?

বলতুম না, এখনো বলি !

ঠিক তাই, অমল গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল ঃ এ ব্যাপারে আমিও আজ আপনার সঙ্গে একমত। ওসব সমাজ, অর্থনীতি নিতান্তই ছেঁদো কথা, মোদ্দা ঘটনা হল মন।

কি ব্যাপার বলুন তো ? পুষ্পর ঠোঁটের কোণ আর চোখের তারায় হাসির জোনাকি জ্বলে উঠল ঃ এত ভণিতা যে, আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসছে ?

আরে না না। আপনি মিছে ভয় পাচ্ছেন আজ্ঞে। সব সময় কি আপনার ভাববাদ আর আমার জড়বাদের লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে বাতচিত করতে হবে নাকি ?

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে পুষ্প বলল ঃ সে তো ঠিকই। তারপর ?

মানে, টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে দাগ কেটে কেটে অমল বলল ঃ আপনি একজন ভালো ছাত্রী। আপনার আত্মীয়-পরিজন এবং বন্ধু-পরিচিত—সকলেই আশা করেন, রেজাল্ট আপনি ভালো করবেন।

হুঁ।

এটা আপনার পবিত্র কর্তব্যও। বক্তৃতার ঢঙে হঠাৎ গলা তুলে অমল ঘোষণা করল ঃ সর্বতোভাবে নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত করাই আপনার দায়িত্ব।

হুঁ।

এখন দেখা দিল সমস্যা। যেহেতু মনের ওপর সবকিছু নির্ভর করেছে, সেহেতু আপনার প্রথম কাজ হল ঐ মন ভদ্রমহিলার দিকে নজর রাখা।

কোনো সন্দেহ নেই।

আর, এ-ও একটা ঘটনা যে মনের ওপর জোর চলে না।

বটেই তো।

সুতরাং, এই মুহূর্তে আপনার দ্বন্দ্বটা হল মনের সঙ্গে মননের। মন চাইছে এখন আমার সঙ্গে বেরোতে, মনন বলছে—না, ক্লাস করো।

দু হাতের দশটা আঙুল জোড়া লাগিয়ে তার ওপর থুতনিটা রেখে মনোযোগী ছাত্রীর মতো পুষ্প অমলের কথা শুনছিল। অমল থামতেই উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠল সে। বলল ঃ ধন্য আপনার প্রতিভা। আমার মনস্তত্ত্বটা এমন নিখুঁত কায়দায় বুঝলেন কি করে? বলুন না, কি করে?

বলতে নেই, ট্রেড সিক্রেট। অমল তখনও গাম্ভীর্য বজায় রেখেছে ঃ কিন্তু এবার একটু রামকেষ্ট হওয়া যাক। অর্থাৎ কিনা নীর থেকে ক্ষীর আহরণের—

হুঁ। আমিও তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ যেন লজ্জায় কৃষ্ণচূড়া হয়ে উঠে পুষ্প তাড়াতাড়ি বলল ঃ তাছাড়া, যা গরম পড়েছে আর মাথা ধরেছে। এখন দু দুটো ক্লাস—তায় আবার ঘোষাল এবং মিস দত্তের। কিছু তো মাথায় ঢুকবেই না, বরং জোর খাটাবার জন্যে গোটা সাবজেক্টটার ওপরই না বেচারা মন বিদ্রোহ করে বসে।

আরে সর্বনাশ। একেবারে বিদ্রোহ? চলুন চলুন, তাহলে এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক। এটা গড়ার যুগ, এখন ওসব অকারণ বিদ্রোহ একেবারে সেক্‌টেরিয়ান চিন্তা।

হুঁ। তাছাড়া আমি আবার বাইরের জোরেও বিশ্বাসী নই।

জয় হোক মহাত্মার!

আবার? পুষ্প হাসল ঃ সুযোগ পেয়েই বুঝি—যান, এগোন। আমি মঞ্জুকে খাতাটা দিয়ে আসছি।

একটা স্টপেজে ট্রাম-বাস দুইই থামে। লাইটপোস্টের ছায়ায় ফুটপাতের ওপর পুষ্প দাঁড়িয়ে। অমল কোমরের কাছে ডান হাতের কব্জিটা বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে নির্দিষ্ট একটা এলাকার মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। পুষ্প অন্যমনস্ক চোখে তার ছায়াটার দিকে তাকিয়ে। কখনো সেটা হাল্কা, কখনো গাঢ়, কখনো লম্বা, কখনো বা ছোট্ট হয়ে চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় একরাশ ধুলো উড়িয়ে ঝকঝকে ডবল-ডেকারটা ছুটে এল। অমল চলতি বাসেই লাফিয়ে উঠে পড়ল। একটু পরে উঠল পুষ্প। তলায় মেয়েদের বসবার একটা আসন খালি। অমল বলল ঃ নিচেই বসুন। আমি একটু দোতলায় আরাম লুটে নি। রিয়েলি, ডবলডেকার সরকারের এক অক্ষয় কীর্তি।

পুষ্প ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইশারা করল। ফিসফিস করে বলল ঃ পথে-ঘাটে এত মুক্তো ছড়াতে নেই। লোকে বলবে কি?

সত্যিই কেউ-কেউ কান পেতে দুজনের আলাপ-উপভোগ করছে বুঝে অমল লজ্জিত পায়ে দোতলায় উঠে বসল। তারপর মাত্র কয়েক মিনিটের মেয়াদ। কলেজ স্ট্রীটের মোড়। দুটো নীল টিকিট দাঁতের আগা দিয়ে কাটতে কাটতে অমল নিচে নেমে এল। তার আগেই পুষ্প এসে ফুটপাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। হকারদের কাগজের পশরা ছড়ানো। আর, অন্য কয়েক-জন দোকানীর কিছু টুকিটাকি জিনিস।

পুষ্প বলল ঃ আপনি টিকিট করেছেন নাকি?

হুঁ, কেন?

আমিও করলাম যে!

আপনি করতে গেলেন কেন? আমি যে করলাম!

বাঃ রে, অন্যদিন ওপরে ওঠার সময় বলে যান, টিকিট করব। আজ কিছু বললেন না, তাই—

যাক যাক, রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি হোক। অমল দাঁত দিয়ে তলাকার ঠোঁট টিপে হাসল : তবে কিনা, আমরা নিতান্তই অভাজন—দু আনা পয়সা, ইত্যাদি।

কোথায় যাবেন?

অমল দুটো হাত একবার মাথার চুলে বুলিয়ে নিল। একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল : কিছু দরকারী কথা ছিল। কফি হাউসে—না থাক। ও তো আবার আপনার সতীত্বে বাধে।

বাজে কথা বলবেন না। এত লোকের মধ্যে আলাদা হয়ে বসতে কার না লজ্জা হয়?

আর্যে, কফি হাউসের গুণকীর্তন করার কোনো স্পৃহা আপাতত আমার নেই। আসল ঘটনাটা হল, ওখানে একটা টেব্‌ল্ দখল করে যতক্ষণ ইচ্ছে আপনি বসতে পারেন, কেউ তাতে বাদ সাধবে না। কিছু না খেলেও ক্ষতি নেই। গলা শুকোবার সময় হলে অমূল্য আপনিই গেলাসে ভরে জল দিয়ে যাবে। আর এদিকে ওয়াই, এম, সি, এ,-তে কেবিনের অধিকার রাখার জন্যে একঘণ্টা অন্তর এক রাউণ্ড করে চা অর্ডার দিতে হবে। ওয়েটারকে না-হোক দু আনা বখশিস না দিলে ইজ্জত থাকবে না। আরও কত কি?

কেন? আমাদের আদি ও অকৃত্রিম জ্ঞানবাবু কি দোষ করলেন?

কিছুমাত্র না। তবে, রোজ রোজ ওখানে যেতে আজকাল কেমন লজ্জা করে। ম্যানেজারবাবু আমাদের এমনভাবে চিনে ফেলেছেন—

লজ্জায়, গৌরবে অপরূপ হয়ে পুষ্প বলল : তা হোক। ওখানেই চলুন।

অবিশ্যি ঐতিহাসিক জায়গা। জানেন, জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান আগে ছিল উল্টো ফুটে, এখন যেখানে অভিজাত দিলখুসা—প্রায় সেইখানে। সে যুগে স্বয়ং বিদ্যেসাগর মশাই নাকি এই চায়ের দোকানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আর এখনকার যে দোকান—সে তো কল্লোল থেকে এপর্যন্ত বিস্তর কবি সাহিত্যিকের চারণভূমি।

তাহলে তো আর দ্বিধা নয়, চলুন।

অপ্রশস্ত দোকানঘরের গা দিয়ে ওপরে উঠবার লালচে সিঁড়ি। মোট

তিনটে কেবিন। কেমন একটা ছন্নছাড়া ঘরোয়া আস্তানাগোছের ভাব।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছোট্ট একটা পরিসরে টেবিল-চেয়ার নিয়ে বড় ম্যানেজারের রাজত্বি। একটা কাঠের বাক্স, বিল বই আর পেনসিল, মদের গেলাসের আকারে রঙ-ওঠা পেতলের পাত্রে ভাজা মশলা। ছুজনকে দেখে প্রৌঢ় ম্যানেজার একটু হাসলেন। অমল বলল ঃ

ছুটো চা, একটা কড়া করে। কিছুক্ষণ বসব কিন্তু ম্যানেজারবাবু।

বসবেন বৈ কি! আপনাদের জন্যেই তো দোতলায় দোকান তুললুম।

এক কথা! দোতলার বন্দোবস্ত হবার পর অমল যতদিন এ দোকানে পুষ্পকে নিয়ে এসেছে, ততদিনই আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছে সে, কিছুক্ষণ বসবে তারা। ম্যানেজারবাবুও এক উত্তর দিয়েছেন। তবুও কেমন যেন লজ্জা করে। এতক্ষণ পাখা ঘোরে, অথচ চা আর কালেভদ্রে মাংসের সিঙাড়া ছাড়া তাদের বিলে অন্য কিছু তাঁকে কোনোদিনই লিখতে হয় নি।

হাত বাড়িয়ে পাখা খুলে দিলেন ভদ্রলোক, আলো জেলে দিয়ে হাঁকলেন ঃ মদন, চা ছুটো—একটা কড়া। জল ছু গ্লাস।

ধপাস করে পুষ্প বসে পড়ল। চশমাটা খুলে রাখল টেবিলের ওপর। ফাইল, খাতা আর বইগুলো রাখল পাশের চেয়ারে। মুখোমুখি আসন নিল অমল। ও-ও ছাত্র। তবে বইপত্রের বালাই নেই।

ছুজনেই মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। মদন জল ভরে গ্লাস এনে রাখল টেবিলের ওপর। শব্দে চমকে উঠে অমল তাকাল পুষ্পের দিকে, পুষ্প চোখ রাখল অমলের মুখে। তারপর হেসে উঠল ছুজনেই।

কি ভাবছেন ?

ভাবছি ? লাজুক মুখে আবার অমল ঘাড় নাবাল। তারপর বাঁ হাতের কন্নুইটা টেবিলে ঠেকিয়ে চেটোর ওপর গাল পেতে বাঁ দিকে অল্প ঝুঁকে চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বসে বলল ঃ পুষ্প, জীবনটা সত্যিই আশ্চর্য, সত্যিই আশ্চর্য !

পৃথিবীর আদিমতম কণ্ঠে যেন প্রথম গান স্থর হয়ে ঝরে পড়ল। পুষ্প স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অমলের দিকে।

জানেন ? ছেলেবেলা থেকে কাব্যি করি। মনে ভারী একটা অহংকার ছিল—জীবনের অন্তত কিছুটা আমি বুঝেছি। বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে তর্কও

করেছি কম না। কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পারছি কি ভয়ানক বোকা ছিলাম।

একটা কথা বলব? গাঢ় স্বরে পুষ্প বাধা দিল: এমন করে ভাবছেন কেন? আপনিই না বলতেন জীবন হল নতুন অবস্থাবিন্যাসের ভেতর নতুনতর বিকাশ? বর্তমান বাস্তব মহত্ত্বের। কিন্তু তাই বলে অতীত তো আর সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যে ছিল না!

অমল একমুহূর্ত পুষ্পর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল: তা ঠিক। হাসল: পুষ্প, আপনি আমাকে প্রতিদিন অবাক করছেন কিন্তু।

কেন?

বুঝতে পারছেন না?

পারছি। পুষ্পও হাসল: কিন্তু ভুলে যাবেন না আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে আমার হিন্দুদর্শনের কোনো অমিল নেই।

বটে? আপনি না বলেন সত্য এক এবং অপরিবর্তনীয়?

বলিই তো। নিছক অভিজ্ঞতা বা লৌকিক বাস্তবতা তো আর অখণ্ড সত্য নয়। তাই, তার পরিবর্তনে সত্যেরও পরিবর্তন সূচিত হয় না। রঙ বা সৌরভ একটা গোলাপফুলের সত্য নয়, বুঝলেন?

কিন্তু আর্যে, সত্যের স্বরূপটা কি সোনার পাথরবাটি।

আজ্ঞে না। সত্য আমি অর্থাৎ আমার আত্মা—আমার মধ্যেকার ক্রিয়েটিভ ফোর্স—যার বিনাশ নেই। হাসছেন তো? দোষ আমারই। মহাজনবাক্য অগ্রাহ্য করে বেনা বনে মুক্তো ছড়াচ্ছি। তবে বুঝবেন একদিন!

দেখা যাক। অমল গম্ভীর হয়ে হাসল: আমার পথ যদি ঠিক থাকে, আমার মত যদি বিজ্ঞান আর ইতিহাসসম্মত হয়—তবে আমি জানি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একদিন আমার পক্ষে পাব। এ তো কিছু আর জোরের কথা নয়! আপনি পড়ুন, আলোচনা করুন, দেখুন। তারপর বোঝা যাবে কে ঠিক।

পড়ছি তো। ছুটিতে আপনার সেইগুলো শেষ করলাম। এখনও কিন্তু কন্‌ভিন্‌স্‌ড্ নই। তবে, এ ব্যাপারে আমিও কোনো জোর খাটাচ্ছি না। মনের সায় পেলে আপনার পথই স্বীকার করব।

তা আমি জানি পুষ্প। অমল গভীর হয়ে বলল : আমি জানি।

চা এল। অমল আলতো একটা চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল : দেখেছ কাণ্ড? আজও চিনি বেশি। ম্যানেজারবাবু, একটু লিকার লাগবে যে।

আপনি কিন্তু বড্ড কড়া চা খান। মাত্রাও বেশি।

কে বলল? আজকাল বারো থেকে চোদ্দ কাপে নেমেছি।

একটুখানি চুপ করে থেকে পুষ্প আস্তে আস্তে মাথা তুলল : খুব অন্যায়। অল্প থেমে আবার বলল : অন্যায় না?

সাধারণ নিয়মে। কিন্তু সব কিছুরই তো ব্যতিক্রম আছে।

হ্যাঁ। হেসে উঠল পুষ্প : সেইটেই তো শেষ সান্ত্বনা।

ছুটিতে কেমন ছিলেন?

এই একরকম। মায়ের অসুখ, কাজকর্মের চাপ বেশি। কলেজের পড়াশুনো একদম হয় নি। পরীক্ষাও তো এসে গেল।

হ্যাঁ। রেজাল্ট কিন্তু ভালো করা চাই।

চেষ্টায় থাকব। তবে জানেনই তো—যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। আপনার পড়াশুনো কিছু হল নাকি?

আমার? অমল হেসে উঠল : বুঝতেই পারছেন।

এইবার কিন্তু একটু একটু পড়াশুনো করা উচিত। দিনে ঘণ্টাখানেক পড়লেই তো আপনি অনার্সে ভালো করতে পারেন।

হ্যাঁ, লোকে তাই বলে বটে। আমার অবিশ্যি নিজের ওপর আস্থাও নেই, অনাস্থাও নেই।

পার্সেন্টেজের কি হবে?

ও হয়ে যাবে এখন।

এবার ক্লাস-টাস করুন? আর ক দিনই বা বাকি?

আর বলেন কেন? অমল নড়েচড়ে বসল : আজ তো ঠিকই করেছিলাম এবার থেকে নিয়মিত ক্লাস করব। মাঝখান থেকে খুড়ো দিলেন মেজাজ নষ্ট করে।

কিরকম?

উপেনবাবুর ক্লাস ছিল। অপরাধের মধ্যে আমি লাস্ট বেঞ্চে বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। ভদ্রলোক একগাল হেসে

বললেনঃ অমল, আমার সৌভাগ্য যে তুমি বছরের শেষে হলেও ক্লাসে এসেছ। কিন্তু পড়াটা যদি শুনতে, তাহলে আরও খুশি হতুম। ছেলে মেয়ে সকলে মুখ টিপেটিপে হাসতে লাগল। আমার তো প্রেস্টিজ টাইট।

সকলেই আপনাকে জানে, লজ্জা পাবার কিছু নেই। আর এতই যদি— পড়াটা শুনলেই হয়।

হুঁ। রবি ঠাকুরকে একজন পড়াবার নামে হত্যা করছেন—এ প্রলাপ শোনার থেকে আমার নিজের ভাবনায় মশগুল থাকাটা কিছু কম মহত্ত্ব নয়।

বটে? কি এমন রাজভাবনা শুনি?

ওই তো? অমল হাসির ফানুস উড়িয়ে বলল ঃ আমাদের উপমা প্রয়োগে এমন ভুল হয়। বড় কিছু বোঝাতে গেলেই আমরা রাজারাজড়াদের না টেনে পারি নে। রাজভাবনা হতে যাবে কোন দুঃখে; মানুষ-ভাবনা, অর্থাৎ কিনা মানুষকে নিয়ে ভাবনা।

আহা! পুষ্প ঠোঁট টিপে হাসল ঃ এই একটা মাথায় দুনিয়ার মানুষের ভাবনা—সইবে কেন? চা বলি আর এক কাপ?

ঠাট্টা করছেন? মানুষের ভাবনার কিন্তু দুটো বিভাগ আছে—একটা সাধারণ, অন্যটা ব্যক্তিগত। রূপ কখনো সাবজেক্টিভ, কখনো অবজেক্টিভ।

তবু ভালো। আপনার তখনকার ভাবনাটা কি ছিল—ব্যক্তিগত না নৈর্ব্যক্তিক। আর কি বলে যেন—সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ।

পুষ্পর নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক প্রশ্নই কিন্তু অমলকে অসহায় করে দিল। কি ভাবছিল সে? শুধু তখন কেন, আজকাল অনেকখানি সময় জুড়ে কি ভাবে সে, একথা অমল বলতে চায়, পুষ্পকে বলা দরকারও, কিন্তু পারে না। এইখানেই তো যত যন্ত্রণা!

মুহূর্তের মধ্যে তার মনের সমুদ্রে তরঙ্গ খেলে গেল। ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের সংঘাত, ফেনা, রামধনু!

মফস্বল থেকে আই, এ, পাশ করে পুষ্প ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে এই কলেজে এসে ভর্তি হল। প্রেসিডেন্সি থেকে বিতাড়িত হয়ে অমলও বাঙলা পড়তে একই কলেজের খাতায় নাম লেখাল। তারপর দেড়বছর কেটে গেছে। পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্র কিভাবে অন্তরঙ্গতার গভীর বন্ধনে দুজনকে

মালার মতো বেঁধেছে সে এক ইতিহাস। আজ ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে। সেকথা কেউ কাউকে বলে নি। বিশ্ব দুনিয়ার সমস্ত সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন ওরা তর্ক করেছে, ঝগড়া করেছে, আলোচনা করেছে। কিন্তু প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে নয়। তবু দুজনে দুজনার কাছে ধরা পড়ে গেছে। এমনকি ধরা পড়েছে কলেজের আরও অনেকের কাছে। মুখে কোনো কথা না বললেও বন্ধুজনের এই পরিহাস তাদের যতখানি অস্বস্তি দিয়েছে, গৌরব দান করেছে তার থেকে অনেক বেশি।

কিন্তু। তবু যেন কোথায় একটা ব্যবধান থেকে গেছে। অমল ভেবেছে, আশ্চর্য হয়েছে, অথচ বুঝতে পারে নি। কি-এক গোপন ব্যথায় নিজের মনেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে। কিন্তু যন্ত্রণার কোনো স্পষ্ট চেহারা চোখে না পড়ায় পুষ্পকে বলতেও পারে নি কিছু। দিন কেটেছে। তারপর অনেক, অনেক দেরিতে তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে কাঁটাটা কি, কোথায়।

মাসখানেক ছুটি ছিল। পুষ্পর চিঠিতেই এবার আসল রোগটা ধরা পড়ল। মুখের কথায় কখনো যা অস্বাভাবিক ঠেকে নি, কাগজের হরফে তাই আজ অমলকে খোঁচা দিল। অবিশ্যি, শহরতলির সেই বিশেষ ডাকঘরের ছাপমারা এনভেলাপ যে সে এই প্রথম পেল, তা-ও নয়। তবু হঠাৎ যেন তার নতুন উপলব্ধি হল। কেন, সেকথাও অমলের কাছে স্পষ্ট নয়।

নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, আজও কেন তারা পরস্পরকে আপনি বলে ডাকে, কেন তুমির সহজ স্বর তাদের মধ্যে বাজল না?

অনেক ভেবেও যখন উত্তর খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন মনকে সে বোঝাল—ক্ষতি কি। এই তো বেশ। কেন হঠাৎ দুনিয়ার চলতি ছক মেনে আপনি থেকে তুমিতে লাফ দেবে তারা?

কিন্তু, তবু তো শান্তি পাওয়া গেল না। তবু তো যন্ত্রণার শেষ নেই। বরং মন যেন উল্টো কথা শুনলেই খুশি হয়। শেষে অনেক বিশ্লেষণের পর তার মনে হল অসাধারণত্বের ছদ্ম-আবরণে আসলে এ তাদের দুর্বলতা, সংকোচ। সিদ্ধান্ত নিল, আর নয়। কলেজ খুললেই ঘটনাটা সরল করে নিতে হবে।

অথচ সরল করার পদ্ধতিটা যত সহজ হবে ভেবেছিল, কার্যত তা হল না। দর্শন আর রাজনীতির হরেক সমস্যা নিয়ে প্রচুর বক্তৃতা দেওয়া

যায়। কিন্তু কি করে একথা পুষ্পকে বলবে সে? যদি হেসে ওঠে? আর নাটকীয়ভাবে হঠাৎ তুমি বলেই বা কথা বলা যায় কি করে? সে তো রীতিমত ভাল্‌গার দেখাবে।

কলেজে প্রথম দেখা হওয়ার সময় অমল ভেবেছিল আপনা থেকেই তার ডাকে তুমি বেরিয়ে আসবে। এল না। অনার্স লাইব্রেরিতে বসে যখন দুজনে মিলে ক্লাস ফাঁকি দেবার সিদ্ধান্ত নিল—তখন জিভের ওপর অমল জোর খাটাতে চেয়েছিল। পারে নি। বাসে বসে নিজের অহেতুক লজ্জা আর সংকোচকে ধিক্কার দিয়েছে সে। তবু জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকানে এসেও সহজ হওয়া গেল না। যা সত্য, যা সুন্দর—তাকে সহজতর করার পথে মধ্যবিত্ত মনের অনেকগুলো লজ্জা, সংকোচ, কুণ্ঠা আর আত্মাভিমান প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল।

চা যে আপনার জল হয়ে গেল।

অমল সচকিত হল। এক চুমুকে আধকাপ চা শেষ করে জামার হাতায় মুখ মুছল সে। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। কেমন একটা লজ্জা করছে পুষ্পর দিকে তাকাতে। জানতে ইচ্ছে হয় ছুটির কদিন পুষ্প কি ভেবেছে। কি ভাবছে আজকাল। তার মনেও কি নতুন প্রশ্ন, নতুন যন্ত্রণা রক্তজবার মতো পাপড়ি মেলে নি?

কি হয়েছে আপনার? ব্যথিত চোখে তাকিয়ে পুষ্প বলল: এত কি ভাবছেন চুপচাপ বসে? কথা বলুন, দেখা হল কতদিন পরে।

কথা? অমল হাসল। যেন বৈশাখের আধশুকনো ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি মেলল বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে। গেলাসের জলে কাপের অবশিষ্ট চাটুকু ঢেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ তুলে একটা বাদামী রঙ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখায় রেখায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

জানেন? অমল আবার হাসল: জীবনের রঙ কিন্তু এত সহজে পাল্টায় না। আজ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলুম। প্রিন্সিপালের সাধের টেনিস লনে আমগাছের শুকনো পাতা এক-একটা দমকা হাওয়ায় ঝরে ঝরে পড়ছে। মরশুমী ফুলের পাপড়িতেও আসন্ন বৈশাখের ছাপ। প্রকৃতির

রাজ্যে ঋতুপরিবর্তন কেমন নিয়ম মেনে চলে। আমাদের জীবনে নিয়মকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে হয়। এইখানেই মানুষের জিত।

কিন্তু—একটু থেমে, যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে পুষ্প বলল: জানেন; মানুষ অনেক নিয়ম গড়তে চায়, পারে না। পারা উচিত, তবু পারে না। আজকাল প্রায়ই আমার একথা মনে হয়। আর আপনার ভাষায় একেই বোধহয় বলে জীবনের যন্ত্রণা।

চমকে উঠল অমল। পুষ্প একথা বলছে কেন? অমল কি ধরা পড়ে গেল, না পুষ্প নিজেও কিছু বোঝাতে চায়? কিন্তু না, না। লজ্জা আর আনন্দের এই যন্ত্রণাক্ত মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে পারছে না, পারবে না।

তাই তাড়াতাড়ি অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হঠাৎ বলে বসল অমল: আর এক রাউণ্ড চা খেলে মন্দ হত না।

পুষ্প হাসল: হুঁ, আপনার চা তো জল হয়ে গেছিল।

অমল চিৎকার করে বলল: ম্যানেজারবাবু, দু কাপ চা—একটা কড়া: আচ্ছা, এতক্ষণ বসে আছেন—একটাও সিগারেট খেলেন না তো?

অমল লজ্জা পেল। একটু ইতস্তত করে বলল: তেমন একটা ইচ্ছে নেই আর কি।

সুখবর। এতবার চা না খেয়ে অন্য কিছু খেলেও তো পারেন।

হুঁ। তাতে স্বাস্থ্যসঞ্চয় হয় বটে।

আপনি তো বেজায় বস্তুবাদী, স্বাস্থ্যটা বুঝি ভাবরাজ্যের আওতায় পড়ে?

আজ্ঞে না। আমার জীবনের কনট্রাডিক্‌শন্‌টা ওইখানে। তবে আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠব।

পুষ্প ঠোঁট টিপে হেসে প্রশ্ন করল: চেষ্টা আছে?

থাকা তো উচিত।

তা জিগ্‌গেস করা হয় নি।

বাদ দিন তো? অমল দোলনার মতো চেয়ারটা পেছন দিকে হেলিয়ে বসে বলল: স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের তত্ত্বকথা কি এমন সন্ধেয় ভালো লাগে?

পুষ্পও একটু সতর্ক হল: সন্ধে হয়েছে নাকি?

হওয়া উচিত।

আজ কটার ট্রেন ধরব? ছটা চল্লিশ?

সত্যি, এতটা পথ। অমল লজ্জিত হল : আপনার খুব অসুবিধে হয় তো ?

বাড়ি গিয়ে রান্না করতে হবে যে। নইলে আর অসুবিধে কি ? তাছাড়া অনেকদিন বাদে কলেজ খুলল। বাড়ির লোকজনও আজ একটু দেরিতে ফেরার বাড়তি সুযোগ দিতে আপত্তি করবেন না।

অমল হেসে ফেলল : বাড়তি সুযোগটা নিয়মিত অধিকারে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

সত্যি। পুষ্প কুণ্ঠায় অপরূপ হয়ে বলল : আপনার জন্যেই তো।

তা বটে ! যত দোষ নন্দ ঘোষ।

থাক, আর ঝগড়া করতে হবে না। কি দরকারী কথা বলবেন বলছিলেন ? এইবার শুরু না করলে ছটা চল্লিশও ধরা যাবে না। তারপর আপনিই আবার দেরি করার জন্য আমাকে শাসন করবেন।

অমল সোজা হয়ে বসল। চশমাটা চোখ থেকে খুলে জামা দিয়ে কাচ দুটো ঘষে নিল ভালো করে। কেমন যেন সব দাগ পড়েছে। সন্ধে হলে মাথা ধরে। পাওয়ার বাড়ল নাকি আবার ?

বলুন ?

মনের সঙ্গে শেষবারের মতো কুস্তি করে অমল মুখ খুলল : ইয়ে, দেখুন ? পরীক্ষা তো এসে গেছে। আপনার ভারতীর কাছ থেকে আমায় পরীক্ষার সিলেবাস আর কিছু নোট জোগাড় করে দিন।

মিথ্যে, মিথ্যে। এ কি বলছে সে ? মেঝেতে চটিশুদ্ধু ডান পাটা ঠুকল অমল। আজও হল না। হেরে গেল সে। এই কি তার দরকারী কথা ? এই প্রয়োজনটুকু শোনাবার জন্যই কি পুষ্পকে আটকে রেখেছে এতক্ষণ ?

পুষ্প কিন্তু বেজায় খুশি। দেয়ালীর প্রদীপের মতো জ্বলে উঠে বসল : আমার অসীম সৌভাগ্য, আপনি ডেকে আমাকে পড়ার কথা বলছেন ?

না, দেখুন। অমল অসহায় হয়ে বলল : ক্লাস করি নি, বইপত্তরও নেই। অনার্সটা তো দিতে হবে।

নিশ্চয়ই। গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে পুষ্প বলল : আপনার ওপর আপনার অধ্যাপক, বন্ধু, আত্মীয়—সকলের কত আশা। আপনি তো উপেনবাবুর নিন্দে করছিলেন। পরিমল বললেন সেদিন নাকি ওঁদের ত্রিযামা ক্লাসে স্যার আপনার কথা বলে আফসোস করেছেন।

হুঁ। অমল হাসল: আফসোস অনেকেই করেছেন, অনেককেই করতে হবে। আজীবন।

পুষ্পও হাসল: অনেকে আফসোস করে মুক্তি পায় জানেন তো?

হ্যাঁ, জানি। বাদার, দেখে থাকি।

উঃ, কি আমার দ্রষ্টা রে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

আজ্ঞে না স্যার। আসল কথা তো দিব্বি উবে গেল। তাহলে নোট আমি এনে দিচ্ছি, আপনি পড়ছেন—কেমন?

হ্যাঁ, চলুন ওঠা যাক।

চলুন।

কেবিনের বাইরে বেরোতেই বোঝা গেল সন্ধে হয়েছে। ম্যানেজারবাবু তাড়াতাড়ি বিল আর মশলার গ্লাস এগিয়ে দিলেন। চারকাপ চা, ছ আনা।

পুষ্প, ব্যাগ খুলুন। আজ আমি নিঃস্ব।

পুষ্প হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে পয়সা বের করে দেখল সম্বল আছে সোয়া চার আনা।

অমল আর একবার সাড়ে তিনটে পকেট হাতড়ে দেখল। ফলে কয়েকটা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের টিকিট আর একটা ফুটো পয়সা আবিষ্কৃত হল।

অমল মুখ তুলতে পারছে না। পুষ্প ঘাড় নাবিয়েছে। প্রৌঢ় ম্যানেজার হেসে বললেন: কি অমলবাবু, পকেট থেকে পয়সা হারিয়েছেন তো? পরে দেবেন। এগুলোও রেখে দিন। বাসভাড়া লাগবে না?

হয়ে যাবে, পরে দেবোখন গোছের দু-চারটে অস্ফুট স্বগতোক্তি করে অমল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল। পেছনে পুষ্প। এমন তো হয় নি, এমন তো হয় না। রেস্তোরাঁয় ঢোকার সময় দুজনের কাছেই দু চার আনা পয়সা থাকে। কিন্তু এ কি হল আজ। আজ, যখন একমাস পরে কলেজ খুলেছে!

নিচে নেমেও প্রথমে কেউ কথা বলতে পারল না। কি একটা যেন দুজনকেই চমকে দিয়েছে।

নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে পাতা-ঝরার সুরে অমল বলল: শেয়ালদা হেঁটে যেতে হবে তো। এগিয়ে দি?

পুষ্প ঘাড় নাড়ল।

আরো কয়েক পা এগিয়ে অমল বলল: দুবার করে বাসের টিকিট না কাটলেই হত।

থমকে দাঁড়াল পুষ্প। তারপর অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য সুরে হেসে বলল: আজ এইজন্যেই বুঝি তোমার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল না?

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

॥ ৫ ॥

বৌদ্ধ-ভারতের মানচিত্রটি মনে রাখা প্রয়োজন। হিমালয়ের কোলে ভারতের উত্তরপুব অঞ্চল: তার দক্ষিণে কলিঙ্গ, উত্তরে কুরু ও পঞ্চাল; পুবে অঙ্গ, পশ্চিমে অবন্তী। প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে মোটের উপর এই এলাকাটিরই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

আধুনিক মানচিত্রের বাঙলার পশ্চিমে, গঙ্গার দক্ষিণে, আধুনিক বিহারের যে-দক্ষিণাংশ তাই ছিল সেকালের মগধ। পালি ভাষায় তার রাজধানীর নাম রাজগহ, সংস্কৃতে রাজগৃহ—আধুনিক রাজগির। প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রধানতম এলাকা বলতে এই মগধই। তার পুবে অঙ্গ, প্রধান নগরের নাম চম্পা। উত্তরে, গঙ্গার ওপারে বজ্জি, তাদের প্রধান নগরের নাম বেশালি, সংস্কৃতে বৈশালী। আরো উত্তরে মল্ল। মগধের পশ্চিমে কাশী, প্রধান নগরের নাম বারাণসী। কাশীর উত্তরে কোশল, রাজধানী শ্রাবস্তী। কোশলের উত্তরে শাক্য, পুবে কোলিয়।

ডক্টর ই. জে. টমাস মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এই মগধ, অঙ্গ, বজ্জি, মল্ল, কাশী, কোশল, শাক্য ও কোলিয় নামগুলি মোটেই স্থানবাচক নয়। এগুলি আসলে ট্রাইব্-বাচক। এবং এই ট্রাইবগুলির মধ্যে তখন একমাত্র মগধ ও কোশলই ট্রাইবাল-সংগঠনের পর্যায় ছেড়ে (দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী) রাষ্ট্রশক্তির রূপ গ্রহণ

করেছিল। তৃতীয়ত, বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক বলতে শুধুমাত্র উপরোক্ত তালিকার মানুষগুলিরই।

কথাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ধৃত করা ভালো।

All these are tribal names, and it is misleading to use the terms Anga, Magadha, etc., as if they were names of countries. In the sixth century B. C. the Magadhas and Kosalas had developed out of tribal organizations into two rival kingdoms, the Kasis being absorbed by the Kosalas, and the Angas by the Magadhas. These are all the peoples that have any claim to be connected with the scenes of events in Buddha's life.

যদি তাই হয়, তাহলে এই পটভূমি সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন না হলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত রূপটিকে নিশ্চয়ই চেনা যাবে না। কিন্তু সচেতন হতে হলে কয়েকটি মূল প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

বৌদ্ধ-ভারতে শুধুমাত্র মগধ ও কোশল ছাড়া সবই যদি ট্রাইবাল-সমাজ হয় তাহলে প্রথম প্রশ্ন তোলা দরকার, ট্রাইব্যাল-সংগঠনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী? মগধ ও কোশল তখন যদি ট্রাইব্যাল-সমাজ পিছনে ফেলে সবে রাষ্ট্রশক্তির রূপ গ্রহণ করে থাকে তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন তোলা দরকার, ট্রাইব্যাল-সংগঠনের সঙ্গে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রভেদ ঠিক কী এবং কীভাবেই বা ট্রাইব্যাল-সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়? তৃতীয়ত, আশেপাশের ওই যে-ট্রাইবগুলির তখনো ট্রাইব্যাল-অবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল সেগুলির প্রতি উদীয়মান রাষ্ট্রনায়কদের মনোভাবটা কী রকম; এবং গৌতম বুদ্ধের মনোভাবটাই বা কী রকম ছিল।

দুঃখের বিষয় ডক্টর টমাস—তথা রিস্-ডেভিড্স্, ওল্ডেনবার্গ, ফিক্-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদরাও—এই প্রশ্নগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ভূমিকা আজো আমাদের কাছে অনেকাংশে অস্পষ্ট হয়ে থেকেছে।

ট্রাইব্যাল-সমাজ মানে কী?—এ প্রশ্ন বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই প্রাচীন ট্রাইবগুলির কথা আলোচনা করা যায় না। এবং প্রশ্নটিকে একবার স্বীকার করলে আর অস্বীকার করা যায় না হেন্‌রি লুইস মর্গানের আবিষ্কার। কিন্তু সে-

আবিষ্কার স্বীকার করতে হলে ব্যক্তিগত-সম্পত্তি, রাষ্ট্রশক্তি প্রভৃতির সনাতনত্ব অস্বীকার করা প্রয়োজন।* অথচ, এগুলিই হল আধুনিক সমাজের ভিত। ফলে, এই আধুনিক সমাজেরই এক অংশে—আধুনিক বিদ্বান-সমাজে মর্গানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবন্ধ! এই কারণে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই আজো আমাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত।

শুধুই যে আমাদের দেশের প্রাচীন-ইতিহাস প্রসঙ্গেই এ-বিড়ম্বনা, তাই নয়। প্রাচীন রোমের আধুনিক ইতিহাস নিয়েও অধ্যাপক জর্জ টমসনকে আক্ষেপ করতে হয়েছে :

The trouble with this school of historians is that they are trying to explain tribal institution of early Rome without raising the question of what tribal society is.

॥ ৬ ॥

প্রকৃত ট্রাইব্যাল-সমাজে ভাঙন ধরবার আগে পর্যন্ত আদিম সাম্যাবস্থা। উৎপাদন-শক্তির উন্নতির ফলে সেই সাম্যাবস্থা ভেঙে যায় এবং তারই ধ্বংস-স্তূপের উপর রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ বিশ্লেষণে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের এই সাধারণ নিয়মটি সম্বন্ধে উদাসীন হলেও বৌদ্ধ-গ্রন্থ-লেখকেরা তা ছিলেন না। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব প্রাচীন কালের ঘটনা বলেই প্রাচীন পৃথিবীর এই যুগপরিবর্তনের স্মৃতিটি হয়তো বৌদ্ধ-ঐতিহ্যে অনেকদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাবস্তু-অবদান থেকে রাজশক্তির উদয়-সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কাহিনীটি উদ্ধার

---

* কেননা, মর্গানের সিদ্ধান্তটা হল : A mere property career is not the final destiny of mankind, if progress is to be the law of the future as it has been of the past. The time which has passed away since civilization begun is but a fragment of the past duration of man's existence ; and but a fragment of the ages yet to come. The dissolution of society bids fair to become the termination of a career of which property is the end and aim ; because such a career contains the elements of self-destruction.

করেছেন, পৌরাণিক চিন্তার সংমিশ্রণ সত্ত্বেও এ-কাহিনীর মূলে ওই ঐতিহাসিক বিবর্তনটিরই আভাস পাওয়া যায়।

"যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি 'সত্ত্ব' আভাস্বর হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়।......তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন সবই ধর্ম।

"তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল—যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ।...... পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙ-ও সেইমত হইয়া গেল। এইরূপে অনেকদিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া উঠে, আর যাঁহারা অল্প আহার করেন তাঁহাদের রঙ ভাল থাকে। ভাল রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং আমি বড় তুমি ছোট এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিল। একদিন যে-ধর্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে তাঁহাদের সে-ধর্মের প্রভাব খর্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ পাইয়া গেল। তখন তাঁহারা খান কি? পৃথিবীর সর্বত্র ভুঁইপটপটি উঠিল......ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মত তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল।......ভুঁইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মতই হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান। এ-ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ।......এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত.. সঞ্চয়ের নামটিও করিত না কিন্তু ক্রমে দু'একজন ভাবিল, দু'বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক-বেলাতেই দু'বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল। বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু'বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল। ...অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল;

কতকগুলি জীবের স্ত্রী-চিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল। …ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল। …ক্রমেক্রমে অনেক দিন পর এ-দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্মসম্মত, সমাজসম্মত, সহবতসম্মত। লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে একদিন, দুইদিন একত্র বাস করিত। এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর, একত্রে বাস করিতে লাগিল। গৃহকর্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল। ক্রমে অধর্মের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

"ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান ক্ষেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্ট লোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন ক্ষেত্র ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে—এই ক্ষেত তোমার, এই ক্ষেত আমার, এই ক্ষেত রামের, এই ক্ষেত শ্যামের। এইরূপ আবার কিছুদিন চলিল।

"একজন বসিয়া ভাবিতে লাগিল ; আমার ত এই ক্ষেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কী করিয়া চলিবে ? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের ক্ষেত্রের ধানগুলি উঠাইয়া আসিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া কহিল, 'তুমি কর কি ? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ ?' 'আর এরূপ করিব না।' কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, 'তুমি ফের এই কাজ করিলে ?' সে বলিল, 'আর এরূপ হইবে না।' কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল,—'দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে, দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে। কী অন্যায়, কী অন্যায় !' এইভাবে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যা কথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

"তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল,—আইস, আমরা একজন বলবান, বুদ্ধিমান, সকলের মন যোগাইয়া চলে, এমন লোককে আমাদের ক্ষেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব।

সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে মাটিতে পড়িয়া মাটি হইয়া গেল। শেষে তাঁহাদের ক্ষেত আগলাইবার জন্য একজন ক্ষেতওয়ালার দরকার হইল। সেই ক্ষেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।"

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মহাবস্তু অবদানের এই অংশটির তুলনা নেই। এ কথা ইতিপূর্বে দাবি করা হয়েছে, মহাভারতের শান্তিপর্বেও এই স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যে প্রাক্‌-বিভক্ত সাম্য-সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাজশক্তির বা রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, সে কথা ঠিক। তবুও মহাবস্তু-অবদানের কাহিনীটির বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে অধ্যাত্মবাদের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, বরং দৃষ্টিভঙ্গিটি বস্তুবাদীই---সে বস্তুবাদ যত প্রাকৃত ও স্থূল হোক না কেন। কেননা, এই উপাখ্যান অনুসারে কৃষিকাজ, ক্ষেত-ভাগ, ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রভৃতিকেই প্রাক্‌বিভক্ত সমাজের ধ্বংস-কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এমনকি খাদ্যবৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই বর্ণবৈষম্যের ব্যাখ্যা খোঁজা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের পারিবারিক জীবনের উৎপত্তি-সংক্রান্ত যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাও উপেক্ষণীয় নয়।

অপর পক্ষে, মহাভারতাদির কাহিনী অধ্যাত্মবাদ-প্রসূত। রাজা সেখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেমন দেখাচ্ছেন, একমাত্র বৌদ্ধ ঐতিহ্যই রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে সম্মত হয় নি।

"এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত চলিতেছে। রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই মতটি অধিক দেশে চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর এ কথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্তি খ্রীঃ পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন:

গণদাসস্য তে গর্বাঃ ষড়্‌ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।

—তুমি ত দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয়ভাগের একভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর কর কি?

গৌতম-বুদ্ধও কোনোদিন রাজশক্তির প্রতি খুব বড়ো একটা সম্মান দেখান নি। অজাতশত্রুর মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষাকার বজ্জিদের বিরুদ্ধে রাজ অভিযানের জন্য গৌতমের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার পর ভিক্ষুদের ডাক দিয়ে গৌতম বলেছিলেন, বজ্জিদের ওই গণসমাজের বা ট্রাইব্যাল্ সমাজের গণবন্ধনটিকে সার্থকভাবে অনুকরণ করবার উপরই বৌদ্ধ-সঙ্ঘগুলির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল।

ক্রমশ

"আরোগ্য নিকেতন" ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন'-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে : আয়ুর্বেদ বনাম আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা। এই বিষয়ে আমরা একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে যে-আলোচনা পেয়েছি তার মধ্যে বিশেষ একটি বক্তব্য থাকায় আলোচনার জন্য তা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হল। আলোচক লেখকের বক্তব্য এবং বিষয়-ব্যাখ্যানের মধ্যে ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তা সত্ত্বেও বইটির শিল্পমূল্য কিরকম ; এখানে সে প্রশ্ন তোলা হয় নি ; যদিও খুঁটিনাটির অযথার্থতা সত্ত্বেও শিল্প-সার্থকতার বিষয়টিও সাহিত্যের পক্ষ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আশাকরি পরবর্তী আলোচকেরা এই দিকেও দৃষ্টি দেবেন এবং আলোচনাটি সম্পূর্ণ করবেন। —সম্পাদক]

"আরোগ্য নিকেতন" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। সম্প্রতি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদপটের উপর রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি ঘোষণার স্লিপ আঁটা আছে। কলকাতা থেকে

শতাধিক মাইল দূরে পশ্চিমবঙ্গের এক পল্লীগ্রামের এক তিনপুরুষব্যাপী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী-বংশের চিকিৎসালয়ের নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে। বিষয়বস্তু রোগ ও মৃত্যু; বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ও চিকিৎসক। পল্লীগ্রামের ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত-মেশানো সমাজের পটভূমিকায় সনাতন ও নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির সংঘাতের চিত্র সুনিপুণ ভাবে এঁকেছেন তারাশঙ্করবাবু। সাহিত্যের দিক দিয়ে এই উপন্যাসের বিচার করবার অধিকার আমার নাই। তার প্রয়োজনও নাই। রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তিতেই এই উপন্যাসের উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু অপর একটি দিক থেকে এই উপন্যাসের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। রোগ-নির্ণয়ে এবং রোগের পরিণাম বিচারে অথবা মৃত্যু-সম্ভাবনার পূর্বাভাস উপলব্ধি করায় সনাতন শাস্ত্রীয় নাড়ীজ্ঞানের অদ্ভুত কৃতিত্ব কতকগুলি সম্ভব ও অসম্ভব ঘটনার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। লেখক নাড়ীজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় শিক্ষিত চিকিৎসকদের ব্যর্থতা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। এর জন্য তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি অথবা টেক্‌নিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। ডাক্তারদের মুখ দিয়ে তিনি এইসব বিষয়ে নানারকম উক্তি করিয়েছেন। বিভিন্ন রোগের রোগীকে তিনি একত্র করেছেন এবং চিকিৎসায় ও রোগ-নির্ণয়ে নানারকম জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি এইসব রোগের বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন এবং সেইসব রোগের আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলির প্রকাশ দেখিয়েছেন। এমনকি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ঔষধগুলির প্রয়োগবিধি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক হলেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানব-চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকায় চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও আতিশয্য থাকলেও সম্ভাব্যের সীমা তারা লঙ্ঘন করে নি। এই চরিত্রগুলির রোগের লক্ষণ-বিবরণে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান কতদূর জানি না। কিন্তু তিনি যদি রোগীর লক্ষণসমূহের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন এবং

রোগের বৈজ্ঞানিক নামগুলি ব্যবহার না করতেন তাহলে অসঙ্গতি দেখা যেত না।

প্রদ্যোৎ ডাক্তারের স্ত্রী মঞ্জুর **টাইফয়েড জ্বরের চারদিনের 'দিন—ফাষ্ট' উইকে, লেখক যে বিবরণ দিয়েছেন, তা টাইফয়েডের দ্বিতীয় কি তৃতীয় সপ্তাহের অবস্থা**। টাইফয়েডে হেমারেজ প্রথম সপ্তাহে হয় না। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে অথবা তৃতীয় সপ্তাহে হয়। কিন্তু লেখক রোগের তীব্রতা দেখাতে, ক্লোরোমাইসেটিন দেওয়ার পরও ৭ দিনের দিনই হেমারেজ করিয়ে দিলেন। গরম দুধ পড়ে একটি ছোট ছেলে পুড়ে গেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। টেবিলের উপর শোয়াবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বার কয়েক স্প্যাজ্‌ম্ হয়ে ছেলেটি মরে গেল। এ বিবরণেও অসঙ্গতি আছে। মারাত্মকভাবে পুড়ে গেলে, বিশেষত শিশুদের, "শক" হওয়ার কথা। এবং পুড়বার অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যুর প্রধান কারণ 'শক'। এ অবস্থায় "স্প্যাজ্‌ম্" হবার কোনোই কারণ নাই। দাঁতু ঘোষালের রোগের বিবরণ থেকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস্ ও এম্‌ফাইসিমা রোগ বলে মনে হয়। তাই থেকেই হাঁপানি হয়েছে। **"বদহজম থেকে হাঁপানী" হয় না।**

ঔষধ সম্বন্ধেও লেখক ডাক্তারদের মুখ দিয়ে কয়েকটি ভুল কথা বলিয়েছেন। রতনবাবুর ছেলে বিপিনের ব্লাডপ্রেসার ও তার সঙ্গে কিডনির দোষ। বিবরণ থেকে হাই-ব্লাডপ্রেসার-জনিত হার্ট ফেলিওর ও ইউরিমিয়ার লক্ষণ মনে হয়। কলকাতার বড় ডাক্তারের পরামর্শমতো হরেন ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে। হিক্কা দেখা দেওয়ায় তার চিকিৎসা প্রসঙ্গে হরেন ডাক্তার বলছে—"আফিং-ঘটিত ওষুধে হিক্কা থামতে পারে কিন্তু হার্টের কথা ভেবে সে সব ওষুধ ব্যবহার করিনি।" হার্টের উপর আফিং বা মরফিয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে এটা সাধারণ লোকের প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু একথা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। কাজেই **কোনও ডাক্তার, বিশেষত কলকাতার বড় ডাক্তারের সমর্থন নিয়ে এরকম কথা বলতে পারে না। করোনারি থ্রম্বোসিসের মতো হার্টের অতি মারাত্মক রোগে সময়মতো মরফিয়াই একমাত্র জীবনরক্ষক ঔষধ।** ব্লাডপ্রেসারজনিত হার্টফেলিওরে রাত্রে দারুণ হাঁপ কষ্ট হলেও (যাকে কারডিয়াক্ অ্যাজ্‌মা বলে) মরফিয়া ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে মরফিয়া সম্বন্ধে হার্টের ব্যারামে এমন

একটা প্রচলিত ভীতি আছে যে এই রকম ক্ষেত্রে ডাক্তাদের পক্ষে মরফিয়া ব্যবহার করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে ওঠে। কারণ মরফিয়া ব্যবহার করার পরও যদি রোগী মারা যায় তবে ভুল বোঝার ফলে ডাক্তারের দুর্নামের ভয় থাকে। সাধারণ অ্যাজ্‌মাতে (ব্রঙ্কিয়েল অ্যাজ্‌মা) মরফিয়া অনিষ্টকর। বোধহয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল ডায়গ্‌নোসিসের ফলে এই অবস্থায় মরফিয়া দিয়ে রোগের বৃদ্ধি অথবা রোগীর মৃত্যু হওয়ায় মরফিয়া সম্বন্ধে এরকম ধারণা প্রচলিত হয়েছে। যাই হোক এখানে তারাশঙ্করবাবু প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে ডাক্তারকে দিয়ে এই অবৈজ্ঞানিক উক্তি করিয়েছেন। বিপিনবাবুর এই অবস্থায় হয়তো আফিং-ঘটিত ওষুধ দেওয়ার বাধা ছিল, কিন্তু সেটা হার্টের অনিষ্টের ভয়ে নয়, অন্য কারণে।

একটি ম্যালেরিয়ার রোগীর কুইনিন ইনজেকশন দেওয়ার পর জ্বর ছেড়ে গেল। তবুও অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ "কোলাপ্স" করে রোগীটি মারা গেল। প্রদ্যোৎ ডাক্তার এই ব্যর্থতায় মনে মনে আপসোস করে নিজের ভুল সম্বন্ধে চিন্তা করছে—"কোথায় ভুল হল তবে? ' ম্যালেরিয়া বলে ধরেছিল সে। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ভুল হয়ে গিয়েছে সেইখানে। কুইনিন ইনজেকশনও সে দিয়েছিল। ফলটা হয়েও স্থায়ী হল না। **ইণ্টারভেনাস দেওয়া উচিত ছিল।**" এ কথাটাও বৈজ্ঞানিক নয়। সাধারণ লোকের ইনজেকশন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। প্রদ্যোৎ ডাক্তার তরুণ, উৎসাহী, অল্পদিন-পাশ-করা। তার পক্ষে এরকম চিন্তা স্বাভাবিক নয়। সাধারণ লোকের ধারণা যে-কোনো ওষুধই খাওয়ার চাইতে ইন্‌জেকশনে ভালো কাজ হয়। ইন্‌ট্রাভেনাস (কথাটা ইণ্টারভেনাস নয়) ইন্‌জেকশনে আরোও ভালো কাজ হয়। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। বিভিন্ন ওষুধের বিভিন্ন প্রয়োগবিধির সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন এবং তার সঙ্গে কার্যকারিতার তারতম্য নিয়ে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কুইনিন ইন্‌জেকশনরূপে ব্যবহৃত হলে মুখে প্রয়োগের চাইতে বেশি ফলপ্রদ হয় না, অবশ্য রোগী যদি ওষুধ বমি না করে অথবা তেতো বলে ফেলে না দেয়। ইন্‌ট্রাভেনাস কুইনিন দেওয়ার প্রয়োজন হয় একমাত্র যখন রোগী অচেতন থাকে অথবা যখন কোলাপস হয়ে রক্ত চলাচল ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু ইন্‌ট্রাভেনাস দিলেই কুইনিনের ফল বেশি স্থায়ী হয় না। ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রের আবর্তনের একটি

বিশেষ সময়ে রোগীর শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের ম্যালেরিয়া জীবাণুর ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এই আবর্তন হয়। সময়মতো বারবার কুইনিন দিয়ে সেই প্রতিক্রিয়া রোধ করতে হয়। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় কুইনিন দেওয়া সত্বেও হঠাৎ মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এখানে কুইনিন দিয়ে জ্বর ছাড়ল, ডাক্তার সকালে রোগী দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পরদিনই পথ্য দেবেন বলে এলেন। যদিও রোগী একটু "ড্রাউজি" ছিল। রোগীর ঠাকুরমা রোগীর সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা সত্বেও ডাক্তার ভয়ের কিছু বুঝতে পারলেন না। সেই দিনই বিকেলে ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। এতে জোর করেই একটা সাজানো ব্যাপার করে বৈজ্ঞানিক ডাক্তারের প্রগ্‌নোসিসের শোচনীয় ব্যর্থতা প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় কুইনিনের শতকরা ৯৯ভাগ সাফল্য উপেক্ষা করে নামমাত্র ব্যর্থতা বড় করে দেখানো— তা-ও ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইনজেকশন দেওয়া হয় নি বলে —অবাস্তব হয়েছে।

এক জায়গায় অভয়া নামে একটি মেয়ের রোগ ডাক্তাররা ভুল করে যক্ষ্মা বলে সাব্যস্ত করেছে বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু **আশ্চর্য এই যে ডাক্তাররা যক্ষ্মা ডায়গনোসিস্ করে ব্যবস্থা করেছেন পেনিসিলিন ইনজেকশনের।** ডায়গনোসিস্ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। কিন্তু যক্ষ্মা ডায়গনোসিস্ করে স্ট্রেপ্টোমাইসিন না দিয়ে পেনিসিলিনের ব্যবস্থা করার অসঙ্গতি জোর করেই ডাক্তারদের ওপর চাপানো হয়েছে।

গোটা বইটাতে ডাক্তারদের উপর লেখকের একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপ ভাব দেখা যায়। বিশেষত রীতিমতো মেডিক্যাল স্কুল-কলেজে পড়া ডাক্তারদের। একমাত্র রঙলাল ডাক্তারের উপর লেখকের খানিকটা শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। তিনি নিজের চেষ্টায় নদী থেকে মড়া তুলে ডিসেক্‌শন করে এবং বই পড়ে ডাক্তারি শিখেছিলেন বলেই বোধহয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার ওপর লেখকের প্রেজুডিস্ তাঁকে স্পর্শ করে নি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগ চিনবার অক্ষমতাকে দেখাতে গিয়ে ডাক্তারদের বুদ্ধি-বিবেচনা এমনকি কমনসেন্সকেও সাধারণ লোকের চাইতেও হীন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

অতসীর ছেলের মুখে একটা ফুস্কুড়ি হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা ফোড়ার মতো ফুলে ব্যথা বাড়ল। সকালবেলায় জ্বরে অচেতন। মুখ ফুলেছে। গাল-গলা ফোলা—"চিবুক থেকে কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত রক্তরাঙা স্ফীতি"।—এ রোগ

চিনতে ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রদ্যোৎ ডাক্তারের "ধাঁধা" লাগছে। —"মাম্‌স নয়তো" ? (কথাটা মাম্প্‌স হওয়া উচিত)। অরুণেন্দ্র রক্ত নিয়েছে। স্ট্রেপটোকক্কাস ইন্‌ফেক্‌শন হয়েছে মনে করছে।—"বিকেল পর্যন্ত গলায় ঘা দেখা দেবে।" প্রদ্যোৎ ডাক্তার বলছে। স্ট্রেপটোকক্কাস তো সাধারণত এমনভাবে ফোলে না। এত জ্বর হয় না। সে সিনিয়র ডাক্তার চারুবাবুকে কল্ দিয়েছে পরামর্শ করতে। পেনিসিলিন দিতে দ্বিধা করছে। জীবন মশায় (শাস্ত্রীয়-নাড়ীজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ) নাড়ী দেখে রক্ত দূষিত হয়েছে বলে দিচ্ছেন এবং প্রদ্যোৎ ডাক্তারকে পেনিসিলিন দিতে উৎসাহিত করছেন।

যেভাবে রোগটির সৃষ্টি ও বৃদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এর চিকিৎসায় কোনো ডাক্তারের কোনো সমস্যা হওয়ার কারণ নাই; যে-কোনো ডাক্তারই জানেন স্ট্রেপটোকক্কাস বা স্টেফাইলোকক্কাস জনিত মুখের ব্রণ বা ফোড়া থেকে হঠাৎ সেলুলাইটিস হয়ে সেপটিসিমিয়া হতে পারে। এর সঙ্গে মাম্প্‌সের ভুল হওয়ার কোনোই কারণ নাই। মাম্প্‌স মারাত্মক ব্যারাম নয়। স্ট্রেপটোকক্কাস্ ইনফেকশন থেকে সেপটিসিমিয়া হলেই মারাত্মক হয়। আজকাল পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারও এরকম অবস্থায় গোড়া থেকেই পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে দ্বিধা করে না। রক্ত পরীক্ষা করে সেপটিক ইনফেকশন হয়েছে কিনা বোঝা যায়। ব্লাড কালচার করে সেপ্‌-টিসিমিয়া ধরা যায়। কিন্তু রক্ত-পরীক্ষা এসব ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ডায়গনোসি-সের সমর্থনের জন্যেই করা হয়। তার রিপোর্টের অপেক্ষায় পেনিসিলিন্ চিকিৎসা আরম্ভ করতে বাধে না। এমনকি মাম্প্‌স থেকেও উপসর্গ হিসেবে এই রকম সেপ্‌টিক্ ইনফেকশন হতে পারে। সাধারণত মাম্প্‌সে উপসর্গ না থাকলে এ-রকম সাংঘাতিক অবস্থা সৃষ্টি হয় না। এবং সে ক্ষেত্রেও চিকিৎসা পেনিসিলিনই। কাজেই এখানে সমস্যাটা নিতান্তই কাল্পনিক। তাছাড়া স্ট্রেপটোকক্কাস ইনফেকশন শুধু গলার ঘা ছাড়া আরও অনেক ভাবেই হয়। আর **সব ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস ইনফেকশনেই গলার ঘা (ফলিকুলার টনসিলাইটিস) হওয়ার কথা নয়।** কাজেই অরুণেন্দ্র ডাক্তারকে দিয়ে ও কথা বলানো অস্বাভাবিক হয়েছে। অরুণেন্দ্রের রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্টটি হয়েছে আরও হাস্যকর। **"উইথ এ টেণ্ডেন্সি টু-ইরিসিপ্লাস"।** **এ কথা শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, রক্ত-পরীক্ষা সম্বন্ধে লেখকের**

অদ্ভুত ধারণার পরিচায়ক। এবিষয়ে লেখক আরও অজ্ঞতা অন্যত্র দেখিয়েছেন। **ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট চিনতে ব্লাড কালচার করতে হয় না। ব্লাড স্লাইড বিশেষভাবে রঙ করে মাইক্রোস্কোপে দেখে চিনতে হয়।**

কিশোরের দশদিন একজ্বরী। বুকে সর্দির দোষ। নতুন-পাশ-করা হরেন ডাক্তার নিউমোনিয়া বলে চিকিৎসা করছে। নতুন ডাক্তারের অভিজ্ঞতায় এ ভুল না হয় মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি বলছেন—"নিউমোনিয়া এতদিন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিত, কিন্তু আমি গোড়া থেকেই বেঁধেছি"। এরকম কথা টোট্‌কা চিকিৎসায় প্রচলিত। পাশ-করা ডাক্তারের মুখে এরকম কথা অস্বাভাবিক।

এক ভদ্রমহিলা বাড়ির উঠানে হোঁচোট লেগে পড়ে গিয়েছিলেন। দুঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মারাত্মক অসুখ। রঙলাল ডাক্তার দেখতে গেলেন। সঙ্গে জীবন মশায়। রোগিণী ধনুকের মতো বেঁকে আছেন। "ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ। চোয়াল পড়ে গিয়েছে" (? লেগে গিয়েছে)। কথা বলতে পারছেন না। ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস। "শরীরের কোন স্থানে পাখীর পালকের স্পর্শে অসহ্য যন্ত্রণায় রোগিণী থর থর করে কেঁপে উঠছেন"।

রঙলাল ডাক্তার ঠিক বুঝতে পারলেন না। জীবন মশায়কে বললেন নাড়ী দেখতে। জীবন মশায় নাড়ী ধরে ধ্যানস্থ হলেন। নাড়ী যত ক্ষীণই হয়ে থাক অসাধ্য নয় বুঝলেন। "উচ্চস্থান থেকে পড়ে গেলে বা ভগ্ন অস্থি সংযোজন কালে, অতিসারে, অজীর্ণ রোগে, বাত রোগে এমন হয়"। তাঁর সিদ্ধান্ত হল—ধনুষ্টঙ্কার নয়। "অজীর্ণ-রোগে জীর্ণ-দেহে পড়ে যাওয়ার আঘাতের ফলে এমন হয়েছে। আঘাতটা শুধু হেতু হয়েছে, এখন প্রয়োজন কুপিত বায়ুর প্রভাবে শরীরের স্নায়ু-শিরাগুলির সংকোচন দূর করা"। রঙলাল ডাক্তারও একমত হলেন যে টিটেনাস্ নয় এবং জীবনের অনুমানই সম্ভব। জীবন বলছে অসাধ্য নয়, কিন্তু রঙলাল ডাক্তার ভাবছেন চিকিৎসা কি করে হবে? "চোয়াল পড়ে গেছে—ওষুধ যাবে না। শরীরে কোথাও হাত দেবার উপায় নাই, মালিশ করা যাবে না। সাধ্য হবে কিসে?"

ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া, হাত-পা খিঁচুনি, চোয়াল লেগে যাওয়া ইত্যাদি ধরনের মাস্কুলার স্প্যাজম্ কয়েকটি রোগে হয়। যেমন টিটেনাস্,

টিটেনি, স্ট্রিক্‌নিন পয়জ্‌নিং, এপিলেপ্‌সি, হিস্টিরিয়া, মেনিনজাইটিস। ক্ষত না হলে টিটেনাস্‌ হয় না, তাও আঘাত লাগার দু ঘণ্টার মধ্যে কখনই নয়। স্ট্রিক্‌নিন পয়জ্‌নিং, এপিলেপ্‌সি বা মেনিন্‌জাইটিসও এখানে সম্ভব নয়। টিটেনিতে অন্য ধরনের স্প্যাজ্‌ম হয়। মহিলাটির পুরনো অজীর্ণ রোগ ছিল। অম্বলের ব্যারামে বারেবারে বমি করলে অথবা অ্যালক্যালি চিকিৎসা বহুদিন করলে এবং বহুদিনকার উদরাময় থাকলে অ্যালক্যালোসিস্‌ হয়ে টিটেনি হতে পারে। তবে তার জন্য আঘাতের প্রয়োজন হয় না। তবে এটা টিটেনিও বলা যায় না।

আঘাত লাগলে রক্তক্ষয় ছাড়া প্রথমেই একমাত্র মারাত্মক যা হতে পারে তা হল শক। কিন্তু শকের লক্ষণ লেখকের বর্ণনার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এখানে রোগিণীর প্রকৃত রোগ চেনা যে-কোনো বিচক্ষণ চিকিৎসকের পক্ষে মোটেই দুঃসাধ্য হওয়ার কথা নয়। নিউরোটিক বা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোকেদের সামান্য আঘাতে এরকম হয়। এটা অসহ্য বেদনার জন্য নয়। এখানে সাংঘাতিক বেদনা হবার কথাও নয়। যে হোঁচোটে কোনো ক্ষত নি, আঙুল ফোলে নি অর্থাৎ ভিতরেও রক্তক্ষরণ (হেমাটোমা) হয় নি, হাড় ভাঙে নি, সেখানে এরকম যন্ত্রণা কাল্পনিক। রোগী বা রোগিণীর শরীরের উপর সাংঘাতিক বেদনার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নিজের ধারণা এবং লোককে বেদনার অসহ্যতা দেখানোর প্রয়াসই এর কারণ। যন্ত্রণায় বেঁকে যাওয়া, হাতে-পায়ে খিল ধরা, দম আটকে যাওয়া, এগুলো সাধারণ লোকের মনে বেদনার অসহ্যতার পরিমাপক। সত্যিকারের অসহ্য বেদনার শরীরে শকের লক্ষণ দেখা যায়। তাতে রোগীর চেতনা ও অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আসে। হাত-পা শিথিল ও ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং শরীর ঘামতে থাকে। কাজেই এখানে রঙলাল ডাক্তারের পক্ষে রোগীর অবস্থা না বোঝার কারণ নাই। লেখক রঙলাল ডাক্তারকে অন্যান্য ডাক্তারের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েও তার জ্ঞানকে প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসের উপরে তুলতে পারেন নি। মুখ দিয়ে ওষুধ না খাওয়াতে পারলে যে ইন-জেকশন দেওয়া যায় সেটাও রঙলাল ডাক্তারের মাথায় এল না। তিনি খাওয়ার ওষুধ অথবা মালিশ ছাড়া এ অবস্থায় চিকিৎসার আর কোনো ব্যবস্থা জানেন না। **যন্ত্রণাটা সত্যিই খুব সাংঘাতিক ধরে নিলেও ডাক্তারের**

যন্ত্রণা নিবারণের প্রধান ওষুধ মরফিয়ার কথা তাঁর মনে এল না কেন তা দুর্বোধ্য। বোধহয় লেখকের মনে সাধারণ লোকের মতো মরফিয়া সম্বন্ধে প্রচলিত ভীতির জন্যই। তবে হাসপাতালে যেসব ডাক্তার কাজ করেন তাঁদের অনেকের অভিজ্ঞতায় এ রকম সামান্য আঘাতে সাংঘাতিক বেদনাগ্রস্ত রোগীকে ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার ইনজেকশনের পর ঘুমিয়ে পড়তে দেখা গেছে।

পরানের রক্তবমি ও জ্বর। চারুবাবু ডাক্তার "রক্তবমি ও জ্বর দুটো উপসর্গ দেখেই সাংঘাতিক ধরনের — গ্যালপিং থাইসিস্" বলে ধরেছিলেন। আসলে পরানের হয়েছিল "পুরনো ম্যালেরিয়া এবং রক্তপিত্ত" মিলিয়ে একটা জটপাকানো ব্যাধি। অবশ্য সেটা নাড়ীজ্ঞানবিশারদ জীবন মশায়ই চিনলেন। মুখ দিয়ে রক্ত বমি হয়েও উঠতে পারে, কাশি হয়েও উঠতে পারে। যখন বমি হয় তখন সেটা পেট থেকে আসছে জানা যায় এবং সেটা যে টি-বির জন্য নয় এটা সব ডাক্তারই জানেন। চারুবাবু বৃদ্ধ ডাক্তার। যত পাড়াগেঁয়েই হোন ডাক্তারি শিক্ষার প্রথমেই তাঁকে হিমাটেমেসিসের (রক্তবমি) সঙ্গে হিমপ্‌টেসিসের (রক্তকাশি) পার্থক্য শিখতে হয়েছে। পুরনো ম্যালে-রিয়ায় পিলে-লিভার বড় হয়ে লিভারে সিরোসিস্ হয়ে রক্তবমি হয়। এটা পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার চারুবাবুর অন্তত অজানা থাকার কথা নয়। তবু তাঁকে দিয়ে এ ভুল করাতে গিয়ে লেখকই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

লেখক ডাক্তারিতে ব্যবহৃত আরও কয়েকটি ইংরেজি শব্দ প্রচলিত সাধারণ অর্থ দিয়ে বুঝতে গিয়ে ভুল করেছেন। প্রদ্যোৎ ডাক্তারের স্ত্রীর টাইফয়েডে হেমারেজ হওয়ার কথা আগে বলেছি। এখানে লেখক জীবন মশায়কে দিয়ে পূর্বে নাড়ী দেখিয়ে রোগিণী সেরে উঠবেন বলে আগেই প্রগ্‌নোসিস্ করিয়ে নিয়েছেন, এবং সেই নাড়ীজ্ঞানের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য ৭ দিনের টাইফয়েডেও এই রোগের মারাত্মক সব উপসর্গ টেনে এনেছেন। প্রদ্যোৎ ডাক্তারকে দিয়ে তিনি বলাচ্ছেন —'রক্তদাস্ত যখন হয়েছে তখন ইনটে-স্টাইনে পারফোরেশন হয়েছে নিশ্চয়'। **ইনটেস্টাইনাল পারফোরেশন ও হেমারেজ (রক্তদাস্ত) সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।** এবং টাইফয়েডের ফলাফলও সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডাক্তাররা কখনই হেমারেজকে পারফোরেশনের লক্ষণ বলে ধরে নেন না। লেখক হয়তো মনে করেছেন যে হেমারেজ বা

রক্তক্ষরণ শরীরে কিছু ক্ষত না হলে বা ছিঁড়ে না গেলে হয় না, এবং টাইফয়েডে হেমারেজ যখন ইন্‌টেস্টাইন থেকে হচ্ছে তখন ইন্‌টেস্টাইন নিশ্চয়ই ছিঁড়ে গেছে অর্থাৎ ফুটো হয়ে গেছে। ইন্‌টেস্টাইনের গঠন ও টাইফয়েডের প্যাথলজি লেখকের জানবার কথা নয়। কিন্তু যে-কোনো মেডিসিনের বই খুললে অথবা যে-কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি টাইফয়েডে হেমারেজ ও পারফোরেশনের পার্থক্য বুঝতে পারতেন।

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় প্রগনোসিস্ বলে একটা কথা আছে। রোগের ফলাফল কি হতে পারে, রোগীর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা ফিরে ওয়ার কতটা সম্ভাবনা, এবং কতদিনে তা হতে পারে, কি কি লক্ষণ রোগের বিভিন্ন অবস্থায় শুভ অথবা অশুভ ফলের সূচনা করে—এ সমস্তই প্রগনোসিসের বিচার্য বিষয়। মেডিসিনের সব বইতে প্রত্যেক রোগের বিবরণের সঙ্গে প্রগনোসিসের আলোচনা থাকে। রোগীর বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর প্রগনোসিস্ বিচার প্রতিষ্ঠিত। লেখক ডাক্তারি চিকিৎসার এদিকটা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি যে কয়েকটি ডাক্তার-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাদের এ বিষয়ে শোচনীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন নি, তাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রই যে এ বিষয়ে উদাসীন তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি রঙলাল ডাক্তারকে দিয়ে বলিয়েছেন—"আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। রোগ কঠিন। মরবেন কি বাঁচবেন সে আমি জানি না।" অন্যত্র রঙলাল ডাক্তার টাইফয়েড ডায়গনোসিস্ করেছেন। রোগীর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—এ রোগ সারতে কত দিন লাগবে? রঙলাল উত্তর করলেন—'সে কি করে বলব আমি। সে আমি জানি না।' অপর দিকে প্রদ্যোৎ ডাক্তার সকাল বেলায় যে রোগীকে পরদিন পথ্য দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে এলেন, বিকেলেই সে মরে গেল। বিপিনবাবুর ব্লাড প্রেসার তার সঙ্গে ইউরিমিয়ার লক্ষণ। তাকে প্রদ্যোৎ ডাক্তার আশ্বাস দিচ্ছেন সেরে যাবেন বলে। স্তোক দেবার জন্য নয়, সত্যিকার বিশ্বাস করেই। একমাত্র কলকাতার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চ্যাটার্জির উপর লেখক একটু সুবিচার করেছেন। তার কথাগুলিতে খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষিত হয়।

বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে তারাশঙ্করবাবুর ব্যক্তিগত মতামত

থাকতে পারে। কোনো বিশেষ চিকিৎসার উপর তাঁর পক্ষপাতিত্বও স্বীকার করা যায়। তাঁর উপন্যাসে সেই পদ্ধতির বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টাতেও আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তার খুঁটিনাটি নিয়ে ভুল আলোচনা করা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাঁর মতো খ্যাতনামা লেখকের সব কথাই লোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। সেই কারণেই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দিক থেকে তাঁর ভুলগুলি দেখাবার চেষ্টা করলাম।

সমালোচনা

বই

বিচিন্তা—রাজশেখর বসু ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ ॥ দু টাকা চার আনা ॥

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর পনেরোটি প্রবন্ধ একত্রিত হয়ে 'বিচিন্তা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি গত সাত বৎসরে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু বিসংবাদ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।

কয়েকটি প্রবন্ধ সত্যই উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ। 'ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার', 'বাংলা ভাষার গতি' এবং 'ভেজাল ও নকল'—এই তিনটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তুচ্ছ, কিন্তু তিনটিতেই একটা রাজশেখরীয় বৈশিষ্ট্য আছে। বেশ রসিয়ে রসিয়ে প্রচুর দৃষ্টান্তের সাহায্যে রাজশেখরবাবু বক্তব্যগুলি পেশ করেছেন। বোঝা যায় যে বক্তব্য বিষয়ে তাঁর অসামান্য অধিকার। 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' প্রবন্ধটির বক্তব্য একটু পুরনো ও একঘেয়ে লাগল। আজকাল কেই বা আছেন যিনি নিজেকে বৈজ্ঞানিক ভাবেন না। তবু এই প্রবন্ধে দুটি একটি দৃষ্টান্ত যা দেওয়া হয়েছে তা একেবারে ওস্তাদি মার।

'ইহকাল পরকাল' প্রবন্ধে একটা শক্ত দার্শনিক প্রশ্নের সুতো খোলা হয়েছে চমৎকার সহজভাবে। দার্শনিকেদের পরকাল নামক কালো বেড়াল অন্ধকার ঘরে ধরা পড়লেও পড়তে পারে যদি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দেখেন যে দূরবেদন বা ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে তথ্য আকস্মিকতার নিয়ম

দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না—মোটামুটি এই হল রাজশেখরবাবুর বক্তব্য ইন্‌টারেস্‌টিং সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে নানা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তথ্যগুলি যদি সত্যই তথ্য হয়, সেগুলি সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম বলেও গণ্য হতে পারে। তাছাড়া বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে কোনো নিয়মেরই শেষ নির্বচন সম্পন্ন হয়েছে, এরূপ মনে করার কারণ নেই। পরমাণুর কাণ্ডকারখানা আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেকে যেমন ভাবছেন যে বিজ্ঞান অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করছে, রাজশেখরবাবুর চিন্তাধারাও সেই পথে। এক্ষেত্রে দর্শনকে বিজ্ঞানের ভৃত্য না করে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকেই দর্শনের সেবায় লাগানো হচ্ছে।

'সমদৃষ্টি' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক ভাবধারা সম্বন্ধে নিছক স্পেকুলেশনের আশ্রয় নিলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি জিনিসটা একটু বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেমন ধর্মনীতি ও নিসর্গনীতি নামে ছুটি পরস্পর-বিরোধী শাশ্বত নীতির অস্তিত্ব কল্পনা করে রাজশেখরবাবু বলছেন যে আধুনিক হিউম্যানিজম দুয়ের মধ্যে একটা রফা করেছে এবং তার "প্রধান লক্ষ্য—সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের অবিরোধে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থসাধন এবং সেই স্বার্থের অবিরোধে যথাসম্ভব জীবে দয়া।" মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে হিউম্যানিজমকে দেখার চেষ্টা খুবই ব্যর্থ প্রয়াস। কিন্তু মেনেই নেওয়া যাক রাজশেখরবাবুর সংজ্ঞাটা। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ অব্যাহত রেখে কোনো ব্যক্তি বা কোনো রাষ্ট্র যদি নিজের স্বার্থসাধন করে, তাহলেই বা ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে রফাটা ঠিক হল কোথায়? তবে কি পৃথিবীর সব মানুষই সন্ন্যাসী হয়ে যাবে এবং সব রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রের কাছে আত্মবলি দেবে? এ-দুটো জিনিসই বন্ধ্যাপুত্র ও শশশৃঙ্গের মতোই অসম্ভব ব্যাপার। তারপর মানুষ জীবগণের প্রতি 'যথাসম্ভব' দয়া দেখালে যদি ধর্মের কিঞ্চিৎ গ্লানি হয় তাহলে কি মানবসমাজ জীবগণের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেই ধর্ম জয়যুক্ত হবে?

'অশ্রেণিক সমাজ' প্রবন্ধটিতে 'শ্রেণী' পদটির এমন অতিব্যাপ্তি ঘটেছে যে শ্রেণীভেদ নামক দৈত্যটিকে রাজশেখরবাবু রূপকথার রাজপুত্রের মতো পৃথিবীর সর্বত্র খুজে বেড়িয়েছেন শুধু আসল জায়গাটিতে ছাড়া। 'বিজ্ঞানের বিভীষিকা

প্রবন্ধে দেখলাম রাজশেখরবাবু এই বিশ্বাস রাখেন যে লোকমতের প্রভাবে "অতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে" এবং "পরমাণু শক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে"। কিন্তু মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই যুদ্ধের "বিভীষিকা দেখাচ্ছে" এটা মানা যায় না। 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' প্রবন্ধে রাজশেখরবাবু নিজেই শিখিয়েছেন—"যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক, তিনি…সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন।" খবরের কাগজের পাতা উলটে নিত্যই তো নতুন নতুন প্রমাণ পাওয়া যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সত্য সত্যই শান্তি চায়। এগুলি যদি প্রমাণ বলে গণ্য না হয় তাহলে বলতে হয় যে 'প্রমাণ' শব্দটি ওষ্ঠ, জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর এক বিশেষ প্রকার সঞ্চালন মাত্র!

'বাঙালীর হিন্দীচর্চা' প্রবন্ধে রাজশেখরবাবু ভরসা দিয়েছেন যে বাঙালী হিন্দী শিখলে বাঙলা ভাষার কোনো সর্বনাশ হবে না। আশ্বাসের কথা। কিন্তু বাঙালী লেখকদের প্রলুব্ধ করবার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে তাঁদের 'জনকতক' যদি হিন্দীতে সাহিত্য রচনা করেন তাহলে সর্বভারতীয় বাজারে বই বিক্রি করে তাঁরা প্রচুর টাকা পাবেন। অবাক হয়ে ভাবি, তাই যদি তাঁরা করেন তাহলে বাঙলা ভাষার সর্বনাশের আর বাকি রইল কি, বিশেষত এটা যখন একপ্রকার নিশ্চিত যে 'জনকতক'-এর মহৎ দৃষ্টান্ত সকলেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করবেন! বাঙালী নিজের গরজে কাজ-চালানো-গোছের হিন্দী ধীরেসুস্থেই শিখতে চায়। চারিদিকের লক্ষণগুলিও সেই রকম। কিন্তু মুশকিল বাধে যখন হিন্দীপ্রচারকদের টাকার থলির মধ্যে ঢুকে হিন্দী নানা-রকম আওয়াজ করতে থাকে।

'সাহিত্যিকের ব্রত' ও 'ভারতীয় সাজাত্য' নামক প্রবন্ধ দুটির নামোল্লেখ করে রাজশেখরবাবুর রাজনীতিক প্রবন্ধগুলির আলোচনা করা যাক। তিনটি ভয়ংকর রকমের রাজনীতিক প্রবন্ধ বইটিতে আছে, যথা: 'জাতিচরিত্র', 'জীবনযাত্রা' ও 'জন্মশাসন ও প্রজাপালন'। এই তিনটি প্রবন্ধই বইটির প্রধান আকর্ষণ বলে বোধহয় বিবেচিত হবে। স্বয়ং রাজশেখরবাবুও বোধহয় সকলকে "চিন্তার খোরাক" জোগাতে চান এই তিনটি প্রবন্ধের দ্বারাই। প্রবন্ধ তিনটি পড়ে কিন্তু মনে গভীর দুঃখ ছাড়া অন্য কোনো মানসিক প্রক্রিয়া অনুভূত হল না। দুঃখ এই যে রাজশেখরবাবু গুরুতর রাজনীতিক, আর্থনীতিক

ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে তাড়াহুড়ো করে যেসব মত ব্যক্ত করেছেন সেগুলি সবই এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাপিটালিস্ট পণ্ডিতদের, চেম্বার অব কমার্সের সভাপতিদের ও সরকারী নেতাদের নিত্য নিত্য শোনা স্ট্যান্ডার্ড মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাঁর নিজের 'অবদান' শুধু তাঁর বিরাট নামডাক, স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীর শিশুর মতো তাঁর গোলগাল ফুটফুটে ভাষা এবং তাঁর শাস্ত্রবাক্য আওড়াবার আশ্চর্য ক্ষমতা। আরো দুঃখ পেলাম এই দেখে যে জনসাধারণের প্রতি এতবড় একজন সাহিত্যিকের মমতার লেশমাত্র নেই, সাধারণ মানুষের প্রতি কড়া মেজাজে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করতে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা নেই এবং তাদের নস্যাৎ করার জন্য বিজ্ঞানকে প্রতি পদে বিকৃত ও পদদলিত করতে তাঁর যেন উৎসাহের অন্ত নেই। গল্পলেখক হিসাবে তিনি সকলের পরম শ্রদ্ধেয় বলেই এই দুঃখটা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

অনেক কথা যদি রাজশেখরবাবু বলেন, প্রত্যেকটির আলোচনা বা উত্তর সম্ভব নয়। বেছে বেছে তাঁর কয়েকটি উক্তির শুধু বিচার করব। 'জাতিচরিত্র' প্রবন্ধটির বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। অন্য দুটি প্রবন্ধের মধ্যেই আলোচনা আবদ্ধ রাখব।

'জীবনযাত্রা' প্রবন্ধে রাজশেখরবাবু বলেছেন : "এদেশের ভদ্রসন্তান শ্রম-সাধ্য জীবিকা চায় না, সে জন্য তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। তাদের বিলাসবাসনা আছে কিন্তু সদুপায়ে তা তৃপ্ত করতে পারে না, সেজন্য তাদের অসন্তোষ বেড়েই যাচ্ছে।" লেখার ভাবগতিক দেখে মনে হয় রাজশেখরবাবু এখনও সেই পুরনো থিওরি আঁকড়ে আছেন যে মানুষ বেকার হয় স্বেচ্ছায়, কাজের কষ্টের চেয়ে আরাম (অর্থাৎ আলস্য) যাদের কাছে অধিকতর লোভনীয় তারাই হয় বেকার। বিশ বৎসর পূর্বে জন্ মেনার্ড কেইন্স এই থিওরিটিকে সমাধিস্থ করেছিলেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখনও এর মধ্যে প্রাণের লক্ষণ যথেষ্ট রয়ে গেছে। আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্র বলে যে, দেশে (ক) বেকারের সংখ্যা নির্ভর করে একদিকে (খ) কর্মযোগ্য জনসংখ্যার উপর এবং অন্যদিকে (গ) জাতীয় আর্থনীতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র জড়িয়ে কর্মসুযোগের মোট পরিমাণের উপর। অর্থাৎ ক=(খ – গ)। এই ফরমূলা অনুসারেই ভারতের প্ল্যানিং কমিশন বেকার-সমস্যা সমাধানের কথা ভাবছেন। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শ্রমবিমুখতা, বিলাসবাসনা, অসৎ অভিসন্ধি, অসন্তোষ

প্রভৃতি কথা উত্থাপন করা কোনো জ্ঞানী লোকের পক্ষে অশোভন। যদি শুধু বাঙালী ভদ্রসন্তানের কথাই তোলা হয় তাহলেও এটা আজ সুবিদিত যে তারা সম্প্রতি দলে দলে কারখানায় ঢুকছে এবং কাজের সুযোগ বাড়লে আরও ঢুকবে। এদেশে বেকারদের মধ্যে অসন্তোষ আছে ঠিকই। তারা চায় অন্যদেশের মতো এদেশেও কাজ পাওয়ার অধিকার সত্যসত্যই স্বীকৃত হোক এবং কাজ না থাকলে বেকার-ভাতার ব্যবস্থা হোক। যেটা অন্যদেশে বেঁচে থাকার মানবিক অধিকার বলে গণ্য হয় সেটা এদেশে কেউ চাইলেই 'বিলাস-বাসনা' ও 'অসৎ অভিসন্ধি' বলে নিন্দিত হবে, এমন কথা এক রাজশেখরবাবুর উলটো পুরাণে ছাড়া ভূভারতে কোথাও লেখে না।

এই প্রবন্ধের অন্যত্র রাজশেখরবাবু বলেছেন: "রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন সামর্থ্য বুঝেই জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" রাষ্ট্র মানে বোধহয় সমাজ বা জাতি। ভারতে বা অন্য কোনো অনুন্নত দেশে দ্রুত আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা করতে গেলে দুটি পথ বেছে নেওয়ার সমস্যা উপস্থিত হয়: (ক) উৎপাদন-সামর্থ্যের (production capacity) যতদূর সম্ভব অধিক বৃদ্ধি, বর্তমান জীবনোপায়ের (means of subsistence) যতদূর সম্ভব সংকোচসাধন (তার মানে এমন নয় যে পূর্বের চেয়ে জীবনোপায় কমে যাবেই যাবে) এবং ভবিষ্যতে জীবনোপায়ের যতদূর সম্ভব প্রসার; (খ) উৎপাদন-সামর্থ্যের যতদূর সম্ভব কম বৃদ্ধি, বর্তমান জীবনোপায়ের যতদূর সম্ভব প্রসার এবং ভবিষ্যতে জীবনোপায় ও সাধারণ আর্থনীতিক অবস্থা প্রায় বর্তমানের মতোই রাখা। এই যখন সমস্যা তখন রাজশেখরবাবুর উদ্ধৃত উক্তিটি ঠিক কোন পথ অবলম্বন করতে বলছে এবং কোন পক্ষকেই বা সমর্থন করছে, কিছুই বোঝা গেল না।

যদি উৎপাদন-সামর্থ্যের মানে হয় বাৎসরিক জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় তাহলে সমস্যাটা দাঁড়ায় এই: যুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রস্তুতির দরুণ, এত শিল্পায়নের দরুণ (বা অন্য কারণে) জাতীয় আয় যখন দ্রুত বাড়ছে তখন জীবনোপায়ের পূর্বনির্দিষ্ট মোট মূল্যের সঙ্গে ব্যবহারযোগ্য আয়ের (disposable income) সমতাসাধন কি উপায়ে করা যায়? তার দুটি পথ আছে: (ক) অধিক কর, 'বাধ্যতামূলক' সঞ্চয় প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবহারযোগ্য আয়টিকে যথা-প্রয়োজন কমানো; এবং (খ) জীবনোপায়ের সামগ্রীর দাম বাড়তে দেওয়া

যাতে করে জীবনোপায়ের মোট মূল্য বেড়ে গিয়ে ব্যবহারযোগ্য আয়ের সমান হয়। এই দ্বিতীয় পথটি অবলম্বিত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার টেকনিক্যাল নাম ইনফ্লেশন। সকলেই জানেন যে ইনফ্লেশনের একটি 'দুষ্টচক্র' আছে এবং সেজন্য আর্থনীতিক সাম্যসাধনের ওটা কোনো পথই নয়। এখন রাজশেখরবাবুর বক্তব্য এই যে, শ্রমিকদের 'আবদার' রক্ষার জন্যই কেবল ইনফ্লেশনের 'দুষ্টচক্র' জন্মায়, কেননা ধনিকরা নিম্নতম লাভ বজায় না রেখে কি করে শ্রমিকদের 'আবদার' মেটাবে। কিন্তু রাজশেখরবাবু এই কথাটা বেমালুম চেপে যাচ্ছেন যে ইনফ্লেশনের অবস্থায় ধনিকদের লাভ শুধু 'বজায়'ই থাকে না, দমাদম বাড়তে থাকে। সবাই যখন ইনফ্লেশনের 'দুষ্টচক্র' 'হাড়ে-হাড়ে' ভুগছে তখন ধনিকদের জীবনধারণের মান কমা দূরে থাক তাঁদের 'বিলাস-বাসনা' যেন চতুর্গুণ শোভা ধারণ করে এবং ইনফ্লেশনের সমস্ত চোটটা গিয়ে পড়ে বেচারা শ্রমজীবী মানুষদের উপরই। কাজেই ইনফ্লেশনের অবস্থায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমিকরা যদি মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেন সেটা তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং এই দাবিটিকে ধনিকরা তাঁদের লাভের মাত্রা মাত্র 'বজায়' রেখে খুবই মেটাতে পারেন। এই তো গেল এক কথা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে ইনফ্লেশনের অবস্থায় শ্রমিকদের মজুরি না বাড়িয়ে যদি শুধু ধনিকদের লাভকেই বাড়তে দেওয়া হয় তাহলেও ইনফ্লেশনের দুষ্টচক্র কিন্তু কম সৃষ্ট হয় না, বরং তা আরো সমাজবিধ্বংসী রূপ ধারণ করে। একথা আজকাল খুব গোঁড়া অর্থনীতিবিদেরাও অস্বীকার করেন না। ইনফ্লেশনের কারণ শ্রমিকদের 'আবদার' বা 'বিলাস-বাসনা' নয়, আসল কারণ হল সরকারের আর্থনীতিক ও ফাইনানশিয়াল পলিসি। কিন্তু রাজশেখরবাবু এত সব গোলমালের মধ্যে গিয়ে ঝামেলা সহ্য করতে রাজী হননি।

'জন্মশাসন ও প্রজাপালন' প্রবন্ধটিতে রাজশেখরবাবু ম্যালথাস ও তাঁর আধুনিক শিষ্যদের সব কথা নির্বিচারে মেনে নিয়ে আমাদেরও যেমন দুর্ভাবনায় ফেলেছেন নিজেও তেমনই দুর্ভাবনায় পড়েছেন। দুঃখ হয় তাঁর জন্যই বেশি। যোশুয়া দ্য কাস্ত্রো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'বুভুক্ষার ভূগোল' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির আট ভাগের এক ভাগ মাত্র অদ্যাবধি চাষ হয়েছে! বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মেরু ও মরু অঞ্চলেও চাষ হতে পারে, সমুদ্র থেকেও প্রচুর খাদ্য পাওয়া যেতে পারে। চাষের জমি না

বাড়িয়েও শুধু টেকনিকের উন্নতির দ্বারা পৃথিবীর সকল মানুষের ক্ষুধা যে মেটানো সম্ভব তা দেখানোর জন্য কলিন ক্লার্ক এই মন্তব্য করেছেন ; "আশা করা যাচ্ছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বছরে শতকরা এক ভাগ বাড়বে, কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বছরে মানুষ-পিছু ফসলের উৎপাদন শতকরা দেড় ভাগ বাড়বে (কোনো কোনো দেশে শতকরা দুভাগ)। সুতরাং কোনো প্রকার গভীর ম্যালথুসীয় নৈরাশ্য একেবারেই বাজে জিনিস ··।"

জনবাহুল্য কি অতিপ্রজতার ফলেই সৃষ্ট হয়? কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন যে এক-এক সমাজব্যবস্থায় এক-এক কারণে জনবাহুল্য সৃষ্ট হয়। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে মুনাফার হার বজায় রাখার জন্য বেকারবাহিনী অর্থাৎ 'জনবাহুল্য' সৃষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক দেশে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও শোষণই গণদারিদ্র্যের ও গণবুভুক্ষার মূল কারণ। দ্য কাস্ত্রো মন্তব্য করেছেন ; 'যে সকল বিস্তীর্ণ ভূভাগে ক্ষুধা বারো মাস লেগেই আছে সেগুলি সবই হল হুবহু ঔপনিবেশিক অঞ্চল। ··· ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় যদি এরূপ মূলগত পরিবর্তন না আসে যাতে করে উপনিবেশের লোকেরা নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য যথেষ্ট উৎপাদন করতে পারে, তাহলে বিশ্বব্যাপী বুভুক্ষার কোনো সত্যকার প্রতিকার আশা করা দুরাশা মাত্র।"

রাজশেখরবাবু বলেছেন ; "অবাধ প্রজাবৃদ্ধি এবং অযোগ্য প্রজার বাহুল্য হলে সমগ্র সমাজ ভারাক্রান্ত ও ব্যাধিত হয়। সকলের হিত করতে গেলে প্রত্যেকের ভাগে অল্পই পড়ে, অগণিত হতভাগ্যের প্রতি দয়া করতে গেলে সুস্থ সবল ও সুযোগ্য প্রজারা তাদের ন্যায্য ভাগ পায় না।" ম্যালথাসেরই কথা। ম্যালথাস ও তৎশিষ্যদের ভাবখানা এইরকম। দেশে যদি অসংখ্য দরিদ্র, বেকার ও বুভুক্ষু থাকে তাদের খাওয়াবার জন্য ও রোগ হলে চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্র কিজন্য ভাগ্যবান ধনীদের উপর কর বসিয়ে টাকা খরচ করবে ? দারিদ্র্যের জন্য দরিদ্ররা নিজেরাই দায়ী। দারিদ্র্য একটি দারুণ অপরাধের ফল এবং সেই অপরাধটি হল অতিপ্রজতা। অতিপ্রজতা দূর না হলে দারিদ্র্য দূর হবে না, সুতরাং প্রকৃতির ভোজে অনিমন্ত্রিত ভাগ্যহীন দরিদ্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব মরতে দাও ওদের বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, যুদ্ধে। মিছিমিছি ওদের

বাঁচাবার চেষ্টা করলে শুধু ভাগ্যবানদের ভাগে কম পড়ে যাবে এবং ধর্ম তার যথাযোগ্য পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে।

ম্যালথাসের এই প্রতিক্রিয়াশীল, ক্রূর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ জনসংখ্যা-তত্ত্বের জবাবে সমসাময়িক লেখক মানবপ্রেমিক উইলিয়ম হ্যাজলিট কঠিন বিদ্রূপের সঙ্গে ম্যালথাসকে এই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন: পুওর-ল বজায় থাকার জন্য ধনীদের আস্তাবলে ঘোড়ার সংখ্যা কি কমে গেছে, ধনিক-দুলালীদের বেশভূষার বাহারে কি মন্দা পড়েছে, রাষ্ট্র যদি গরিবদের জন্য টাকা খরচ করে তাহলে এটাই কি সত্য কথা নয় যে গরিবের টাকা গরিবের কাছ থেকে আদায় করে সেই টাকাই আবার রাষ্ট্র গরিবদের জন্য ব্যয় করে? এবিষয়ে হ্যাজলিট প্রায় শেষ কথাই বলে গিয়েছিলেন। তাই আশ্চর্য হই যখন দেখি যে রাজশেখরবাবু আজও এই মত পোষণ করেন যে দরিদ্ররাই ধনীদের শোষণ করে। মার্কসবাদী বা অমার্কসবাদী, যাঁরাই ধনীদের ধনসঞ্চয় সম্বন্ধে কিছুমাত্র গবেষণা করেছেন তাঁরাই জানেন যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও বুভুক্ষু শ্রমিকের অস্তিত্ব ধনীদের ধনবৃদ্ধির মূল ও অলঙ্ঘনীয় শর্ত। যদি সত্য সত্যই কোনো কৌশলে সমস্ত দরিদ্রকে পরলোকে পাঠানো হয় তাহলে ইহলোকে বেচারা ধনীদের কি অবস্থা হবে আমি শুধু এই কথাটাই ভেবে দেখতে রাজশেখরবাবুকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

অনুন্নত দেশে শতকরা পঁচাশিজন মানুষের বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র পথ হল ঔপনিবেশিক দাসত্ব ছিন্ন করে উৎপাদন বাড়ানো ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নত হলে এবং তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হলে একদিকে যেমন তাঁদের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশক্তি বাড়বে, অন্যদিকে তেমনিই প্রজননের হারও ধীরে ধীরে কমে যাবে, একথা আজ প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানীই মানেন। দ্য কাস্ত্রোর মতে জীবনধারণের মান বাড়লে মানুষ জৈব প্রোটিন খাদ্য বেশি করে খায় এবং তার ফলেই জন্মের হার কমে যায়। অন্য পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে নৈতিক, মনোজাগতিক ও পারিবারিক কারণগুলির উপর বেশি করে জোর দেন। দেশের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্বল ও জাতীয় জনসংখ্যার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সাম্যস্থাপনের জন্য যদি আবশ্যক হয়, স্বেচ্ছায় জন্মশাসন ও পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য দম্পতিদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ দেওয়া হোক।

তাতে কারো কোনো আপত্তিই থাকবে না। কিন্তু অতিপ্রজতাই দুঃখ-দারিদ্র্যের ও গণবুভুক্ষার মূল কারণ এটি একদম ভুল কথা। যাঁরা ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন সব লিবারাল পণ্ডিতরাও আজ একথা মানেন। তাঁরা আরো মানেন যে কাজ পাওয়ার অধিকার, ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, বিনা খরচে বা অল্প খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভের অধিকার, এগুলি প্রাথমিক অধিকারের মধ্যে গণ্য। এগুলি যে-রাষ্ট্র দেয় না সেই রাষ্ট্রেরই বাঁচবার কোনো অধিকার নেই। সম্মিলিত জাতিসংঘের 'খাদ্য ও কৃষি সংগঠন'-এর তরফ থেকে বারবার দেখানো হয়েছে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা বিশ্বমানবের বুভুক্ষা মেটানো সম্পূর্ণ সম্ভব, কিন্তু রাজশেখরবাবু আগেভাগেই এই সম্ভাবনাটিকে বাতিল করে দিয়েছেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় উল্লিখিত লিবারাল দৃষ্টিভঙ্গি রাজশেখরবাবুর নেই। Vogt প্রমুখ নব্যম্যালথুসীয়দের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার দ্বারা তাঁর মন এমন আচ্ছন্ন যে তিনি মহা দুর্ভাবনার সঙ্গে চিন্তা করেছেন, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মের কথা বলেছেন, যে-ধর্ম প্রজাদিগকে ধারণ করে, তাকে ম্যালথুসীয় ভাবধারার দ্বারা সংশোধিত করে কি করে ম্যালথুসীয়দের আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করা যায়। এই রাষ্ট্রের তিনি নাম দিয়েছেন, দনুজরাজ্য [অর্থাৎ, দাসরাষ্ট্র] এই রাজ্যের শাসকবর্গ 'সমাজহিতৈষী কিন্তু নির্মম' [অর্থাৎ খুনী অথচ মানবপ্রেমিক], এই রাষ্ট্রে রুগ্ন ক্ষুধিত ও বৃদ্ধদের হত্যা করা হবে এবং এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য 'পরিমিত সংখ্যক প্রজার কল্যাণ ও উৎকর্ষসাধন' [অর্থাৎ শাদা বাঙলায় মনোপলিস্টদের ধনবৃদ্ধি]। আজীবন শাস্ত্রচর্চার পর জনসাধারণের প্রতি প্রবীণ সাহিত্যিকের এই অবজ্ঞা ও নির্মমতা দেখে দুঃখিত মনে ভাবি, দুর্দৈব আর কাকে বলে। 'অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতা'র সাধক সন্দীপও একদিন এই সত্য আবিষ্কার করেছিল : 'কোন এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তাহলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাত নেই'। কিন্তু রাজশেখরবাবু মনে করেন তাঁর সঙ্গে 'পাঁচুর' এতই তফাত যে পাঁচুর বেঁচে থাকারই অধিকার নেই। সন্দীপ যা বুঝতে পেরেছিল আমাদের জাতীয় নেতারা যদি তা বুঝতে আরম্ভ করেন তাহলে জাতিচরিত্র গঠনের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

নবাঙ্কুর—সুলেখা সান্যাল ।। গ্রন্থাগার ।। চার টাকা ।।

"নবাঙ্কুর" বাঙলা দেশের বালিকা-মনের বিশিষ্ট এক আত্মপ্রকাশের চিত্র। বাঙলা সাহিত্যে নারী-চরিত্রের সার্থক চিত্রের অভাব নেই। বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র কেন, আহেলি 'স্নবারি অ্যান্ড্ সফিসটিকেশন'-সাহিত্যেও নারী-চরিত্র সুপরিজ্ঞাত—নিউরোটিক, উদ্ভট, চলচ্চিত্ত, খেয়ালী, যা-ই হোক তাদের স্বভাব, তারা চোখে পড়ে। আশাপূর্ণা দেবীর মতো নারী লেখিকাও আছেন, যাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা সত্যসত্যই শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও 'নবাঙ্কুর' বিশিষ্ট এবং শুধু বিশিষ্ট নয়, এক নতুনের সার্থক আভাস।

বিশিষ্ট। কারণ, বালিকা-মন এ-পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে ঠিক এরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে কিনা জানি না। 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দ থেকে 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার কথা মনে রেখেই একথা বলছি। 'পথের পাঁচালী' অপুর কথা, দুর্গার কথা নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ দুর্গাকে সরিয়ে রেখেও সরিয়ে রাখতে পারেন নি, তাই শেষ পর্যন্ত একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। বাঙালী বালিকা লেখকের স্নেহ লাভ করলেও লেখকের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। বাঙালী সংসারেও কি তার আসনটা এরকমই নয়? মা, বাবা, পিসি, সকলেই জানেন—ছবির মেয়ে-জীবনে অনেক লাঞ্ছনা অনিবার্য; কিন্তু তাই বলে কি মণিদা আর সে সমান? ছেলে আর মেয়ে এক কথা? বহু-বহুদিনের পুরুষ কর্তৃত্বে এ-ধারণা যে বাঙালী পরিবারের মধ্যেও কত নিষ্ঠুর এবং নিশ্চেতন সত্যে পরিণত হয়েছে, এ-পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে তার উল্লেখ দেখি নি। রায়বাড়ির ছবির সংবেদনশীল মনের মধ্য দিয়ে প্রথম তা চোখে পড়ল। এই ক্রমস্ফুট বালিকা-চিত্তের মধ্য দিয়ে অবশ্য শুধু গঞ্জনার দিকটিই উদ্‌ঘাটিত হয় নি, বরং তার সংবেদনশীল মন মায়ের মুখে, বাপের চিত্রে এই কথাটাই পরিষ্কার করে তুলেছে—বাঙালীঘরের স্নেহ-মায়া-মমতার কতখানি নির্মল ধারা এই সংস্কারের পীড়নে শুকিয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়। ছবিও সার্থক তার মেয়েসুলভ বাস্তব-চেতনার জন্য আর তার নিজস্ব সুকুমারচিত্তের এই অনুভূতি-সম্পদের জন্য। ছবি মেয়ে, অপুর মতো কল্পনাপ্রবণ নয়, বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষাও মানুষ তার জীবনবোধ অধিক প্রবুদ্ধ করে। নিজের পরিবারের মানুষ, গ্রামের

পাঠশালার সখী ও সঙ্গিনীরা, অধীরকা ও মায়া, শহরের পিসিমা-পিসেমশায় ছাড়াও সরমা-'পিসি', নিলু, পিলু, পরীবানু, মিনু, আর তার দাদা অসীম—যে তার কিশোরীমনকে প্রথম চকিত করে ; সাধনদা—ছবির মনে যে প্রথম প্রণয়চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ; তারপরে ফিরে-আসা গ্রামের সেই মন্বন্তর আর ফ্রি-কিচেনের ওয়ার্ক-হাউসের সুখদা,তমাল—যে তার কিশোরী চিত্তের প্রথম ভালোবাসা লাভ করল, আর রায়বাড়ির ভেঙে-পড়া সংসারের সেই কাকা, বাবা, দাদু ও মা-কাকিমারা—বালিকা থেকে তরুণীর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষায় যে-ছবি ক্রমে জাগ্রত হয়ে উঠল তা এইসব মানুষদের সম্পর্কে, তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে বিচিত্র সহানুভূতির বলে, আপনার বুদ্ধি ও হৃদয়ের সম্পদে। তবু যেখানে ছবি আত্মসচেতন তরুণী হয়ে উঠছে, সেখানে কিন্তু সে বা তমাল তত সুস্পষ্ট নয়। এই মানুষদের সঙ্গে এই আত্মিক যোগ না ঘটলে ছবির দেখা এই অজস্র মানুষ এমন জীবন্ত, এমন আশ্চর্য সত্য হয়ে উঠত না। নভেলের কাহিনীর তুলনায় তারা অনেকে অবশ্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ছবির বিকাশের দাবিতে তারা প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয়—এমন বিশিষ্ট ও বিচিত্র মানুষের অজস্র চিত্র সচরাচর কোনো বাঙলা উপন্যাসে দেখেছি বলে বলতে পারি না। সুলেখা সান্যালের শক্তি এদিকে অসাধারণ ও অফুরন্ত। কাহিনীর সামগ্রিকতার দিকে চেয়ে তিনি যদি ভবিষ্যতে নিপুণ গৃহিণীপণার সঙ্গে তা পরিবেশন করেন, তবে তাঁর কীর্তি অবিস্মরণীয় হবে। কারণ, এত মানুষকে এত নিজস্ব শ্রীতে দেখবার ও আঁকবার ক্ষমতা কম স্রষ্টারই থাকে।

মানব-কেন্দ্রিক বলেই সুলেখা সান্যাল তাঁর সত্যনিষ্ঠায় সমকালীন জীবনসমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কোনো 'পথের পাঁচালী' রচনা করতে অগ্রসর হন নি। বাঙলা দেশের মেয়েদের পক্ষে—নিতান্ত কল্পনাজীবী না হলে—আত্মকেন্দ্রিক হওয়া হয়তো অসম্ভব। সংসার রূঢ়ভাবেই তাদের সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং হাঁড়িকুড়ির মধ্যেই নির্জীব ও নিঃশেষ হতে শেখায়। বাঙলা দেশের মেয়েদের সৌভাগ্য সে-কাল শেষ হয়েছে ; কঠিনতর, জটিলতর কাল হয়তো এসেছে। কিন্তু একালটা ছবির মায়ের মতো সহনধর্মের কাল নয় ; বরং ছবি, দুর্গা, মায়া আর মণিদা-অধীরকার মতো দহনধর্মের মানুষের কাল। সুলেখা সান্যালের ছবি চোখ মেলতেই

দেখল, তার গ্রামের আদর্শস্থানীয় যুবক অধীর রাজনৈতিক দুঃসাহসিকতার জন্য বন্দী হয়ে চলল জেলে—বোধহয় সেটা উত্তর-ত্রিশ বাঙলা দেশের দহন-জ্বালার দিন। তারপর লেখাপড়া শিখতে শিখতে কৈশোরের সীমানায় পা দিতেই ছবি দেখল পূর্ববাঙলার কিশোর অসীমদা স্বপ্ন দেখছে টেগরার মতো রিভলভার হাতে সে মরবে; দেখল আকাশ ছেয়ে নামছে যুদ্ধের মেঘ আর তার তলায় সুধাদি, শোভাদিরা গেলেন জেলে; দেখল মন্বন্তরের ছায়ায় দ্বীপান্তর-ফেরা যক্ষ্মাগ্রস্ত সেই গণবিপ্লবী অধীরকাকে আর তার মায়ার প্রেমের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। তারপর ছবি—রায়বাড়ির সেই ছবি—দাদুর বিরুদ্ধে বংশের ঐতিহ্য উড়িয়ে একদিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফ্রি-কিচেন-ওয়ার্ক-হাউসের কাজে, আর-একদিকে বিদ্রোহিনীর মতো পরিবার-নির্দিষ্ট বিবাহ-সম্বন্ধ অস্বীকার করে চলল লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের অভিযানে। বাঙলা দেশের উত্তর-ত্রিশের মেয়ে সে—প্রথম দশকের অপু নয়, যাদের পথের পাঁচালী শেষ হয় স্বপ্নমায়ায়। ছবি সেই দিনের মেয়ে যাদের কৈশোর-যৌবন জেনে না-জেনে এগিয়ে গিয়েছে জীবনের অভিযানে। সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর' সেই অঙ্কুরায়মান নতুন সত্যের স্বাক্ষর—মেয়েদের 'পথের পাঁচালী' নয় জীবনের অভিযান, স্বপ্নমাধুর্যে ভরা নয় সংগ্রামে-সত্যে পূর্ণ। আর এ সত্য রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক তথ্যে ভারাক্রান্ত না হয়ে মানুষের সম্পর্কে শিল্পের প্রকাশ-সৌন্দর্য লাভ করতে পেরেছে। এইখানেই লেখিকার কৃতিত্ব।

'নবাঙ্কুর' ত্রুটিহীন উপন্যাস নয়। তার কাহিনীতে লেখিকা আরেকটু সংহতি আনতে পারতেন, মানুষের চিত্রে আরেকটু শিল্পবৈচিত্র্য আনতে পারতেন, আঙ্গিকে আরও কুশলী হতে পারতেন—এসব বলা যায়। কিন্তু তা বলা যায় এজন্য যে 'নবাঙ্কুর' সার্থক এবং সম্ভাবনায় উদ্‌ভাসিত।

গোপাল হালদার

জনপদের ছন্দ—(রাহুল) রামেন্দ্র দেশমুখ্য ॥ অগ্রণী বুক ক্লাব ॥ সাড়েতিন টাকা

সতুবস্তির রোজনামচা—সতুবস্তি ॥ নতুন সাহিত্য ভবন ॥ দুটাকা বার আনা

একসঙ্গে—গোলাম কুদ্দুস ॥ ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি ॥ দুটাকা

রম্যরচনা বলতে কী বোঝায় জানি না। একটি সমালোচনায় দেখেছিলাম, সমালোচক এবম্বিধ রচনাকে প্রবন্ধ উপন্যাস প্রভৃতি ভাগের মতো নতুন একটি ভাগ বলে অভিহিত করে সাহিত্যের চতুরঙ্গ পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। অথচ মুশকিল এই যে বঙ্গীয় রম্যরচনা বলে যে বস্তুটি অধুনা আবির্ভূত হয়েছে তার কোনোটি নিছক উপন্যাস, কোনোটি নিতান্তই ভ্রমণ, কোনোটি বা ব্যক্তিগত রচনা, লঘু রচনা। তথাপি যদি একটি ভ্রমণ, একটি উপন্যাস বা একটি ব্যক্তিগত নিবন্ধমালাকে রম্য রচনা নামক সাধারণ শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত করতেই হয় তবে এদের মধ্যে শুধু একটি সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কারই সম্ভব—তা দুর্ভাগ্যবশত সাহিত্যের চতুর্থ অঙ্গগত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, নিতান্তই আঙ্গিকগত প্রভেদ। রম্যতা বলতে যা প্রকাশকেরা বোঝাতে চান এবং কিছু পাঠক বুঝতে অভ্যস্ত হন, তা আসলে হল লেখার বিশেষ কোনো বিভাগ নয়, বিশেষ একটা বিভঙ্গ—একটা চাল। লেখকভেদে সে চালের নানা ইতর বিশেষ, নানা ক্ষমতা অক্ষমতা সম্ভব কিন্তু একটি লক্ষ্যে মনে হয় সকলেই একমত—পাঠকদের কিছু বলতে হবে তা নয়, কিছুক্ষণ ভোলাতে হবে। সুরের লঘুতা, প্রসঙ্গের খেয়ালীপনা, আকস্মিক আদিখ্যেতা—এ সব এ চালের অঙ্গীভূত। এবং সেই জন্মেই এ জাতীয় রচনা নিন্দনীয় একথা বলি না। কারণ আপাত গুরুত্বের অভাব আছে বলে লঘু রচনার জাত যায় না, জাত যায় যদি তাতে ফাঁকি ঘটে সত্যের এবং সততার। 'রম্য'-রচনার রম্যতায় অধুনা যেখানে মিছরির ছুরি চলছে সেটা ঠিক এই হৃৎপিণ্ডেরই জায়গা।

রাহুলের 'জনপদের ছন্দে' এই ছুরির উৎপাত চোখে পড়বে। বইটি আসলে বিভিন্ন জনপদে লেখকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ, কিন্তু সোজাসুজি ভ্রমণ বা রিপোর্টাজ হিসাবে না গড়ে রচনাটিকে রম্য রূপে গড়তে চেয়েছেন লেখক। অথচ উপকরণ এবং বক্তব্যে বইটি রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। রহস্যময় নাগা গ্রাম থেকে শুরু করে অন্ধ্রের জনপদ, বোম্বের সমুদ্রতীর অনেক জায়গার অভিজ্ঞতা লেখকের আছত্তে। এতখানি লেখার মধ্যে লেখক শুধু বাইরের বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত নন, জনজীবনের ধিকিধিকি আকাঙ্ক্ষার ছবিও তিনি আঁকতে পারেন। বক্তব্যেও তিনি ক্ষমাহীন—এ সমাজটা বদলে নতুন একটা সমাজ গড়ার আকুতি

তৈরি করার জন্য সচেষ্ট। অথচ এতবড়ো একটা কথা উপস্থিত করতে গিয়ে লেখক কেন যে রম্যরচনা প্রলোভনে পা দিলেন জানি না। তার ফলে নাম গোপন করে নায়ক সাজতে হয়েছে, অসংলগ্ন হতে হয়েছে, এমন পরিস্থিতির অবতারণা করতে হয়েছে যা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় এবং চরিত্রগুলি (অধিকাংশই নারী) প্রায় প্রথম দর্শনেই তাদের জীবনের নানা কাহিনী অবলীলাক্রমে উদ্ঘাটিত করে দিতে এবং উদ্ঘাটিত হতে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই ভাবতে হয়, জনপদের ছন্দের উদ্দেশ্য সৎ হলেও সৎসাহিত্য হতে পারল কি ?

গোলাম কুদ্দুসের 'একসঙ্গে' ও একটি ভ্রমণের কাহিনী। তবে তা কোনো বিচিত্র দেশের অভিজ্ঞতা নয়, একদল ধর্মঘটী মজুরের সঙ্গে পায়ে হেঁটে, বাঙলার গ্রাম জনপদ পার হয়ে রানীগঞ্জ থেকে কলকাতা এসে পৌঁছুনো। রানীগঞ্জ সেরামিক কারখানায় মজুরেরা দীর্ঘদিন ধর্মঘটের পরেও যখন মালিক এবং সরকারকে টলাতে পারল না তখন দেশের লোকের কাছে তাদের সংগ্রামের কাহিনী উপস্থিত করার জন্য তারা মিছিল করে হেঁটে এল কলকাতায়। আসতে আসতে অভিনন্দন পেল দুপাশের কৃষক অঞ্চল থেকে, শহরতলীর মজুর এলাকা থেকে, দেশপ্রেমিক জনসাধারণের কাছ থেকে। কবি গোলাম কুদ্দুস এই অভূতপুর্ব শ্রমিক যাত্রার সঙ্গে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন স্বাধীনতার রিপোর্টার হিসাবে। 'একসঙ্গে' তারই দিনলিপি। প্রসঙ্গের অভূতপূর্বতার জন্যই এ বই পড়া দরকার।

কিন্তু উত্তেজনার তাৎকালিক মুহূর্ত পার হয়ে যাবার পরে একটি প্রশ্নও মনে জাগে। প্রকরণ-পদ্ধতিতে রাহুল যা বেছে ছিলেন, গোলাম কুদ্দুসের রীতি ঠিক তার বিপরীত। রম্যরচনায় আঙ্গিকটাই যদি অতিকায় হয়ে থাকে, কুদ্দুস সাহেবের কাছে আঙ্গিকটাই হল সবচেয়ে উপেক্ষার বস্তু। ঘটনার বিষয়ে এতটুকু কল্পনার খাদ মেশাতে তিনি নারাজ। নিজের চোখে যেটুকু দেখেছেন শুধু তাই নয় যেভাবে দেখেছেন শুধু সেইটুকুই এবং প্রায় সেই ভাবেই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আশঙ্কা হয় এতেও ফল শুভ হয় নি। কেননা, একজন রিপোর্টারকে যেভাবে নিতান্ত হেঁটে চলা ও কোনোক্রমে রিপোর্ট লেখার জন্য এ ক্ষেত্রে সর্বক্ষণ নিযুক্ত থাকতে হয়েছে তাতে নিতান্ত ঘটনা ছাড়া শ্রমিকদের পেছনকার মানুষগুলোকে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ

মিলেছে কম। তদুপরি ঘটনা হিসাবেও তেমন বড়ো কিছু এখানে ঘটেনি। এবং যথাযথ বিবরণ সত্য হলেই আকর্ষণীয় হবে এমন কথা নেই। অথচ সব মিলিয়ে তাৎপর্যটি কিন্তু অতি বৃহৎ। তার ফলে দুটি অংশ মিশ খায়নি। বর্ণিত ঘটনা ও মানুষজন এবং বক্তব্যের ভাবাবেগ উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের ব্যক্তিগত সততা ভালো লাগে কিন্তু সাহিত্যের সত্য কি তাতে মেটে? অন্তত কবি গোলাম কুদ্দুসের কাছে পাঠকদের প্রত্যাশা বোধহয় তার চেয়ে কম নয়।

সতুবিদ্যর বিষয়বস্তু ভিন্ন। রোগী আর রোগিণী নিয়ে তাঁর রোজনামচা। অভিজাত বাড়ি, মধ্যবিত্ত বাড়ি, গরিব বস্তি, মজুর—নানা মানুষের রোগ-যন্ত্রণার মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে সতুবদ্যিকে, চিকিৎসা করতে হয়েছে এবং অনুভব করতে হয়েছে "দুনিয়ার অনেক দেশের লোক কোটি কোটি মানুষ যোগ দিয়েছে চলার মিছিলে। কিন্তু সতুবদ্যির নিজের দেশের লোক খালি ঠোকর খাচ্ছে অচলায়তনের প্রাচীরে।"

বলতে হয়েছে, 'গোটা দুনিয়াটাকেই ঢেলে সাজতে হবে? সতুবদ্যি কি তা পারবে?'

অন্তত এ পারার প্রথম কাজটা তিনি পেরেছেন। রোজনামচার মধ্য দিয়ে যে কাহিনীগুলি তিনি হাজির করেছেন, তা পাঠকদের আলোড়িত করবে নিঃসন্দেহে। তাঁর কলমকে স্বাগত।

প্রকরণের দিক থেকে সতুবদ্যি ওপরের দুই চূড়ান্ত মেরুর মাঝামাঝি, কিংবা ঠিক মাঝামাঝি নন, হয়ত রম্যতার দিকেই একটু বেশি ঝুঁকেছেন। ডাক্তারের রোজনামচা—কিন্তু যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং একেবারেই নয়। কল্পনার খাদ তাতে মিশেছে, হাজির করার ধরনে আছে সচেতন প্রয়াস। ভালো লাগাবার জন্য এমনকি প্রযুক্ত হয়েছে তথাকথিত রম্যরচনার নানা গৌণ লক্ষণ, যথা অপ্রাসঙ্গিক আলাপ, অপ্রত্যাশিত রসিকতা ইত্যাদি। কিন্তু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, যখন দেখি, তাঁর রম্যতার ছুরি রচনার হৃৎপিণ্ডটার কাছে এসে হঠাৎ সরে দাঁড়িয়েছে সভয়ে। আপাত চাপল্য ভিজে উঠেছে জীবন্ত প্রাণের কান্নায় আর নালিশে। এদিক থেকে 'মাতৃদর্শন', 'রাম ভরোসের হাসি' আর 'রোজ কেয়ামত' অপূর্ব।

তবে সর্বত্র নয়। কান্না আর নালিশের সঙ্গে হাসি মিশলে সুন্দর হত যদিও

সর্বত্র মেশেনি। মাঝে মাঝে নিতান্তই স্থূল লাগে তাঁর রসিকতা। আশা রইল—এ দোষ কাটাতে তাঁর মতো জাতবস্থির বেশি সময় লাগবে না।

সত্যেশ রায়

দ্বন্দ্ব—চেখভ ॥ অনুবাদঃ রাম বসু ॥ ক্যালকাটা বুক ক্লাব ॥ তিন টাকা ॥

পূর্বাভাষ—ইভান তুর্গেনিভ ॥ অনুবাদঃ রাম বসু ॥ তারা লাইব্রেরী ॥ তিন টাকা ॥

সিসটার ক্যেরী—থিয়োডোর ড্রাইজার ॥ অনুবাদঃ ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ॥ মিত্রালয় ॥ চার টাকা ॥

জীবনস্মৃত—লিও টলস্টয় ॥ অনুবাদঃ বিমল রায় ॥ ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড ॥ দু টাকা ॥

বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্য এতদিনে সাবালক হয়েছে বলা যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে অতীতকালে উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশিত হত না, বা গতযুগের সাহিত্যরথীরা এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। একটা কথা তবু স্বীকার্য যে, এ প্রচেষ্টা তখনও ব্যাপকতা লাভ করতে পারে নি। কাজ যেটুকু হয়েছে, তা হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দমকে দমকে। সুখের কথা, এখন অনুবাদ সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের একটা সমৃদ্ধ শাখারূপে গণ্য হয়েছে। প্রতিমাসেই কিছু না কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদের একটা নিম্নতম মান রক্ষিত হচ্ছে। পাঠক হিসাবে একটা তবু অভিযোগ থেকে যাচ্ছে—অনুবাদের কাজে এখনও তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। অনেক আজেবাজে বই-এর তর্জমা বেরোচ্ছে অথচ বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আজও ইংরেজি-না-জানা পাঠকদের কাছে অনধিগম্য থাকছে।

আলোচ্য গ্রন্থ চতুষ্টয় সম্পর্কে অবশ্য তেমন কথা বলা চলে না। বরং এই বই কখানা এতদিন যে বাঙলা ভাষায় অনুদিত হয় নি—তার মধ্যেই আমার অভিযোগের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়।

সবকটি অনুবাদের মধ্যে নিষ্ঠা এবং যত্নের পরিচয় আছে। অনুবাদে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য। রাম বসু ভাষা নিয়ে কিছু পরীক্ষা করেছেন। তার ফল কিন্তু সবসময় ভালো হয় নি।

শচীন বসু
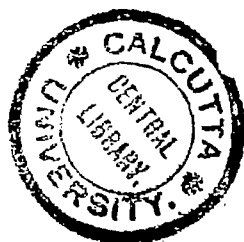
আড়াই হাজার বছর পরে

গোপাল হালদার

বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্র আকাশের প্রান্তে দেখা দিচ্ছে।

অপরাহ্নের ছায়ায় ছয়-রঙের ছোটবড় পতাকার ঢেউ তুলে তিব্বতী লামা, বর্মী শ্রমণ ও সিংহলী ভিক্ষুদের ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা রাজপুরুষদের সম্মুখে নিয়ে সভাক্ষেত্রে চলে গিয়েছে। পীত রেশম-বস্ত্রে আচ্ছাদিত বজ্রাসন দিগ্‌দেশের ভক্তদের ময়ূরপালকে, বিচিত্র বর্ণের চীনাংশুকে, পুষ্পহারে সুসজ্জিত; প্রদীপসজ্জার শান্তশ্রীতে সমুজ্জ্বল। বোধিদ্রুমের শাখায় শাখায় তিব্বতী ভক্তদের বিচিত্র বর্ণের পতাকা, চিত্রাঙ্কিত, মন্ত্রাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ড মন্দবায়ুতে ঈষদান্দোলিত। দ্রুমচ্ছায়ায় সহস্র প্রদীপের আধারে অনন্যচিত্তে নারিকেল তৈল প্রদান করে চলেছেন লঙ্কার ভাগ্যবতী গৃহস্বামিনী। সুবেশা বর্মী সুন্দরী ভক্তিনম্র মুখে করজোড়ে প্রার্থনা করছিলেন, প্রণাম করে উঠে গেলেন। দরিদ্রা, প্রৌঢ়া সামান্যবেশিনী বাঙালী মাতা—পশ্চাতে তাঁর বাঙালী বালকপুত্র—পাকিস্তানের ছাড়পত্র নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন, আরতির প্রদীপের আভা ছোঁয়াচ্ছেন পুত্রের মাথায় ও মুখে। নতজানু হয়ে সেইখানটিতে বসে এখন তিনি মাথা লুটিয়ে দিলেন বোধিদ্রুমের পদতলে।

অপরদিকে মুদিত নেত্রে বর্মী সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবার প্রণাম শেষ করে যাচ্ছেন ; সেইখানটিতে সংকোচে, শ্রদ্ধায় ক্লান্তদেহ বাঙালী গৃহকর্তা প্রার্থনায় এসে বসেছেন। দক্ষিণের এই চত্বরে নবশষ্পাচ্ছন্ন প্রশস্ত মঞ্চে বর্মী ভিক্ষুরা জন কয় ধীরে ধীরে এলেন ; সম্মুখে নিজনিজ হরিদ্র বস্ত্রখণ্ড বিস্তার করে নতজানু হয়ে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন ; তারপর স্থির হয়ে ধ্যানাসনে বসলেন—সার্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বেকার ধ্যানী বুদ্ধের মতো নিস্তব্ধ, প্রশান্ত।

বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্র আকাশের প্রান্তে উঠে এসেছে সার্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বেকার মতো।

দামোদর উপত্যকার বাড়তি বিজলির আলোকপ্লাবনে মহাবোধি মন্দিরের বিমান পর্যন্ত উদ্‌ভাসিত। বেতারযন্ত্র ধাতবকণ্ঠে বারেবারে তাড়না করে যাচ্ছে—রাজ্যপাল সভায় সমাসীন ; সভাক্ষেত্রে 'আ যাইয়ে ভাইয়োঁ, বহিনোঁ'। 'অশোক-বেষ্টনী'র পাশ দিয়ে উৎসবমুখর নরনারী সোৎসুক দৃষ্টিতে মন্দির দেখে চলেছেন, অভ্যন্তরে স্বর্ণাভ বুদ্ধমূর্তিকে প্রণাম করছেন, ফিরে আসছেন, সোপানাবলী অতিক্রম করে আলোকস্নাত দ্বিতলে এসে দাঁড়াচ্ছেন—দেখতে, নিজেদের দেখাতেও। বিচিত্রবেশী, বিচিত্রভাষী, বিচিত্রচিত্ত একালের ভারতবাসী! বিলাসে-সারল্যে, ঐশ্বর্যে-দৈন্যে, পঞ্চাল-প্রসাধনে, বিহারী বস্ত্রসংকোচে, অর্থহীন কলভাষণে, নিরর্থক কটুভাষণে, ইংরেজী আর্ষপ্রয়োগে, দেহাতী দুর্বোধ্য বুলিতে, ভ্রষ্ট আচরণে, শিষ্ট মর্যাদায়, প্রশাসনিক উচ্চপ্রচারে ও বিশৃঙ্খল ব্যবস্থায়, বিংশ শতাব্দীর বৈষয়িক স্থূলতায় ও বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক উদ্যোগবিস্তারে একালের ভারতবর্ষ তার আড়াই হাজার বৎসরের স্বপ্ন ও সত্যকে একই সময়ে আত্মবিস্তারের উৎসাহে ও গাম্ভীর্যহীন গর্বে পুনরবলোকন করছে ; সহস্র হস্তের করতালি বাজিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে তার নবপ্রতিষ্ঠিত স্বরাজ-নেতৃত্বের এই আত্ম-পরিতৃপ্ত মুখরতাকে—মহাপরিনির্বাণ উৎসবের 'ভাষণ'-বন্যাকে। কুতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে সহস্র বৎসরের বনজঙ্গলের মধ্য থেকে তাদেরই অর্থে নবীন পরিচ্ছন্নতায় পুনঃপ্রকাশিত মহাবোধি মন্দিরের চৈত্যস্তূপাকীর্ণ প্রাঙ্গণ, তার পার্শ্বস্থিত ভগ্নসোপান পদ্মসরোবর, তার অযত্ন-লাঞ্ছিত তীর্থমহিমা। শ্যামল সযত্ন-লালিত শষ্পমঞ্চে বসে আমি আজ দেখছি আড়াই হাজার বৎসরব্যাপী সেই

সম্যগ্ সম্বুদ্ধের সাধনা, আজকের ভারতবর্ষ, তার বাস্তব স্থূলতা ও মহৎ অভীপ্সা।

বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্র আকাশে উঠছে—আড়াই হাজার বৎসর ধরে যেমন উঠেছে আর দেখেছে ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়ের মধ্যে মহাবোধির মহাশ্রমণকে, তাঁর নির্বাণের সাধনাকে। দেখছে আজকের এই অনুভূতিহীন উৎসবের বিশৃঙ্খল আয়োজন, আর দিগ্ দেশাগত ভক্তিবিনম্র নরনারীর পূজা ও প্রার্থনার সহজ শ্রী ও সৌন্দর্য। দেখছে—স্থূলতায় শ্রদ্ধায় মেশানো আজকের ভারতবর্ষ। আড়াই হাজার বৎসরের বৈশাখী পূর্ণিমার সেই চন্দ্র জানে আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাস—তার উত্থান ও পতন, পরিণাম ও অভিপ্রায়।

বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্রে রাহুগ্রাস দেখা দিচ্ছে।

লীলা, আমি কেন এলাম এখানে, এই রাহুগ্রাসের চন্দ্রমাচ্ছায়ায় মহা-বোধির তীর্থপ্রাঙ্গণে?

আড়াই হাজার বৎসর ফিরে আসবে না। ক্ষণিক প্রভায় জ্বলে জ্বলে তা এগিয়ে এসেছে, এগিয়ে যাবে। এক নদীতে দুবার কেউ অবগাহন করে না। সর্বম্ ক্ষণিকম্, সর্বম্ অনিত্যম্—হে নাগসেন, আমি জানি তোমার এই উত্তর। আমি তা মানি না, কারণ আমি ইতিহাসের প্রবুদ্ধ ছাত্র। জিজ্ঞাসু মিলিন্দ আমি সেই দেবতার সম্মুখে। একালের এই 'মিলিন্দপঞ্হো' নিয়েই আমি এসেছি এই মহাবোধির সমীপে মহাপরি-নির্বাণের উৎসব-দিনে। হে ইতিহাস, কী উত্তর তোমার?

আমি কেন এলাম, লীলা? আমি বৌদ্ধ নই, বুদ্ধভক্তও নই। হিন্দু নই, যজ্ঞে-পূজায় বিশ্বাস রাখি না। আমি মুমুক্ষু নই, নির্বাণেও আমার প্রয়োজন নেই। আমি বিংশ শতকের মানুষ, ভারতবর্ষের সন্তান, অশান্ত বাঙলার অশান্ত শিশু মানুষকে গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। প্রণাম মানুষকে।

বুঝি প্রঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্র এমনি করে উঠেছিল মেঘনার আদিগন্ত জলরাশির মধ্য থেকে। বামে আকাশে আঁকা সুপারি-নারিকেলের শ্যাম বনরেখা; দক্ষিণে তরঙ্গ-চূর্ণিত দিগ্ বলয়; মাথার উপরে

মন্দ-শিহরিত ঝাউবীথির গুঞ্জন ও সম্ভাষণ; আকাশের নীল গঙ্গায় রজতস্রোতের প্লাবন; তলায় পৌরগ্রন্থাগারের শ্যামল প্রাঙ্গণে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে উত্থিত হচ্ছিল ত্রিশরণ মন্ত্র :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

দূর পূর্ব বাঙলার ক্ষুদ্র শহর নোয়াখালিতে আমরা বৎসরে বৎসরে তখন বৈশাখী পূর্ণিমায় "ভগবান তথাগতের স্মৃতিপূজার আয়োজন" করতাম। ত্রিশরণ মন্ত্রে তার উদ্‌বোধন হত আর রবীন্দ্রনাথের গানে গানে তার পরিসমাপ্তি ঘটত। আড়াই হাজার বৎসরের চাঁদ স্মিত কৌতূহলে দেখেছে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার সেই আয়োজন—আমরা স্মরণ করছি ভগবান তথাগতের কথা; আমরা বরণ করছি ইতিহাসের মধ্যে ভারতবর্ষের কল্যাণময় প্রকাশ; আমরা গ্রহণ করছি অন্তরের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্ভাবনা।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার সেই রাজপুত্রের মানবমৈত্রীর সাধনা পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল 'মানবমঙ্গল মণ্ডলী' গঠনে। সেখানে কাশ্যপ ছিল না, আনন্দ ছিল না, বিম্বিসার বা অনাথপিণ্ডদের প্রয়োজন ছিল না। ছিলাম আমরা কয়জন বন্ধু, অগ্রজ ও অনুজ, একই যৌবনতীর্থের সতীর্থ। আজ তারা কেউ আছি কেউ নেই। কেউ সওদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি, কেউ সরকারি আপিসের গরিষ্ঠ করণিক, কেউ উচ্চ শিক্ষালয়ের অভাগা অধ্যাপক, কেউ রাজনৈতিক আন্দোলনের হতভাগা উত্তরসাধক! জেনে ও না-জেনে আমরা সেদিন নিজেদের মধ্যে অনুভব করেছিলাম শাস্ত্রশাসনমুক্ত মানুষের নবজন্মের দাবি, বুদ্ধের মতোই 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা'। সে প্রয়োজন আমরা প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করতেও দ্বিধা করি নি। অবশ্য তাতে ক্ষুদ্র শহরের বয়োজ্যেষ্ঠদের বিরাগ ও বিভীষিকা ছাড়া আর যে আমরা কী উৎপাদন করেছিলাম তখন তা জানি নি! কিন্তু বৎসর পাঁচ-সাত পরে জানলাম তা ব্রিটিশরাজের প্রচ্ছন্ন পুলিসের শঙ্কা ও সংশয় উৎপাদন করেছিল। 'মানবমঙ্গল মণ্ডলী'র নামটি গাঁথা হয়ে আছে কলকাতার লর্ড সিংহ রোডে আমার নামের গোপনীয় ফাইলে।

সংশয়ের কারণ তাদের না ছিল তা নয়। কারণ, তৃতীয় দশকের সেই মধ্যভাগে তখনো এদেশের জীবন-জিজ্ঞাসা গান্ধীবাদকে অতিক্রম করে গেলে যার আশ্রয় গ্রহণ করত সে হয় শাস্ত্র নয় শস্ত্র। আমরা দুইই অগ্রাহ্য করে চাইলাম প্রাণের উদ্‌বোধন—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'! একটা লোকায়ত জীবনদর্শন ও মানবমঙ্গলের অস্পষ্ট আদর্শ নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম। চলেছিলাম নিশ্চয়ই বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক সমাজদর্শনের পথের টানে। ক্ষণে ক্ষণে ইতিহাসের উড়ো পাতার ক্ষীণ লেখন-পাঠে আমার চোখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তখন। কিন্তু সাধ্য কি তাই বলে তখন পাঠ করি বিশ্ব ইতিহাসের নতুন যুগের উদয়বাণী, মার্কসীয় মানব-ধর্মের অবশ্যম্ভাবী বিজয়যাত্রা। সময়ের সরণি বেয়ে একদিন আমি সেখানে পৌঁছলাম বটে, কিন্তু সে অন্তত আরো দশ বৎসর পরে। সেই ১৯২৫ এর গোয়েন্দাবিভাগের চরেরা কি করে জানবে আমার সেই অনাগত পরিণামের বার্তা? তবু সতর্ক সংশয়ে তাঁরা এই 'মানব-মঙ্গল-মণ্ডলী'র জন্মবার্তা লিখে রেখে গিয়েছেন তাঁদের অনুশাসনপত্রে। আর তাই হয়তো পূর্বাভাস আমার নবজন্মের জন্মপত্রিকার—কখন কোন দিক দিয়ে একালের মানবিকতার পথ এসে মিশেছে একালের সাম্যবাদী সাধনায়। আধুনিক জীবনের শিক্ষাদীক্ষায় কেমন করে বাঙালী প্রাণ একশত বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় রিনাইসেন্সের মানবমর্যাদাবোধ ও ফরাসি বিপ্লবের মানব অধিকারবাদের তাড়নায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। কেমন করে তা এগিয়ে গিয়েছে জাতীয় স্বাধীনতায় মুক্তির বুদ্ধিতে ও বুদ্ধির মুক্তিতে। কেমন করে ভারতের জাতীয় আত্মাধিকারের সাধনা সর্বজাতিক আত্মাধিকারের চেতনার অঙ্গরূপে নিজেকে চিনতে শিখেছে। কেমন করে জীবননিষ্ঠা ও মানবনিষ্ঠা হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিভ্রান্তিজাল ছিন্ন করে গীতার ও বেদান্তের পরমার্থিক ভাবজাল অপসারিত করেছে, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বৈজ্ঞানিক সমাজবিন্যাসের বৈপ্লবিক সাধনায়। কেমন করে আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সভ্যতা আমার কাছে দিনের পর দিনে সত্য হয়ে উঠেছে এই জীবন্ত কালের জীবন্ত ভারতবর্ষের মধ্যে, সমগ্র মানুষের বিচিত্র সভ্যতার কেন্দ্রানুগ এই বিশিষ্ট ও নবায়মান প্রকাশে। কেমন করে আমি পেলাম ইতিহাসের সহস্রভাষী কণ্ঠে এই

উত্তর—আমি মিথ্যা নই, ভারতবর্ষ মিথ্যা নয়, আর 'সবার উপরে মানুষ সত্য'!

সত্যই এ উপলব্ধি আমার অন্তরে এল কি করে? লীলা, আমি এযুগের মানুষ বলে, আর আমি বাঙালী বলে, এযুগের বাঙালী বলে, নাথপন্থী ও চর্যাপদের বাঙালী বলে, সহজযানের বাঙালী বলে, বৈষ্ণব সহজিয়া বাঙালী বলে। সেই 'সহজে'ও তাই আমি বিশ্বাস রাখি না যে 'সহজ' আসলে মানুষ নয়, নির্বিশেষ আত্মামাত্র। আমি চাই সংসারের মানুষ। মর্ত্যমমতায় ভরা মর-মানুষের প্রতি আমি আস্থাবান; আর, তারও অপেক্ষা বড় কথা, মানুষের প্রতি আমি মমতাবান। এ মানবিকতা গ্রীসের কাব্য-নাটক থেকেও আমার কাছে আসত। ইউরোপীয় রিনাইসেন্সের সৌন্দর্যপ্রভায় মণ্ডিত হয়েও আমার কাছে পৌঁছত। ফরাসি বিপ্লবের রক্তস্নানে রঞ্জিত হয়ে রুদ্রদূতের মতোও আমার সামনে দাঁড়াত। কোনো ধারাই তার অনাস্বাদিত নয়। কিন্তু আমি সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমে পৌঁছেছি আমার উনবিংশ শতকের পিতৃগণের অর্জিত দানে, তাঁদের সৃষ্টি ও তপস্যার মধ্য দিয়ে রামমোহন ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উত্তরপুরুষরূপে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মহেন্দ্রলাল সরকারের অনুগামী রূপে মধুসূদন ও বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের রচিত বাঙলার বাঙালী বলে। তাই আমি জেনেছি—সবার উপরে মানুষ সত্য।

বিংশ শতকের বাঙালী হয়ে জন্মানো একটা পরম গৌরব, এবং মহৎ দায়িত্ব। ভাবো লীলা, তোমার-আমার সেই উত্তরাধিকারের কথা। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা তখন আমাদের ভূগোলকে, ইতিহাসকে, আমাদের বাস্তব সম্পদকে, বিচিত্র সভ্যতাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই কলকাতা শহরে আবিষ্কার করছে। আর আমরা সেই আলোকে নিজেদের আবিষ্কার করছি, উপলব্ধি করছি। প্রিন্‌সেপকে অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে সহায়তা করেছিলেন 'জজ-পণ্ডিত' কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। তাই প্রিয়দর্শী আবার পরিচিত হয়ে উঠলেন, ধর্মচক্র পরিজ্ঞাত হল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালের সংস্কৃত-বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাণ্ডারদ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন, বেগেলের সহকারীরূপে আমাদের হয়ে মহাবোধির এই মন্দিরকে পুনঃসংস্কার করেছেন। বাঙলার নিজস্ব বৌদ্ধধারাকে বাঙলায় সঞ্জীবিত রাখছিলেন "বৌদ্ধপঞ্জিকা"র

চট্টগ্রামী কবি ও তাঁদের অনুগামী কবিগোষ্ঠী। গিরিশ ঘোষ আর্নল্ডের 'বুদ্ধদেবচরিত' বাঙলায় অনুবাদ করলেন, রামদাস সেন বুদ্ধদেবের জীবনী ও ধর্মনীতির আলোচনা করে গবেষণাগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন বঙ্কিমকে। নবীনচন্দ্র তাঁর নিজের অঞ্চলের বৌদ্ধ-বাঙালীর জীবন্ত কামনাকে রূপদান করলেন 'অমিতাভে'। চারুচন্দ্র বসুর 'ধম্মপদ' আমাদের ভাষায় নিয়ে এল শাস্তার বিস্মৃত ধর্মশাসন। অশোকের অনুশাসন আমাদের নিকটে ভারতবর্ষের 'ধর্মবিজয়'-এর অতীত স্মৃতিকে জীইয়ে তুলেছে। ভাবো, ততক্ষণে বাঙালীর মনে কেমন করে যেন একটা 'বৌদ্ধযুগের' সুন্দর সমৃদ্ধ পরিকল্পনা রূপলাভ করে উঠছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অদ্ভুত জীবননিষ্ঠ কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ গবেষণা চল্লিশ বৎসর ধরে আমাদের মন আলোকিত করেছে। টডের 'রাজস্থান', পদ্মিনী-উপাখ্যান থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' পর্যন্ত আমাদের প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু কখন সেই রাজস্থান পেরিয়ে আমরা চলে গেলাম আরও দূরে—বাল্মীকি-ব্যাসের যুগে, কালিদাসের কালে, তারপরে সেই নতুন বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত এই বৌদ্ধসংস্কৃতির রাজ্যে—যেখানে গৌতম আর অশোক আর হর্ষবর্ধন, যেখানে অনাথপিণ্ডদ ও বিম্বিসার, দেবদত্ত ও অজাতশত্রু, উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার মুখে আমাদের আত্মীয়মুখ দেখলাম। ইতিহাসের সেই নব্য-রোমাণ্টিক যুগের দ্বার খুলে দিলেন তোমার-আমার কাছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ। আর ভিড় করে সেখানে আমরা প্রবেশ করে গেলাম স্বদেশী যুগের নবলব্ধ জাতীয় গরিমায়। প্রবেশ করলেন আমাদের কবি ও শিল্পীরা, আমাদের কথাকার ও নাট্যকাররা, আমাদের দার্শনিক ও জিজ্ঞাসুরা। নৈয়ায়িকের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বৌদ্ধ-ন্যায়ের ব্যাখ্যা ছেড়ে বুদ্ধচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হন সতীশ বিদ্যাভূষণ, কালীবর বেদান্ত-বাগীশ, 'মিলিন্দপঞ্হো'র প্রথম সম্পাদক বিধুশেখর শাস্ত্রী। পুরাতাত্ত্বিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাখালদাস নামলেন কথারাজ্যে, শরৎ দাসের অনূদিত 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা' এনে দিল তার রূপকথার দেশ। গিরিশচন্দ্র বৌদ্ধযুগের বিচিত্র কথাকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সহায়তায় সর্বসাধারণের করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের পূর্বেই বিজয়চন্দ্রের ও সত্যেন্দ্রনাথের হাতে জীইয়ে উঠলেন 'থেরীগাথা'র অম্বপালী, শাক্য সন্তা-গারের শ্রীমহানামন ও বাসবক্ষত্রিয়া। আর সেই সঙ্গে আমাদের সামনে

এসে গেলেন হ্যাভেল-কুমারস্বামী-নিবেদিতা-ওকাকুরার নবীন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও সুরেন মজুমদার ; তারপর লেডি হ্যারিংহামের সহায়তায় অজন্তার প্রথম তীর্থযাত্রীরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সৌন্দর্য-সাধনার স্বরূপ প্রকাশিত করলেন, সুন্দরের রূপ দেখে আমাদের চোখে যেন পলক পড়ে না। সাঁচি, ভারহুত, অমরাবতী, বাঘ, সিগারিয়া ছাড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি তখন চলে গেল সমুদ্র ডিঙিয়ে পর্বত পেরিয়ে 'বৃহত্তর ভারত'-এর দিকে। আমাদের গৃহে বসে গেল এবার নেপাল, তিব্বত, চীনের অনুশীলনের পাঠশালা। রাহুল সাংকৃত্যায়নের আহরিত পুঁথি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা জাগাল। বিধুশেখর শাস্ত্রী বসে গেলেন দর্শনের আলোচনায়। পুরাতত্ত্বের আলোচনা-ক্ষেত্র রচিত হল লাহাদের বিদ্যানুরাগে ; সিলভাঁ লেভিকে গুরুপদে বরণ করে প্রবোধ বাগচী মহাযানের ইতিহাস অনুসন্ধানে এগিয়ে গেলেন। আর রবীন্দ্রনাথ চললেন যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, শ্যামে, চীনে। আমাদের চোখে জেগে উঠল বোরোবুদুর, আঙ্করভাট, ও আনন্দ মন্দিরের সৌন্দর্যলোক। আমাদের 'শান্তিনিকেতন' বিশ্বের পণ্ডিত-তীর্থ রূপে নব-নালন্দা হয়ে উঠল। কী সেই যুগ! কী সেই অদ্ভুত আগ্রহ! কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, দর্শনে, ইতিহাসে ভারতবর্ষের সে কী আত্মোপলব্ধি। আর ভাবো, বাঙলাদেশ তার সাধনপীঠ, বাঙালী সেই আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসের উত্তরসাধক।

সেই যুগে আমি বাঙলায় বাঙালী হয়ে জন্মেছি। জীবনে যখন মানুষ প্রথম স্বপ্ন দেখে তখন জাতীয় আত্মোপলব্ধির এই স্বপ্ন-অভিসারে আমার কিশোর চিত্ত বহির্গত হয়েছিল। অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে আমাদের মহাগুরু এসে দাঁড়ালেন—রবীন্দ্রনাথ। সারনাথ, মথুরা, গান্ধার আর অজন্তা-অমরাবতীর রূপাস্বাদনে আমায় দীক্ষা দান করলেন নিবেদিতা ও কুমারস্বামী। স্বপ্নমুগ্ধ কিশোর আমিও আঁকতে বসেছিলাম আমার ধ্যানের মূর্তি ধ্যানীবুদ্ধকে—সেদিন রূপের উৎসব সৃষ্টি করছে বঙ্গীয় শিল্পকলা। যৌবনের সীমাহীন সাহসে আমিও কাব্যনাট্যে লিখতে বসেছিলাম বিম্বিসার-অজাতশত্রুর বিরোধকাহিনী, শাক্যপুরীর ধ্বংসকথা। জাতকের গল্প শেষ করে রিস ডেভিড্‌স্, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সিলভাঁ লেভির আলোকবর্তিকা দেখে আমিও এগিয়ে গেলাম। 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ'-এর অগ্রজদের আশ্বাসে আমিও সশ্রদ্ধ মনে ফরাসি ও

জার্মান পুরাবিদ্ পণ্ডিতদের পদচ্ছায়া প্রার্থনা করেছি। ইউরোপীয় ও জাপানি মনস্বীদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে তিব্বত, চীন, ও জাপানের মহাযানী ধারা অনুধাবন করতে চেয়েছি। আর দেখতে চেয়েছি চট্টগ্রাম থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত, মাদ্রাজ থেকে মথুরা পর্যন্ত সংগ্রহশালায় সুন্দরের শাশ্বত স্বাক্ষর।

এই নালন্দার মহাবিহার তখন চোখ মেলে নতুন করে দেখছে আকাশের মুখ। বড়গাঁওর পল্লীগ্রামের অশ্বত্থচ্ছায়ায় বিশালকান্ত ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি, ভয়ে ও অশ্রদ্ধায় 'ভৈরোঁ বাবা' নামে পরিত্যক্ত। পাটনায় রাজগিরে তখনো বুদ্ধদেব ও মহাবীরের নাম শিক্ষিতদেরই পরিচিত। মহাবোধির এই মন্দিরপ্রাঙ্গণ বন-জঙ্গলে পরিবৃত, শৈব-মহান্তের অনুচর-শাসনে মন্দির ও বিগ্রহ পরিধৃত। তিব্বতী লামার সঙ্গে এই পরিক্রমা-পথে আমি 'অশোকবেষ্টনী'র উৎকীর্ণ জাতক-কাহিনী পাঠ করে গেলাম। পূজার্থিনী ভুটানের রাজকন্যার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলাম তাঁর সহস্রদীপের পার্শ্বে আমার বাঙালী মনের গন্ধধূপের সামান্য শলাকা। বললাম ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ত্রিশ-বৎসর পূর্বেকার আমার সে প্রণাম, সে ধূপাবাস আজ আমার চিত্ত-ক্ষেত্র থেকে আবার নিবেদন করতে এসেছি এই বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যক্ষণে। এই আমার বাঙালী জন্মের দায়িত্ব। আমরা ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করেছি, বুদ্ধকে আমরা তাঁর স্বরাজ্যে স্বীকার করেছি, আমরা জেনেছি 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

না, লীলা, না, ইতিহাস পিছিয়ে যায় না, এক নদীতে দুবার অবগাহন অসম্ভব; আমি তা জানি। আমি নিজেই তার সাক্ষী যে-আমি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথে পৌঁছেছি সাম্যবাদী সংকল্পে, ভারতীয় আত্মমর্যাদার পথে পৌঁছেছি মহা-মানবের মহিমা উপলব্ধিতে, আর পেয়েছি আমাদের কবির দীক্ষা—'সমস্ত মানুষকে মিলিয়েই এই মহামানব'। আমিও আর চাই না সেই কলিঙ্গসমর-ক্লান্ত দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শীকে, চাই না সেই পুরুষপুরের জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ কণিষ্ককে, প্রব্রজ্যাবিলাসী সম্রাট হর্ষবর্ধনকে। চাই না নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলার

দীপঙ্কর-শীলভদ্রের কাল, ঋষিপত্তনের মৃগদাব, বৈশালীর বজ্জিসঙ্ঘ, শ্রাবস্তীর জেতবন; চাই না আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার নিরঞ্জনা-তীরের সেই উরুবিল্বও।

এক নদীতে দুবার স্নান করা যায় না। কিন্তু বহু নদী আজ এসে গিয়েছে মহাসাগরের সঙ্গমসীমায়। সত্য, লীলা, আমি জানি তার কলধ্বনি আজ হারিয়ে যাচ্ছে নিরানন্দ উত্তেজনার ফেনোৎক্ষিপ্ত বাচালতায়। এই রাজ্যপাল-মন্ত্রিপালদের 'ভাষণ'-এর মূল্য আমি জানি। জানি এই আত্ম-পরিতৃপ্ত রাজশক্তির সংস্কৃতিবিলাস, রাষ্ট্রীয় ফিল্‌মবোর্ডের প্রগল্‌ভতা, বহুশাখ সরকারের গাম্ভীর্যহীন আত্মপ্রচারের উৎকটতা, সংবাদপত্রীয় ঢক্কা-নিনাদ, বার্তাজীবীর আলোকচিত্র-বিলাসের ইতর আতিশয্য, মন্দির-প্রাঙ্গণের এই সহস্র কণ্ঠের শত ভাষার স্থূল-কর্কশ কথা ও কৌতুক, অনুভূতিহীন ঔৎসুক্য, আন্তরিকতাহীন আড়ম্বর—ফ্যাশানজীবীর এই বিলাস-বিভ্রম, দেহবিকার ও যৌবন-বিজ্ঞাপনী—নির্বোধ হুজুগজীবীর হৈ-চৈ-হুল্লোড়। এইসব চোখ বুজে না দেখে ইতিহাসের শুভ্রোজ্জ্বল পাতায় আশ্রয় গ্রহণ আমার অন্তত প্রার্থিত নয়। আমি এসব বিস্মৃত হব না। তার মূল্য জানি বলেই আমি তার অস্তিত্বেও আশাহত হই না। সেই অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমি জানি ইতিহাসের নিয়মে সে অস্বীকৃত। যেমন গৌতমের দিনে অস্বীকৃত শত বেদাচারীর যজ্ঞধূম ও প্রব্রজ্যাধারীর কৃচ্ছ্রসাধন। যেমন অশোকের দিনে অস্বীকৃত পররাজ্যগ্রাসী রাজশক্তির যুদ্ধপ্রিয়তা ও হিংসাদগ্ধ তিষ্যরক্ষিতার বিদ্বেষবুদ্ধি। যেমন সর্বযুগের সর্ব-মানুষেরই জীবনের সমগ্রতার মধ্যে অস্বীকৃত তার অন্তরের-বাহিরের-চতুর্দিকের সঞ্চরমান, প্রবহমান বিভ্রমজাল। আজকের এই বিলাস ও বিজ্ঞাপন তেমনিভাবেই ইতিহাসের উত্তরে অগ্রাহ্য। অগ্রাহ্য জেনেই আমিও তাকে গ্রহণ করছি, যেমন করে সর্বযুগের সর্বসত্যানুসন্ধানী গ্রহণ করে হিংসাকে প্রেমের অপমৃত্যুরূপে, দ্বেষকে মৈত্রীর অপঘাতরূপে, পীড়া ও জরাকে দেহস্ফূর্তির অবক্ষয় রূপে, আর মরণকে জীবনের রাহুগ্রাস রূপে। আর যেমন করে আমরা জানি সত্য এই সমগ্রতার মধ্যে ক্রমপ্রকাশিত—তার গতি আর বিকাশ আর পরিণতি। তেমনিভাবেই গ্রহণ করছি আমি এই রাহুগ্রাসগ্রস্ত চন্দ্রমাকে—আকাশ যে এবার লজ্জায় পরিম্লান।

মানুষের ইতিহাসে উত্থান আছে, পতন আছে, আছে অসমান বিকাশ, বি-সম বিস্তার। বর্বরতার অন্ধকারে বারে বারে রাহুগ্রস্ত হয়েছে সভ্যতা। বর্বরতর সভ্যতার আণবিক অপঘাতে অন্ধকার হবে হয়তো মানুষের সভ্যতার সূর্যও। কিন্তু লীলা, মানুষ আপনার সাধনার বলেই সিদ্ধিলাভ করবে তাতে আর সন্দেহ নেই। মানবমৈত্রীর সেই বোধিসত্ত্ব, সেই অনাগত মৈত্রেয় আজ ইতিহাসের মধ্যে সমাগতপ্রায়। আমি জানি, আরও অনেক অনেক 'মার'বিভ্রমের জাল ছিন্ন করে, অনেক 'স্কন্ধ' আর 'সংস্কার' বিদূরিত করে তবেই ইতিহাসে উদিত হবে সে-যুগ। কিন্তু তা উদিত হবে। আর তা উদিত হবে শুধু মস্কো বা পেকিঙে নয়, শুধু নিউ ইয়র্ক বা লণ্ডনে নয়, তা উদিত হবে এই ভারততীর্থেও যেখানে এই আদিবুদ্ধ তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘোষণা করেছেন—শাস্ত্রে নয়, শস্ত্রে নয়, যুক্তিতেই মানুষের শক্তি ; ভোগে নয়, দৈন্যে নয়, মধ্য পথেই তার স্বস্তি ; আর মৈত্রী ও করুণাতেই তার আত্মোপলব্ধি।

লীলা, এই সত্যকে জেনেছি বলেই আজ আমি বুদ্ধদেবকে প্রণাম করতে এলাম।

হে সম্যগ্‌বুদ্ধ, আমরা এযুগের মানুষ, তাই জানি জগৎ 'অনিত্য' নয়, সবই গতিমান, বিকাশশীল। আমরা জানি মানুষ 'অনাত্ম' জন্ম-জন্মান্তরের কর্মচক্রমাত্র নয় ; প্রতি মানুষের বিচিত্র সত্তার মহিমায় বিশ্বমানবের মহিমা প্রতিবার নতুনতর সত্য হয়ে প্রকাশিত। দুঃখই শেষ কথা নয়, মানুষের ইতিহাসে দুঃখ অপেক্ষাও আনন্দের আহরণ ক্রমবর্ধনশীল। আর জন্মজন্মান্তরব্যাপী জীবনজ্বালার 'নির্বাণ' অপেক্ষা আমরা জীবন থেকে জীবনান্তরে প্রাণপ্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে রেখে যেতে চাই। গৌতম, আমরা তোমার 'দুঃখবাদ' মানি না, তোমার 'কর্মবাদ' মানি না, তোমার 'নির্বাণবাদ'ও মানি না। আমরা মানি তোমাকে—আপনার মধ্যে তুমি মানুষকে প্রকাশ করেছ। মানি তোমার তপস্যাকে মানুষের আপন প্রয়াসেই, তোমার মানব-মঙ্গল নীতিকে—ক্ষমা-মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার মধ্য দিয়েই যাতে জীবনের জয় সুনিশ্চিত হয়েছে। ইতিহাসের কাছ থেকে আমরা এই উত্তরই পেয়েছি।

ইতিহাস আমাদের জানায়, হে তথাগত, তোমার এ-রূপ মিথ্যা নয়।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে কুশীনগরে তোমার মহাপরিনির্বাণে তোমার এই রূপ নির্বাপিত হয় নি। একশত বৎসর পরে বৈশালীতে 'স্থবিরবাদ' তোমার 'মহাসাংঘিক' অনুচরদের অস্বীকার করেও তোমাকে তাদের বিনয়-পিটকের বিশুদ্ধ বিধিনিয়মে স্থবিরতা দান করতে পারে নি। তিনশত বৎসর পরে তিষ্য তোমাকে পাটলিপুত্রে প্রিয়দর্শীর মহারাজ্যে ত্রিশরণের মন্ত্র ও প্রণাম দিয়েও বন্দী করতে পারে নি। আরও দুইশত বৎসর পরে তোমাকে প্রতীকে, বিগ্রহে, মূর্তিতে আপনার করে নিতে লাগল মানুষ। তুমি শকসম্রাট কণিষ্কের ভক্তিপ্লুত মহাযানী পুজা নিয়ে 'সুখাবতী'র সহস্রদ্বার খুলে দিলে। তারপর তিব্বতে, চীনে, খোটানে, মোঙ্গোলিয়ায়, কোরিয়ায়, জাপানে যে কত দ্বার খুলে গেল আর বন্ধ হল! কাশ্মীরে, গান্ধারে, মগধে, গৌড়ে, নেপালে, বঙ্গে মহাযান, হীনযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান কত শাখাপ্রশাখায়, মন্ত্রে ও দেবতার বনগুল্মে সমাবৃত হয়ে তোমাকেও হারিয়ে ফেলল—হে বুদ্ধ, তুমি কি আর তাদের চিনতে পার?

তবু তারা আজ প্রভাতে এল। তিব্বতের হরিদ্রাবাস লামারা, চীনের ভক্তিপ্রণত ভিক্ষুণী, সিংহলের পুজাবাহী শ্রমণদল, ব্রহ্মের অনিত্যবাদী সানন্দ সাবলীল নৃত্যশীল ভক্তেরা, শ্যামের শ্রমণেরা, ভারতের শ্বেতশুভ্র উপাসক-উপাসিকা, প্রব্রজ্যাধারী ভিক্ষুক—তোমার কাছে নিবেদন করে গেল তাদের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সাধনার একই প্রণাম: নমস্তে ভগবতো তথাগতো পরমঅর্হতো সম্যগ্ সম্বুদ্ধম্।

তুমি তাঁদের সে প্রণাম কি গ্রহণ না করে পেরেছ?

কাল থেকে কালান্তরে মানুষের চেতনা তোমাকে নব-নবদেশে নতুনতর প্রণামে অনির্বাণ করে রেখে দিয়েছে। আজকের এই আড়াই হাজার বৎসরের মহাপরিনির্বাণের দিনে আমার সন্দেহ নেই, হে শাস্তা, আবার তুমি এই ভারততীর্থে উদিত হচ্ছ, বিশ্বের মানবতীর্থে তোমার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। আর, তোমার 'অনিত্যবাদ' এবার জীবনবাদে রূপায়িত হচ্ছে, তোমার 'অনাত্ম'বাদ এবার বিশ্বাত্মবাদে পরিণত হবে, তোমার 'নির্বাণ'বাদ এবার সৃষ্টির মহোৎসবে পূর্ণতা লাভ করবে, আর নিখিল মানুষ এবার যৌথসম্পর্কে গ্রহণ করবে তোমার সেই পঞ্চশীল—তোমার মানবিক ধর্মের মঙ্গলনীতি, মহত্তম সূত্র।

লীলা, আমি দেখছি ভারতবর্ষে আজ নতুনতর "বৌদ্ধধর্ম" ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, পৃথিবীতে এই মানবিকতার ধর্মচক্র প্রবর্তিত হতে আর দেরি নেই। বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্র রাহুগ্রাস থেকে ক্রমশ মুক্তিলাভ করছে। এসো, প্রণাম করি মহামানবকে এই মহাযুগের ভূমিকায়। প্রণাম করি এবার মহাপরিনির্বাণের সম্যগ্‌বুদ্ধকে। প্রণাম করি আমাদের কালের বিজ্ঞান-উদ্‌বুদ্ধকে মানুষকে, মানবিকতায় প্রবুদ্ধ এই আগামীকালের 'প্রত্যেকবুদ্ধ'কে। প্রণাম মানুষকে।
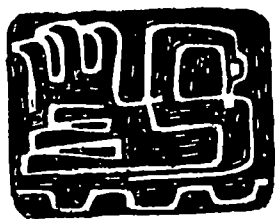
কবিতা

একটি মেঠো কাহিনী

বিষ্ণু দে

সদ্য সূর্য জাগছে, নদীর কুয়াশা
পাহাড়ের গায়ে লাগছে।
তুমি একাধারে সূর্য এবং পাহাড়।

যদি ভেবে থাকো ঝিঁঝির ঝিঁঝিট নশ্বর
তাহলে সে ভুল,
বহু বছরের অষ্টপ্রহর কীর্তন!

পথ দিয়ে তুমি চলে গেলে যেন
হালকা উজানী নৌকা,
নদী হয়ে যায় মাল্লার গান, তন্ময়।

তুমি ভাবো বুঝি তোমার হাসির ঝরনায়
মেলাব চোখের নদীকে?
অসীম ধৈর্য, ঝরনার মোড় ফেরাব।

তোমাকে দেখলে দীঘি হয়ে যায় নদী,
বৃথাই কেবল বাঁধ তোলা হায় নদী
শুনেছে অথই সাগর জলের গান।

সঠিক খবর দাও নি, শুধুই বাতাসে
মনে হয় আসে আশ্বিন,
হৃদয় হয়েছে ঝকঝকে তলোয়ার।

অছিলার নেই অভাব,
এই যাই বাঁশসাঁকোর জোড়টা সারাতে,
এই যাই আল ভাঙতে।

সকাল বেলার ত্বরিত শিশির,
সারাদিন দেখা নেই,
কেনই বা আসা রাত্রির ঘুমঘোরে ?

স্বপ্নের কথা মেনেছি, নিত্য সাঁঝে
খুলে রাখি দ্বার, যদি বা হাওয়ার খুশিতে
ভিতরেই চলে আসো।

তোমাকে জিতব জীবনের অধিকারে,
হাতে হাত বেঁধে গড়ব আরেক জীবিকা,
দয়িতা আমার, নির্দয় হোয়ো নাকো।

আমি যেন হিম মাঘের মাটিই,
তোমাতে হাজার বউল,
বৈশাখে আম নামবে।

হাটে গেলে আর সাধের অন্ত থাকে না,
এই ভাবি হই গালাজোড়া চুড়ি
এই শাড়ি এই গামছা।

সাঁচি পান নই,
আমার কথায় তোমার ঠোঁট কি রাঙবে,
এই ভেবে হই মাঠ পার।

আমার কি ভয়, আমার মুঠিতে
দীর্ঘ আশার বর্শা,
নেক্‌ড়েরা বৃথা হন্যে।

তুমি ছাড়া গ্রাম মরাদেশ
তুমি না এলে
শহর শুধুই জড়কবন্ধ গঞ্জ।

নাই থাক পাতা, তবুও রয়েছে
সজিনার শতবাহু,
আমিই কেবল হারব ?

বাতাস তোমার আঁচল ওড়ায় উতরোল,
নিশ্বাস নিই বাতাসে
শ্বাসে প্রশ্বাসে তাল দিয়ে যাই বাতাসে।

কেটে দিই এই আড়াল,
সূর্যে মেলাই চাঁদের লক্ষ তারার
অভিন্ন যোগাযোগ।

মেঘদূত ঃ যক্ষপুরীতে

অসিতকুমার

আমি তো এখন বন্দী রয়েছি আমার মনে
নগ-নদী পার মৃত চেতনার নির্বাসনে,
কি জানি কোথায় রয়েছে প্রাণের অমরাবতী
মাঝে মাঝে শুধু উড়ে-চলা মেঘ বেদনা আনে,
আমি তাকে জানি, মনে হয় সেও আমাকে জানে
কি জানি কোথায়, কি জানি, বিশ্ব বিস্মরণে
আত্মা আমার আত্মশিখরে লুপ্তগতি।

থেকে থেকে হাওয়া ছুঁয়ে যায়, বলে তোমাকে চিনি,
এস হাত ধর, আমিও তো যাব উজ্জয়িনী
নয়নাভিরাম. দশার্ণগ্রাম, আমারই দেশ,—
কি করে যে বলি, অন্ধ একক অন্যমনা,
শূন্য শিখরে, এ আমি আমার ভস্মশেষ!

আশা করি নাকো এবার কান্তাসম্মিলনে,
অন্ধকারেতে প্রার্থনা করি মৌন মনে,
উদ্ধত মেঘ, এস তুমি কোনো অন্ধরাতে,—
সৌধশিখর কাঁপাও তোমার আক্রমণে,
প্রিয়াকে আমার বাঁচাও অদেহী আলিঙ্গনে,
যক্ষপতির তন্দ্রা ভাঙাও বজ্রাঘাতে!

পিতামহী

পবিত্র সরকার

আমার বৃদ্ধা পিতামহী রাতে রূপকথা বলে পদ্মকন্যা,
রাজপুত্রের, শুকসারী আর তেপান্তরের সুপ্রসন্না
ব্যাঙ্গমীদের। চোখ দুটো তার চকচক করে বলতে বলতে,
ও পাশে শূন্য তেলের প্রদীপে মিটমিট করে ঝিমোয় সলতে।

মাঝে মাঝে আমি তাকে ডেকে বলি,
'আজকের এই রূপকথা আর
মন-পবনের নৌকোয় চড়ে সময় পায় না পাল তোলবার।
রাক্ষসরাও আশে-পাশে থাকে সর্বনাশের অক্ষয় সুখে
প্রয়োজন নেই দূরে ছোটবার যদি দিতে চাই তার মৃত্যুকে।'

ঠাকুমা থমকে বিস্মিত হয়, তারপর মৃদু বিরক্তি নিয়ে
সেই নিস্তেজ থমথমে ঘরে ফিসফিস স্বর হাওয়ায় ছড়িয়ে,
সপ্তডিঙায় মধুকর আর ময়ুরপঙ্খী নৌকোয় তাঁর
হৃদয় পালায় আমাদের এই দৃপ্ত ক্ষোভের সময়ের পার।

হীরে-পান্নার মুহূর্তগুলো জোর করে চায় আঁকড়ে ধরতে,
সেই স্বপ্নের বিহ্বলতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কিসের শর্তে?
কাজেই ঠাকুমা অন্ধ আবেশে রূপকথা বলে রাজরাজড়ার
আরেক পৃথিবী যদিও দীপ্ত রূপকথা গড়ে হাড়-পাঁজরার।

তাহের আলি

মিহির আচার্য

জেল আদালতেই তার বিচার হয়ে গেল। শান্ত্রীরা শৃংখলাবদ্ধ কয়েদীকে টেনে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্ধকার সেলের কুঠুরিতে।

বাইরে হয়তো এখনো এত ঘন অন্ধকার নামেনি। ভারত মহাসাগরের তৈলাক্ত পিচ্ছিল জলরাশি হয়তো এখনো আলকাতরার মতো কালো হয়ে ওঠেনি। এখনো ডারবান ডকে ব্যস্ত কুলি-কামিন মাঝি-মাল্লাদের বিচিত্র কর্মপ্রবাহে ভাঁটা পড়েনি। দূরপাল্লার কোন কারগো বন্দর ছাড়বার পূর্ব-মুহূর্তে সংগ্রামোদ্যত শ্বাপদের মতো শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে। জোয়ারের জলে জেটি কাঁপছে......ছলাৎ ছলাৎ......ভাসমান বয়াগুলোকে দেখাচ্ছে মহিষের মাথার মতো। আর আলোর দীপমালায় সমস্ত ডক অঞ্চলটা কেমন আশ্চর্য রূপসী হয়ে উঠেছে।

বাইরে হয়তো এখনো এত মিশকালো অন্ধকার নামেনি, কিন্তু পুরু দেয়াল-ঘেরা সেলের ভেতরে নরকের অন্ধকার নেমে এসেছে। কোনো রকমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা শক্ত শয্যার পরে নিজেকে মেলে দিল তাহের আলি। বিচারে জুরিরা রায় দিয়েছে। তার ফাঁসি হবে। তার প্রথম অপরাধের বোঝা সে জন্মকাল থেকেই বয়ে নিয়ে এসেছে। তার চামড়া কালো। আর এই কালো চামড়া সম্বল করে কিনা সে শ্বেতাঙ্গী মিস্ মার্থাকে রেপ্ করতে গিয়েছিল!

একটু আগে ওয়ার্ডার এসে একটি কালিঝুলিমাখা বাতি রেখে গিয়েছিল। সেই কৃপণ আলোতে সমস্ত ঘরটা আলোকিত হতে পারেনি। তবু, একটুকরো সোনারাঙা আলো। এই আলোই না মানুষের কোন এক পূর্বপুরুষ স্বর্গ থেকে চুরি করে এনেছিল। একটুকরো আলোর আশীর্বাদ। আলোর সামনে তার শক্ত মজবুত হাতটা এগিয়ে দিল তাহের আলি। সত্যিই কি কালো—কালো তার গায়ের চামড়া। হ্যাঁ কালো—কালো —কালো। কালোর কোনো রঙ নেই তা শুধু কালোই। কিন্তু·····এই কুৎসিত কালো চামড়ার ঢাকনাটাকে যদি একবার পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়, তাহলেও কি কোথাও ছিটেফোটা একটু শাদাও দেখা দেবে না? এই কালো চামড়ার আস্তরণের তলে পুরু মাংসের স্তর·····লাল রক্ত আর শাদা হাড়। আচ্ছা, শাদা মানুষের রক্তও কি শাদা? নাকি, কালো চামড়ার মতোই সেই রক্তের রঙ লাল? হা আল্লা! তোমার দুনিয়ায় শাদা-কালোর প্রভেদ করেছিলে কেন? পৃথিবীতে তো এক রঙেরই মানুষ—শুধু শাদা—গির্জের পাদরির আলখাল্লার মতোই শ্বেতশুভ্র। আর যদি কালোই করবে তাহলে মানুষের রক্তের লাল রঙ ঢেলে দিলে কেন আমার শিরা-উপশিরায়।

বিচার বসবার আগে বাচ্চাটাকে নিয়ে লক-আপে দেখা করতে এসেছিল তার বউ জাবেদা। জাবেদা তার তেরো বছরের শাদি-করা বউ·····আর তার বাচ্চা সেলিম। আহা, কতদিন চুলে তেল দেয়নি জাবেদা, গায়ের কামিজ যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া·····এই অল্প বয়েসেই কেমন সে বুড়িয়ে গেছে·····চোখের দৃষ্টি গোরুর মতো ড্যাবডেবে····· গলার স্বরও গেছে ভেঙেচুরে ফাটা বাসনের মতো। জাবেদার মুখচ্ছবি এখনো ভাসছে। জ্বলন্ত আগুনের শিখার মতো। জাবেদা তার বউ— এখনো বুকের মধ্যে জেলে রেখেছে আগুন। যে-আগুন যে-উত্তাপ জীবনেরই সত্য প্রকাশ। সে যে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকতে চায়—তাই তো সে বুকের মধ্যে অনির্বাণ এক অগ্নিশিখা পুষে রেখেছে। জাবেদা জীবনকে দেখেছে, ভালোবেসেছে, সে গেরস্থালি পেতেছে, তার স্বপ্ন, তার সাধ জড়িয়ে গেছে স্বামীপুত্রের সঙ্গে। জাবেদা তাহেরকে ভালোবেসেছে, কারণ সে জীবনকে ভালোবেসেছে·····তাহের তার কাছে এক সংগ্রামময় জীবনের অর্থপূর্ণ

প্রতীক······তাহের ডারবান ডকের জবরদস্ত মজদুর······তার পেশীতে ইস্পাতের কাঠিন্য, তার শক্তিতে সমুদ্রে জোয়ার আসে। সে খাটতে চায়, সাচ্চা মানুষের কাছে তার শ্রম ছাড়া আর পবিত্র জিনিস কি আছে? কিন্তু সে অন্ধ পশু নয়, তার চোখ খোলা আছে, চোখ খোলা রেখে সে খাটুনির জোয়াল কাঁধে নেয়। তাহেরের হাতে ডক-মজুরদের আত্মার চাবি! তাহেরের যোগ্যতাই তাকে নেতৃত্বের আসনে তুলে দিয়েছে।

তাহের। ডারবান ডকের সাহসী নেতা। জাবেদার স্বামী। তাকে না ভালোবেসে কি জাবেদা পারে?

জাবেদার ক্লিষ্ট, কঠিন মুখচ্ছবি এখনো ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

বিড়বিড় করে বলেছিল জাবেদা: 'বলো—বলো তুমি—তুমি মার্থাকে বেইজ্জত করেছিলে?'

তাহেরের চোখেও আগুন জ্বলে উঠেছিল। ক্ষুধার্ত এক সাপ ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার চোখের তারায়। মাথা ঝাঁকিয়ে বলছিলঃ 'না।'

'তবে? তবে কেন তারা তোমাকে ফাঁসি দেবে। কেন, কেন, কেন?' জাবেদা আহত মরিয়া চিৎকার করে উঠেছিল।

এরপর একমুহূর্তও শান্ত্রীরা জাবেদাকে কথা বলতে দেয়নি। চুপ। তাহেরের ঠাণ্ডা ভারি হাতটা সেলিমের মাথার উপর নেমে এসেছিল। কি বলতে চাইছিল সে, জাবেদা এগিয়ে এসেছিল, বলেছিল: 'কিছু বলবে?'

তাহের নিরুত্তরে চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল: 'জাবেদা —সেলিম···আমার বাচ্চা সেলিম ও.যেন শাদা হতে চায় না কোনোদিন···'

বুঝতে পেরেছিল কিনা, জানি না। ফ্যালফ্যাল করে একবার তাহেরের দিকে আর একবার সেলিমের দিকে চেয়ে মূক হয়ে গিয়েছিল জাবেদা।

আজ এই সেলের নির্জনে বসে তাহের সেই কথাগুলোই ভাবছিল আবার। ভাবছিল কালো হওয়ার দাম তো সে জীবন দিয়েই শোধ করে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার ছেলে সেলিম—সেও বড় হবে, কালো হবে, সেও হয়তো ডারবান ডকে কুলিগিরি করতে যাবে—তারপর···

না। তারপর নেই। তবু, কাজ নেই শাদা হয়ে। কালো হয়েই যেন বড় হতে পারে সেলিম, কালো রঙ দিয়েই যেন প্রতিটি মুহূর্তকে সে ভরিয়ে রাখে। আর যেন কোনোদিন সে না-ভোলে এই কালোর দাবিকে অমর

করে রাখবার জন্যেই তার বাপ একদিন ফাঁসিকাঠে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ?

কিন্তু শুধু কি কালো ? শুধু কালো—এই তার অপরাধ। এই অপমৃত্যু শুধু কি কালোর দাবিকে দৃঢ় করবার জন্যে।

জলেডোবা মানুষের মতো সমস্ত ঘটনাগুলো যেন এক-এক করে মনের পটে ভেসে উঠতে লাগল। আজ তার জীবনের শেষ রাত্রি। তাহেরের বেঁচে থাকার বিরাট ইতিহাসটা আজ রাত্রিশেষেই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে। লুপ্ত হয়ে যাবে একটা মানুষের বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা—তার সংগ্রাম, তার আনন্দ, তার শ্রম, তার বেদনা—তার চিন্তার উত্তরাধিকারী আর কেউ থাকবে না।

থাকবে না ?

থাকবে। থাকবে তার সাথীদের মধ্যে, তার পরিবারের মধ্যে।

কিন্তু তারা যদি বিশ্বাস না করে। নিশ্চয়ই করবে। তার বিশ্বাস দিয়েই তো তাদের বিশ্বাসকে স্পর্শ করেছে সে। মানুষের উপর বিশ্বাস কোনোদিনই হারাবে না সে।

হঠাৎ কী দ্রুত সমস্ত পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল মজুররা। কোম্পানি তাদের কাঁধে মাল বোঝাই আর খালাস করে লাভের পাহাড় বানিয়ে তুলল। তাদের মতো মজুর মানুষগুলির ঘামে ডকের পাটাতন ভিজে গেল। বৎসরশেষে মুনাফার বাড়তি অংশ প্রতিশ্রুতি মতো এল না তাদের ভাগ্যে। মদমত্ত মালিক রক্তচক্ষু দেখাল। এরপরই ঘটল সেই দুর্ঘটনাটি। মাল খালাস করতে গিয়ে কি করে একটি বোঝাই বাক্স এসে পড়ল পলের ঘাড়ে। সাহায্য করতে আসবার আগেই ফাঁসা বেলুনের মতো চ্যাপ্টা হয়ে মরে গেল পল্। পল্ তাদের মতো ইণ্ডিয়ান নয়, সে নিগ্রো। কালো। মালিক বললে, একটা কালো নিগ্রোর খুনের জন্যে কোম্পানি কোনো ক্ষতিপুরণ দিতে পারে না।

তারপর শ্রমিকরা নোটিশ দিল। স্ট্রাইক শুরু হল ডক ইয়ার্ডে। কাজ হারাল মজুররা, কিন্তু কাজ বাড়ল তাদের। তারা বুঝল ভিখারীর মতো কয়েক টুকরো বাসি রুটির চেয়ে স্বাধীনতা বড়, বড় তাদের ইজ্জত।

তাহেরের দিনে কাজের শেষ নেই, রাত্রে ঘুম নেই। স্ট্রাইকের দিন যত

বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল অভাব। দশ হাজার শ্রমিকের রুজি বন্ধ মানে আরো কুড়ি হাজার ছেলেমেয়েবুড়োর পেট বন্ধ। দিন এনে দিন খাওয়া। হপ্তা পেয়ে র‍্যাশন আনা। অর্থের অভাবে র‍্যাশনও বন্ধ। তবু বাঁচতে হবে, দু টুকরো বাসি রুটির চেয়ে ইজ্জত বড়, স্বাধীনতা বড়।

কোম্পানি দু-একবার তাহেরকে ডেকে পাঠিয়েছিল। লোভ দেখিয়েছিল, তার মাইনে বাড়িয়ে দেবে বলেছিল, তারপর শাসানি, পুলিশী আর গুণ্ডামির ভয়।

তাহের শুধু বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল: 'সাহেব, দু-একটুকরো বাসি রুটির চেয়ে স্বাধীনতা বড়, ইজ্জত বড়।'

মজুরদের মধ্যে বিভেদ আনবার সব চেষ্টাই করেছিল কোম্পানি। শাদা লোকদের ডেকে বলেছিল: ওই বর্বর ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শাদা মজুররা তাদের ক্রীশ্চানিটিরই অপমান ডেকে আনছে– লর্ড জিজাস্ নাকি এতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হবেন।

শ্রমিকদের জরুরি মিটিঙে তাহের আলি সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল: 'দোস্ত—শাদা-কালো তো চামড়ার রঙ। এই চামড়ার তলায় আমাদের রক্ত লাল···মালিকের চাবুকের ঘায়ে আমাদের শাদাপিঠ-কালোপিঠ ছিঁড়ে গেছে···ফিনকি দিয়ে আমাদের রক্ত ছুটছে···তার রঙ লাল। দোস্ত—একই আগুনে আমরা পুড়ছি। সে-আগুন ক্ষুধা—এই আগুনের হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হলে আমাদের এক পাঞ্জা দিয়ে লড়তে হবে।···'

সমস্বরে জবাব দিয়েছিল মজুররা। লড়াই চলতেই থাকবে।

ডকে কাজ বন্ধ। জাহাজ এসে পড়ে আছে। দূর সমুদ্রে ঘনঘন জাহাজ থেকে সিগন্যাল দিচ্ছে; কিন্তু জাহাজঘাটিতে জায়গা নেই। মাল খালাস হচ্ছে না। স্তূপাকার মাল পড়ে আছে। পচছে। পচা গন্ধে ডক অঞ্চল ভরে উঠেছে।

এদিকে শ্রমিক-এলাকায় আগুন জ্বলছে। ক্ষুধা। বুড়োরা মাথা নেড়ে বলছিল: এত বড় লড়াই নাকি ডারবানে এই প্রথম।

যুবকরা মাথা নেড়ে বুঝিয়েছিল: 'ঠিক। বড় লড়াই—তাই তাকতও চাই বড়।'

রাত্রে ঘুম চোখে তাহেরের ছেলেটা টলতে টলতে মাকে জিগেস করেছিল : 'আম্মা, আমরা খেতে পাইনে কেন ?'

জাবেদা বলেছিল : 'ডকে মাল পচছে কিনা, তাই।'

'পচছে! তবু আমাদের খেতে দেবে না!' সেলিম। সাত বছরের ছেলে, সেও প্রশ্ন করেছিল। ক্ষুধা তাকে দমাতে পারেনি, দমিয়েছিল মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের এই অধর্মের সংগ্রাম।

সেলিম। তাহেরের ছেলে। সে প্রশ্ন করেছিল তার রাত্রিভরা চোখে। হয়তো দিনের আলোয় ভুলে গিয়েছিল সে রাত্রির সেই অন্ধকার প্রশ্নটা। তারপর আরো রাত গেছে, আরো অনেক রাতের মতো আজকের রাতটাও থমকে দাঁড়িয়েছে তাহেরের অস্তিত্বকে স্তব্ধ করে দিয়ে। আজকের রাতেও ঘুমভাঙা চোখে বাচ্চা সেলিম যদি আবার সে-প্রশ্ন করে, তাহলে ওর মা জাবেদা আজো কি সেই একই জবাব দেবে? জাবেদা। আহা, কতদিন ও চুলে তেল দেয়নি, ওর খঞ্জনি পাখির মতো জীবনভরা চঞ্চল চোখদুটো কি নিষ্ঠুর স্থির হয়ে গেছে। তার সাতাশ বছরের তৃপ্তিহীন জীবন-যৌবন নিয়ে কি সম্বল করে টিকে থাকবে সে। তাহের। তাহের এখন থাকবে না—মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পূর্ণচ্ছেদ—তখনও তো থাকবে ওই সাতাশ বছরের অচরিতার্থ জীবন-যৌবন—জাবেদার সামনে রইল বিরাট পৃথিবী, মহান আকাশ, উদার সমুদ্র, আর উত্তাল বায়ুতরঙ্গের মর্মরসংগীত—তার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, ফুল ফুটবে, পাখিরা গান গাইবে—জাবেদার জীবন তো তাহেরের ফাঁসির রজ্জুর সঙ্গেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তার ভবিষ্যত আছে, সম্ভাবনা আছে, জীবন আছে, যৌবন আছে।...যদি হৃদয় থাকে জীবন্ত, আশা থাকে পুষ্পিত...তাহেরের স্মৃতির বোঝাকে ঠেলে ঠেলে জীবনকে পঙ্গু করবার অর্থ নেই, মৃত লোক জীবন্ত পৃথিবীতে কোনো ঋণ রেখে যায় না। তাহেরের অবর্তমানে যদি কোনো নওজোয়ান তার জীবনসংগ্রামে সাথী হিসেবে জাবেদাকে বাহুমূলে তুলে নেয়—তাহলে তাহেরের মতো আনন্দিত কে হবে? জীবন বিরাট—তার আয়োজন-উপকরণ অজস্র—সাতাশ বছরের নির্জন যৌবনের পক্ষে এই দীর্ঘপথ একা চলা দুরূহ—যদি পথের সঙ্গী পাওয়া যায়—কে না জানে পথ চলা কত সহজ হয়, নিশ্চিত হয়।

জাবেদা। জাবেদার প্রশ্নটাই ধারালো ছুরির মতো ঝিলিক দিয়ে উঠছে

চোখের সামনে। 'বলো—বলো তুমি—তুমি মার্থাকে বেইজ্জত করেছিলে ?'

'না। না, জাবেদা না। ঝুট। বিলকুল ঝুট।' যদি চিৎকার করে বলতে পারত তাহের। বলতে পারত সে সাচ্চা মজুর—মেহনতি মানুষ—মানুষের কাছে মেহনত করে বেঁচে থাকার মতো পবিত্র জিনিস কি আছে। বেঁচে থাকতে হলেই কাজ করতে হবে। কাজ—কাজ। আজ এই মুহূর্তে তাকে শৃংখলমুক্ত করে দিয়ে যদি তারা জিগেস করত : 'কী, কী চাও তুমি ? স্বাধীনতা—?' না। তাহের বলত : 'আমি স্বাধীনতা চাই না—মরবার স্বাধীনতা! আমি কাজ চাই—কাজ—কাজের স্বাধীনতা।' কাজ-করা মানুষ, শ্রমে আনন্দে বিজয়ী ক্লান্তিহীন গ্লানিহীন মানুষ—জীবন তার কাছে বিচিত্র রঙে রসে সঞ্জীবিত। ঘোলাটে চোখে জীবনকে দেখবার নেশাটা কর্মহীন অলসদের জন্যে, যারা শাদামাটা জীবনকে দেখতে ভয় পায়। মদ আর মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষ আর মদ—এই তাদের জীবনের রূপ।

মিস মার্থা। কোম্পানির পোষা মেয়েমানুষ। দুজোড়া সিল্ক স্টকিং আর কয়েক বোতল কোকাকোলা। তারপর শিশিখোলা শ্যাম্পেনের মতোই হাসবে সে উদ্দাম, অনর্গল বকবক করে যাবে, ঢেউয়ের মতো লুটোপুটি খাবে, তারপর নরম কুকুরের মতো কখন এলিয়ে পড়বে সে আপনার কোলে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে ত্যাগ করে যখন সে ডারবানে ফ্ল্যাট ভাড়া করে নতুন করে সংসার পাতল, কেউ জানত না সেদিনও পর্যন্ত তার পোশাক-আশাক-টয়লেট আর নরম বিছানার নিয়মিত দাম জোগাচ্ছে কে। কোম্পানির সাহেবদের চরণ রাত্রিতে সুরা এবং কামিনীসাহচর্যে মার্থার ফ্ল্যাটে শব্দিত হয়ে উঠত।

কোম্পানির মোটা বকশিসের লোভে যখন এই নতুন অভিসারে মেতে উঠল মার্থা, কেমন রোমাঞ্চই জেগেছিল। তার দেহস্পর্শের অধিকার যেখানে একমাত্র উপরতলার শাদা সাহেবদের, সেখানে কিনা সে ছুটছে এক ডার্টি ইণ্ডিয়ানের পেছনে।

তাহেরের পেছনে লেলিয়ে দিল কোম্পানি মার্থাকে। জয় করতে হবে লোকটাকে, তার বিবেক, তার আত্মার চাবি কেড়ে নাও।

ছায়ার মতো ঘুরতে লাগল মার্থা। কিন্তু এ কেমনধারা মানুষ। লোভ নেই, আসক্তি নেই। যে মেয়েটাকে ইচ্ছে করলেই নাকি সে বুকের কাছে জাপটে ধরতে পারে! কিন্তু মার্থার হিসাবেও যেন ভুল হল। আর ভুলটা

যত বেশি করে ধরা পড়তে লাগল, জেদও বাড়তে লাগল তার। এ যেন মার্থাকে অপমান নয়, অপমান তার যৌবনকে। জীবনের সাতাশটি বছর যে প্রতিটি রাত্রে পুরুষকে শয্যাসঙ্গী করেছে, জেনেছে পুরুষ-চরিত্র···পুরুষের কামনার অন্ধকূপে যে একলহমায় নরকের বীভৎস আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। প্রতিটি পুরুষ তার কাছে শিশু···শিশুর মতোই বিচিত্র তাদের কামনার অলিগলি ··। কিন্তু তাহের—একটা কালা ইণ্ডিয়ানের কাছে সে কি হেরে যাবে।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন সন্ধ্যে থেকেই। আর ঝোড়ো বাতাস। সমুদ্র থেকে আহত মুমূর্ষুর কাতরানির মতো একনাগাড়ে সাইক্লোনের শব্দ ভেসে আসছিল। যেন বন্দী প্রমিথিউসের চিৎকার। নিঃশব্দ ডক এলাকায় ভূতের ঘোলাটে চোখের মতো বাতিগুলো জলছে। গলির ওধার থেকে একটা কুকুর ঘেউঘেউ করছে অকারণে। লাইট হাউস থেকে রেড সিগন্যাল দিচ্ছে। জাহাজের নাবিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে মাঝদরিয়ায় নোঙর বেঁধে উদ্‌বিগ্ন প্রহর গুনছে।

অনেকক্ষণ রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল তাহের।

হঠাৎ পেছনে ঘাড়ের পাশে মৃদু খসখস শব্দ। দুনিয়ার যত রকমের নার্ভউত্তেজিত-করা উগ্র সুবাসিত গন্ধ। লোনা হাওয়াটা পর্যন্ত চমকে উঠল এই উগ্র শব্দের স্পর্শে।

'প্লিজ—'

পিছনে ফিরে দাঁড়াল তাহের।

মিস মার্থা। মুখে লম্বা সিগারেট, আর চোখে অনুনয়।

'প্লিজ—'

লাইটার জ্বালিয়ে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল তাহের। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মার্থা কৃতজ্ঞতা জানাল: 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

তাহের আবার সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সমুদ্র। ঝড়। ঘনঘন সার্চলাইট আর লাল আলোর সংকেত।

মার্থা তখনো তার পাশে দাঁড়িয়ে। আপনমনে সিগারেট টানছে আর অপাঙ্গে চাইছে তাহেরের দিকে।

ফিসফিস করে বললে একবার: 'রাত্রে ঝড় হবে, না?'

তাহের জবাব দিল না।

মিস মার্থা আবার বললে, 'কাছেপিঠে কোথাও একটা পাবলিক হাউস নেই? ওয়েদার ইজ সো ওয়াইল্ড—লেট ইউ হ্যাভ সাম ড্রিংক।'

তাহের নিরুত্তর। ঝড় উত্তাল হয়ে উঠছে। রাস্তাঘাট জনমানবহীন। অন্ধকারে ভূতের চোখের মতো কেবল বাতিগুলির মিটিমিটি হাসি। হাঁটতে শুরু করল তাহের। কত রাত হবে? নটা বেজে গেছে। জাহান্নামের রাত্রি।

হঠাৎ ওর সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল মার্থা। এতক্ষণকার চেষ্টাকৃত সংযত আবরণটা যেন নগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্ধকারেও হয়তো ক্ষুধিত মার্জারের মতো ওর চোখের নীল তারা জ্বলছিল। ফুলেফুলে উঠছিল ওর পরিপুষ্ট বক্ষদেশ। বিপদ গুণল তাহের। নির্লজ্জ মেয়েমানুষ যখন নিজেকে উদঘাটন করে দেয় তখন সে ভারত মহাসাগরের সাইক্লোনের চেয়েও ক্রূর।

তাহের কিছুক্ষণ স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'কি চাই? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

মিস মার্থা ছেনাল গলায় বলে উঠল: 'আই—আই লাভ ইউ।'

'থ্যাঙ্কস। ঐট ওয়ে প্লিজ।' তাহের আঙুল দিয়ে তাকে কোম্পানির সাহেবদের বাঙলোর রাস্তা দেখাল। প্রেম! মিস মার্থার প্রেম। ৬ জোড়া সিল্ক স্টকিং আর কয়েক বোতল কোকাকোলা।

জোর পা চালিয়ে দিল তাহের।

মিস মার্থা ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিজের মনেই গালাগালি দিল বর্বর কালা আদমিটাকে।

রাত্রে ব্যারাকে ফিরে ভুলে গিয়েছিল তাহের সন্ধ্যারাত্রির ঘটনা। সারারাত্রি ওর চোখে ঘুম আসেনি অন্যদিনের মতোই। সেলিমকে বুকে জড়িয়ে অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে জাবেদা। স্বপ্নায় শান্তিতে কী ওর মুখখানা আর এত করুণ। সেই রাত্রে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছিল বউটাকে। ওর রুক্ষ কর্কশ চুলগুলোর মধ্যে, ওর চোখেমুখে একটু হাত বুলিয়ে দিতে বড় ইচ্ছে করছিল তাহেরের। কতদিন ওকে ছোঁয়নি সে। তাহেরের মৃদু স্পর্শে কখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল

জাবেদা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে নির্নিমেষ হাসছিল সে। আরো ঘন হয়ে সরে এসেছিল তাহেরের বুকের কাছে। ওর আলতো একটা হাত জড়িয়ে ধরেছিল তাহেরের কণ্ঠদেশ। কতক্ষণ এভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে গভীর আরামে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল জাবেদা। তাহেরের চোখে ঘুম নেই। অন্ধকারে চোখদুটো তার দবদব করছিল কপালের শিরাটা।

ভোর রাত্রে হঠাৎ তার ঘরের বাইরে কেমন একটা চাপা-গুঞ্জনে সচকিত হয়ে উঠল তাহের। জাবেদার আলিঙ্গন মুক্ত করে উঠে এল সে জানালার ধারে। বাইরে তখনো ফিকে অন্ধকার, কুয়াশায় অস্পষ্ট। তবু মনে হল কারা যেন বাইরে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ। তারাই। যাদের আসার কথা—আজ নয় কাল। সমস্ত কোয়ার্টারটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সশস্ত্র প্রহরী। আর দরজার সামনে অপেক্ষারত সার্জেন্ট।

জাবেদারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কি জিগেস করতে চাইছিল সে। তাহের বললে, 'চুপ'।

দরজায় ভারি বুটের লাথি।

'কে? কে ওরা?' জাবেদা ত্রস্ত চোখে জিজ্ঞেস করেছিল।

তাহের স্থির গলায় বলেছিল: 'পুলিশ।'

জামা কাপড় পরে দরজা খুলে দিল তাহের।

সার্জেন্ট গম্ভীর গলায় জানালে: 'ইউ আর অ্যারেস্টেড।'

খটাখট বেঁধে ফেলল তাকে। তারপর টেনে তুলল প্রিজন ভ্যানে। ভ্যান ছুটল।

জাবেদা চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মতো। ওর রুক্ষ কর্কশ চুল উড়ছিল···রাতের সেমিজে পেটিকোটে অনাবৃত অর্ধনগ্ন দেহে স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে ছিল। মজুর ব্যারাক তখনো জাগেনি, চোরের মতো এসে তাহেরকে নিয়ে ওরা চলে গেল।···

অন্ধকার নির্জন জেলের পাথরের বেদীতে স্থির হয়ে বসেছিল তাহের। জেলের অন্ধকারটা যেন ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। পৃথিবীর বুকে আর একটি নতুন দিন সৃষ্টি হতে চলেছে।

কেউ যেন এসে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে। মিস মার্থা। ছোটোজা

সিস্ক সকিং আর কোকাকোলা। 'আই—লাইক লাভ ইউ।' মিস মার্থা আদালতেও দাঁড়িয়ে আবেগ কম্পিত স্বরে তার নিযাতিত নারীত্বের কাহিনী বলে যাচ্ছে : 'দিস ডার্টি ইণ্ডিয়ান—তাহের আলি······'

'বলো—বলো তুমি—মিস মার্থাকে বেইজ্জত করেছিলে?' কানের কাছে জাবেদার আর্তনাদ।

'না।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল তাহের : 'না না না না।'

'তবে? কেন তারা তোমাকে ফাঁসি দিচ্ছে। কেন কেন কেন?'

হট্ যাও।

বাইরে সেলের কপাট খোলার শব্দ।

'কে? কে তোমরা কি চাও?' তাহের আলি চিৎকার করে উঠেছে। 'আমি মরব না। আমি মরতে পারি না। দোস্ত--সাথী--যদি আবার জন্মাতে হয়—যদি বারেবারেই এই পৃথিবীতে আসতে হয়—তবে বারবার যেন এই পথেই আসি। জাবেদা—সেলিম—দোস্ত: হুঁশিয়ার। কয়েক টুকরো বাসি রুটির চেয়ে স্বাধীনতা বড়, ইজ্জত বড়।'

মীমাংসা-দর্শনের নববিকাশ

ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

মীমাংসাদর্শন অর্থাৎ পূর্বমীমাংসা মোটেই ভাববাদী (Idealistic) দর্শন নহে, বরং ইহার মূল রূপ বাস্তববাদী (Realistic)। ইহা ভাষ্যকারগণের হাতে পড়িয়া যেভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে যে যে স্থলে ছেদ সেই সকল স্থান লক্ষ্য করিলে অনেক নূতন তথ্য ধরা পড়ে এবং সেগুলি বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

ইহার যে ভাষ্যকারের গ্রন্থ আদি বলিয়া স্বীকৃত তাহার পূর্বের ও পরের অনেক গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম দর্শনটির উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্পরীক্ষায় ধরা পড়ে। আচার্য শবরের ভাষ্যের পূর্বে লিখিত "উপবর্ষ" ও "ভবদাস"-এর গ্রন্থ যেমন আমরা পাইতেছি না তেমনই শবরের পরবর্তী "ভর্তৃমিত্র"-এর গ্রন্থও আমরা পাইতেছি না। ইহাদের গ্রন্থ না পাওয়ায় এই দর্শনটিকে কিভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে লোকগোচর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ রূপ আমরা জানিতেছি না। কিন্তু ভট্টকুমারিলের সুপ্রসিদ্ধ "শ্লোকবার্ত্তিক" গ্রন্থের উপোদ্ঘাতের দশম সংখ্যক কারিকায় পাইতেছি যে—

প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তী কৃতা
তামাস্তিক পথে কর্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া॥

অর্থাৎ ভট্টকুমারিলের পূর্বে প্রায়ই মীমাংসকেরা এই শাস্ত্রকে লোকায়ত দর্শনমুখী (Materialistic) করিয়াছেন; যেজন্য ভট্টকুমারিল ইহাকে আস্তিক পথে পরিচালিত করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।

কুমারিলের এই ইঙ্গিত কোন গ্রন্থকারের উপর ইহা জানিবার প্রয়োজন আছে। আচার্য শবরের গ্রন্থে এরূপ লোকায়তী ইঙ্গিত কুত্রাপি নাই।

গুরুপ্রভাকর মিশ্রকে কেহ কেহ ভট্টকুমারিলের পূর্বের লোক বলিয়াছেন কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ নহে বরং তাহাকে ঐ ভট্টের শিষ্য বলিয়া গণ্য করিবার বহু কারণ আছে। তাঁহাকে সমসাময়িক ধরিয়া ভট্টের ইঙ্গিত তাহার উপর প্রযোজ্য গণ্য করিলে তাঁহার গ্রন্থ পরীক্ষা করিতে হয় কিন্তু তাঁহার "বৃহতী" গ্রন্থ পরীক্ষায় একমাত্র "সমবায়" বিষয়ক ইঙ্গিত ছাড়া লোকায়তী ইঙ্গিত কিছুই নাই। বরং উল্লিখিত শ্লোকবার্ত্তিক কারিকার "ন্যায়রত্নাকর" টীকায় আচার্য পার্থসারথী মিশ্র বলিয়াছেন যে—"মীমাংসা হি ভর্তৃমিত্রাদিভিরলোকায়তৈব সতী লোকায়তীকৃতা নিত্যনিষিদ্ধয়োরিষ্টাঽনিষ্টং ফলং নাস্তীত্যাদি বহ্বপসিদ্ধান্ত পরিগ্রহেনেতি"। অর্থাৎ আচার্য শবর এবং ভট্টকুমারিলের মধ্যবর্তী "ভর্তৃমিত্র" মীমাংসাদর্শনের ঐরূপ লোকায়তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভর্তৃমিত্রের গ্রন্থের কোনও কোনও উদ্ধৃতি আচার্য পার্থসারথীর "শাস্ত্রদীপিকা" গ্রন্থে পাইতেছি কিন্তু সমগ্র রূপ দেখিবার জন্য গ্রন্থখানির অনুসন্ধান একান্তভাবে হওয়া কর্তব্য।

উল্লিখিত কারিকার "প্রায়েণ" কথাটি হইতে দর্শনটির লোকায়তীকরণ বিষয়ক আমাদের সন্দেহ আরও অন্যান্য ব্যক্তির উপর হওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য শবরের পূর্বের আরও যে দুইটি নাম অর্থাৎ "উপবর্ষ ও ভবদাস" আমরা পাইতেছি তাহাদের আলোচ্য বিষয়ও পরিগণন করা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশত ইহাদেরও কোনও গ্রন্থ, এমনকি তাঁহাদের ঐতিহাসিকত্বও পাইতেছি না। তবে সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনির গুরু হিসাবে এক "উপবর্ষ"-এর নাম পাওয়া যায় এবং "ভবদাস" এই উপবর্ষের বৃত্তিকেই সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই মত আচার্য শবর জ্ঞাপন করিয়াছেন; অতএব শবরের এই দুই পূর্বাচার্যের মধ্যে উপবর্ষের মত লক্ষণীয়।

মীমাংসাশাস্ত্রকে আমরা যে দুই দার্শনিক রূপে দেখিতে পাই তাহার একটি হইতেছে ব্যাকরণদর্শন রূপ। ভাষ্যকার উপবর্ষ যদি পাণিনির গুরু উপবর্ষ হন তবে এই ব্যাকরণদর্শন রূপ সম্ভবত তাঁহারই উদভাবিত। অন্য বিশেষ প্রমাণ না পাইলেও আমাদের এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে মীমাংসাদর্শনে তর্কপ্রসঙ্গের সূত্রপাতকর্তা আচার্য ভট্টকুমারিলের শিষ্য "মণ্ডন মিশ্র"ও তাঁহার "ভাবনাবিবেক" এবং "স্ফোটসিদ্ধি" গ্রন্থদ্বয় দ্বারা মীমাংসার এই ব্যাকরণ দর্শনের রূপ বিস্তৃত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা সত্য যে আচার্য মণ্ডন তাঁহার

শেষোক্ত গ্রন্থে বেদান্ত অনাদৃত "স্ফোটবাদ" স্থাপন করিয়াছেন এবং সেজন্য পরবর্তী আচার্য সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "তত্ত্ববিন্দু" গ্রন্থে উক্ত আচার্য মণ্ডনের মতকে খণ্ডন করিয়া ভট্টকুমারিলের "অভিহিতান্বয়বাদ" আশ্রয়ে ব্যাকার্থ বিবেচনার পথ বিবৃত করিয়াছেন। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে মীমাংসা শাস্ত্রের আদিভাষ্যেরই ক্রমপরিণতি দ্বন্দ্বমূলক ধারায় বিকশিত। বাস্তবিক ঐ "তত্ত্ববিন্দু" গ্রন্থের যে সংস্করণ আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মুখবন্ধে (Introductory Note) সংক্ষেপে অধ্যাপক কে, আর, পিশারথী লিখিয়াছেন যে—It occupies an important place in the dialectic literature of this (Mimansa) school of Indian thought (Page XVII).

মীমাংসাদর্শনে বহু কারণে যে এরূপ দ্বন্দ্বমূলক (Dialectical) আলোচনা আসিয়া গিয়াছে তাহা উক্ত "তত্ত্ববিন্দু" গ্রন্থের সম্পাদক ভি, এ, রামস্বামী শাস্ত্রী ভূমিকায় আলোচিত গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অন্যতম মীমাংসক অপ্পয়দীক্ষিত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—In some of his dialectical dissertations revealed certain truths which no autho on the Mimansa Sastra probably except Kumarila has assiduously cared to investitage (Introduciton—Page-94).

অতএব আমরা মীমাংসা-শাস্ত্রের ব্যাকরণ ও ন্যায়দর্শন ভাষ্যপন্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)-এর ভিত্তিতে দার্শনিক রূপ গঠন করিবার ইঙ্গিত পাইতেছি এবং এরূপ করিবার প্রচুর উপাদান যে ইহার মধ্যে আছে তাহা ভট্টকুমারিল ও গুরু প্রভাকরের প্রমেয় পদার্থের তুলনামূলক আলোচনা এবং তৎসহ মীমাংসার শ্রেষ্ঠ "অপূর্ব"তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে ধরা পড়ে। আচার্য পার্থসারথী তাঁহার "শাস্ত্রদীপিকা" গ্রন্থে যে বিষয়ী (Subject) ও বিষয় (Object) ভিত্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাকে আশ্রয় করিয়াই মীমাংসার এই নববিকাশ পল্লবিত করাও সহজসাধ্য এবং ভট্টকুমারিল হইতে শুরু করিয়া মণ্ডন মিশ্র, আচার্য পার্থসারথী, নারায়ণ ভট্ট, ও পণ্ডিত রামানুজাচার্য প্রভৃতি যে স্বতন্ত্র ধারায় এই দর্শনটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে এরূপ প্রচেষ্টা মোটেই পরের পরিশীলিত পন্থা নহে।

জে. বি. প্রিস্টলির

'ইন্সপেক্টর কল্‌স'

অবলম্বনে

●

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

তিনকড়ি। (লীলাকে থামাইয়া দিয়া) আচ্ছা থাক ও-কথা—আপনাদের ঝগড়াটা না হয় পরেই সারবেন। (অমিয়কে) তারপর মিস্টার বোস? প্যালেস ম্যাসেজ ক্লিনিকে আপনার সঙ্গে ঝরনা রায়ের প্রথম দেখা—কেমন?

অমিয়। (অল্প ইতস্তত করিতে করিতে)—মানে—ওসব জায়গায় আমি এমনিতে বড় একটা—

তিনকড়ি। বুঝেছি অমিয়বাবু—আপনি ওসব জায়গায় এমনিতে বড় একটা যান না। কিন্তু সেদিন গিয়েছিলেন—

অমিয়। হ্যাঁ—মানে—শরীরটা ঠিক ফিট মনে হচ্ছিল না। তাই মনে হল একবার ঘুরেই আসি। ম্যাসাজের পর ঘর থেকে বেরিয়েছি এমন সময় মানে—জানেনই তো—ওসব জায়গায় ঐ টাইপের মেয়েই বেশি আসে—

রমা। (কৌতূহলী হইয়া) ঐ টাইপের মেয়ে—?

তিনকড়ি। যাক গে টাইপটা এখন নাই বা আলোচনা করলেন। বিশেষ করে ওঁর সামনে—(শীলাকে দেখাইয়া দিলেন)

রমা। (চটিয়া উঠিয়া) আমি যে তখন থেকে বলছি—শীলা, তুই এঘর থেকে যা!

শীলা। তুমি ভুলে যাচ্ছ মা—আজ বাদে কাল অমিয়র সঙ্গে আমার বিয়ে! তারপর অমিয়? ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছ, এমন সময় জানতে পারলে ওখানে ঐ টাইপের মেয়েরাই বেশি আসে—তারপর?

অমিয়। (ক্রুদ্ধ স্বরে) খুব মজা লাগছে শুনতে—না শীলা! আচ্ছা শীলা —তোমার এতটুকু লজ্জা করছে না—

তিনকড়ি। (বাধা দিয়া) Come along মিস্টার বোস, তারপর?

অমিয়। না—মানে বেরিয়ে এসেছি—এমন সময় দেখি—মানে—ঐ মেয়েটি—মানে ঝরনা—একেবারে সামনে—(কিছুটা আত্মবিস্মৃতের ন্যায়) রঙ ফরশা, ঘন কালো চুল, টানা চোখ—(হঠাৎ থামিয়া গিয়া)—My god!

তিনকড়ি। কি হল মিস্টার বোস?

অমিয়। না, মানে—আমার ঠিক মনে ছিল না—

তিনকড়ি। (রূঢ় স্বরে) যে মেয়েটি একটু আগে মারা গেছে, এই তো?

শীলা। আর আমরাই তাঁকে মেরেছি, তাই না?

রমা। শীলা!

শীলা। তুমি চুপ করো মা!

তিনকড়ি। হ্যাঁ, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন ঐ মেয়েটি—তারপর?

অমিয়। দেখি আমাদের ধীরেশ তার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। আর মেয়েটি প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাকে বাধা দেবার। তার মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হল, ম্যাসাজ ক্লিনিকে খুব বেশি দিন সে আসে নি—

রমা। কিন্তু ধীরেশ? কোন্ ধীরেশ, অমিয়?

অমিয়। আমাদের ধীরেশ কাকিমা—এস. এনের ছেলে—

রমা। সত্যি?

শীলা। হ্যাঁ মা, সত্যি। তুমি ভাব, বোকা-বোকা মুখ করে এখানে আসে, তোমাকে কাকিমা কাকিমা করে, চা-টা খায়—অমন ছেলে আর হয় না।

আমর। তো এসব ব্যাপার বহুদিন জানি! পাশের বাড়ির প্রতিভাদিকে চেনো?

রমা। কে প্রতিভা? ও—ঐ স্কুল-মিস্ট্রেস?

শীলা। হ্যাঁ। প্রতিভাদি ধীরেশের ছোট বোনকে পড়াত দু-মাস পরে টিউশান ছেড়ে দিতে হল। কেন জানো? তোমাদের ঐ এস এনের ছেলে ধীরেশ দু-একদিন তার হাত ধরে—

চন্দ্রমাধব। (জোরে ধমক দিয়া উঠিলেন) শীলা—! (শীলা থামিয়া গেল)

তিনকড়ি। (অমিয়কে) আপনি থামলেন কেন? বলে যান—

অমিয়। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার যেন কিরকম মায়া হল। ধীরেশের হাত থেকে ছাড়িয়ে, ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম—

তিনকড়ি। সেদিন কোথায় উঠলেন?

অমিয়। পাশের রয়াল হোটেলে।

তিনকড়ি। কিছু কথাবার্তা হয় নি?

অমিয়। হয়েছিল—তবে অল্প। নাম বললে ঝরনা রায়। কথায়-কথায় জানতে পারলাম, বাপ-মা কেউ নেই। আগে চাকরি করত—দু-দুবার চাকরি যাওয়ায় কোথাও কিছু না পেয়ে, শেষে এই ম্যাসাজ ক্লিনিকে চাকরি নেয়। ম্যাসাজ ক্লিনিকের ব্যাপার যে খানিকটা জানত না তা নয়—জানত। কিন্তু অন্য কিছু না পেয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এদিকে কথা খুব কম। আমাকে তো আগের কথা কিছু বললেই না—আমিও অবিশ্যি জোর করি নি। তবে কথার ফাঁকে শুধু এইটুকু জানতে পারলাম—হাতে টাকা-পয়সা কিচ্ছু নেই। না আছে আত্মীয়স্বজন, না আছে বন্ধু-বান্ধব। কি জানি কেন বড্ড মায়া হল। হাতে কিছু টাকা দিয়ে আর ঐ হোটেলেই দিন পনেরো থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সেদিনের মতো আমি চলে এলাম।

তিনকড়ি। তারপর—দিন পনেরো বাদে আপনি ঠিক করলেন—মেয়েটিকে আপনার নিজের কাছেই রাখবেন—এই?

রমা। অমিয়!

শীলা। এতে অবাক হওয়ার কিছু তো নেই, মা! গল্পের গোড়া দেখলেই

সো শেষটা বোঝা যায়।--যাকগে অমিয় তুমি বলো—মা তো একটু চমকাবেই !

অমিয়। পনেরো দিন বাদে আবার আমাদের দেখা হয়। সেদিন কি জানি কেন মনে হল একা এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাকে ছেড়ে যাওয়া খুবই অন্যায়। সে-সময় আমার এক বন্ধু মাস-পাঁচেকের জন্যে বম্বে গিয়েছিলেন। তার ফ্ল্যাটের চাবিটা আমার কাছে ছিল। আমি তাকে ঐ ফ্ল্যাটটায় এনে রাখলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন তিনকড়িবাবু, কোনো অভিসন্ধি আমার ছিল না। আমি শুধু তার একটু উপকার করতে চেয়েছিলাম—কোনো প্রতিদান আমি চাই নি—

তিনকড়ি। ও —

শীলা। (নিজের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) দেখ অমিয়,—কাকে বলার কথা, আর কাকে বলছ——

অমিয়। I am sorry শীলা—মানে —

শীলা। না না, মানে আমি বুঝি অমিয—তুমি তো বলছ না, উনি তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন——

তিনকড়ি। আচ্ছা—তারপর থেকে রায়না আপনার সঙ্গেই রয়ে গেল—কেমন ?

অমিয়। (হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে) সেটাও কি আপনাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে ? কিচ্ছু বোঝেন না আপনি ?

তিনকড়ি। বুঝি বই কি—তার দিকটা বেশ ভালো করেই বুঝি। একা অসহায় স্ত্রীলোক। আপনিই বোধহয় তার জীবনের প্রথম বন্ধু! কিন্তু আপনি ? আপনি কি সত্যিই তাকে ভালোবেসেছিলেন ?

চন্দ্রমাধব। দেখুন, তিনকড়িবাবু—আমি চাই না, আমার বাড়িতে এসব কথাবার্তা হয়—

তিনকড়ি। কিন্তু, আপনি না চাইলেও হচ্ছে। মেয়েটিকে আপনিই প্রথম তাড়িয়েছিলেন।

চন্দ্রমাধব। সেটা শুধু আমি নয়, আমার মতো যেকোনো এমপ্লয়ারই তাকে তাড়িয়ে দিত। যাকগে সেকথা। আমি চাই না আমার বাড়িতে, আমারই মেয়ের সামনে, এ ধরনের অভব্য কথাবার্তা হয়।

তিনকড়ি। আপনার দেশে কিছু চাদের দেশে ... —ইটকাঠের ভুনিয়ার তাকে পা ফেলে চলতে হয়!— হাঁ, তারপর মিস্টার বোস—আপনি কি সত্যিই মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলেন?

অমিয়। না—মানে—সে—আমাকে—

তিনকড়ি। না, না, তার কথা আমি জানি। সে আপনাকে ভালোবেসে ছিল—কিন্তু আপনি?

অমিয়। আমার একটা মোহ থাকা খুব অস্বাভাবিক কি?

শীলা। আর এই মোহটা বোধহয় তোমার মাসতিনেক ছিল, না অমিয়? তাই বোধহয় তিনমাস এখানে আসতে পারো নি? ঐ যে গেল বছরের মে-জুন-জুলাই?

অমিয়। কিন্তু শীলা—আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলি নি। ও তিনমাস সত্যিই আমার কাজ খুব বেশি ছিল!

শীলা। কিন্তু ওখানে বোধহয় তুমি রোজই যেতে?

অমিয়। না, রোজ মোটেই যেতাম না—

তিনকড়ি। কিন্তু প্রায়ই যেতেন তো?

অমিয়। হাঁ—

রমা। ছিঃ অমিয়—যত সব ডিসগাসটিং ব্যাপার—

অমিয়। কিন্তু কাকিমা—আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না—

রমা। তার মানে?

তিনকড়ি। মানে, ব্যাপারটা আপনার কাছে ডিসগাসটিং হলেও ওঁর কাছে নয়।

অমিয়। আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে?

তিনকড়ি। হাঁ—শেষে কি হল?

অমিয়। আগস্টের শেষে হপ্তা দুয়েকের জন্যে আমার বাইরে যাবার কথা হয়। যাবার আগে বেশ ভালো করে ভেবে দেখলাম—দেখলাম আর জের টানার কোনো মানেই হয় না। আমার আসা-যাওয়া কম দেখে ঝরনাও বুঝতে পেরেছিল। একদিন তাকে সব খুলে বললাম—

তিনকড়ি। কিভাবে নিলে সে?

অমিয়। খুব সহজভাবে। আশ্চর্য, এত সহজভাবে নেবে; তা ভাবতেও পারি নি।

শীলা। (ব্যঙ্গের সুরে) তোমার তো খুব ভালোই হল—

অমিয়। তুমি কত কম বোঝ শীলা, অথচ কথা বলো কত বেশি ! সে আমায় কি বলেছিল জানো ? বলেছিল, এত সুখ সে জীবনে কোনোদিন পায় নি ! জানো শীলা, ঝরনা আমার ওপর এতটুকু রাগ করে নি। জিজ্ঞেস করতে বলেছিল—রাগ করতে যাব কেন ? আমি তো গোড়া থেকেই জানি এ-সুখ আমার সইবে না ! (দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে) ওঃ আজ যদি সে একবারও ফিরে এসে বলে যেত— যত দোষ, সব তোমার অমিয়, যত দোষ সব তোমার !—তাহলে বোধহয় আমি বেঁচে যেতাম শীলা !

তিনকড়ি। তারপর অমিয়বাবু—ঝরনাকে ঐ ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হল, কেমন ?

অমিয়। হ্যাঁ, অবিশ্যি যাবার আগে আমি তাকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নেয় নি। বললে—আমি যা দিতাম, তা থেকেই কিছু তার হাতে পড়ে আছে। আমি অনেক বললাম। কিছুতেই রাজী হল না। বললে দু-একটা মাস, কোনো রকমে চলে যাবে—তার মধ্যে একটা না-একটা কিছু জুটে তার যাবেই—

তিনকড়ি। কোথায় যাবে, কিছু বলেছিল আপনাকে ?

অমিয়। না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু কোনো উত্তর পাই নি। তবে কথার আভাসে মনে হয়েছিল বোধহয় কলকাতায় থাকবে না। আপনি জানেন কিছু ?

তিনকড়ি। হ্যাঁ—মাসখানেকের জন্যে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিল —নির্জন ছোট্ট একটা জায়গায়—

অমিয়। একা ?

তিনকড়ি। হ্যাঁ, একা থাকবার জন্যেই তো গিয়েছিল। ছোট্ট নির্জন একটা জায়গা—বসে বসে সারাদিন ভাবত আপনার কথা, তার নিজের কথা—আর মনে রাখবার মতো ঐ মে-জুন-জুলাইয়ের কথা—

অমিয়। কিন্তু আপনি এসব কথা জানলেন কি করে ?

তিনকড়ি। ঐ যে বললাম—সে একটা ডায়েরি রেখে গেছে। সুদিনের কথা কে না মনে রাখতে চায় বলুন? দেখলে, সামনেই তার সময় খারাপ। তাই সামনে না তাকিয়ে ঐ একটা মাস শুধু পেছনের কথাই ভাবলে—পেছনের ঐ তিনটে মাস!

অমিয়। ও—কিন্তু এ সব পরের খবর তো আমি রাখি না—

তিনকড়ি। আপনার কাছ থেকে এই খবরটাই আমি চেয়েছিলাম—এর পরেরটা নয়!

অমিয়। দেখুন—তাহলে—মানে—আমি যদি এখন একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি—(তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল) অবিশ্যি আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে—

তিনকড়ি। কোথায় যাবেন? বাড়ি?

অমিয়। না না, বাড়ি নয়—এই বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি ঠিক ফিরে আসব।

রমা। তার মানে? এখানেই তাহলে শেষ নয়?

অমিয়। কি জানি বাড়িমা—আমার তো মনে হয়—না। তারপর—উনি জানেন—(তিনকড়ির দিকে ইঙ্গিত করিয়া বাহির হইয়া গেল)

শীলা। কিন্তু তিনকড়িবাবু, আপনি তো ছবিটা অমিয়কে দেখালেন না?

তিনকড়ি। দরকার মনে করলুম না—মনে হল, না দেখানোই ভালো।

রমা। আপনার কাছে মেয়েটার ছবি আছে নাকি?

তিনকড়ি। আছে। একবার দেখবেন নাকি?

রমা। আমি? আমি কেন দেখতে যাব? কি দরকারটা আমার?

তিনকড়ি। না দরকার কিছু নেই। তবু একবার দেখলে পারতেন?

রমা। আচ্ছা কই দেখি—নিয়ে আসুন—

(তিনকড়িবাবু মিসেস সেনের নিকট আসিয়া পকেট হইতে ছবি বাহির করিলেন। মিসেস সেনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মনে হইল খুব ভালো করিয়া ছবিটি দেখিতেছেন।)

তিনকড়ি। (ছবিটি যথাস্থানে রাখিয়া) চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়?

রমা। তার মানে? আমি কি করে চিনব?

তিনকড়ি। সে কি? ছবিটা অবশ্যি আগেকার তোলা। মুখের চেহারা

একটু-আধটু বদলাতেও পারে। কিন্তু তাই বলে এত বদলে গেল, যে একেবারে চিনতেই পারলেন না?

রমা। দেখুন, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। কি বলতে চান আপনি?

তিনকড়ি। বুঝতে পারছেন না—না, বুঝতে চাইছেন না?

রমা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তার মানে?

তিনকড়ি। মানে, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

রমা। তিনকড়িবাবু, ভদ্রভাবে কথা বলতে চেষ্টা করুন—

চন্দ্রমাধব। তার মানে? আগে উনি তোমার কাছে মাফ চাইবেন, তারপর অন্য কথা।

তিনকড়ি। কিন্তু ভুল করছেন—যা করছি, তা আমার ডিউটি, তার জন্যে মাফ চাইব কেন?

চন্দ্রমাধব। কিন্তু গালাগাল দেওয়াটা আপনার ডিউটি নয়। আপনি আমাদের রাম-শ্যাম-যদু-মধু পেয়েছেন নাকি? আমরা শহরের একটা নামকরা লোক, তা জানেন?

তিনকড়ি। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার সেন, নামকরা লোক হিসেবে আপনাদের যেমন সুবিধেও কিছু আছে, তেমনি দায়িত্বও কিছু আছে।

চন্দ্রমাধব। তা হয়তো আছে। কিন্তু আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে কি জন্যে? দায়িত্বের কথাটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে?

শীলা। খুব ঠিক করে কিন্তু বলা যায় না বাবা—হয়তো তা হলেও হতে পারে—

রমা। শীলা!

শীলা। আচ্ছা মা, তোমরা যে এই বড়মানুষী ভড়ং দিয়ে ব্যাপারটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছ, কোনো মানে হয় এর? পাঁচটা টাকা বেশি মাইনে চেয়েছিল বলে বাবা তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমার চেয়ে দেখতে ভালো বলে, আমি রেগে গিয়ে তার চেন-স্টোরের চাকরিটা খেলাম। অমিয় তার খেয়ালখুশিমতো তাকে নিজের কাছে এনে রাখলে—আর যেই দরকার ফুরোল, তাকে বিদায় করে দিলে। আর তুমি?

তুমি ছবিটা নিয়ে দেখলে। পরিষ্কার বোঝা গেল, তুমি চিনতে পেরেছ! তুমি চিনতে পেরেও বললে চিনি না, অথচ ওঁকে বলছ মাফ চাইতে! কেন উনি মাফ চাইবেন?

রমা। শীলা, তুই চুপ করবি! আমি যা ভালো বুঝেছি তাই বলেছি।

শীলা। কিন্তু ভালো যে তুমি বোঝ নি মা। তোমার এ মিথ্যে ভড়ংএ ব্যাপারটা যে ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে—

(সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল)

চন্দ্রমাধব। আঃ—আবার কে এল—

রমা। বোধহয় অমিয় ফিরে এল—

তিনকড়ি। কিংবা দেখুন, হয়তো তাপসবাবু বাইরে গেলেন—

চন্দ্রমাধ। আমি দেখে আসি, বুঝলে?

(তিনি দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন)

তিনকড়ি (রমাকে) আচ্ছা মিসেস সেন, আপনি তো নারীসহায়ক সমিতির প্রেসিডেন্ট—না? (মিসেস সেন চুপ করিয়া রহিলেন)

শীলা। বলো মা—চুপ করে রইলেন কেন? এটাতে তো হাঁ বলতে কোনো বাধা নেই! (তিনকড়িকে) হ্যাঁ উনিই প্রেসিডেন্ট কিন্তু কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। আচ্ছা, শুনেছি মেয়েরা বিপদে-আপদে পড়লে, আপনাদের কাছে আবেদন-টাবেদন করে—আপনারা নাকি নানারকম সাহায্যটাহায্য করে থাকেন—সত্যি?

রমা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) সাহায্য-টাহায্য নয়—দরকার হলে রীতিমতো টাকা পয়সা দিই—এমন অনেক কেসে আমরা দিয়েছি!

তিনকড়ি। আচ্ছা, হপ্তা-দুয়েক আগে আপনাদের একজিকিউটিভ কমিটির একটা মিটিং হয়ে গেছে, না?

রমা। আপনি যখন বলচেন—তখন হয়েছে নিশ্চয়—

তিনকড়ি। (দৃঢ় স্বরে) আমি বলছি বলে নয়—আপনিও জানেন—হয়েছে। সে মিটিংএ আপনিই ছিলেন প্রেসিডেন্ট—

রমা। যদি থাকিই প্রেসিডেন্ট তাতে আপনার কি?

তিনকড়ি। (কঠোর স্বরে) শাদা কথায় বলব আপনাকে? সহ্য করতে পারবেন? (চন্দ্রমাধবের প্রবেশ)

চন্দ্রমাধব। বুঝলে; তাপসই—

রমা। আশ্চর্য—কোথায় গেল বল তো? এই বলছিল শরীরটা খারাপ—

চন্দ্রমাধব। আরে শরীর খারাপ কি? তখন দেখলাম—আবোল-তাবোল বকছে। আমি বললাম—শুতে যা—তো কে-কার কথা শোনে! বলে ইন্‌স্পেক্টর আমাকে জেগে থাকতে বলেছেন! আমি তবু বললাম—বলুক ইন্‌স্পেক্টর—আমি বলছি, তোকে দরকার হবে না—

তিনকড়ি। আপনি ভুল বলছেন, মিস্টার সেন—তাঁকে আমার সত্যিই দরকার। আর তিনি যদি শিগ্‌গির না ফেরেন, তাহলে আমাকেই গিয়ে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতে হবে— (মিস্টার ও মিসেস সেন ভীতভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন)

[ক্রমশ

'আরোগ্য নিকেতন' ও সাহিত্যবিচার

সীমান্ত সেন

'আরোগ্য নিকেতনে' চরিত্র-বিশেষের রূপায়ণে বিকৃতি সম্পর্কে গত সংখ্যায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডাক্তার পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিবাদের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ না থাকলেও স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে একটি বিশেষ চরিত্রায়ণে বিকৃতি অথবা অতিরঞ্জন সাহিত্য-মূল্যকে প্রভাবিত করছে কিনা। তা যদি না করে তাহলে সাহিত্য-পাঠকেরা ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ নির্বিচারে উপেক্ষা করতে পারেন, কেননা চিকিৎসাশাস্ত্রের নির্ভুল এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্যে কেউ উপন্যাস পড়ে না। দ্বিতীয় লক্ষণীয়, সমগ্র উপন্যাসে বিকৃত চিত্রণের প্রভাব কতটুকু। মৌল অর্থেই যদি এটি টাইপ-চরিত্র হয় অর্থাৎ এ শুধু একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব না হয়ে বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়, তাহলে উপন্যাসের ঘটনা-নিয়ন্ত্রণে ঐ বিকৃতির দায়িত্ব নিশ্চয়ই সবিশেষ আলোচ্য। অন্যক্ষেত্রে, যেমন ধরা যাক এমন এক উৎকেন্দ্রিক ডাক্তারের চরিত্র সৃষ্টি করা হল, ভুল চিকিৎসাতেই যার জনপ্রিয়তা, সেখানে তিনি যদি স্ট্রেপ্টোমাইসিনের জায়গায় পেনিসিলিন ব্যবহার করেন তাহলে তা অতিরঞ্জন হবে না, বিকৃতি তো নয়ই। 'আরোগ্য নিকেতন'-এর শশী ডাক্তার ইনট্রাভেনাস ইনজেকশনকে ইন্টারভেনাস বলতে

আমরা বিচলিত হই না, কিন্তু হাসপাতালের এম বি পাশ করা ডাক্তারের মুখে এ সম্বন্ধ প্রয়োগে আমরা আপত্তি করব। সুতরাং চরিত্রগুলির বিশেষ পটভূমিকায় 'আরোগ্য নিকেতন'-এর সাহিত্যমূল্য বিচার্য।

'আরোগ্য নিকেতন' ১৩৫৮ সালের 'শারদীয় আনন্দবাজারে' প্রকাশিত 'সঞ্জীবন ফার্মেসি'র পরিবর্ধিত রূপ। বলা বাহুল্য ডাক্তারি বিষয়ের অত বিস্তৃত খুঁটিনাটি শেষোক্ত বড় গল্পে নেই। সুতরাং এদিক থেকে 'সঞ্জীবন ফার্মেসি'তে অসঙ্গতি অপেক্ষাকৃত কম। বস্তুত এর থিম্ (theme) একান্ত ভাবেই ছোটগল্পের—উপন্যাসের বিষয়বিস্তৃতি অথবা বৈচিত্র্য এর নেই। গল্পের বিষয় আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদের দ্বন্দ্ব; শেষ পর্যন্ত আয়ুর্বেদের জয়। এই দুয়ের মধ্যপন্থা হিসেবে আছে ডাক্তার রঙলাল। সে যদিও পেশায় ডাক্তার (তবে পাশ করা নয়), তবু সে স্বীকার করে এবং বলে, 'কবিরাজী আমি পড়ি নি, এমন মনে করো না। ওর মধ্যে অপূর্ব বস্তু আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে ও এগোয় নি। কালের সঙ্গে রোগের প্রকৃতির উপসর্গের পরিবর্তন হয়েছে। একটা রোগের সঙ্গে আর একটা রোগের সংমিশ্রণ হয়ে নূতন ব্যাধির উদ্ভব হয়েছে। ইউরোপের এই চিকিৎসা বিজ্ঞান অহরহ তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে চলেছে।" অন্যত্র সে জীবন ডাক্তারকে উপদেশ দিয়েছে, "ডাক্তারি, কবিরাজী মুষ্টিযোগ তিনটি নিয়েই তোমার ট্রাইসাইকেল তৈরী কর।" কার্যত দেখা যায় আলোচ্য উপন্যাসে, মুষ্টিযোগ, দ্রব্যগুণ (স্বপ্নে পাওয়া)-কে কবিরাজী শাখারই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবন ডাক্তারের একটি প্রেমের কাহিনী উপন্যাসের মূল্যবান পর্যায়—মঞ্জরী ঔপন্যাসিকের একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। মঞ্জরী জীবন ডাক্তারি পড়ত জেনেই তার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু যখন সে শুনল জীবন ডাক্তারি পড়বে না, পৈতৃক ব্যবসায় কবিরাজীকেই অবলম্বন করবে, তখন তাকে নিতান্ত অনাধুনিক বলে প্রত্যাখ্যান করল। তার বিয়ে হল দেউলিয়া জমিদারের দুশ্চরিত্র ছেলে ভূপী বোসের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে রোগরুগ্ন মঞ্জরীকে অন্ধচোখে আসতে হল জীবন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে এবং জীবনের কথানুযায়ী নির্ধারিত দিনে (এ বিষয়ে জীবন ডাক্তারের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।) সে মারা গেল।

মঞ্জরীর জীবন ও মৃত্যু কবিরাজীর মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বলতর করেছে। মঞ্জরী-রূপী রোগ-জীবনের উপকাহিনী উপন্যাসে শুধু এইটুকু দায়িত্ব পালন করেছে, অন্যথা মূল কাহিনীর সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন। উপন্যাসে ঘটনার বিকাশে লেখকের নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি। এখানে কোথাও আয়ুর্বেদ এবং ডাক্তারির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব বা Conflict নেই, গোড়া থেকে আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের মতো স্বীকৃত। জীবন ডাক্তারও এদিক থেকে নির্বিকার, অথচ মঞ্জরীর বিয়ের ঘটনার পর এ সংশয় তার আসা উচিত ছিল। বরং তার নির্ভুল নাড়ীজ্ঞানের জন্যে তাকে অনেক বেশি বিব্রত দেখা যায়। কেননা এজন্যে তাকে অকারণে জনপ্রিয়তা হারাতে হয়েছে। তার মাঝে ডাক্তারি ছেড়ে দেবার মূলে শেষোক্ত কারণই প্রবল।

সুতরাং এই উপন্যাসে চরিত্র-বিশেষের প্রতি লেখকের অকারণ পক্ষপাতিত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ে. ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের অতি-অনুশাসনের দরুন চরিত্রগুলি নিজের মতো বাড়তে পারে না, ফলে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে নাটক সৃষ্টি সম্পর্কে শ-র অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, নাটকের বিষয় এবং চরিত্র পরিকল্পনা তিনি করেন, কিন্তু নাটক লিখতে শুরু করলে চরিত্রের উপর স্রষ্টার অধিকার তিনি হারিয়ে ফেলেন, তাদের স্বধর্মেই তারা চলতে শুরু করে। তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' সম্পর্কে একথা বলা চলে না। ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশে আমরা স্রষ্টার উপস্থিতি সবসময় অনুভব করি। এই কারণে বিরুদ্ধ চরিত্রগুলির প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি। জীবন ডাক্তারের তুলনায় আধুনিক ডাক্তারেরা অনেক উদ্ধত, মায়ামমতাহীন, রোগীর প্রতি সহানুভূতিশূন্য। চরিত্রায়ণে এর প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে পাশ-করা ডাক্তারদের অজ্ঞতা, আর কবিরাজ হয়েও কিছুটা স্বজ্ঞা (intuition), কিছুটা অভিজ্ঞতার বলে জীবন ডাক্তারের প্রায় নির্ভুল অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত নিয়ে সামান্যীকরণ অসম্ভব। তারাশঙ্কর [illegible] করেছেন। বিরুদ্ধ চরিত্রের প্রতি লেখকের অবিচার সময় সময় [illegible] পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ দুয়ের দ্বন্দ্বই যদি তাঁর মুখ্য বিষয় হত তাহলে এক্স-রে প্রভৃতি আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি আরেকটু সুবিচার করতেন। কোনো এক পক্ষের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব থাকা স্বাভাবিক,

কিন্তু তার জন্যে শিল্পীর দায়িত্বসম্পর্কে উদাসীন হওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ। উনিশ শতকে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল. ভারতের যা কিছু প্রাচীন, তাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে। ঐতিহ্য বলতে তাঁরা জীর্ণত্ব, স্থবিরত্ব সবকিছুই বুঝতেন। কিন্তু অতি উৎসাহে তাঁরা এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতের জন্যেও ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে হয় এবং তা সম্ভব ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ের মধ্যে। জীবন ডাক্তারি পড়বার দুবার সুযোগ পেয়েও পড়ে নি, কিন্তু তার সমগ্র জীবনে এ না-পড়ার অসম্পূর্ণতা সে কদাচিৎ বোধ করেছে। কিশোর চরিত্র পরিকল্পনাটিও কেমন ছককাটা। সে যেহেতু দেশকর্মী সুতরাং কবিরাজীর প্রতি আস্থা। বলা বাহুল্য কিশোরও উপন্যাসটির কোনো অপরিহার্য চরিত্র নয়।

এই পটভূমিকায় ডাক্তার পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগগুলি বিচার্য। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, উপন্যাসিকের যতটা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, 'আরোগ্য নিকেতন'-এর লেখকের তা নেই। সুতরাং এ বিকৃতি সম্পর্কে তাঁর আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারের চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন পাঠকসমাজে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে দেখা যাক। তারাশঙ্করের মতো জনপ্রিয় লেখক, তাঁর রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত বই এবং কলকাতার কোনো একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে এর স্থায়ী অভিনয় ব্যবস্থা—এ সমস্তই পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে এরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি অসম্ভব নয় যে, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র না হোক চিকিৎসকেরা একেবারে অজ্ঞ, সুতরাং মহামারীতে ডাক্তার না ডেকে মা শীতলার পূজার আয়োজন অধিকতর ফলপ্রদ। সাধারণ পাঠকের সারল্যের সুযোগ নিয়ে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেবার মনোবৃত্তি সব সময় নিন্দনীয় এবং 'আরোগ্য নিকেতন' এদিক থেকে সার্থক প্রতিক্রিয়াশীল রচনা।

তারাশঙ্করের হয়তো ধারণা সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার অবসানের সঙ্গেসঙ্গে সেযুগের ঐতিহ্যেরও বিসর্জন হবে। ঐতিহ্যকে বর্জন করে নয়, তাকে অবলম্বন করেই নতুন কালের সৃষ্টি। অবশ্য তারাশঙ্করের অর্থে 'ঐতিহ্য' নয়, কেননা 'আরোগ্য নিকেতন' পড়ে সন্দেহ হয় স্বপ্নে

ওষুধ পাওয়াও ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বিশেষ ধারা। তার জীবন ডাক্তার 'অন্ধকার ঘরের খড়ের চালের দিকে চেয়ে ভাবতেন—আজ স্বপ্নে যদি তিনি কোনো ওষুধ পান! তাঁর বাবা যদি কোন মুষ্টিযোগ বলে দেন! গুরু রঙলাল ডাক্তার যদি বলে দেন—লেখ প্রেসক্রিপসন—লেখ, আমি বলে দিচ্ছি।'

বাঙলা উপন্যাসের একশ বছর পূর্ণ হল। বঙ্কিম যুগে আমরা 'magnetised ত্রিশূল' ইত্যাদির কথা পড়েছিলাম। প্রায় ষাট-সত্তর বছর পরে রীতিমত হাতযশওয়ালা ডাক্তারের স্বপ্নে প্রেসক্রপশন পাবার অভিলাষের কাহিনী পড়লাম তারাশঙ্করের উপন্যাসে। ওয়াজেদ আলীর মতো কি আমরাও বলব, সেই 'tradition' সমানে চলে আসছে, তার বিবর্তন নেই, পরিবর্তন নেই?

মুক্তি

তপোবিজয় ঘোষ
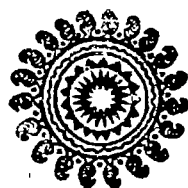
অফিস তো নয় যেন মানুষমারা কল। একশ টাকার লোভ দেখিয়ে এনে ফাঁদে ফেলা। তারপর লোহার গারদে আটকে রেখে তিলে তিলে শেষ করা।

অথচ এরই জন্যে এত মারামারি। এত কাড়াকাড়ি।

বড়সাহেব-ছোটসাহেবের শালা-ভাগ্নের ভিড় ঠেলে একটু জায়গা বে-দখল। মাসের পর মাস হাঁটাহাঁটি করে প্রাণান্ত।

ইন্টারভিউ। পুলিশ ভেরিফিকেশন্। আরো কত কি!

তবু যা হোক চাকরিটা পেয়েছিল অনন্ত। সেই সঙ্গে এক কোঠাওলা একটা কোয়ার্টার। কলোনির শেষপ্রান্তে। পিওন আর বরকন্দাজের কোয়ার্টারগুলোর গা ঘেঁষে। জি বারো।

গায়ে লাগা আরো একটা কোয়ার্টার। জি তেরো। মাঝখানে একটা ছোট্ট পাঁচিল উঠে দুভাগ করেছে বাড়িদুটো। এ বাড়িতে কথা বললে শোনা যায় ওবাড়ি থেকে। ওবাড়ির ছিচকাঁদুনে ছেলেটা মাঝরাতে গলা ছেড়ে কঁকিয়ে উঠলে ঘুম ভেঙে যায় এবাড়ির মানুষের।

তবু ভালো। বাড়িতে আলো আছে। জল আছে। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য একফালি বারান্দাও আছে। সেই সঙ্গে একটু উঠোন। বাগান করার মতো একটিলতে ঘেরা দেওয়া জায়গা।

প্রথম প্রথম খুশিতে উপচে উঠেছিল অলকা। খাঁচা-ছাড়া ছোট্ট পাখিটার মতো ঘর আর এ-ঘর করে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে শুধু।

সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে ভয়ে ভয়ে আলো জ্বালিয়েছে। আবার নিভিয়ে পরখ করে দেখেছে এক-একবার করে।

আড়চোখে তাকিয়ে অনন্ত মুচকি হেসেছে শুধু। গভীর আগ্রহে উপভোগ করেছে অলকার ছেলেমানুষীকে।

কিন্তু ইদানীং কেমন যেন মিইয়ে গেছে অলকা। কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব। একটা অকারণ গাম্ভীর্য। সব পেয়েও অনেককিছু হারানোর ব্যথায় বিবর্ণ নীল একজোড়া চোখ।

অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছে অনন্ত। কোথায় যেন একটু সূক্ষ্ম পরিবর্তন হচ্ছে অলকার। যেন অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছে সে। দূরের মানুষ।

অনন্ত তার হদিশ পায় না আজকাল! কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। বুকে টানলে ঠাণ্ডা বিস্বাদ লাগে। অথচ কেন যে এমন হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না অনন্ত। মাঝে মাঝে অলকাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেসও করে:

এখানে থাকতে তোমার কি ভালো লাগে না অলকা?

বোবা দৃষ্টি মেলে অলকা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অনন্তর মুখের দিকে। তারপর ঘাড় নাড়ে: না!

: কেন? অনন্ত বিস্মিত হয় একটু, বলে: ছিলাম বস্তিতে—উঠে এসেছি পরীর রাজ্যে। এত জল—এত আলো—

: তা হোক! বাধা দেয় অলকা: আমার কাছে সেই ছিল ভালো। প্রাণ ছিল সেখানে—মানুষ ছিল—। অনন্ত তবু জিজ্ঞেস করে: আর এখানে?

: সব যন্ত্র! মানুষগুলো যেন এক-একটা বরফের টুকরো!

হয়তো তাই। একটু একটু করে বুঝবার চেষ্টা করে অনন্ত। ডুব দিতে চায় অন্ধকার মনের গভীরে। বুঝতে পারে চিরকালের মিশুকে মেয়েটি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে এখানে এসে। অতল শূন্যতার মাঝে থই পাচ্ছে না কোথাও। হাঁপিয়ে উঠেছে।

আর অনন্ত নিজেও কি অবাক হয়েছে কম? এ জায়গার হালচাল দেখে ঘাবড়ে গেছে সে নিজেও। মিইয়ে গেছে। ভাবতে গিয়ে মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে আরও। চোখের পাতায় ক্লান্তি ঘনায়। মনের গোপন কন্দরে

পুব-বাংলার বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ উঁকিঝুঁকি মারে। জল থই থই পানা-পুকুরে ডিঙি নাওটা বোঁ করে পাক খেয়ে ঘুরে যায়। দিক বদল করে। সূর্য ওঠে। সূর্য ডোবে। আবার হারিয়ে যায়। স্মৃতি কাঁদে। জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এ কদিনের অভিজ্ঞতাতে বুঝে নিয়েছে অনন্ত—এ কলোনির আবহাওয়াটা যেন কেমন-কেমন। হিমালয়ের চূড়ায় জমা বরফের মতো। নিস্তেজ। নিষ্প্রাণ। লোকগুলো যেন বোবা। কথা বলতে জানে না ভালো করে। মিশতে জানে না সহজ সরল হয়ে।

যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে সব। আপনমনে নিয়ম মাফিক। দশটা-পাচটার অফিসে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া ছাড়া আর যেন কোনো কাজ নেই ওদের। না ঘরে, না বাইরে। এহেন পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় অনন্তর। সারাদিনে একটা লোক পায় না কথা বলবার। অফিসের ঠিক পাশের চেয়ারটিতে বসে যারা তারা যেন অন্য যুগের মানুষ! প্রাগৈতিহাসিক মমি কিংবা কলের পুতুল। ডেকে কথা বলতে গেলে ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। আরো বেশি করে মুখ থুবড়ে পড়ে ফাইলের কাগজপত্রে।

সরকারী কলোনি এটা। সরকারী চাকুরেদের জন্য গড়ে উঠেছে শহরের বুক চিরে। দেশলাই-এর খোলের মতো এক ধাঁচের বাড়ি। এঁকেবেঁকে গোলাকারে। মাঝে পার্ক। পাশে সাহেব-সুবোর বাংলো। সরকারী ক্লাব। কেবলমাত্র সাহেব-সুবোর গতায়াত সেখানে। এ গ্রেড, বি গ্রেড অফিসারদের জন্য সংরক্ষিত। কেরানিরা ধারে কাছেও ঘেঁষে না তার। অত সাহস নেই। চাকরিটা মুঠোয় পুরে চলাফেরা করতে হয় এখানে। পা ফেলতে হয় গুনে গুনে। কথা বলতে গিয়ে ছিপি আঁটতে হয় মুখে। একটু কিছু বেফাঁস বেচাল হলেই সর্বনাশ! চাকরি নিয়ে টানাটানি তখন। জান নিয়ে বেসামাল।

তাছাড়া আরো আছে। কড়া আইনের মারপ্যাঁচে বাধা এ কলোনি। অর্থাৎ প্রোটেক্‌টেড্ এরিয়া। তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা গেটে সশস্ত্র প্রহরী। বড়সাহেব আর ছোটসাহেবের কড়া নজর এর প্রত্যেকটি গাছ-পালার উপর। আই, বি ডিপার্টমেন্টের ছদ্মবেশী গোবেচারা টিকটিকিদের নিত্য অভিসার এ জায়গার আনাচে-কানাচে।

অতএব সাবধান ! কে কথা বলছে ওখানে ? একসঙ্গে অত লোক কেন। কি বলাবলি করছে ওরা ? দেখ—খোঁজ নাও ! কনফিডেনশিয়াল্ রিপোর্ট পাঠাও।

এত সব ঝামেলা। এত উৎপাত। অতএব বুদ্ধিমানেরা চুপচাপ। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। খালি অফিস আর বাড়ি। বাড়ি আর অফিস। ক্ষয়িষ্ণু জীবনের দিনগত পাপক্ষয় !

তবু অলকার কথা শুনে হাসবার চেষ্টা করে অনন্ত। অনেকটা যেন সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে : কেন, পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে ভাব হয় নি তোমার ?

বিকৃত ভঙ্গি করে ঠোঁট কোঁচকায় অলকা : ভাব ? সে তো দূরের কথা ! একদিন গিয়েছিলাম, বুড়ীটা কি বলে জান ?

: কি ?

: বলে 'একা একা বেড়িও না মা—লোকে নিন্দে করবে !'

: সে কি ! জেনে শুনেও বিস্ময়ের ভান করে অনন্ত।

অলকা ঘাড় নাড়ে, বলে : হ্যাঁগো ! এখানকার নাকি তাই চল—কেউ যায় না কারো বাড়ি—গেলে যেন তাড়িয়ে বাঁচে !

সান্ত্বনা দেয় অনন্ত : তবে থাক—দরকার কি গিয়ে ? লাইব্রেরি থেকে ভালো ভালো বই এনে দেব'খন তাই পড়ো বসে বসে—

কিন্তু তাতেও কি সময় কাটে ছাই অলকার ! সেই কোন দশটায় নাকে মুখে চারটে গুঁজে অফিসে ছোটে অনন্ত। তারপর থেকে একা অলকা।

ছোট বাড়িটা অসীম শূন্যতার মাঝে ডুবে যায় তখন। হারিয়ে যায় নিঃশেষে। নিঝুম দুপুর মুঠো মুঠো রোদ মুখে মেখে ঝলসানো চোখে চেয়ে থাকে ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে। পেঁপে আর নিমগাছে বাতাস জড়িয়ে যায় গাঢ় হয়ে। কাক উড়ে উড়ে বসে এসে। শালিক চড়ুই ডাকে। রোদ বাড়ে। বেলা বাড়ে। রোদ কমে। বেলাও পড়ে আসে।

একক নিঃসঙ্গ ঘরে কেমন যেন ভয় ভয় করে অলকার। অকারণে ছটফট করে মনটা। একা ঘরে থাকতে পারে না সে কিছুতেই।

ঠিক পাঁচটায় জল আসে কলে। অলকা বিছানা ছেড়ে উঠে আসে তখন। গা ধুয়ে চুল বাঁধতে বসে না—জল তোলে। উনুনে আঁচ দেয়।

তারপর নিঃশব্দে এসে বসে থাকে বাইরের বারান্দাটুকুতে। লাল সুরকি

ঢালা পথটা এগিয়ে গেছে এঁকেবেঁকে সর্পিল গতিতে। ইতি-উতি ছড়ানো এক ছকের বাড়িগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মিশেছে গিয়ে দোতালা অলকার ঘরটার লোহার গেটের সামনে।

অনন্তকে এই পথ ধরে আসতে দেখে সে প্রায়ই। ক্লান্ত অবশ পদক্ষেপে হেঁটে আসে লোকটা। শেষ-সূর্যের রক্ত-লাল আভাটুকু ওর মাইনাস্ ফী পাওয়ারের চশমার কাঁচটার উপর ঝক্‌মক্ করে। ঘাম-কালো মুখে এই শান্ত বিকেলেও সন্ধ্যার জল-কালি অন্ধকারের ছোপ ধরায়।

চেয়ে থাকতে থাকতে অলকার মুখ-চোখও একসময় খুশির আভায় চিক চিক করে উঠে। দৃষ্টিটা প্রখর লোভাতুর হয়ে ওঠে তখন।

বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় অলকা। পারলে যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে অনন্তকে এমনি অবস্থা! সারাদিনের দীর্ঘ বিরহের পর এ এক মধুর মিলনক্ষণ। বহু প্রত্যাশিত একটুকরো স্বপ্নের মতই।

আজও ব্যতিক্রম হয় নি তার। অনন্ত লক্ষ্য করল ঠিক জায়গাটিতে এসে বসে আছে অলকা। স্থির পুতুলের মতো। দেখে খুশি হয়ে উঠল সেও। মুখের ভাব গোপন করে বলল: তুমি এখানে বসে যে?

ঠোঁট টিপে হাসল অলকা: তোমার জন্য নয় স্যার!

: তবে? কৃত্রিম বিষাদের ছায়া-মুখে চোখে ঘনিয়ে আনল অনন্ত: আজকাল আর কারো সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছ নাকি কিছু?

: তাই করব ভাবছি!

: হা হতোস্মি! অনন্ত যেন ককিয়ে উঠল: আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যাবে আমারি আঙিনা দিয়া?

: তাই যাবে! খিলখিল করে হেসে উঠল অলকা। কিন্তু তাই বলে তুমি কি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? ঘরে ঢুকবে না।

: না ডাকলে যাই কি করে!

কিন্তু ততক্ষণ উপরে উঠে এসেছে অনন্ত। এসে দাঁড়িয়েছে অলকার পাশটিতে। বড় কাছে, প্রায় গায়ে গা ছুঁইয়ে।

হাসি-হাসি দুজোড়া চোখ শান্ত দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ নিবদ্ধ হয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। অনন্ত দেখে অলকাকে। অলকা অনন্তকে।

অনন্ত ভাবে অলকা বড় শুকিয়ে যাচ্ছে আজকাল। আগের উজ্জ্বল মুখে

কিসের বেদনা যেন ছুঁয়ে আছে ওর। মিশে আছে ছলোছলো চোখের পাতায়। আর মনক, ভাবে ঘামে-ভেজা, অনন্তের মুখটা বড় রুক্ষ, বড় করুণ।

তিলে তিলে বেলা গড়িয়ে চলে। কলোনির নিজস্ব পাওয়ার হাউসটার চূড়ায় সূর্যের লাল রঙ ফিকে হয়ে আসে। ইট-ঘেরা ইউক্যালিপটাস আর কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতায় পাতায় বিকেলের বাতাস জড়িয়ে যায় শান্ত হয়ে। মৃদুমৃদু শব্দ উঠে শিরশির। সূর্য ডোবে। সন্ধ্যা ঘনায়। কালি-লেপা কাপড়ের মতো বাড়িগুলোর শাদা রঙ অস্পষ্ট ঘোলাটে হয়ে উঠে। তারপর নিস্তব্ধ কলোনির হৃদপিণ্ডটাকে কাঁপিয়ে বিকট শব্দ উঠে একটা ভটভট্। পাওয়ার হাউসে ডায়নামো স্টার্ট নেয়। আলো জ্বলে।

অমনি বিন্দু বিন্দু কাচের বাল্বগুলো তখন যেন সজাগ প্রহরীর মতো কলোনির এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চক্রাকারে পাহারা দেয়।

এক একটা বাড়ির জানালা-দরজার ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে নীল আলোর ছটা এসে পড়ে বাইরের বাগানে কিংবা রাস্তায়। অত্যন্ত সাবধানে। ভয়ে ভয়ে।

গা-হাত ধুয়ে অনন্ত চেয়ারটা টেনে এনে বসে বারান্দায়। চুপচাপ। একা একা। নরম আকাশে একরাশ শুক্লপক্ষ তারাগুলোর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবে। কি যেন রোমন্থন করে।

অলকা আসে আরো একটু পরে। নিঃশব্দে পা টিপেটিপে। অনন্তের ভাবতন্ময়তার কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়েই।

আজো টের পেল না অনন্ত। স্মৃতি-রোমন্থনে সে তখন সমাহিত। তাছাড়া আর কিইবা করতে পারে সে? বর্তমান যার কাছে মৃত-বীভৎস, ভবিষ্যতের কোনো বালাই যাদের নেই, একমাত্র অতীতকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কি থাকতে পারে তাদের?

অলকা চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিঃসাড় হয়ে। তারপর ধীরে ধীরে ডাকল: ওগো শুনছ!

অনন্ত চমকে উঠে বলল: কে, ও—কিছু বলছিলে—?

: না। অলকা বিস্মিত হয়: বেড়াতে বেরুবে না আজ?

: তাই তো, অনন্তের যেন মনে পড়ে যায় হঠাৎ: তোমার হয়ে গেছে?

: হ্যাঁ।

দিকে অন্ধকারে অলকার বেশ-বাস লক্ষ্য করে অনন্ত : এই কাপড় পরেই বেরুবে নাকি ?

: তা নয়তো কি ! অলকা হাসিমুখে জবাব দেয় : বেড়ানো মানে তো পার্কের এককোণে গিয়ে ঘুপটি মেরে বসে থাকা—, তার জন্য পটের বিবি সেজে বেরুতে হবে নাকি !

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অনন্ত, বলে : তাহলে চলো—ঘুরেই আসি একবার—। ঘরে তালা লাগিয়ে হাত ধরাধরি করে পথে নামল ওরা।

রোজই নামে। লাল সুরকি বিছানো পথটা ধরে এগিয়ে যায় একটু একটু করে ! কলোনির নিজস্ব পার্কে বেঞ্চ পাতা সারি সারি। কিন্তু ওখানে বসে না ওরা। ধারে কাছের আলোগুলোতে স্পষ্ট দেখা যায় সে জায়গাগুলো। অলকা বসতে চায় না সেখানে !

বলে : এ আলোর মধ্যে বসে দুটো প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি না আমি বাপু ! কেমন যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট লাগে—

অনন্ত হাসে : অন্ধকারের জীব কিনা আমরা, আলোকে তাই এত ভয় ! আলো-ছায়া অন্ধকারে অলকার মুখটা মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণ বেদনাতুর হয়ে ওঠে। অনন্তের কথাটা কোথায় যেন খোঁচা দেয় মনে। বন্দিনী অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে।

অলকা ধীরে ধীরে উত্তর দেয় : হয়তো তাই—, এ যন্ত্রপুরীর অন্ধকার গা সওয়া হয়ে গেছে আমাদের……হঠাৎ আলোতে এসে পড়লে তাই বোধহয় চমকে উঠি !

কোনোদিন হয়তো এত গভীরভাবে নেয় না কথাটা। খতিয়ে দেখতে চায় না অতশত। শুধু মিহি স্বরে হেসে উঠে জবাব দেয় : তা নয় গো,—আরো অনেক কারণ আছে !

অনন্ত জিজ্ঞেস করে : কি কারণ শুনি !

: না, সে শুনে কাজ নেই তোমার !

অনন্ত চোখদুটো মিটমিট করে বলে : গোপনীয় কিছু নাকি ?

: হ্যাঁ !

: তবে থাক—বলে কাজ নেই কোনো !

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। পাশাপাশি হেঁটে পার্কের গভীরে প্রবেশ

করে ওরা। সাতকাটি দুপাশে ... উপর কপাল বিচ্ছিন্ন বসে থাকে অন্ধকারে।

অলকা বলে : কই, সন্দেহ করতে শুরু করলে নাকি ?

অনন্ত গম্ভীর হয়ে বলে : না।

অলকা হাসে ঠোঁট টিপে : তাহলে বলেই ফেলি কথাটা বাপু—। তোমার এ সাহেব-সুবোর চাকরি এলো। বড় বিশ্রী লাগে আমার—ব ... দিয়ে যেতে যেতে এমনভাবে তাকায় সব—

অনন্ত শান্ত করে বলে : ভালোই তো, স্ত্রীভাগ্যে কিছু ধন এসেছিল, এবার না হয় প্রমোশন্-টমোশন কিছু একটা—

অলকা রেগে ওঠে : আহা কি কথার ছিরি ! হতচ্ছাড়াগুলোকে দেখলে রাগে গা ... করে আমার—

—চুপ ! চুপ !

ব্যস্ত হয়ে ওঠে অনন্ত। সজাগ-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ভয়ে ভয়ে একবার তাকায় চারপাশে। পাতলা অন্ধকারে চলাফেরা করছে আরো কয়েকজন। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে এ কলোনির নব জীবরা। হালকা কথা মিহি সুরের হাসি শোনা যাচ্ছে এদিক-ওদিক থেকে। অনন্ত বিব্রত হয়ে উঠে। কে জানে কেমন ধারা লোক ওরা ! এ ধরনের আলোচনা শুনতে পেলে রক্ষা থাকবে না আর। চাকরি না যাক নির্ঘাত রিপোর্ট যাবে বড়সাহেবের কাছে। লাল কালির মোক্ষম দাগ পড়বে সারভিস বুক-এ !

প্রায় ধমকে অলকাকে থামিয়ে দেয় অনন্ত : থাম তুমি, যত সব বাজে কথা—

কিন্তু থামতে গেলেও অত সহজে কিন্তু চুপ করতে পারে না অলকা। সারাদিনের ক্লান্তিকর দিনের পরেই এই বেদনার রাত। অসীম শূন্যতার মধ্য থেকে তখন জেগে ওঠে অলকা ! প্রাণ পায়। মুখরা হয়।

সারাদিনের জমানো মনের কথা একসঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় তখন। এ যক্ষপুরীর বিরুদ্ধে অনেক নালিশ-অভিযোগ, অনেক পুঞ্জীভূত নিরাশা, ... নিজেকে চুপ করতে পারে না তাই অলকা। শুধু বলতে চায়। আজে-বাজে অনেক এলোমেলো কথা। বলে যেন হালকা হতে চায়।

এমনি করেই রাত ... পড়ে একসময়।

পার্কের কোণে কোণে জমাট ভিড় পাতলা হয়ে আসে। হাসি-কথার দীর্ঘশ্বাস টুকরোগুলো ঘরে ফিরে যায় নীরবে।

পিওন-বরকন্দাজের বাড়িগুলো এরি মধ্যে হারিয়ে যায় অন্ধকারে। এত রাত অব্দি বাতি জ্বালিয়ে রাখবার মতো সঙ্গতি ওদের নেই। সাত সকালেই রান্নার পাট সেরে নিশ্চিন্ত ওরা। শুধু সাহেব-পাড়া আর ক্লাবঘরের অত্যুজ্জ্বল বাতিগুলো জ্বলতে থাকে দপদপ করে। সুরাশ্রিত কণ্ঠের মত্ত হাসির সঙ্গে 'থ্রি নো ট্রাম্পের' গলাবাজী চলে।

একরাশ পোকা পথের ধারে বাতিগুলোর নিচে ঘুরে ঘুরে জটলা করে। বাসন্তী বাতাস আরো ঘন হয়ে জড়িয়ে যায় এই প্রোটেক্‌টেড্‌ কলোনির গাছ-পাতার উপরে। রাত দশটা বাজে। পাওয়ার হাউসের পেটা ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা পড়ে।

অনন্ত আর অলকা ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠে আসে তখন। অন্ধকার ছেড়ে আলোতে নামে। পথে নামে হাত ধরাধরি করে। তারপর ধীরে এগিয়ে যায় জি বারো নম্বর কোয়ার্টারের দিকে।

ইদানীং অফিস থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরি করছে অনন্ত। পাঁচটায় ছুটি হলেও বাড়ি ফিরতে পারে না সে। থাকতে হয় আরো ঘণ্টা খানেক। বড়বাবু নিধিরাম গুপ্ত—সাহেবের 'পেয়ারের' লোক। নিজে মরেবেঁচে মন জুগিয়ে চলেছে সাহেবের। সেই সঙ্গে বিনা মূল্যে উপদেশ বিতরণ করে যাচ্ছে অধীনস্থ কেরানিদের মধ্যে। বারোটায় বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সেরে লম্বা ঘুম দেন বড়সাহেব। হেলেদুলে অফিসে আসেন আবার সেই চারটেয়। তখন থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ চলে অফিসে। বড়বাবু থাকেন। টাইপিস্ট ছোকরা অনাদিপ্রসাদ থাকে। আর থাকতে হয় অনন্তকে। নতুন চাকরি ওর। ছয় মাসও হয় নি এখনো। বড়বাবুর মুখের উপর 'না' বলার ক্ষমতা তার নেই! অফিসে কাজ বাকি অনেক। ফাইলের উপর ফাইল। টেবিল বোঝাই করা ফাইল। সেগুলো সারতে হয় অনন্তকে। সাত ঘণ্টায় কুলিয়ে উঠে না। বাড়তি ঘণ্টাদুই তাই থাকতে হয় তাকে।

কিন্তু মনে-প্রাণে রেগে উঠেছে অলকা। একেই খালি বাড়িতে থাকতে পারে না সে। দশটা-পাঁচটার মধ্যবর্তী সময় ছটফট করে কাটায় জরো-রুগীর মতো। তার-উপরেও এই শূন্যতার বোঝা!

অলকা ভাবে—নতুন পেয়ে এবং বোকা বলেই অনন্তকে ওরা খাটিয়ে নিচ্ছে খুব করে! আর লোকটাও তেমনি! একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকত নিজের! চিরকালের গোবেচারা মানুষ—। কিংবা এই যন্ত্রণার পেষণে নিজেও ক্রমে পাথর হয়ে যাচ্ছে কি? মরে গেছে কি তার অনুভূতিগুলো? নইলে মুখ বুজে কেমন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে অফিসে? ঘরে যে আরো একজন বুভুক্ষু অন্তর নিয়ে সারা দিনমান প্রতীক্ষা করে তার, সে কথা কি মনে থাকে না অনন্তর?

অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে আজকাল প্রায়ই অনন্তকে নিয়ে পড়ে অলকা। কান্নাভেজা অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলে: আচ্ছা রোজ রোজ তুমি এত দেরি করে বাড়ি ফেরো কেন বলো তো?

অনন্ত হাসে। সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। তবু বিষয়টাকে উপহাস দিয়ে ঢেকে হালকা করার চেষ্টা করে সে: অফিসটা তো আর আমার শ্বশুরবাড়ি নয় অলকা—

অলকা রেগে ওঠে। চায়ের কাপটা ধক করে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বলে: খবরদার—তুমি আমার বাপ তুলে কথা বলো না বলছি—

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি জবাব দেয় অনন্ত: সর্বনাশ! তাই কি পারি! দুবছরও হয়নি নগদ দেড়হাজার টাকা—আর তোমার মতো রূপসী গুণবতী—

কথাটা আর শেষ হয় না অনন্তর। তার আগেই দুহাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে অলকা। সারা দিনের ক্লান্ত শূন্য প্রহরগুলো অতিক্রমের পর স্বামীর এই সহজ ঠাট্টাটুকুও সহ্য করতে পারে না সে।

বিব্রত লজ্জিত অনন্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে অলকার মুখের দিকে। চট্ করে আর ভাষা জোগায় না ওর মুখে। এত সামান্য কারণে কেন যে আজকাল কেঁদেকেটে অনর্থ বাধায় অলকা, তার একবর্ণও বুঝতে পারে না অনন্ত। অবাক বিস্ময়ে শুধু অলকাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর-নরম কণ্ঠে বলে: তুমি কাঁদছ কেন অলকা?

অলকা কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দেয়: তুমি আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছ!

আরো অবাক হয় অনন্ত: আমি কেমন হয়ে গেছি অলকা?

—হ্যাঁ! খালি অফিস আর অফিস, বাড়ির কথা যেন মনেই থাকে না তোমার—

অনন্ত ঘাড় নাড়ে জোরে জোরে: না, তুমি বুঝছ না অলকা—নতুন চাকরি—এ সময় সাহেব-সুবোর একটু মন জুগিয়ে চলাই ভালো।

অলকা বোঝে না। বুঝতে চায় না। তর্ক করে মুখে মুখে: তাই বলে এত রাত করে বাড়ি ফিরবে?

: কই, বেশি রাত হয় নি তো! আটটা বাজে মোটে। ঘড়িসুদ্ধ হাতটা অলকার চোখের সামনে তুলে ধরে অনন্ত। হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয় অলকা। তীব্র কণ্ঠে বলে: কিন্তু খেটে খেটে কি চেহারা হয়েছে আজকাল. সেদিকে নজর আছে?

: তাছাড়া আর উপায় কি! ফাঁকি দিতে বলছ শেষ কালে?

: দরকার হলে দেবে বই কি! সবাই তো দেয়।

: তাই নাকি। অনন্ত ঠিক বুঝতে পারে না। বিস্মিত হয়।

অলকা ব্যাখ্যা করে: তা নয় তো কি? তোমাদের ওই মেনিমুখো সাহেবটা তো রোজই বারোটায় ঘরে ঢোকে—আবার যায় সেই চারটায়—। ঘর থেকে ঠিক মোটরের আওয়াজ পাই আমি—

অনন্ত হাসে: সারাদুপুর তুমি বারান্দায় বসে কাটাও নাকি?

তা কেন? অনন্তের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসে অলকা: তুমি বেরিয়ে যাও সেই কোন্ সকালে—তারপর সারাটা দিন আর এই এতটা রাত পর্যন্ত আমার কি করে কাটে বলো তো?

সেকথা বোঝে বৈকি অনন্ত। ঠিকই বোঝে। তবুও কিছু করবার উপায় নেই তার। অফিসে ফাইলের উপর ফাইল। ছুঁচলো-মুখো বড়বাবুর অনুরোধের নামে তাগিদ।

তারপরে আবার নতুন চাকরি। অলকা বুঝবে না অতশত। বুঝতেও চাইবে না। কিন্তু অনন্ত বুঝেছে—চাকরি বজায় রাখা চাকরি পাওয়ার চাইতেও কঠিন। সব চাইতে কঠিন বড়বাবু আর বড়সাহেবের মন জুগিয়ে চলা। অদৃশ্য দেবতার মতো ওঁরা যে কখন শান্তশিষ্ট আর কখন উগ্র মারমূর্তি ধরেন বোঝা বড় শক্ত: এবং দুর্বোধ্য বলেই এত ভয়ের কারণ।

তবু এরি মধ্যে কয়েকটা দিন হয়তো লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে আসে

অফিস থেকে। নানা অজুহাত দেখিয়ে বাসায় এসে হাজির হয় ঠিক পাঁচটায় কিন্তু সে মাত্র কটা দিনের জন্যই। তারপর আবার যে-কে সেই।

বিরাট হলঘরটার মাঝখানে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকে অনন্ত। একশ পাওয়ারের উজ্জ্বল আলোটা শ্মশানের চিতার মতো জ্বলতে থাকে মাথার উপরে। চতুর্দিকে গরম হাওয়ার ফুলকি উড়িয়ে ফ্যানটা ঘোরে বন্‌বন্‌ করে। বিশ্রী একঘেয়ে একটা খট্‌-খট্‌ শব্দ ওঠে টাইপ মেশিনের।

নির্বিকার অনাদিপ্রসাদ একটার পর একটা জরুরী চিঠি টাইপ করে যায়, একাগ্রমনে। লম্বা ঘরের এককোণে কালো বন্যপশু ভালুকের মতো হেডক্লার্ক নিবিরাম গুপ্ত বসে থাকে ওঁত পেতে।

নাকের ডগায় ঝুলন্ত চশমার ফাঁক দিয়ে ওর ছোট ছোট চোখদুটোর হিংস্র সতর্ক দৃষ্টিটা বড় কুৎসিত মনে হয় অনন্তর।

কানদুটো সদাসবদা সজাগ থাকে বড়বাবুর। পাশের ঘর থেকে বড় সাহেব কখন ডেকে বসেন ঠিক কি। হারামজাদা বেয়ারাটা হয়তো ঢুলছে বেঞ্চিতে বসে বসে।

বছরের শেষ এখন। সাজ সাজ রবে তাই জেগে উঠেছেন সাহেবরা। উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষ নাকি ঘুমিয়ে কাটিয়েছে তাদের সারাটা বছর। এখন টনক নড়েছে সবার। অন্তত কেরানিরা তাই বলে অভিযোগ করে। বাইরে নয়—ঘরে। স্ত্রীর কানে কানে সংগোপনে।

তাদের অসমাপ্ত কাজগুলো তাই অনাবশ্যকভাবে ঘাড়ে এসে পড়েছে হতভাগ্য কেরানিদের। টেবিলে ফাইলের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। টাইপ-মেশিনের বরাদ্দ কালি ফুরিয়ে যাচ্ছে মাসের অর্ধেক দিন না যেতেই। তবু চুপচাপ সব। দম দেওয়া কলের ঘড়ির মতো কাজ করে যায় একমনে। নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে।

তবু এরি মধ্যে অনন্তের মুখ দিয়ে বুঝি ফস করে বেরিয়ে গিয়েছিল একদিন— : এ অন্যায়—ভারী অন্যায—অনাদিবাবু—।

কথাটা শেষ হয় নি তখনো অনন্তর—তার আগেই প্রবলভাবে চমকে উঠল অনাদিপ্রসাদ। চলন্ত আঙুল দুটো মেশিনের উপর স্থির নিশ্চল হয়ে গেল। আশে পাশে আরো কয়েকজন কাজ করছিল চুপচাপ। তাদের কলমগুলোও আঠার মতো সেঁটে দাঁড়িয়ে গেল কাগজের উপর। একটা

অ[illegible] দুর্ঘটনায় যেন হতবোধ হয়ে গেল সবাই। ফ্যালফ্যাল করে সবাই তাকিয়ে রইল অনন্তের মুখের দিকে, যেন খুব বড় একটা নতুন কিছু কথা বলে ফেলেছে সে। প্রকাশ করে দিয়েছে কোনো সযত্ন রক্ষিত গুহ্য [illegible]।

শুধু ভালুক-রঙ বড়বাবু হিংস্র জানোয়ারের মতো একজোড়া চোখের বিষাক্ত দৃষ্টি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অনন্তর উপর: কি—কি-কি বললেন মশাই?

কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে অনন্ত। পকেট থেকে রুমাল টেনে বের করে কপালের ঘামটা মুছল সে। তারপর নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিল: ইয়ে—মানে আর্দালিটার কথা বলছিলাম স্যার। সেই কখন থেকে এক গ্লাশ জল চাইছি—অথচ—, ইডিয়টটা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে বসে বসে। বলুন—আপনিই বলুন স্যার—এ অন্যায় কিনা?

কিন্তু রেগে উঠেছে অলকা নিজেই। অস্থির হয়ে উঠেছে।

থাকবে না সে এখানে! কিছুতেই না। এ অন্ধকার পাষাণপুরীর মধ্যে শুকিয়ে মরতে চায় না সে। মরতে দিতে চায় না অনন্তকে।

সকাল দশটা থেকে রাত দশটা—কতক্ষণ? কতক্ষণ একটা মানুষ কাজ করতে পারে একসঙ্গে? নির্জন বাড়িতে নিঃসঙ্গ প্রহর অতিক্রম করতে পারে মুখ বুজে?

অনন্ত আজকাল কথা বলে না বেশি। চিঁচিঁ করে নিরন্ন রুগীর মতো। শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে দিনকে দিন। তাকালে চোখ ফেটে জল আসে এমন!

তবু সান্ত্বনা দেয় অনন্ত: এই তো আর কটা দিন লক্ষ্মীটি! বছরের শেষ কিনা এখন—তাই—

অলকা মুখিয়ে ওঠে: হোক শেষ! চুলোয় যাক তোমার অফিস। ছুটি নাও তুমি।

: ছুটি? অনন্ত হাসবার চেষ্টা করে: তা হয় না অলকা, এখন ছুটি মানেই ছাঁটাই!

: তাই বলে মরবে এমন করে? অলকা চেঁচিয়ে ওঠে: জীবনের জন্য জীবিকাকে গ্রহণ করেছ সেই জীবনকে যদি বলি দিতে হয়—তবে কাজ কি এমন চাকরির?

অনন্ত চমকে উঠে বলল : চাকরি ছেড়ে দিতে বলছ অলকা ?

চট করে আর কোনো কথা জোগায় না অলকার মুখে। স্থির—অকম্পিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে সে বাইরের দিকে। ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো যেখানে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাগপাশ বাঁধনে জড়িয়ে ফেলেছে এ কলোনিটাকে। ঝিরঝির আলোর ছটায় লাল সুরকি বিছানো পথটা আরো রক্তিম হয়ে উঠেছে। সেই দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে অলকা। এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। এর জবাব নেই।

কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা করতে পারল কই অনন্ত ?

অলকা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি তাকে, তারই জবাব দিল অফিসের গোপন মহল। দিল অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুরভাবে

অফিসের একরাশ মৃত ফাইলের চাপা স্তূপ থেকে এ কঠিন সত্যটাকে আবিষ্কার করল অনন্ত। টাইপিস্ট অনাদিপ্রসাদের 'ড্রয়ার' টেনে 'লিস্ট' দেখল।

যথাসময়ে নোটিসও এল তার কাছে। সে নোটিস ঝোলানো হল বোর্ডে।

কাজের জন্য দরকার মানুষের। প্রয়োজন শ্রমের।

যেখানে কাজ নেই—বাড়তি ভিড় পুষে রাখবার মতো ঔদার্যও নেই সেখানে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা সমাপ্তপ্রায়। মশানজোড়ের বাঁধও শেষ। অতএব সাময়িকভাবে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য থোকে থোকে টাকা গোনবার সার্থকতা কি ? কর্তৃপক্ষ তো আর 'গৌরীসেন' নন।

সেদিন এক ক্লান্ত অবসন্ন দুপুরে প্রোটেক্‌টেড্ এরিয়া সরকারী কলোনির জি বারো নম্বর কোয়ার্টারের দরজার কড়াটা নড়ে উঠল খটখট্ করে।

বিছানায় গা এলিয়ে বই পড়ছিল অলকা। পড়তে পড়তে বইটাকে বুকে চেপে ধরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি।

খট্‌খট কড়া নাড়ার বিশ্রী আওয়াজে চমকে জেগে উঠল সে।

ঘুম চোখে উঠে এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল. চোখে মুখে একরাশ ভাবনা-বিস্ময়ের ছায়া ঘনিয়ে বলল : একি, তুমি এমন সময় চলে এলে যে ?

প্রত্যুত্তরে কোনো কথাই আজ বলল না অনন্ত। ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে বিছানার এককোণে বসে পড়ল ধপ করে।

ওর বসে পড়বার ভঙ্গিটা দেখে কেমন যেন চমকে উঠল অলকা।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে কপালে একটা হাত রাখল ওর—বাস্তব ... বলল : কিগো, কথা বলছ না যে ?

শান্ত বরফ ঠাণ্ডা গলায় অনন্ত বলল : তুমিই তো বলতে অলকা, এ যন্ত্রপুরীতে থাকলে বাঁচব না আমরা ?

অলকা অবাক হয়ে বলল : কেন ? ও কথা বলছ কেন হঠাৎ ?

অনন্ত হাসল কিনা বোঝা গেল না। কি-এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ঠোঁটজুটো একটু বেঁকে গেল বলে মনে হল যেন।

চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল সে : এখান থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি অলকা।

: তার মানে ? অলকা আকস্মিক একটা আঘাতের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল প্রায়। সেইসঙ্গে সারাদেহ কেঁপে উঠল থরথর করে।

অনন্ত তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলল : তার মানে তো একটাই হয় অলকা, বছর শেষ হল, কাজও কমে এসেছে আপাতত, বাড়তি লোকের দরকার কি আর ?

কথাগুলো যেন শুনতে পায়নি অলকা, এমনিভাবে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে অনন্তর মুখের দিকে। চোখের মণিজুটো শুধু ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে লাগল তার। কান্না-মাখানো একটা ছাই ছাই পাণ্ডুরতার আভা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা মুখ জুড়ে।

আষ্টেপৃষ্ঠে আইনের মারপ্যাচে বাঁধা এই প্রোটেকটেড্ এরিয়া কলোনির অন্ধপুরী থেকে মুক্তি চেয়েছিল অলকা। মুক্তি চেয়েছিল একাকী নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্বিষহ যাতনা থেকে।

মুক্তি চেয়েছিল অনন্তও মানুষমারা অফিস-কলটার হাত থেকে। দশটা-পাঁচটার ক্লান্ত জীবনের আয়ু যেখানে ঝরে যায় ঘাম হয়ে। ফাইল আর লেজার বইএর হিসাবে যৌবনের সুখ-দুখ-আনন্দ-বেদনা চাপা পড়ে থাকে কর্মপ্রার্থীর দরখাস্তের মতো। কিন্তু সে মুক্তি কি এই মুক্তি ?

প্রোটেক্টেড্ এরিয়া কলোনির জি বারো নম্বর কোয়ার্টারে দুটো মানুষ বসে রইল চুপ করে। নিষ্প্রাণ দুটো পুতুলের মতো। বাইরের খাঁখাঁ দুপুরের দুরন্ত বাতাস রোদ-আগুন মুখে মেখে গাছ-পাতায় বাড়ি খেয়ে খেয়ে গোঁ-গোঁ করে গোঙাতে লাগল শুধু।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত

(পূর্বানুবৃত্তি)

রণজিৎ গুহ

৫ ॥ রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য

ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ফিলিপ ফ্রান্সিসের ধারণা তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারণ একথা তিনি তাঁর চিঠিপত্র ও বিবৃতিতে অনেকবার বলেছেন যে হেস্টিংসের নীতি অনুসরণ করার ফলে আশু স্বার্থের লোভে সাম্রাজ্যের মৌলিক ও স্থায়ী স্বার্থকে বলি দেওয়া হচ্ছে এবং এই সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্ব (permanence of dominion) কায়েম করার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি পেশ করেছেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক আদর্শগুলিকে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়ে সাম্রাজ্যগঠনের একটি নতুন ও বিশিষ্ট উপায় নির্ধারণ করাই ছিল তাঁর চেষ্টা। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে নিছক অর্থনৈতিক প্রস্তাব হিসাবে বিচার করলে ভুল হবে।

প্রচলিত ইতিহাসগুলি এই ভুলের পুনরাবৃত্তিতে ভরা। কারণ সামগ্রিক ইতিহাসবোধের অভাববশত লেখকগণ ফ্রান্সিসকে হেস্টিংসের মতোই কোম্পানির মামুলী কর্মচারীদের অন্যতম বলে গণ্য করে থাকেন; এবং যেহেতু কোম্পানির কোনও কর্মচারীর পক্ষেই সেই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মকে অস্বীকার করার নজির আর নেই, তাই তাঁরা হয়

ফিলিপ ফ্রান্সিসের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসমূল্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন, কিংবা স্বীকার করেও বলেন যে ঐ সব মতামত ব্রিটিশ রাজনীতির ক্ষেত্রে কোম্পানিঘটিত দলীয় বিবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, অতএব তার কোন স্বতন্ত্র আদর্শগত গুরুত্ব নাই। এইরূপ ধারণার ফলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্থনৈতিক বক্তব্যটিকে তার রাজনৈতিক ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে।

ফ্রান্সিস যদি হেস্টিংসের মতোই কোম্পানির আদর্শ-কর্মচারীর 'টাইপ' হতেন, তাহলে হয়তো সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব তিনি পলিটিশিয়ানদের উপর ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। কিন্তু তা যে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।[৫] বাংলাদেশে কোম্পানির শাসননীতির সমস্যা তার কাছে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই সাধারণ ও বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যার অংশবিশেষ। আমেরিকার তৎকালীন ঘটনাবলী থেকেও তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে উপনিবেশকে শোষণ করার নীতিটি কার্যকরী না হলে সাম্রাজ্য-কর্তৃত্ব কখনই সুনিশ্চিত হয় না। সুতরাং এদেশে এসেই তিনি এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যা হেস্টিংস ইত্যাদির পক্ষে ধারণা করাই সম্ভব ছিল না ; সে হচ্ছে সব রাজনীতির গোড়ার প্রশ্ন : ক্ষমতার প্রশ্ন :

"বাংলাদেশের রাজা কে ? ইংল্যাণ্ডে কে এমন আছে যে সেকথা জানে বা জানা দরকার মনে করে ?"[১১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাবটি যেদিন লাট কাউন্সিলে পেশ করা হয়, সেই দিনই তিনি এক চিঠিতে এই কথা লেখেন।

ক্ষমতার প্রশ্ন

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলেনি বলেই তাঁর মতে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় এত জটিলতা দেখা দিচ্ছে। দেশের রাজশক্তি প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির হাতে, অথচ আইনত মোগল বাদশার রাজত্ব তখনও বজায় আছে। "এদেশের লোক এখন যে অবস্থায় বাস করে তা একাধারে দ্বৈরাজ্য ও নৈরাজ্য।

৫ পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৬২।

কোম্পানির দ্বৈতভূমিকা

এদেশে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কর্তৃত্ব সরাসরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেই অবশ্য মানতে হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। বণিক ও শাসকরূপে কোম্পানির দ্বৈতভূমিকার মৌলিক অসঙ্গতির কথা তাই ফিলিপ ফ্রান্সিস বারবারই উত্থাপন করেছেন। ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক ভূমিকা কি হওয়া উচিত এই প্রশ্ন আঠারো শতকের শেষে ব্রিটিশ রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনবার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছিল—১৭৭৬, ১৭৮৪-৫ ও ১৭৯৩ সালে, এবং তিনবারই ফ্রান্সিস বিনা দ্বিধায় ও স্পষ্টভাবে তার মতামত ঘোষণা করেন।

১৭৭৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী লর্ড নর্থের নিকট এক চিঠিতে তিনি রেগুলেটিং অ্যাক্টের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন: "যতদিন কোম্পানির স্বার্থ আর বাংলাদেশের স্বার্থ একই হাতে ন্যস্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোন সংস্কারই সফল হবার আশা নাই। যতটা বুঝি, এই দুটি পরস্পর-বিরোধী। রাজ্যরক্ষা করতে হলে সে দায়িত্ব এমন এক সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে যার সবকিছু নীতিই একটি বিশেষ বণিকসম্প্রদায়ের তথাকথিত অধিকার বা স্বার্থের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না।"[৫]

তারপর, ১৭৮৪-৫ সালে ফক্সের প্রস্তাবিত আইন যখন পার্লামেণ্টের সম্মতি না পেয়ে প্রত্যাখ্যাত হল এবং কোম্পানির সমস্যাকে কেন্দ্র করেই নতুন নির্বাচনের মহড়া চলতে থাকল, ফ্রান্সিস তখন বেনামী পুস্তিকার হাতিয়ার নিয়ে সেই আসরে নামলেন। তাঁর মতামতের একটি নমুনা নিচে উদ্ধৃত হল:

> "একাধারে শাসক ও বণিকের দ্বৈতচরিত্রের সংশ্রবই কোম্পানির ভারতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার মূল কারণ: এজন্যই তাঁদের কার্যকলাপে গুরুলঘুর এক অস্বাস্থ্যকর সংমিশ্রণ ঘটে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, শাসকসুলভ গুরুত্ববোধের বশেই তাঁরা কর্ণাটে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বণিকসুলভ সংকীর্ণতার বশে আবার ব্যয়সংকোচের উদ্দেশ্যে ঐ সৈন্যদের দিয়েই খাজনা ও কর আদায় করানোর লোভ তাঁরা সামলাতে পারেননি। ……এই অসঙ্গতি ঘোচাবার জন্যই (ফক্সের) খসড়া আইনটিতে শাসন ও বাণিজ্য এই দুটি বিভাগকে পৃথক রাখা হয়েছে।"

আবার ১৭৯৩ সালে পার্লামেন্টে ডান্‌ডাসের জবাবে তিনি বলেন যে কোম্পানির সনদের মেয়াদবৃদ্ধির অর্থ মোটেই এই নয় যে ভারতে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা অটুট থাকা উচিত, বরং উল্টোটাই। কারণ, "এক প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি ও সংবিধান অনুযায়ী বণিক হবার যোগ্যতা তাদের আছে, কিন্তু শাসকের যোগ্যতা নাই।"

এই সূত্রেই প্রশ্ন ওঠে, কোম্পানির সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, কোম্পানির অধিকারে পার্লামেন্ট বা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা। ফ্রান্সিস বিনা দ্বিধায় বলেন, উচিত। ফক্সের আইন বাতিল হওয়া উপলক্ষে রচিত "পপুলার টপিক্‌স" নামের একখানি বেনামী পুস্তিকায় তিনি এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছিলেন: "পার্লামেন্ট যখন যেমন উচিত মনে করেছে তখন তেমন আইন প্রণয়ন করেছে, কোম্পানির সনদের তোয়াক্কা রাখে নি। ১৭৭২ ও ১৭৭৩ সালে পার্লামেন্ট বাকিংহাম ... তাদের পূর্ণ সম্মতিক্রমেই...... কোম্পানির সংবিধান সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে ... প্রোপ্রাইটারদের অধিকাংশকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।"

অবশ্য এটা শুধু নজির দেখাবার কথা নয়। পার্লামেন্টের অধিকার মৌলিক নীতির প্রশ্ন।

"যা হয়েছেই নিয়ম যে পার্লামেন্ট কর্তৃক এরকম হস্তক্ষেপের নজির আগে আর পাওয়া যায় না, মিঃ ফক্সের আইনেই এই প্রথম হস্তক্ষেপ হইল। কিন্তু সনদের দ্বারা পার্লামেন্ট যে ক্ষমতা দিল কিংবা যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করল তাকে সংশোধন করার অধিকার তার থাকবে না, এমন বোকার মতো কথা কে ভাববে? দুর্নীতি বা উৎপীড়নে সেই ক্ষমতার যদি অপব্যবহার করা হয়, তাহলে তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার কি পার্লামেন্টের থাকে না?"

ফ্রান্সিস ও অ্যাডাম স্মিথ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈতভূমিকার অসঙ্গতি এবং দেশের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত করার আবশ্যকতা সম্পর্কে ফ্রান্সিসের মতের সঙ্গে অ্যাডাম স্মিথের চিন্তার নির্ভুল সাদৃশ্য আছে। ফ্রান্সিস যে অ্যাডাম স্মিথের সাহায্য ছাড়াই স্বতন্ত্রভাবে তাঁর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা অসামান্য মনীষারই পরিচায়ক। ... বলেছেন যে ফ্রান্সিসকে অ্যা...

রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ করা দরকার—এই ছিল আডাম স্মিথের মত।

অপরপক্ষে, প্রাকৃতধনবাদী হিসাবে ফিলিপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশের কৃষিসমস্যা সমাধানের একটি উপায় অনুসন্ধান করছিলেন, কারণ কৃষিই সম্পদের মূল আকর। তাঁর মতে তৎকালীন কৃষিসংকটের মূল কারণ দুটি। প্রথমত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আন্তর্জাতিক বাজারনীতি কৃষিকাজের প্রেরণাকেই বিনষ্ট করছিল; কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতাই এই নীতির ভিত্তি, সুতরাং সেই ক্ষমতা হরণ না করলে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে কোম্পানির একাধিকার থাকার ফলে কৃষিজ পণ্যের অবাধ চলাচলের পথে বাধা ঘটছিল, এবং সে কারণেই আবার কৃষিতে মৌল উৎপাদনের কাজও ব্যাহত হচ্ছিল। এদেশের বাজারে কোম্পানির এই একাধিকার তার রাজশক্তিকে আশ্রয় করেই টিকে আছে, সুতরাং এই রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি হস্তান্তরিত হয়, তাহলেই কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নতুন বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেবে। কোম্পানি যদি তার শাসকের ভূমিকা পরিহার করে কেবলমাত্র তার মূলধনের সক্রিয়তা নিয়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো সাধারণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নেমে আসতে বাধ্য হবে। অবাধ প্রতিযোগিতার সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, প্রাকৃতধনবাদী তত্ত্বের এই বক্তব্য আগেই আলোচিত হয়েছে।*

সুতরাং কোম্পানির সার্বভৌম অধিকার সম্পর্কে তাঁদের মতামতের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সিস ও আডাম স্মিথের চিন্তার মধ্যে দুটি বড়ো পার্থক্য প্রমাণিত হয়: একটি পদ্ধতিগত, অপরটি বিষয়গত। প্রথমত, আডাম স্মিথের জিজ্ঞাসার মূল কেন্দ্র ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সমস্যা। সেদেশে শিল্প বিকাশের পথসন্ধান করতে গিয়ে তিনি এদেশের রাজশক্তির সমস্যায় এসে পড়েছেন। কিন্তু ফিলিপ ফ্রান্সিসের জিজ্ঞাসার শুরু বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকেই। এদেশের কৃষি-বিকাশের পথসন্ধান করতে গিয়ে তিনি এদেশের রাষ্ট্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছেন। দ্বিতীয়ত, আডাম স্মিথের মতে অবাধ বাণিজ্যই মূল লক্ষ্য, কোম্পানির রাজশক্তি হরণ সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় মাত্র। কিন্তু ফ্রান্সিসের মতে প্রাকৃত কৃষিই মূল লক্ষ্য, অবাধ বাণিজ্য সেই লক্ষ্যসাধনের উপায়মাত্র।

---

* পরিচয়—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩।

ফলে, অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে এই দুজনের মতের মধ্যে একটি মৌলিক অমিল রয়ে গেছে। ফিলিপ ফ্রান্সিস শুধু বাংলাদেশের অন্তর্বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেই চায়। আডাম স্মিথের মতো অবাধ বাণিজ্যকে অর্থনৈতিক বিকাশের একটি ধ্রুব শর্ত বা শাশ্বত নিয়ম বলে মনে করতে তিনি তখনও প্রস্তুত নন। শুধু সাধারণভাবে কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিকার হরণের কথা ১৭৭৫ সালে তিনি আদৌ উত্থাপন করেন নি, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানিকে তার ব্যবসায়ীর ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখা। [আডাম স্মিথের অর্থে সামগ্রিক অবাধ বাণিজ্যের কথা ফ্রান্সিস প্রথম স্বীকার করলেন ১৭৯৩ সালে।[illegible] ভারতে ও ব্রিটেনে অবস্থার ঘোর পরিবর্তন হয়ে গেছে।]

এই মৌলিক পার্থক্যগুলি লক্ষ না করলে প্রাকৃতিকবাদী ফ্রান্সিসকে অবাধবাণিজ্যবাদী বলে মনে করায় অনৈতিহাসিক ভ্রান্তি ঘটতে পারে। কিন্তু আবার এই পার্থক্য মনে রেখেও স্বীকার করতে হয় যে প্রাকৃতবাদী চিন্তা যেমন সাধারণভাবে সামন্তবাদের বিরোধী শক্তি হিসাবে কার্যত অবাধ-বাণিজ্যেরই সহায় হয়েছিল, ফিলিপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারাও তেমনি বাণিজ্য-ধনবাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আঘাত হেনে কার্যত শিল্পধনের ভবিষ্যৎ বিজয় এবং অবাধবাণিজ্যের প্রগতিকেই সাহায্য করেছিল। ফ্রান্সিস ও আডাম স্মিথ তাই একই ইতিহাসকাণ্ডের ভিন্ন শাখা, ভিন্ন কিন্তু পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

---

(১) সি, ডয়েলির নিকট চিঠি, ২২ জানুয়ারী ১৭৭৬ : "দি ফ্রান্সিস লেটার্স" ১ম খণ্ড, ২৫১। (২) ফ্রা-পা, ৩৮ নং। (৩) ঐ। (৪) "লেটার ফ্রম মিঃ ফ্রান্সিস টু [illegible] ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৭৭। (৫) ফ্রা-পা, ৪৯ নং। (৬) ট্রাক্ট : উই হ্যাভ বিন [illegible], দি রং" (ডেব্রেট ১৭৮৫) ৪৬-৭। (৭) "হেড্স অব্ মিঃ ফ্রান্সিসেস্ স্পিচ্ ইন্ রিপ্লাই টু মিঃ ডাণ্ডাস্ অন্ দি ২৩ এপ্রিল ১৭৯৪", ৩-৫। (৮) ট্র্যাক্ট : "পপুলার টপিক্স", (ডেব্রেট ১৭৮৬) ২১-৪। (৯) ফার্মিংগার : ফিফ্থ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, ভূমিকা। (১০) ফ্রা-পা, ৩৬নং। (১১) "হেড্স অব্ মিঃ ফ্রান্সিসেস্ স্পিচ্" ইত্যাদি, ১৫-৬।

সমালোচনা

বই

বাংলা সাহিত্য ॥ মনোমোহন ঘোষ ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি ॥ দশ টাকা ॥

নামপত্র অনুসারে ডক্টর ঘোষ-এর বইটির বিষয়বস্তু "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষাভাষী জনগণের জীবনের সহিত এই ইতিহাসের সম্পর্ক"। এই সম্পর্ক দেখানোর জন্যে লেখক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের যুগভেদ অনুসারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করেছেন : (১) প্রাচীন কাল ও আদিযুগ (৮০০-১২০০ খ্রীঃ); (২) মধ্যকাল (১২০০-১৮০০ ; খ্রীঃ); (৩) আধুনিক কাল (১৮০০খ্রীঃ-বর্তমান সময়)। লেখক প্রত্যেক যুগের মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পটভূমিতে সাহিত্য রচনার ও সেইসঙ্গে সাহিত্যিকদের জীবনেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক ইতিহাসের তথ্যগুলি বেশ পরিষ্কার করে তিনি ফোটাতে পেরেছেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু জনগণের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যরচনার সম্পর্কের যেটুকু পরিচয় তাঁর বইতে পাওয়া যায় তা নিতান্তই ভাসা-ভাসা। এর জন্যে অবশ্য লেখককে খুব দোষী করা চলে না। কেননা, বাঙালীর জীবন ও বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণা সামান্যই অগ্রসর হয়েছে। এই গবেষণার যাঁরা পথিকৃৎ, ডক্টর ঘোষ যে তাদের মধ্যে গণ্য নন, তাঁর রচনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্থাৎ ডক্টর ঘোষের মাল-মশলা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব ও অবিসং-

বাদিত তথ্য। এই মাল-মশলার ব্যবহারে অবশ্য ডক্টর ঘোষ যে যথেষ্ট দক্ষ তা স্বীকার্য।

সংশোধন ও সংযোজন বাদে এই ইতিহাসের পাতার সংখ্যা ৭২৭। এর মধ্যে লেখক প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করেছেন ২০৫ পাতায়। তারপর ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্যের আলোচনায় বইয়ের বাকি পাতাগুলি ভর্তি করেছেন। বইটির দ্বিতীয়াংশের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' পরিচ্ছেদে বাংলার নতুন সাহিত্য প্রসঙ্গে ডক্টর ঘোষ লিখেছেন,

"এই সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব পড়িয়াছে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা আসিয়াছে ভিতর হইতে—বাহির হইতে নহে। নবীন বাংলাই নবীন বা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের স্রষ্টা।"

লেখকের এই মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "বাস্তবতাবোধ" প্রবন্ধের এই উক্তিটি তুলনীয়—

"ইংরাজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে। সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকে জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালীই হউক, এই শিক্ষাকেই ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়া দেশান্তরের সাহিত্য-কুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়া হোক, জীবন হইতে জীবন জাগিয়া ওঠে, মানবচিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।"

ডক্টর ঘোষের অন্তর্মুখীন দৃষ্টি সত্ত্বেও তাঁর তথ্যসমাবেশ যে মূল্যবান সেকথা আগেই বলেছি। মূল্যবিচারেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধার করা যেতে পারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য-রচনা সম্বন্ধে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি—

"১৮৪১ অব্দে অর্থাৎ বিদ্যাসাগর যখন সবে-মাত্র সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা

সমাপ্ত করিয়াছেন এবং কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সাংবৎসরিক উৎসবে দেবেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনার অন্তত ছয় বছর আগে, দেবেন্দ্রনাথের রচনা "গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতার" হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে মৃত্যুঞ্জয়ের বা তাঁহার পরবর্তী বিদ্যাসাগর আদির সমাসবাহুল্য বা শব্দাড়ম্বর একান্তভাবে অনুপস্থিত এবং ইহার শব্দবিন্যাসের রীতিও বাংলা গদ্যের সর্বজন-ব্যবহার্য সুন্দর রূপটিকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙালী তাঁহার এই মহান দানের কথা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে।"

লেখক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা মোটামুটি মামুলি হলেও রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে যারা অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত নন তাঁরা বইটির এই অংশে যথেষ্ট মূল্যবান তথ্য পাবেন। মনোমোহনবাবুর মতে, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক সাহিত্যবিচারে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র গ্যয়টের সঙ্গে তুলনীয়। এই তুলনা সমালোচকের মতে নিতান্ত ওপর ওপর। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে গ্যয়টে বা রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় কিনা সেকথা বলবার অধিকার শুধু তাঁদেরই আছে, জার্মান ও বাংলাভাষায় যাঁদের অধিকার সমান, অন্তত কাছাকাছি। মনোমোহনবাবুর এ অধিকার হয়তো আছে কিন্তু তার কোনো প্রমাণ তিনি দেন নি। মনোমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আর-এক জায়গায় বলেছেন—

> বিদ্যাপতির পদলালিত্য, জ্ঞানদাস-চণ্ডীদাসের গভীর আন্তরিকতা ও মধুর ভগবৎপ্রেম, ঔপনিষদিক ঋষিগণের আনন্দময় বিশ্বানুভূতি, বিহারীলালের সহজ সরল প্রকাশরীতি, মধুসূদনের আবেগময় ওজস্বিতা, স্কট-বায়রনের বলিষ্ঠ বর্ণনাভঙ্গী, ইত্যাদি আশ্চর্য গুণাবলী নানা মাত্রায় তাঁহার সুবিশাল গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠাপরম্পরায় স্বতঃই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মনোমোহনবাবুর এই উক্তি প্রবীণোচিত হয় নি। ইতিপূর্বে তিনি উল্লেখ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার প্রথম যুগে লোকে তাঁকে তুলনা করত শেলীর সঙ্গে। মনোমোহনবাবু কি ভুলে গেলেন ওয়ার্ডসওঅর্থ, কীট্স, টেনিসন প্রভৃতির কথা। স্কট-বায়রনের চাইতে এঁরা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথকে অনেক

বেশি প্রভাবান্বিত করেছেন। যদিও বিহারীলালের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে উল্লেখ করেছেন, তবু আজকের বিচারে কি একথা স্পষ্ট নয় যে বিহারীলাল তাঁর কাব্যরচনায় অকিঞ্চিৎকর নিমিত্তমাত্র, তার বেশি নয়? মনোমোহনবাবু মধুসূদনের কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের রচনার ওপর পাওয়া যায় কিনা সন্দেহকর, কিন্তু ভুলে গিয়েছেন বঙ্কিমের কথা, যাঁর গল্পরচনার ভঙ্গি ও সাহিত্যিক দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল।

বইটির শেষ পরিচ্ছেদে ডক্টর ঘোষ ১৯২০ থেকে ১৯৩১ এই যুগের কয়েকটি লেখকের নাম করেছেন: মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য। কি কারণে নজরুল ইসলাম এই মৃত ব্যক্তিদের দলভুক্ত হলেন জানি না। সম্ভবত লেখকের মতে জীবন্মৃত বলে। কিন্তু কাজীর "শেষের দিকে" রচিত "বহু সংখ্যক সুমধুর সঙ্গীতে"-এ যে তাঁর "কবিহৃদয় অভিনব মহিমায় প্রকাশিত হইয়াছে" এই উক্তি সত্যই বিস্ময়কর। কেননা এই গানগুলি কাজী রচনা করেছিলেন জীবিকার তাগিদে। "আধুনিক সঙ্গীত" নামে অপকৃষ্টের প্রেরণা কাজীর এই গানগুলি। অগ্নিযুগের কবি নজরুলের পতন শুরু হয় এই গান রচনা থেকে।

এই পরিচ্ছেদের শেষ অংশে মনোমোহনবাবু সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "শ্রেণীবিদ্বেষের অভিজ্ঞতা লইয়া রচিত এই একসুরের কবিতাগুলি হেয় নহে।" অর্থাৎ, সুকান্ত একেবারে ফেলনা। সুকান্তর কবিতা তাঁর মতে একেবারে ফেলনা নয়। শেকস্পীয়রের সনেট সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে, যদিও লেখক তা বলেন নি। শেকস্পীয়রের কথা সুকান্ত তো দূরের কথা রবীন্দ্রনাথও তুলনীয় নন, কিন্তু নজরুলের শেষের দিকে রচিত গানে যিনি কবিহৃদয়ের অভিনব মহিমার প্রকাশ দেখেন, সুকান্তের দুটি-একটি কবিতাতেও কি তিনি মহিমার সন্ধান পান নি?

মনোমোহনবাবুর বইএর দু-চারটি ত্রুটিবিচ্যুতি উল্লেখ করলাম। হয়তো এগুলি ত্রুটিবিচ্যুতি নয়, শুধু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ব্যাপার। আরও হয়তো ত্রুটিবিচ্যুতি আছে যা আমার চোখে পড়ে নি, কেননা আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু একটি ভল্যুমে ও মাত্র দশ টাকা দামে যে বহু জ্ঞাতব্য ও মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ করেছেন, আশা করি তা স্বীকৃত হবে।

ব্যক্তির সীমানা ছেড়ে সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে
আশ্চর্য এবং যারা জীবনেরই দেয় সার্থকতা,
কবিতায় দীপ্ত হয় দৈনিক তুচ্ছতা
সে-আঘাতে হানো।'

আমরা খুশি হতাম যদি জীবনের নতুন বাঁকে চৈতন্যের প্রেরণায় কবি আরো কোন কবিতা আমাদের উপহার দিতে পারতেন। তবু প্রবোধবাবু মহাবাস্তবতাকে অস্বীকার করেন নি, জীবন থেকে পলায়ন করেন নি এবং কাব্যের নির্বিশেষে সত্তার নামে অস্বচ্ছ চিত্রকল্পে, কবি-কল্পনাকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করেও তোলেন নি, এটাই তাঁর সততার লক্ষণ। এই কবি-সততা আছে বলেই প্রবোধবাবু 'কোন এক শস্যক্ষেত্রে দুঃখ' দৈনন্দিন তুচ্ছতার ঊর্ধ্বেও তাকে স্থান দিতে পারেন, কিংবা 'অবরোধ' কবিতায় ভাঙা-বাংলার মর্মবেদনা ব্যক্ত করতে পারেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। প্রবোধবাবুর 'দুই দৃষ্টি', 'যুগ' ও 'রোজরাত্রির গানে'ও তাঁর কবি-সত্তার খণ্ডিত চিত্র উপস্থিত।

তবে কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিকে এমন অনেক কবিতা আছে যা অপটুত্বের দায়মুক্ত নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবি-মন সুন্দর কাব্যোপকরণ সংগ্রহ করা সত্ত্বেও প্রকাশ-বৈগুণ্যে পাঠকের চিত্তজয় করতে সক্ষম হয় নি। আসলে কবি খুব বেশি আঙ্গিক-সচেতন নন বলেই মনে হল স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যাবেগেই তাঁর কবি-মনের স্ফূর্তি। এক্ষেত্রে কবিকে আরো সজাগ হতে অনুরোধ করব—তাহলে প্রাচীনপন্থী দুর্বল মিলের আশ্রয় থেকেও কবি সহজে মুক্ত হতে পারবেন।

কবি চিত্ত সিংহের 'বাউল' কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি পংক্তি কিংবা চিত্র-কল্প যে পাওয়া যায় না, এমন নয়। কিন্তু যে কবি-মন কোনো সংহত ভাব-কল্পনার কেন্দ্রভূমিতে সজাগ থেকে সত্য ধ্যান-ধারণার শিল্প সমন্বিত রূপ তুলে ধরতে না পারে, সে কবি-মনের সৃষ্টি আর যাই হোক কাব্য হয় না। 'বাউল' কাব্যের আটাশটি কবিতা সম্পর্কেই একথা মনে হবে। কবির আবেগ আছে কিন্তু সংযম নেই। কথার পর কথা সাজাবার খেলা আছে কিন্তু ভাবসংগতি নেই। কবি চিত্ত সিংহের কাছে

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু কি? ডাঃ রায় চৌধুরী ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাসের রচয়িতা ট্রেভেলিয়ানের মতামত উল্লেখ করেছেন। ট্রেভেলিয়ান বলেন, সামাজিক ইতিহাসে থাকবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানসিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পরিবার এবং গার্হস্থ্য জীবনের চরিত্র, শ্রম ও বিশ্রামের অবস্থা, এবং যুগসংস্কৃতি যা ধর্মে, সাহিত্যে ও সংগীতে, স্থাপত্যে, জ্ঞানবিদ্যায় এবং চিন্তায় নিত্য নূতন রূপে প্রকাশমান। সোজা কথায় শ্রেণী-সম্পর্ক, মানুষের জীবনযাত্রা, ধ্যান-ধারণা, সমাজ ও সংস্কৃতি — এই সবই সামাজিক ইতিহাসের উপজীব্য। সামাজিক ইতিহাসের পরিসর স্পষ্টত ব্যাপক, বিগত যুগের মানুষ এবং তার সমাজের পুরো চেহারাটা উদঘাটন করাই এর লক্ষ্য।

১৫৭৫ সনে সুবা বাংলার প্রতিষ্ঠা। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যতম প্রদেশ হিসাবে বাংলার জীবনের হল শুরু। বাংলা দেশ জুড়ে একটি কেন্দ্রীয় শাসন, রাজস্বব্যবস্থা, "Pan Mughalia"র শান্তি ও শৃঙ্খলার সূচনা হল। মোগল সম্রাটের নিযুক্ত সুবাদারের উপর বাংলার শাসনভার পড়ল। প্রথমেই আভ্যন্তরীণ শাসনের যে কাজে সুবাদার হাত দিলেন তা হল রাজস্ব-ব্যবস্থার পত্তন। এই রাজস্ব-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি? জমিদারি, জাগিরদারি, "খালসা"কে (ক্রাউন ল্যাণ্ড) কেন্দ্র করেই রাজস্ব-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, রায়চৌধুরী এই মত প্রকাশ করেছেন। মোগল যুগেই যে জমিদারি প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মত নূতন নয়। বাংলার প্রসিদ্ধ "বার ভুঁইঞা," সুসংএর রাজা, বীরভূম, হিজলী এবং চন্দ্রকোণার জমিদারগণ—এরাই ছিলেন সেযুগের প্রধান জমিদারবংশ। রাজাকে এরা দিতেন "পেশকস্" বা ট্রিবিউট। শুধু জমিদারই নয়, "তালুকদার" এবং অন্যান্য মধ্যস্বত্ব-ভোগারাও ছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে লেখক দেখিয়েছেন যে, গুজরাটে কালকেতুর রাজ্যে "কায়স্থ"দের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে "ল্যাণ্ড ট্যাক্স" বা ভূমি-কর ছাড়া আদায় করতেন নানা উপরি, যথা,—"সেলামী," "পার্ঠনী," "তোলা," ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন এসে পড়ে। মোগল যুগে কি সামন্ততান্ত্রিক কর (ফিউডাল রেণ্ট) চালু হয়েছিল? জমিদাররা কি করের বিনিময়ে

দের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কৃষ্ণের প্রতি "সখ্য প্রেম", "বাৎসল্য প্রেম," "কান্তা প্রেম" নিবেদন করে ধন্য হতে হবে। জ্ঞানমার্গের পথিক হওয়া নিম গাছের তিক্ত ফলে ঠোকর মারা কাকেরই সমতুল। (পৃঃ ১৫২—৫৩, রায় চৌধুরী)। জ্ঞান-না ভক্তি-মার্গের পথিক হয়ে "নাম-সংকীর্তনের" মাধ্যমে কৃষ্ণের নিকটবর্তী হতে হবে। বৈষ্ণবদের এই প্রচার সমাজের রূঢ় বাস্তব থেকে পলায়নেরই শিক্ষা। মহাযানপন্থীদের বিষ্ণুর অবতাররূপে বুদ্ধমূর্তির পূজার মতো, বৈষ্ণব এবং হিন্দুধর্মেও চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণ অবতার রূপে পূজার প্রচলন হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রতিযোগিতার সামনে বৌদ্ধধর্ম হার মেনেছে। বখতিয়ারের বঙ্গ-বিহার বিজয়ের পরে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি ঘটেছে। মোগলযুগে দেখি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর ছড়াছড়ি। তান্ত্রিক মতের ছোঁয়াচ লেগে দেবীদেরই আদরই যেন বেশি। ভবানী, ভগবতী, মহামায়া, কালী, তারা, সারদা, চণ্ডী, জয়চণ্ডী, বাশুলী প্রভৃতি অসংখ্য দেবীর পূজার প্রচলন দেখা যায়। অমঙ্গল এবং রোগ নিবারণের জন্য লোকে মনসা, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত। মেয়েদের মধ্যে ব্রত-পার্বণ-গঙ্গাস্নান তো ছিলই। ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে রূপটির সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত, মোগল যুগে তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখি।

চৈতন্য শূদ্রকে কোলে স্থান দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন যে, শূদ্রও প্রেম এবং ভক্তির জোরে কৃষ্ণের কাছে যেতে পারে। হিন্দুধর্ম চৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করলেও শূদ্রকে অচ্ছুৎ করেই রাখল। জাতিভেদ-প্রথা দিন দিন কঠোরই হতে লাগল। সমাজের শীর্ষে অবস্থান করতেন ব্রাহ্মণগণ। তাঁদের এবং বিশেষ করে পুরোহিতদের প্রভাব প্রায় অসীম হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণদের বিধান মতোই সমাজ চলত।

ইউরোপ যখন রেনেসাঁস এবং রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রভাবে এক নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করছিল, বাংলায় (এবং ভারতে) তখন চলছে মোগল যুগ —শত বাধা-নিষেধে ঘেরা অনড় অচল সমাজ। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজো, জাতিভেদ ও কৌলীন্য প্রথা; বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ, টোলে টোলে বিজ্ঞান নয়, ইতিহাস নয়, গণিত নয়, শুধু ন্যায় বেদের চর্চা; আমীর-ওমরাহ, জাগিরদার, জমিদারদের অতি কদর্য নৈতিক

কালিদাস স্মরণে

এবারে শান্তি সংসদের উদ্যোগে দক্ষিণ কলিকাতায় কালিদাস স্মৃতি বার্ষিকী উদযাপিত হল। খাস বিশ্বশান্তি সংসদের ডাকে এই সভা। ছোট্ট সভা বসল ৭নং গড়িয়াহাট রোডের দোতলায় সুসজ্জিত কক্ষে। সভাপতি হলেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সভার ক্ষীণকায়তায় যখন কিছুটা বিমর্ষ হয়ে বসে আছি তখন উপস্থিত হলেন একটি চাদর গায়ে দিয়ে প্রধান বক্তা পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী। বাহাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ তিনি এবং হৃদযন্ত্রের দারুণ বিকলতায় আক্রান্ত। কিন্তু যখন বলতে আরম্ভ করলেন তিনি তখন সভার হাওয়া একদম বদলে গেল। যেমন তাঁর গলার জোর তেমনই তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা! অতি সহজ বাংলায় সংস্কৃত শ্লোক যথা-সম্ভব বর্জন করে তিনি কালিদাসের প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি ব্যাখ্যা করে গেলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরলেন প্রাণনত মেঘদূত এবং রঘুবংশ থেকে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর ও অজবিলাপ। কালিদাসের অতুলনীয় সংযম, সৌন্দর্য-বোধ, লৌকিক বচনের প্রতি অনুরাগ এবং মানবিকতা—এইগুলির উপরই জোর দিলেন শাস্ত্রী মহাশয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পর বললেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য। উপসংহারে সভাপতি তাঁর অভ্যস্ত প্রসন্নতার সঙ্গে কয়েকটি মনোনীত মন্তব্য করার পর সভার কাজ শেষ হল। ফেরার পথে আমরা বলাবলি করতে লাগলাম যে আজ মূর্তিমান্ সংস্কৃতিকে দেখলাম। মানুষকে ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাবনাকে ভালো না বাসলে যে কাব্যকে ভালবাসা যায় না তা আজ উপলব্ধি করলাম।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

পাঠক-গোষ্ঠী

রেডিও সাহিত্য সমাচার

কিছুকাল আগে দিল্লী বেতার-কেন্দ্র থেকে সর্বভারতীয় সাহিত্যের (কবিতা) একটি উৎসব-অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। সর্বভারতীয় সাহিত্য-সমারোহ অর্থে যদি হিন্দী-প্রচার না হয়ে থাকে, তবে কেমন করে এ অনুষ্ঠানের মোট একশত জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৪ জনই হিন্দী ভাষা থেকে আসেন, বুঝি না। তুলনায় বাকি বারোটি ভাষার জন্য ৬৬টি প্রতিনিধি ধরলে দাঁড়ায় ভাষাপিছু মাত্র পাঁচ বড়োজোর ছয় জন। এ ব্যবস্থা কি সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য, না হিন্দীভাষী নেতাদের রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে?

সাহিত্য-সমারোহের আর-একটি উদ্দেশ্য যদি হয়, সর্বভাষার সাহিত্য রসের বিতরণ, তবে সেটিও মাটি হয়েছে। কেননা বিভিন্ন ভাষায় কবিতা-প্রবন্ধাদির অনুবাদ হয়েছে যে-হিন্দীতে শ্রোতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার একবর্ণ বুঝতে পারেন নি। হিন্দীর বদলে ইংরেজিতে অনুবাদ হলে অন্তত অন্যান্য ভারতীয় বিশেষ করে দক্ষিণ-ভারতীয় সাহিত্যিক-কবি ও রসবেত্তাদের সুবিধা হত। প্রথম দিনের প্রথমার্ধে সমারোহ ইংরেজিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরে এ নীতি পরিবর্তিত হল কেন? উদ্যোক্তাদের ভাষা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সংখ্যাগুরু অন্যান্য ভাষাভাষীদের রসবোধকে বিড়ম্বিত করার প্রয়োজন ছিল কি?

সর্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে হিন্দী সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সংখ্যায় তাঁরাই ছিলেন বেশি যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের চেয়ে আত্ম-প্রচারের প্রয়োজনে, মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা নানান্য 'কারোবারই'গুলিতে সময়, মনোযোগ ও দক্ষতা নিয়োগ করে থাকেন।

অবশ্য কয়েকজন সত্যকার প্রতিনিধির গরবার অধিকারী ছিলেন, তাঁরা মান্য; কিন্তু দেখা গেল এমনকি তাঁদেরও কেউ কেউ নিজের ও অপরাপর সাহিত্যগুলির প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করতে পারেন নি। কাব্যের ধারার ইতিহাস তাঁরা সততার সঙ্গে বর্ণনা করেন নি।

সমগ্র বাংলা ভাষার গানের কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ভারতীয় সাহিত্যসৃষ্টিতে কি পরিমাণে পড়েছে এবং হিন্দী যে এ-ক্ষেত্রে রীতিমতো ঋণী একথা উল্লেখ মাত্র না করলেই কি ইতিহাসে তা নিরুক্ত হয়ে থাকবে? বিস্ময়ের কথা, হিন্দী কবিতার প্রগতিধারায় রবীন্দ্রনাথের নাম একটিবারও উচ্চারিত হল না। অথচ গুজরাটি ও দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিনিধি কিন্তু মহাকবির ঋণ সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করলেন।

আরো একটি মজা। হিন্দী কবিতার গতি নির্ধারিত হল হিন্দীকবিদের বয়স হিসাব করে। ফলে বাদ পড়লেন সুমিত্রানন্দন পন্থ এবং মহাদেবী। আধুনিক প্রগতিবাদী কবিদের কেউই উল্লেখিত হলেন না। একথা বলাই বাহুল্য হিন্দী কবিতায় "প্রয়োগবাদী" ধারার পুরোভাগে কবি অজ্ঞেয় বাৎস্যায়নের নাম সযত্নে এড়িয়ে যাবার প্রয়োজনই বা হল কেন? [illegible] শ্রেণীবিশেষের অ-ভাষা-বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা এবং তারই সঙ্গে অন্ধ স্বার্থপরায়ণতার উৎকট কুরুচি প্রকাশের সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকার অনবরতই দিয়ে আসছেন—কি আজন্ম-সাধন-ধন কবিতা কল্পনা-লতার ক্ষেত্রেও এমন আচরণ দেখে চিত্ত পীড়িত না হয়ে পারে না।

বাংলা কবিতার প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। বন্ধুগোষ্ঠীর বাইরে বাঙলার আধুনিক কবিদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে তিনি কুণ্ঠিত হলেন দেখে কষ্ট হল। রবীন্দ্রোত্তর কবি হিসাবে তিনি অন্যতম অগ্রগণ্য। এ মনোভাব সেইজন্যই আরো খেদজনক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় আবৃত্তি করলেন 'তিনটি গুলি'। বাংলার আধুনিক কাব্যধারায় 'তিনটি গুলি'র কোনো সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় কি? মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে বহু কবিতা সর্বভাষায় রচিত হয়েছে। 'তিনটি গুলি' যে সেই সব কবিতার প্রতিনিধিত্ব করবার মত কবিতা নয় স্বয়ং মিত্র মহাশয়ও নিশ্চয় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এ কি শুধু এইজন্য যে হিন্দী (বিশেষরূপে?) শ্রোতার সম্মুখে কেবল গান্ধীজী অথবা গান্ধীবাদের পরিবেশন করতে হবে বলে তাঁর ধারণা হয়েছে। হলে আফশোসের কথা।

পরিশেষে সাধারণ একজন শ্রোতা হিসেবে এই প্রশ্ন করি সাহিত্যের উৎসবে এই প্রদেশগত, ব্যক্তিগত নগদ-বিদায় ছাড়া সত্যকার সার্থকতার আয়োজন করার সময় কি এখনো আসে নি?

মায়া গু